আমাদের
রবীন্দ্রনাথ

আমাদের রবীন্দ্রনাথ

AMADER RABINDRANATH

[A short biography & criticism of his works]

Bengali

আমাদের রবীন্দ্রনাথ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ভারতবর্ষে, কিন্তু তাঁর জীবনের বিকাশক্ষেত্র তিনটি মহাদেশ। তাঁর মত চিন্তাশীল কর্মবহুল জীবন পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। ভাবুকতা ও কর্মপ্রাধান্যের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে তাঁর জীবনে। তাঁর জীবন-কথা বাদ দিয়ে শুধু সাহিত্য বিচার করলে তা অসম্পূর্ণ; আবার সাহিত্য-সৃষ্টি বাদ দিয়ে শুধু জীবন-কথা বললেও তা একদেশদর্শী। আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম, দেশ, জাতি ও সমাজের সকল দিকের মনস্বিতার উৎস ছিলেন তিনি। ভারতীয় ঐতিহ্যের সর্বধারা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল একক এই মানুষটির মধ্যে তিনিই ছিলেন এযুগের অদ্বিতীয় 'ভারত পথিক'।

রবীন্দ্র ভাবধারার এই ব্যাপকতা কিশোর ছাত্রছাত্রী মহলে সুপরিজ্ঞাত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই তা সীমিত। রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা ও নাটকের বাহিরেও যে বিরাট ব্যক্তিসত্ত্বা, তা অনেক ছেলেমেয়েই ভালমত জানে না। বহু গ্রন্থ পাঠ করে সে তথ্য জানার মত বয়স, বুদ্ধি, ধৈর্য ও অবসর তাদের নেই। সেইজন্য বিশেষ করে বাঙালী কিশোর ছাত্রসমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথের একটি সামগ্রিক রূপ সংক্ষেপে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন আছে।

কয়েক বছর আগে মাদ্রাজী ও গুজরাটি ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে জানবার ও বুঝবার জন্য তাদের মধ্যে যে আগ্রহ দেখেছি, তাতে বাঙালী ছাত্রসমাজের দৈন্য স্বতঃই মনে উঠেছে। সেই কথা মনে করেই এই বইখানি রচনার প্রয়াস পেয়েছি। সংক্ষেপে রবীন্দ্র জীবন-কথা ও রবীন্দ্র সাহিত্য বিচারের মূলসূত্র বিদগ্ধ সমালোচকদের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে দিয়েছি। এতে উৎসাহী কিশোর-কিশোরীরা মূল গ্রন্থ পাঠে আগ্রহশীল ও রবীন্দ্রচর্চার সুযোগী হবে,—এই বিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গ্রন্থের একটি তালিকাও দিয়েছি। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্র-পাঠকপাঠিকাদের জেনে রাখা ভাল, যে রবীন্দ্রচর্চার প্রারম্ভিক গ্রন্থ হিসাবে প্রভাতবাবুর রবীন্দ্র-জীবনী অবশ্য পাঠ্য।

এই গ্রন্থখানি রচনাকালে নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার, শ্রীযুক্তা রেণুকা কর, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুহৃদ লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ,

কানাইস্মৃতি পাঠাগারের শ্রীমান গোবিন্দ মল্লিক, জয়শ্রী পত্রিকার কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি, তাঁদেরকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। সব শেষে শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডলের উল্লেখ করতে হয়, তাঁরই উৎসাহে এই বই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ কবির হস্তলিপি প্রকাশের যে অনুমতি দিয়েছেন সেজন্য তাঁরাও ধন্যবদার্হ।

যেসব বিদগ্ধ সমালোচকদের গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচারের মূলসূত্র উদ্ধৃত করেছি, তাঁদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের বিচার বিশ্লেষণ রবীন্দ্র ভাবধারাকে পাঠক সমাজের কাছে সহজবোধ্য করেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য-চর্চার পক্ষে তাঁদের মূল গ্রন্থগুলি অপরিহার্য।

প্রসঙ্গতঃ,আরেকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশকের লাভের জন্য এ গ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থের লভ্যাংশ, বাংলার শিশু-সাহিত্যিক, শিল্পী ও শিশু-পত্রিকার সম্পাদকদের সম্মিলিত একমাত্র প্রতিষ্ঠান 'শিশু সাহিত্য পরিষদ'-এ রবীন্দ্র-চর্চা-কেন্দ্র সংগঠনে ব্যয় করা হবে।

সর্বশেষে, কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে এই গ্রন্থ রচনা, পাঠক-পাঠিকারা এ-কথা মনে রাখলে সুখী হবো। তবু যা কিছু বলা হয়নি বা বলতে পারিনি, আর যেখানে যা ত্রুটি রয়ে গেল, তার জন্য দায়ী আমার জ্ঞানের স্বল্পতা ও অক্ষমতা।

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

যে সব বই থেকে সাহায্য নিয়েছি :

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

পিতৃস্মৃতি—সৌদামিনী দেবী—প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮

আমার জীবন—নবীনচন্দ্র সেন

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ—ঐ

পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ—শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ—ঐ

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ—প্রফুল্লকুমার সরকার

রবীন্দ্রনাথ—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ, দি পোয়েট এণ্ড ফিলজফার—ঐ

রবীন্দ্রনাথ—দেবজ্যোতি বর্মন

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্র বিচিত্রা—ঐ

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—ঐ

রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ—ঐ

রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ—ঐ

বিশ্ব ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ—জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

বাহিরবিশ্বে রবীন্দ্রনাথ—জয়ন্ত ভাদুড়ি ও শিশির সেন

দ্বীপময় ভারত—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বক্তব্য—ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

জীবনশিল্পী—অন্নদাশঙ্কর রায়

রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—ডঃ নীহার রঞ্জন রায়

রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা—ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা—ঐ

নায়কের মৃত্যু—শিবনারায়ণ রায়

রবিরশ্মি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ—ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য—যতীন্দ্রমোহন বাগচি

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলার প্রাণ—নলিনীকান্ত গুপ্ত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

বাংলা উপন্যাসের ধারা—অচ্যুৎ গোস্বামী

আর্ট ও সাহিত্য—ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস—ডঃ মনোরঞ্জন জান।

সাহিত্য চর্চা—বুদ্ধদেব বসু

সাহিত্য বিচিত্রা—রথীন্দ্রনাথ রায়

সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্র সংগীতের ধারা—শুভ গুহঠাকুরতা

কাব্য পরিক্রমা—অজিতকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্র সংগীতের ভূমিকা—কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাণ—প্রতিমা ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের গান—সৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর

কথাগুচ্ছ—এম, সি, সরকার প্রকাশিত

বিচিত্রা মাসিক পত্রিকা—১৩৩৮

জয়শ্রী মাসিক পত্রিকা

রামধনু মাসিক প।ত্রকা

আনন্দবাজার পত্রিকা

দেশ সাপ্তাহিক পত্রিকা

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে;—
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা;—
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী;—
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।

'আশা' কবিতার পাণ্ডুলিপি

[বিশ্বভারতীর সৌজন্যে]

আমাদের রবীন্দ্রনাথ

শিশুর নামকরণ হবে।

পিতা বৈদান্তিক, সাধনা ও ভগবৎ চিন্তাতেই দিন কাটান, বললেন—নামকরণের সময় যে পিঁড়িতে খোকা বসবে তার চারিপাশে মোমবাতি জেলে দিও।

অন্নপ্রাশনের সময় শিশুর পিঁড়ির চারিপাশে বাতি জেলে দেওয়া হলো।

পিতা পুত্রের নামকরণ করলেন—রবীন্দ্রনাথ। "রবির অন্নপ্রাশনের যে পিঁড়ির উপরে আলপনার সংগে তাহার নাম লেখা হইয়াছিল, সেই পিঁড়ির চারিধারে পিতার আদেশে ছোট ছোট গর্ত করানো হয়। সেই গর্তের মধ্যে সারি সারি মোমবাতি বসাইয়া তিনি আমাদের তাহা জালিয়া দিতে বলিলেন। নামকরণের দিন তাহার নামের চারিদিকে বাতি জলিতে লাগিল—রবির নামের উপরে সেই মহাত্মার আশীর্বাদ এইরূপেই ব্যক্ত হইয়াছিল।"

[—পিতৃস্মৃতি

সেদিন হয়তো এই দীপাবলীকে শুধুই উৎসবের এক বিশেষ সমারোহ বলে অনেকের কাছে মনে হয়েছিল। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সাধক পুরুষ, মনস্বিতার যে আলোক ভবিষ্যতে একদিন সারা ভারত ও বাহির-বিশ্বকে আলোকিত করবে, মহর্ষি পূর্বাহ্নেই তা বুঝতে পেরে এই দীপাবলীর সমারোহ করেছিঁলেন কি না কে জানে।

রবীন্দ্রনাথের ভাইবোন অনেকগুলি।

মায়ের সান্নিধ্য তিনি খুব বেশী পাননি। বেশীর ভাগ সময়ই কাটতো চাকরদের মহলে। তাদের মধ্যে দু'জনই ছিল বালকের কাছে বিশেষ পরিচিত—ব্রজেশ্বর ও শ্যাম।

ছেলেদের খাওয়ানোর ভার ছিল ব্রজেশ্বরের উপর। ব্রজেশ্বর মানুষটি ছিল লোভী, তার উপর ছিল আফিম খাওয়ার অভ্যাস। খাবার সময় দু'খানি লুচি দিয়েই সে জিজ্ঞাসা করতো—আর লুচি চাই কি?

রবীন্দ্রনাথ চিরকালই ভালমানুষ। বয়স কম হলেও এটুকু তিনি বুঝতে পারতেন যে লুচিগুলির উপর ব্রজেশ্বরের লোভ আছে, তাই বলতেন—না, আর চাই না।

ব্রজেশ্বর আর পীড়াপীড়ি করতো না।

আফিমখোরের দুধ না হলে চলে না। তাই বালকের ভাগ্যে দুধের ভাগও সর্বদাই কম পড়তো।

তাছাড়া সময়-অসময় ব্রজেশ্বরের হাতের দু-একঘা চড়-চাপড়ও বালককে সইতে হয়েছে।

"ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসরাজাদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিল না। আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না। এই-সকল রাজাদের পরিবর্তন বারম্বার ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকল-তাতেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তখন এ-সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনার অবসর পাই নাই—পিঠে যাহা পড়িত তাহা পিঠে করিয়াই লইতাম এবং মনে জানিতাম, সংসারের ধর্মই এই—বড়ো যে সে মারে, ছোটো যে সে মার খায়।"

[—জীবনস্মৃতি

তবে চাকরদের মধ্যে একজনকে বালকের ভাল লাগতো—সে শ্যাম।—"রং ছিল শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ, তেল চুকচুকে লম্বা চুল, মজবুত দোহারা শরীর। তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না, মন ছিল সাদা। ছেলেদের 'পরে ছিল তার দরদ।" [—ছেলেবেলা

শ্যাম ছোটদের কাছে ডাকাতির গল্প বলতো—রঘু ডাকাত বিশু ডাকাতের গল্প। চিঠি দিয়ে তারা ডাকাতি করতে আসতো, তাদের হাঁক শুনলে গৃহস্থের বুক টিপ্ টিপ্ করতো। "ডাকাতি তখন গোঁয়ারের মতো নিছক খুনখারাপির ব্যাপার ছিল না। তাতে যেমন ছিল বুকের পাটা, তেমনি দরাজ মন।"

[—ছেলেবেলা

শ্যামের গল্প ছেলেদের মুগ্ধ করতো। কল্পনার রং মিশে ডাকাতদের বীরত্ব তাদের ভাবের রাজ্য দখল করে বসতো।

এই ভাবরাজ্যে মাঝে মাঝে এসে দেখা দিত বাস্তবের দৃশ্যকাব্য—পাইক ও লাঠিয়ালরা মাঝে মাঝে ঠাকুরবাড়ীতে ডাকাতের খেলা দেখাতো। তাদের ঢেঁকী চালানো, রণ-পা চড়া, লাঠি খেলা, বালকদের মুগ্ধ করতো। বালক

কবি অবসর সময়ে মনে মনে কল্পনা করতেন—সত্যিকারের ডাকাতদের সঙ্গে মুখোমুখি একবার দেখা হলে কি মজাই না হয়।

"হাতে-লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি' "দাঁড়া খবরদার,
এক পা কাছে আসিস যদি আর
এই চেয়ে দেখ্ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।"
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল "হারে রে রে রে রে॥"

তারপর—

"ছুটিয়ে ঘোড়া গেলাম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্ঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হোলো মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক-যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।"

কিন্তু সত্যিকারের এমন ঘটনা তো বাস্তবে ঘটে না।—

"রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা,
এমন কেন সত্যি হয় না আহা।
ঠিক যেন এক গল্প হোত তবে,
শুনত যারা অবাক হ'ত সবে,…" [—বীরপুরুষ

রূপকথার রাজ্যে কল্পনাপ্রসারী এই শিশু-মন নিয়ে বালক সারা দুপুর বন্দী হয়ে থাকতো শ্যামের গণ্ডি দেওয়া দোতলার ছোট ঘরখানির মধ্যে।

শ্যাম দুপুরবেলা বালককে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে চারিপাশে একটি খড়ির দাগ কেটে দিয়ে বলতো—এ লক্ষ্মণের গণ্ডি, পার হলেই বিপদ।

বালক রামায়ণের গল্প শুনেছেন। লক্ষ্মণ সীতাকে গণ্ডি দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই গণ্ডি পার হয়েই তো সীতার বিপদ হলো। শ্যামের এই গণ্ডি পার হলে তারও তেমনি কি বিপদ ঘটবে কে জানে। বালক সারাদিন গণ্ডি পার হয় না। জানালার ধারে বসে বাইরের পানে তাকিয়ে থাকেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী। বাড়ীটির সামনেই একটি পুকুর। পুকুরের পূব্‌দিকে পাঁচিলের গায়ে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ আর দক্ষিণদিকে নারিকেল গাছের সারি। সুন্দর শান্ত ছেলেটি বড় বড় চোখ মেলে পুকুরটির পানে সারাক্ষণ চেয়ে থাকে। ওই পুকুরটিই ছিল বালকের কল্পলোক।

"উপরের তলা থেকে
চেয়ে দেখে
না-দেখা গভীরে ওর মায়াপুরী এঁকেছিনু মনে।
নাগকন্যা মাণিক দর্পণে
সেথায় গাঁথিছে বেণী,
কুঞ্চিত লহরিকার শ্রেণী
ভেসে যায় এঁকেবেঁকে
যখন বিকেল হাওয়া জাগিয়া উঠিত থেকে থেকে।
তীরে যত গাছপালা পাখি
তারা আছে অন্য লোকে, এ শুধু একাকী।
তাই সব
যত কিছু অসম্ভব
কল্পনার মিটাইত সাধ
কোথাও ছিল না প্রতিবাদ।" [—আকাশপ্রদীপ

বিকালে শ্যাম এসে ডাকতো, তখন বালক গণ্ডি পার হতেন।

বয়স বাড়লো। চাকরদের বাধা-নিষেধ কিছুটা কমলো। তখন বালক মাঝে মাঝে দুপুরবেলা লুকিয়ে ছাদে উঠে আসতেন।—

"আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই দুপুর বেলায়। বরাবর এই দুপুর বেলাটা নিয়েছে আমার মন ভুলিয়ে। ও যেন দিনের বেলাকার রাত্তির, বালক সন্ন্যাসীর বিবাগী হয়ে যাবার সময়।...দরজার ঠিক সামনেই ছিল একটি সোফা; সেইখানে অত্যন্ত একলা হয়ে বসতুম।...রাঙা হয়ে আসত রোদ্দুর, চিল ডেকে যেত আকাশে। সামনের গলি দিয়ে হেঁকে যেত চুড়িওয়ালা।...

"দিনের আলো আসছে ঘোলা হয়ে। মন খারাপ নিয়ে একবার ছাদটা ঘুরে আসা গেল, নিচের দিকে দেখলুম তাকিয়ে, পুকুর থেকে পাতিহাঁসগুলো উঠে গিয়েছে। লোকজনের আনাগোণা আরম্ভ হয়েছে ঘাটে, বটগাছের ছায়া

পড়েছে অর্ধেক পুকুর জুড়ে, রাস্তা থেকে [illegible] সইসের হাঁক শোনা যাচ্ছে।" [—ছেলেবেলা

দিনগুলো এমনি চলে যায় একটানা।

ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ ছিলেন বয়সে কিছু বড়। ইস্কুলে পড়তেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এসে তিনি মামাকে রোজই শোনাতেন নানা মজার গল্প। ইস্কুলের গল্প। যত শোনেন ততই ভাল লাগে। শেষে বালক মামা আর মুখ বুঁজে থাকতে পারলেন না, একদিন বায়না ধরলেন—আমি ইস্কুলে যাব।

কিন্তু ছোট ছেলের কথায় বাড়ীর কেউ কান দিলেন না বালক তখন কান্না জুড়লেন—আমি ইস্কুলে যাব!

বাড়ীতে যে মাষ্টারমশাই তখন পড়াতেন কান্না থামাবার সনাতন রীতি তাঁর জানা ছিল। তিনি এক প্রবল চপেটাঘাত করে বললেন—এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদছ, না-যাবার জন্য এর চেয়ে অনেক বেশী কাঁদতে হবে।

গৃহশিক্ষকের সেই কথাটা পরে অবশ্য সত্যসত্যই ফলে গিয়েছিল। কবি রহস্য করে লিখেছেন—"সেই গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। এতবড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী জীবনে আর-কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।" [—জীবনস্মৃতি

যাক্ কান্নার জোরেই বালক ইস্কুলে ভর্তি হলেন। কবির বয়স তখন ছ'বছর।

প্রথমে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে বছর খানেক।

তারপর নর্ম্যাল ইস্কুল।

নর্ম্যাল ইস্কুলের শিক্ষকদের ব্যবহার ভাল ছিল না।

হরনাথ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন, তিনি এমন কটুভাষায় গালাগালি দিতেন যার জন্য বালক শিক্ষার্থীর মনে তিনি কোন শ্রদ্ধা জাগাতে পারেন নি। এই পণ্ডিতটির সঙ্গে কথা বলতে বালকের ইচ্ছা করতো না। তিনি কোন প্রশ্ন করলে বালক তাঁর কথার কোন জবাব দিতেন না। নীরবে ক্লাশের সকল ছাত্রের শেষে বসে থাকতেন।

পড়া না বলার জন্য হরনাথ পণ্ডিতের ক্লাশে তাঁকে অনেক শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। দুপুর রোদে মাথা হেঁট করে পিঠকে ধনুকের মত বেঁকিয়ে বালককে পণ্ডিতমশাই দাঁড় করিয়ে রাখতেন। তবু বালক তাঁর কথার উত্তর

দিতেন না। হরনাথ পণ্ডিত ধরে নিয়েছিলেন—এ ছেলে নিতান্তই গণ্ডমূর্খ হবে এবং পড়াশুনা হবার কোন আশা নেই।

কিন্তু বছর শেষে মধুসূদন বাচস্পতি যখন বার্ষিক পরীক্ষা নিলেন রবীন্দ্রনাথ বাংলায় প্রথম হলেন। হরনাথ বললেন—এ বিশ্বাস করা যায় না। যে ছেলে সারা বছর কিছু পড়েনি, সে কেমন করে এত নম্বর পেলে? নিশ্চয়ই পরীক্ষক পক্ষপাত করে নম্বর দিয়েছেন।

কথাটা ইস্কুলের কর্তাদের কানে উঠলো। রবীন্দ্রনাথকে আবার পরীক্ষা দিতে হলো। এবার অন্যান্য শিক্ষকদের সামনে পরীক্ষা করা হলো। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিজে পরীক্ষকের পাশে চৌকি নিয়ে বসলেন। কিন্তু এবারকার ফল হলো আগের চেয়ে অনেক ভালো। বালক আগের চেয়ে নম্বর পেলেন অনেক বেশী।

হরনাথ পণ্ডিতের আর বলার কিছু রইল না।

হরনাথ পণ্ডিতের কথা মনে করেই বোধ হয় কবি পরে লিখেছেন—

"প্রাইমারী ইস্কুলে
প্রায়-মরা পণ্ডিত
সব কাজ ফেলে রেখে
ছেলে করে দণ্ডিত।
নাকে খৎ দিয়ে দিয়ে
ক্ষয়ে গেল যত নাক
কথা শোনাবার পথ
টেনে টেনে করে ফাঁক।
ক্লাশে যত কাজ ছিল
সব হল খণ্ডিত
বেঞ্চিটেঞ্চিগুলো
লণ্ডিত ভণ্ডিত।"

কিন্তু শিক্ষকের দুর্ব্যবহারই সবটুকু নয়, তার উপর ছিল সহপাঠীদের অভদ্রতা।

"অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তার দিকের এক জানালার কাছে

একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। মনে মনে হিসাব করিতাম, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর—আরও কত বৎসর এমন করিয়া কাটাইতে হইবে।"

[—জীবনস্মৃতি

কিন্তু দীর্ঘদিন এই দুঃসহ পরিবেশের মাঝে বালককে কাটাতে হয়নি।

বাড়ীতে তিনটি ছেলে নর্ম্যাল ইস্কুলে পড়তো,—রবীন্দ্রনাথ, তাঁর দাদা সোমেন্দ্রনাথ এবং ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ। একদিন ইস্কুলের এক শিক্ষক বললেন —তোমাদের বাড়ী থেকে একখানা বই আনতে পারবে? আমি পড়বো।

—কি বই স্যার?

—প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী—মেময়ার অফ্ দোয়ারকানাথ টেগোর।

—আচ্ছা স্যার, চেয়ে এনে দোব।

দ্বারকানাথ রবীন্দ্রনাথের পিতামহ। বইখানি ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে। ছোটরা মহর্ষিকে বড় ভয় করতো। তাঁর কাছে কে যাবে বইখানি চাইতে—এই হলো এক সমস্যা। কিন্তু শিক্ষক মশাইকে কথা দেওয়া হয়েছে, চাইতে তো হবেই। সত্যপ্রসাদের সাহস ছিল বেশী, স্থির হলো সে-ই যাবে। কিন্তু মহর্ষির কাছে কি বলে সে বইখানি চাইবে? মহর্ষি পণ্ডিত ও মাননীয় ব্যক্তি, সাধারণভাবে কথা বললে যদি মহর্ষির অমর্যাদা হয়? অনেক ভেবেচিন্তে সত্যপ্রসাদ বিশুদ্ধ বাংলায় বাক্য বিন্যাস করলেন, তারপর মহর্ষির কাছে গিয়ে বললেন—পূজ্যপাদ মাতামহ ঠাকুর, অস্মদীয় বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় ভবদীয় পিতৃদেবের জীবন চরিত পাঠেচ্ছা প্রকাশ করতঃ ভবৎ সকাশাৎ উক্ত চরিত্র-গ্রন্থ প্রার্থনা করিয়াছেন।

মহর্ষি দৌহিত্রের বাংলা শুনে বুঝতে পারলেন, ছেলেদের "বাংলাভাষা অগ্রসর হইতে হইতে শেষকালে নিজের বাংলাত্বকেই প্রায় ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।"

পরদিন সকালে নীলকমল পণ্ডিত এসে বাংলা জ্যামিতির বই খুলে সবে পড়াতে আরম্ভ করেছেন এমন সময় তেতলায় ঘরে তিন সহপাঠীর ডাক পড়লো। মহর্ষি ছেলেদের বললেন—আজ থেকে তোমাদের বাংলা পড়বার দরকার নেই।

সেদিন থেকে নীলকমল পণ্ডিত বিদায় নিলেন।

নর্ম্যাল ইস্কুলের পাঠও শেষ হলো।

বালকদের ভর্তি করা হলো বেংগল আকাডেমিতে।

এখানে পড়তো ফিরিঙ্গি ছেলেরা। পড়াশুনা বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু ছাত্রদের স্বাধীনতা ছিল খুবই। ছাত্ররা নিয়মিত পড়াশুনা করছে কি করছে না, সে বিষয়ে বিশেষ কেউ লক্ষ্য করতো না। ছাত্রদের কাছ থেকে মাসিক মাহিনাটা নিয়মিত পেলেই ইস্কুলের কর্তারা সন্তুষ্ট থাকতেন, পড়াশুনার জন্য মোটেই চাপ দিতেন না।

এখানে ফিরিঙ্গি ছাত্ররা নেহাৎ ভালমানুষ ছিল না। তারা রবীন্দ্রনাথকে কম উৎপীড়ন করতো না। হয়তো একটি ছেলে হাতের তালুতে ইংরাজিতে 'এ্যাস্' কথাটা উল্টা করে লিখলো, তারপর আদর করে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেল। পিঠের জামায় ছাপ পড়ে গেল 'এ্যাস্' অর্থাৎ কিনা 'গাধা'।

কখন-বা আরেকটি ছেলে ধাঁ করে এক চাপড় মেরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে এমন গম্ভীর হয়ে বসলো যেন সে কিছুই জানে না।

আবার কখন-বা কোথা থেকে একটি ছেলে এসে সহসা মাথার উপর একটি কলা থেঁৎলে দিয়ে চম্পট দিল।

এইসব অত্যাচারে বালক বিরক্ত হতেন, কিন্তু তাঁর মনে কোন দাগ পড়তো না।

কিন্তু বেংগল আকাডেমিতে যত স্বাধীনতাই থাক না কেন, ইস্কুলের বন্ধন রবীন্দ্রনাথের মোটেই ভালো লাগতো না।—

"ঘরে ঢুকতেই ক্লাশের বেঞ্চিটেবিলগুলো মনের মধ্যে যেন শুকনো কনুইয়ের গুঁতো মারে। রোজই তাদের একই আড়ষ্ট চেহারা।" [—ছেলেবেলা

এই সময় রবীন্দ্রনাথের জীবন ধারা রীতিমত বাঁধাধরা সময় তালিকার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কবি নিজেই তখনকার দিনের একটি কাজের সূচী দিয়েছেন :

"অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠি, কুস্তির সাজ করি, শীতের দিনে শির শির করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। শহরের এক ডাকসাইটে পালোয়ান ছিল, কানা পালোয়ান, সে আমাদের কুস্তি লড়াত।···সেখানে পালোয়ানের সঙ্গে আমাদের প্যাঁচকষা ছিল ছেলেখেলা মাত্র। খুব খানিকটা মাটি মাখামাখি করে, শেষকালে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে চলে আসতুম।···

"কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র বসে

আছেন মানুষের হাড় চেনাবার বিদ্যে শেখানোর জন্যে। দেয়ালে ঝুলছে আস্ত একটা কংকাল।···

"দেউরিতে বাজলো সাতটা। নীলকমল মাষ্টারের ঘড়ি-ধরা সময় ছিল নিরেট, এক মিনিটের তফাৎ হবার জো ছিল না।···বই নিয়ে শ্লেট নিয়ে যেতুম টেবিলের সামনে। কালো বোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে অংকের দাগ পড়তে থাকতো, সবই বাংলায়, পাটিগণিত বীজগণিত রেখাগণিত। সাহিত্যে সীতার বনবাস থেকে একদম চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মেঘনাদবধ কাব্যে। সংগে ছিল প্রকৃতি বিজ্ঞান।···

"মাঝে একবার এলেন হেরম্ব তত্ত্বরত্ন। লাগলুম কিছু না বুঝে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করে ফেলতে।···

"ন'টা বাজে। বেঁটে কালো গোবিন্দ কাঁধে হলুদ রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে যায় স্নান করাতে। সাড়ে ন'টা বাজতেই রোজকার বরাদ্দ ডাল ভাত মাছের ঝোলের বাঁধা ভোজ।···

"ঘণ্টা বাজে দশটার।···বুড়ো ঘোড়া পাল্‌কি গাড়িতে করে টেনে নিয়ে চললো আমার দশটা-চারটার আন্দামানে। সাড়ে চারটার পর ফিরে আসি ইস্কুল থেকে। জিম্‌নাষ্টিকের মাষ্টার এসেছেন। কাঠের ডাণ্ডার উপর ঘণ্টাখানেক ধরে শরীরটাকে ওলটপালট করি। তিনি যেতে না যেতে এসে পড়েন ছবি আঁকার মাষ্টার। ক্রমে দিনের মরচে-পড়া আলো মিলিয়ে আসে।···পড়বার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি। অঘোর মাষ্টার এসে উপস্থিত। শুরু হয় ইংরাজি পড়া।···পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চম্‌কে উঠি।" [—ছেলেবেলা

এই ইংরাজি পড়াটাই শৈশবে কবির কাছে সবচেয়ে কঠিন বলে মনে হয়েছিল। তিনি লিখেছেন—"যখন বর্গির উপদ্রব ছিল, তখন বর্গির ভয় দেখাইয়া ছেলেদের ঘুম পাড়াইত—কিন্তু ছেলেদের পক্ষে বর্গির অপেক্ষা ইংরাজি ছাব্বিশটা অক্ষর যে বেশি ভয়ানক, সে বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হইতে পারে না।" [—শব্দতত্ত্ব

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়াশুনার এই জাঁতাকলে নূতনত্ব দেখা দিত রবিবারে। সেদিন সকালে ছিল গান শেখার ব্যবস্থা। শেখাতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী। তারপর সাতটায় সময় আসতেন সীতানাথ দত্ত প্রকৃতি-বিজ্ঞান পড়াতে। তাঁর বিজ্ঞানের পরীক্ষাগুলি বালকের মন হরণ করতো। ঔৎসুক্য ও বিস্ময়ে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন। এই বিষয়টা বালকের কাছে এতো ভাল

জাগতো যে, যে-রবিবারে সীতানাথবাবু আসতেন না, সেই রবিবারটা তাঁর বড় ফাঁকা ফাঁকা মনে হতো।

রবিবার পড়াশুনার সময়-সূচীর কোন পীড়ন ছিল না, ছিল অবসর—একান্ত নিজস্ব উপভোগ্য কার্যক্রম।—

"সোম মঙ্গল বুধের যেন
মুখগুলো সব হাঁড়ি.
ছোটো ছেলের সঙ্গে তাদের
বিষম আড়াআড়ি।
কিন্তু শনির রাতের শেষে
যেমনি উঠি জেগে
রবিবারের মুখে দেখি,
হাসিই আছে লেগে।" [—শিশু ভোলানাথ

কিন্তু রবিবারের বেলা যত এগিয়ে চলে বালকের মনে ততো অস্বাচ্ছন্দ্য জাগে—

"যত ঘণ্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত
শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,
তখন স্কুলে নেই বা গেলেম, কেউ যদি কয় মন্দ
আমি বলব, 'দশটা বাজাই বন্ধ।'
তাধিন তাধিন তাধিন।
... ...
যত জানিস রূপকথা, মা, সব যদি যাস বলে
রাত্ত হবে না, রাত যাবে না চলে;
সময় যদি ফুরোয় তবে ফুরোয় না তো খেলা,
ফুরোয় না তো গল্প বলার বেলা।
তাধিন তাধিন তাধিন।" [—শিশু ভোলানাথ

ইস্কুল ঘরের বন্ধনকে মন মানতে চায় না। বাধাহীন অবকাশের মধ্যে আনন্দের সন্ধান করতে চায়, চায় বন্ধনমুক্তি। সুবিধা পেলেই তিন সহপাঠী ইস্কুল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে আসেন।

ইস্কুল থেকে ছুটি পাবার সুবিধা ছিল। সেই সুবিধাটুকু করে দিতেন মুন্সী সাহেব। মুন্সী সাহেব বাড়ীতেই থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের দাদারা

তাঁর কাছে ফার্সী পড়তেন। তিনি ফার্সীভাষা ভালই জানতেন। ইংরাজিও মন্দ জানতেন না। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল যে তিনি লাঠি খেলায় ও সংগীত বিদ্যায় অসামান্য পারদর্শী। ছেলেরা তাঁর এই দুর্বলতার কথা জানতো, গিয়ে বলতো—আপনি যখন লাঠি চালান মুন্‌শী সাহেব, যেন ঝড় বহে যায়।

মুন্‌শী সাহেব শুনে ভারী খুশি হন।

আরেকজন বললো—আপনি সেদিন যে গানখানা গাইলেন, আমাদের খুব ভালো লাগলো। আপনি আমাদের গান শেখাবেন?

মুন্‌শী সাহেব তো আরো খুশি।

তারপর ছেলেরা আসল কথা পাড়লো—আজ বাড়ীতে একটু দরকার আছে মুন্‌শী সাহেব, একখানা চিঠি লিখে দেবেন, ছুটি করে ইস্কুল থেকে চলে আসবো।

মুন্‌শী সাহেব তখনই ছুটির দরখাস্ত লিখে দিলেন।

সেই চিঠি দেখিয়ে ইস্কুল থেকে চলে আসতে আর কোন বাধা থাকে না।

বাড়ীতেও পড়ায় ফাঁকি দেবার সুবিধা ছিল।

পণ্ডিত মশাই আমসত্ত্ব ভালবাসতেন। পণ্ডিতমশাই এলেই রবীন্দ্রনাথ পকেট থেকে আস্তে আস্তে আমসত্ত্ব বের করতেন। আমসত্ত্ব পেলেই পণ্ডিত মশায়ের মেজাজটা সেদিন ঠাণ্ডা থাকতো।

এই আমসত্ত্ব আসতো মায়ের ভাঁড়ার থেকে চুরি করে।—"চুরি করে আনতুম। সত্য উপুড় হতো, আমি তার পিঠে চড়ে আমসত্ত্বের হাঁড়ি নামাতুম। পণ্ডিতমশাই ঐটি পেলে ঠাণ্ডা থাকতেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করতেন—শুনেছি তোমাদের বাড়িতে নাকি খুব ভালো কেয়া খয়ের হয়? তারপর কেয়া খয়ের সংগ্রহ করে আনতুম তাঁর জন্য, সেও চুরি। যে করে হোক কোনো রকমে ঠাণ্ডা রাখতে পারলে হয়।" [—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

এই ভাবেই দিন কাটতো।

অন্দরে মায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের আদর ছিল।

ছেলেবেলায় যখন কুস্তি লড়তেন, মা ভাবতেন মাটি মেখে ছেলের গায়ের রং আরো কালো হয়ে যাবে। ছুটির দিনে তিনি লেগে যেতেন পুত্রের গায়ের রং শোধন করতে। তিনি ছেলের গায়ে মাখাবার জন্য মলম তৈরী করতেন। তাতে থাকতো বাদাম বাটা, সর, কমলা লেবুর খোসা, আরো কত কি।

রবিবার দিন সকালে মা বসতেন ছেলেকে নিয়ে। বারান্দায় বসিয়ে ছেলের গায়ে মাখাতেন সেই মলম। দলন-মলন চলতো বেশ কিছুক্ষণ। বালক হাঁপিয়ে উঠতেন, ছুটে পালাবার জন্য মন অস্থির হয়ে উঠতো।

সন্ধ্যাবেলা মায়ের আসর বসতো ছাদে।—

"বাড়ির ভিতরের পাঁচিল ঘেরা ছাদ। মা বসেছেন সন্ধ্যাবেলায় মাদুর পেতে, তাঁর সঙ্গিনীরা চারিদিক ঘিরে বসে গল্প করছে। এই গল্পে খাঁটি খবরের দরকার ছিল না। দরকার কেবল সময় কাটানো। তখনকার দিনে সময় ভরতি করার জন্যে নানা দামের নানা মাল-মশলার বরাদ্দ ছিল না। দিন ছিল না ঠাস্ বুনুনি করা, ছিল বড় বড় ফাঁকওয়ালা জালের মতো। পুরুষদের মজলিশই হোক আর মেয়েদের আসরেই হোক, গল্পগুজব হাসি তামাসা ছিল খুবই হাল্‌কা দামের।" [—ছেলেবেলা

এই আসরে যাঁরা আসতেন তাঁদের পুঁথিপড়া বিদ্যা বেশী ছিল না। "আমাদের বাল্যকালে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা বড় একটা ছিল না। বৈষ্ণব মেয়েরা কেহ কেহ বাংলা এমন কি সংস্কৃত শিক্ষা করিত—তাহাদেরই নিকট অল্প একটু শিখিয়া রামায়ণ মহাভারত এবং সেকেলে দুই একখানা গল্পের বই পড়িতে পারিলেই তখন যথেষ্ট মনে করা হইত। আমাদের মা-কাকিমারাও এইরূপ শিক্ষাই পাইয়াছিলেন।" [—পিতৃস্মৃতি

এই সভার মাঝে পুঁথিপড়া বিদ্যার আমদানি করে বালক রবীন্দ্রনাথ সকলকে তাক লাগিয়ে দিতেন।

যেদিন পড়লেন সূর্য পৃথিবীর চেয়ে চৌদ্দ লক্ষ গুণ বড়, সেই দিনই মায়ের আসরে গিয়ে সে কথাটি শুনিয়ে দিলেন।

আরেকদিন শুনিয়ে দিলেন ব্যাকরণে পড়া একটি কবিতা—

ওরে আমার মাছি !

আহা কী নম্রতা ধর, এসে হাত জোড় কর,

কিন্তু কেন বারি কর তীক্ষ্ণ শুঁড় গাছি।

মা শুনে খুব খুশি হতেন। পুত্রটি যে রীতিমত পড়াশুনা করে পণ্ডিত হয়ে উঠছে এ সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন দ্বিধা থাকতো না।

এগারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হলো।

ন্যাড়া মাথায় ইস্কুলে যেতে হবে, এই হলো বালকের দুশ্চিন্তা।

এমন সময় পিতা বাইরে যাবার কথা তুললেন। বালকের জীবনে এলো সে এক আনন্দের সমারোহ।

মহর্ষির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গেলেন বোলপুরে।

সেদিনকার বোলপুর আজকের মত নয়। লাল মাটি, গাছপালাহীন শুকনো খট্‌খটে পাথুরে প্রান্তর। কুড়ি বিঘা জমির মাঝে ছোট একটি একতলা বাড়ী—মহর্ষির আশ্রম।

বর্ষাকাল। তৃণহীন কাঁকর ছড়ানো বন্ধুর প্রান্তরের বুকে খাদ কেটে বর্ষার জলধারা বহে যায়। বালক সেই জলধারার ধারে ধারে ঘুরে বেড়ান, নানা রকমের নুড়ি কুড়িয়ে জামার আঁচল ভর্তি করেন। কোন এক সময় পিতার সামনে নুড়িগুলি ধরে বলেন—আমি এইগুলি কুড়িয়ে এনেছি।

পিতা বিরক্ত হন না, উৎসাহ দিয়ে বলেন—কী চমৎকার! এ সমস্ত তুমি কোথায় পেলে?

বালক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলে—এমন কত আছে। কত কত, হাজার হাজার। আমি রোজ এনে দিতে পারি।

পিতা হাসলেন, বালক উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

মুক্ত প্রান্তরে মুক্ত আকাশতলে বাধাহীন প্রাণচঞ্চল জীবনধারা।

বালক একদিন পিতাকে এসে বললেন—আমি একটা সুন্দর জলের ধারা দেখে এসেছি। সেখান থেকে আমাদের স্নানের ও পানের জল আনলে বেশ হয়।

মহর্ষি বললেন—তাই তো, সে বেশ হবে।

বালকের কথাটিকে ছেলেমানুষি ভেবে মহর্ষি উপেক্ষা করলেন না, সত্যই সেখান থেকে জল আনা হলো।

মহর্ষি বালকের উপর দুটি কাজের ভার দিয়েছিলেন—খুচরো দু-চার আনা পয়সাব হিসাব রাখা, আর তাঁর সোনার পকেট-ঘড়িতে দম দেওয়া।

পয়সার হিসাবে তেমন কোন গোলযোগ ছিল না। কিন্তু ঘড়িতে দম দেওয়া নিয়েই দেখা দিল যত গোলমাল। পিতার দামী ঘড়ি, বালক যত্ন করেই দম দিতেন। কিন্তু সেই যত্নের বোধ হয় কিছু আধিক্য ঘটে গেল। ঘড়ির স্প্রিং গেল কেটে। বালক ক্ষুন্ন হলেন, পিতা কি বলবেন ভেবে শঙ্কাও জাগলো। মহর্ষি কিন্তু কিছুই বললেন না। ঘড়িটিকে কলিকাতায় পাঠিয়ে দিলেন মেরামতির জন্ত।

বোলপুর থেকে একদিন পিতাপুত্রে বেরিয়ে পড়লেন উত্তর ভারতের পথে।—

সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতে করতে তাঁরা এলেন অমৃতসহরে।

এই যাবার পথে একদিন এক বড় স্টেশনে রবীন্দ্রনাথের বয়স নিয়ে একটা গোলযোগ বাধলো।

টিকিট পরীক্ষক এসে টিকিট দেখলো।

মহর্ষি পুত্রের জন্ম একখানি হাফ্ টিকিট কেটেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পানে তাকিয়ে টিকিট পরীক্ষকের মনে হলো যে ছেলেটির বয়স বারো বছরের বেশী। মুখে তিনি কিছু বললেন না, কিন্তু আরেকজনকে ডেকে আনলেন। আগন্তুক রবীন্দ্রনাথকে একবার ভালো করে দেখে গেল, সে-ও মুখে কিছু বললো না। তারা দু'জনে বরাবর গিয়ে ডেকে আনলো স্টেশন-মাস্টারকে।

স্টেশন-মাস্টার মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার এই ছেলেটির বয়স কত?

—বারো বছরের কম।

—বারো বছরের বেশী নয়?

—না।

স্টেশন মাস্টার মহর্ষির কথায় বিশ্বাস করলেন না, বললেন—এই বালকের জন্ম আপনাকে পুরা ভাড়া দিতে হবে।

মহর্ষি তৎক্ষণাৎ একখানি নোট বের করে দিলেন।

স্টেশন মাস্টার ভাড়ার টাকাটা নিয়ে বাকি টাকা ফেরৎ দিলেন। মহর্ষি সেই খুচরো টাকা-পয়সাগুলি প্লাটফর্মে ছুড়ে ফেলে দিলেন। স্টেশন-মাস্টারকে বুঝিয়ে দিলেন যে কয়েকটা টাকা বাঁচাবার জন্ম মিথ্যা কথা বলার মত মানুষ তিনি নন।

অমৃতসহর থেকে পিতাপুত্রে গেলেন ডালহৌসি পাহাড়ে।

এই পাহাড়ের বুকেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। উপত্যকা-অধিত্যকায় চৈতালি ফসলের সোনালি রং, পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির সুনিবিড় ছায়া, কালো পাহাড়গুলির গা বহে ঝর্ণাধারার উচ্ছল রূপ বালকের মন হরণ করতো। বাসার কাছে বিস্তীর্ণ কেলুবনে একটি লৌহফলক বিশিষ্ট লাঠি নিয়ে আপন মনে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। এক একদিন দুপুর-

বেলায় এক পাহাড় থেকে তিনি চলে যেতেন আরেক পাহাড়ে। মহর্ষি তা জানতেন, কিন্তু সেজন্য তিনি কোনদিন পুত্রকে শাসন করেন নি, নিষেধ করেন নি। ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের ছিল অবাধ স্বাধীনতা।

এই আনন্দপূর্ণ পরিবেশের মাঝে মহর্ষি পুত্রের শিক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। বালকের পড়াশুনার সময়সূচী ছিল নির্মম। শীতের প্রত্যূষে, রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণভাবে দূর হবার আগেই বালককে কম্বলের তপ্ত বেষ্টন ছেড়ে উঠতে হতো। তারপরেই সুরু হতো উপক্রমণিকার পড়া। শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্ত করার এই ছিল নির্দিষ্ট সময়। উপক্রমণিকা পড়া শেষ হলে মহর্ষি পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে উপাসনায় বসতেন। উপাসনা শেষ করে দু'জনে বেরুতেন বেড়াতে।

ভ্রমণ শেষ করে এসে মহর্ষি ঘণ্টাখানেক পুত্রকে ইংরাজি পড়াতেন। তারপর স্নানাহারের ছুটি।

দুপুরে আহারাদির পর আবার মহর্ষি পুত্রকে পড়াতে বসতেন। কিন্তু সে সময় বালকের বড় ঘুম আসতো। পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথ ঢুলতেন। বেশীক্ষণ পড়ানো সম্ভব হতো না। পিতা পুত্রকে ছুটি দিয়ে দিতেন। ছুটি পেলেই কিন্তু ঘুম পালিয়ে যেত।

তারপর সন্ধ্যাবেলা পিতা আবার পুত্রকে নিয়ে বসতেন। সুরু হতো জ্যোতির্বিদ্যা শেখা—আকাশের গ্রহনক্ষত্র চেনা। বাহিরের আঙিনায় বসে রাত্রির অন্ধকারে অসীম আকাশের তারাগুলি মহর্ষি একে একে পুত্রকে চিনিয়ে দিতেন, বলতেন সূর্য থেকে গ্রহগুলি কতদূরে আছে, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসতে তাদের কত সময় লাগে, ইত্যাদি।

এই ভাবেই পড়াশুনা চলতো। শুধু পড়াই নয়, কিছু কিছু লিখতেও হতো। মহর্ষি পুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় কিছু কিছু লিখতে বলতেন। বালক সংস্কৃত যা পড়তেন তাই সমাস গেঁথে ইচ্ছামত লিখে যেতেন, তা ঠিক হোক আর ভুল হোক, মহর্ষি সেজন্য কোনদিন কিছু বলেন নি।

হিমালয় থেকে বালক ফিরলেন।

অনেক পড়াশুনার কথা, অনেক বেড়ানোর গল্প মনের মধ্যে জমা হয়েছে, মাকে না শোনাতে পারলে মনটা তো হাল্কা হয় না। দুপুর বেলা ছাদে মায়ের আসর বসে। বালক পিতার কাছে যা কিছু শিখেছেন, সবই শোনাতে

সুরু করেন—গ্রহনক্ষত্রের কত বিচিত্র কথা, ঋজুপাঠে পড়া বাল্মীকির রামায়ণ, আরো কত কি। সংস্কৃতে রামায়ণের অংশটুকু আবৃত্তি করে, শুনিয়ে দেন তার ব্যাখ্যা। মা খুব খুশি হন, বলেন—একবার দ্বিজেন্দ্রকে শোনা দেখি।

এবার বালকের বিপদ দেখা দেয়। মায়ের কাছে ব্যাখ্যা করা যত সহজ ছিল, বড়দাদার কাছে তো ততো সহজ হবে না। বালক সেখান থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মা তখন দ্বিজেন্দ্রনাথকে ডাকতে পাঠিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ এলেন। বালক শঙ্কিত মনে মায়ের সামনে বড়দাদার কাছে রামায়ণের ব্যাখ্যা শোনালেন। অন্যসময় হলে কি হতো বলা যায় না কিন্তু তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি রচনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কয়েকটি শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনেই 'বেশ হয়েছে' বলে তিনি চলে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন, এ-যাত্রা মুখ রক্ষা হলো।

কিশোরী চাটুজ্যে ছিলেন মহর্ষির অনুচর, মহর্ষির কাছে যাতায়াত করতেন। বালক তাঁর কাছ থেকে অনেক পাঁচালির গান শিখেছিলেন, তারই দু'একটা মাঝে মাঝে মায়ের আসরে শোনাতেন। বালক কবির কণ্ঠ ছিল সুমিষ্ট, আসরে তাঁর গান বেশ জমে উঠতো।

কিন্তু মায়ের এই স্নেহ কবির অদৃষ্টে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। কিশোর বয়সেই তিনি মাকে হারান।

সারদাসুন্দরী নাতিনাতনীদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একদিন এক নাতনী দিদিমার আঙুল টিপে দিতে দিতে একটি আঙুল মটকে ফেলে। তা থেকে আঙুলহাড়া হয়ে আঙুলটি পেকে ওঠে ও জ্বর হয়। সেই অসুখ আর সারলো না।

মহর্ষি ছিলেন হিমালয়ে। খবর পেয়ে এক সন্ধ্যায় তিনি এসে পৌছলেন। সে রাত আর প্রভাত হলো না, ব্রাহ্মমুহূর্তে স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়ে সারদা-সুন্দরী বললেন—আমি তবে চললেম!

গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠলো।

রবীন্দ্রনাথ অন্য ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন। একজন দাসী ছুটে এলো, চীৎকার করে উঠলো—ওরে, তোদের কি হলো রে!

বালকের ঘুম ভেঙে গেল। কি যে হয়েছে তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না, হতভম্ব হয়ে পড়লেন। প্রভাতে উঠে এসে দেখলেন : প্রাঙ্গণে খাটের উপর মা শুয়ে আছেন, সিঁদুর আলতা চন্দন ও ফুল দিয়ে মাকে সাজানো হয়েছে।

মা মারা গেছেন। কিন্তু মৃত্যু যে কি, তা বালক তখন বুঝতে পারলেন না। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁরা তাকিয়ে রইলেন। মহর্ষি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফুল চন্দন অভ্র দিয়ে শয্যা সাজিয়ে দিয়ে বললেন—ছয় বৎসরের সময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম।

তারপর মাকে যখন বাড়ী থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো, ছেলেরা পিছু পিছু চললেন শ্মশানে, তখন শোকের প্রথম ধাক্কা এসে লাগলো বালক রবীন্দ্রনাথের মনে। মনের মাঝে হাহাকার উঠলো। আর তো মা ফিরবেন না, আর তো ঘরের মধ্যে এসে বসবেন না। মা চিরদিনের মতই চললেন।

মনের উপর মাতৃবিয়োগ যে ব্যথা রেখে যায় তা কোনদিনই মোছে না, ষাট বছর বয়সে কবি লিখেছিলেন—

"মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে
শোবার ঘরের কোণে,
জানালা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে—
মনে হয়, মা আমার পানে
চাইছে অনিমিখে।
কোলের 'পরে ধরে কবে
দেখত আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে
সারা আকাশ ছেয়ে। [—শিশু ভোলানাথ

মাকে বার বার মনে পড়তো জীবনে কত কাজে, কত সময়। মায়ের জন্ম মন উন্মুখ হয়ে উঠতো।—

"বড়ো হইলে যখন বসন্ত প্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম, তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত; আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম, যে-স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।" [—জীবনস্মৃতি

সাতান্ন বছর বয়সেও কবি মায়ের স্বপ্ন দেখতেন।—

"আমি নিতান্ত বালককালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার হঠাৎ কী হল জানি নে—আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে, মা আছেন। তখনই তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন—'তুমি এসেছ!'

এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল।" [—শান্তিনিকেতন

মায়ের মৃত্যুর পর বাড়ীর কনিষ্ঠ বধূ মাতৃহীন বালকদের ভার নিলেন। তিনি বালকদের সস্নেহে কাছে টেনে নিলেন। দিনরাত তিনি চেষ্টা করতেন বালকদের ভুলিয়ে রাখার জন্য।

বউ ঠাকুরানীর এই স্নেহই রবীন্দ্রনাথের কিশোর জীবনকে স্নিগ্ধ করে তুলেছিল।

ছাদই ছিল বালকের কল্পনার বিচরণক্ষেত্র। সেই ছাদের পাশের ঘরেই থাকতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বউঠাকুরানী।

"সেই ছাদে তাঁরি হোলো পূরো দখল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতা পড়ত সেইখানে। নেমন্তন্নের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠতো এই ছেলেমানুষ। বৌঠাকরুণ রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালবাসতেন, এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সংগে পান্‌তা-ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না।" [—ছেলেবেলা

বউ-ঠাকুরানীর স্নেহ বালকের জীবনধারার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে পড়েছিল।

"বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর, বৌদিদের আমসত্ত্ব পাহারা, তাছাড়া আরো পাঁচ রকম খুচরো কাজের সাথী। পড়ে শোনাতুম বংগাধিপ

পরাজয়। কখনো কখনো আমার উপরে ভার পড়ত জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটবার। খুব সরু করে সুপুরি কাটতে পারতুম। আমার অন্য কোনো গুণ যে ছিল, সেকথা কিছুতেই বৌঠাকরুণ মানতেন না, এমন কি চেহারারও খুঁৎ ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন।" [—ছেলেবেলা

কিন্তু শুধু সুপারি কাটলেই কাজ শেষ হতো না। বৌদির আসরে আরেকটা কাজও বালকের ছিল, তা বঙ্গদর্শন পড়ে শোনানো।

"তখন বঙ্গদর্শনের ধুম লেগেছে।···

তখন পাড়ায় দুপুরবেলা কারো ঘুম থাকত না। আমার সুবিধা ছিল, কাড়াকাড়ি করবার দরকার হোত না, কেন না আমার একটা গুণ ছিল আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বৌঠাকরুণ ভালবাসতেন। তখন বিজলী পাখা ছিল না, পড়তে পড়তে বৌঠাকরুণের হাত-পাখার হাওয়ার একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম।" [—ছেলেবেলা

এদিকে ইস্কুলের পড়াশুনার সঙ্গে কবি ঠিকমত তাল রেখে চলতে পারেন না। বেঙ্গল আকাডেমিতে তিনি তখন পড়তেন, কিন্তু পড়াশুনা করার কোন চেষ্টা ছিল না।

"ল্যাটিন শেখার ক্লাশে আমি ছিলুম বোবা আর কালা, সকল রকম একসারসাইজের খাতাই থাকত বিধবার থান কাপড়ের মত আগাগোড়াই সাদা। আমার পড়া না করবার অদ্ভুত জেদ দেখে ক্লাশের মাষ্টার ডিক্রুজ সাহেবের কাছে নালিশ করেছিলেন। ডিক্রুজ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন পড়াশুনা করবার জন্যে আমরা জন্মাইনি। মাসে মাসে মাইনে চুকিয়ে দেবার জন্যই পৃথিবীতে আমাদের আসা।" [—ছেলেবেলা

তেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথকে ভর্তি করে দেওয়া হলো সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে।

কিন্তু এখানে এসেও বালকের মন কিছু বদলালো না।

এই ইস্কুলে যে ক'জন শিক্ষক ছিলেন তাঁরা সকলেই যে শিক্ষার ব্যাপারে সমান কৃতী ছিলেন, তা নয়। মিশনারী ইস্কুলের 'ফাদার' হিসাবে প্রত্যেকেই যে ভগবৎ-ভক্তিতে নম্র ছিলেন, তা-ও নয়। তাঁদের শিক্ষাদানের সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের বাহ্যাড়ম্বর মিশে এমন এক জাঁতাকল তৈরী হয়েছিল বালকের হৃদয়-বৃত্তিকে শুষ্ক করে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট।

এই শিক্ষকদের মধ্যে একজনকে বালকের ভালো লাগে। তিনি 'ফাদার-দি-পেনেরাণ্ডা। মানুষটি ছিলেন নম্র। শিক্ষকতার রুক্ষ ভাব তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর কোমল ব্যবহার বালকের মন জয় করেছিল।

একদিনের ঘটনা।—

কপি লেখার ক্লাশে ছাত্রেরা কপি লিখছে। ফাদার-দি-পেনেরাণ্ডা প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করছেন। কোন এক সময় তিনি লক্ষ্য করলেন বালক রবীন্দ্রনাথের কলম চলছে না। একবার, দু'বার, তিনবার তিনি দেখলেন, তারপর সস্নেহে বালকের পিঠে একখানি হাত রেখে বললেন—টেগোর, তোমার কি শরীর ভাল নেই?

ছোট একটি কথা, স্নিগ্ধ একটু ব্যবহার, কিন্তু এরই আন্তরিকতা কিশোরের চিত্তে সারাজীবনের মতো দাগ কেটে দিয়েছিল, মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জেগেছিল।

কিন্তু ইস্কুলের বাঁধাধরা পথে বালকের লেখাপড়ার বিশেষ উন্নতি হলো না। বালকের মন কিছুতেই ইস্কুলের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায় না। কিন্তু তা বলে বাড়ীর লোকেরা তো আর হাল ছেড়ে দিতে পারেন না। তারা প্রথমে ভর্ৎসনা করলেন, তারপর নানাভাবে চেষ্টা করলেন। মহর্ষি ছিলেন বক্রোটা শিখরে, বালকের পড়াশুনার খবরটা তাঁর কাছেও পৌঁছালো। তিনি সেখান থেকে চিঠি লিখলেন—'রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী পড়া যে ভাল হইতেছে আমার এমন বোধ হয় না।'

দাদারা অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু পড়াশুনায় বালকের মন বসানো গেল না। দাদারা শেষে তাঁকে সংশোধন করার আশাই ছেড়ে দিলেন। বড়দিদি সৌদামিনী দেবী একদিন মনের দুঃখে বললেন—আমরা সকলেই আশা করেছিলাম বড় হলে রবি মানুষের মত হবে কিন্তু তার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ বার্ষিক পরীক্ষা দিলেন না, নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে তিনি প্রমোশন পেলেন না। আর এক বছর পড়লেই তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারতেন, তা আর হলো না। ইস্কুলের পড়াশুনা এইখানেই শেষ হয়ে গেল।

"যে-বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাঁসপাতাল-জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্য আবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোনোমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।" [—জীবনস্মৃতি

ইস্কুলের বাঁধাধরা পড়াশুনা না হলেও, মনোমত পড়াশুনা রীতিমতই চলছিল। সেদিকে প্রথম পাঠ সুরু হয়েছিল রামায়ণ ও চাণক্য-শ্লোক থেকে।

চাকরদের বৈঠকে তখন এই দু'খানি বইয়ের প্রচলন ছিল। ভৃত্য ব্রজেশ্বর ঠাকুরবাড়ীতে চাকরী নেবার আগে গাঁয়ের কোন এক পাঠশালার গুরু-মশাই ছিল। সারাদিনের কাজকর্মের শেষে সন্ধ্যাবেলা চাকরদের একটা বৈঠক বসতো। সেই বৈঠকে ব্রজেশ্বর রামায়ণ ও মহাভারত পড়তো। বালক রবীন্দ্রনাথ তন্ময় চিত্তে বসে বসে পাঠ শুনতেন। ঔৎসুক্যের নিবিড়তায় মন নিবিষ্ট হয়ে যেত, রাত্রির অন্ধকার গভীর হয়ে উঠতো চারিপাশে।

এই সান্ধ্য আসরে মাঝে মাঝে এসে পড়তেন কিশোরী চাটুজ্যে। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল তাঁর মুখস্ত, সুর করে হাত-পা নেড়ে তিনি বলে যেতেন—ওরে রে লক্ষ্মণ, একি অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ!

বালক স্তব্ধ হয়ে শুনতেন।—

"মনে মনে ইচ্ছে হত যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দলে,
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।" [—ছড়ার ছবি]

সময় সময় বালক নিজেও রামায়ণ পড়তেন। মায়ের এক বিধবা কাকী ছিলেন শুভংকরী দেবী, তাঁর মার্বেল-কাগজের মলাট দেওয়া পুরাণো একখানি রামায়ণ ছিল, মায়ের ঘরের দরজার কাছে বসে সেই বইখানি কোলের উপর নিয়ে বালক মাঝে মাঝে পড়তেন। পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যেতেন। কোন একটা করুণ বর্ণনা পড়তে পড়তে ঝরঝর করে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো। শুভংকরী দেবী এসে হাত থেকে বইখানা কেড়ে নিতেন, বলতেন—আর পড়ার দরকার নেই!

বালক মুখ তুলে তাকাতেন, বাইরের মেঘমেদুর আকাশে তখন অপরাহ্ণের আলো ম্লান হয়ে উঠেছে। দুপুর যে কখন গড়িয়ে এসেছে অপরাহ্ণ বেলায় বালক তা টের পাননি।

কিশোরের মন রামায়ণের কাহিনীগুলির মধ্যে কল্পনায় যে জাল বুনে যেত, তারই স্মৃতি পরিণত বয়সে কবির লেখনীতে ছন্দিত হয়েছিল:

"বাবা যদি রামের মতো
পাঠায় আমায় বনে,
যেতে আমি পারিনে কি
তুমি ভাবছ মনে।
চোদ্দ বছর ক'দিনে হয়
জানিনে মা, ঠিক—
দণ্ডক-বন আছে কোথায়
ঐ মাঠে কোন্ দিক।
কিন্তু আমি পারি যেতে
ভয় করিনে তাতে—
লক্ষ্মণ-ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে॥" [—শিশু

তখনকার দিনে ছোটদের পড়ার মত বই বিশেষ ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পড়ার আগ্রহ ছিল খুব বেশী। হাতের কাছে কোন বই পেলেই তিনি পড়ে ফেলতেন, তা কিছু বুঝতে পারুন আর না-ই পারুন।

হাতের কাছে যে বই পান তাই তিনি শেষ করেন। কাশীরামদাসের মহাভারত শেষ করলেন। তারপর আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, বাংলা রবিনসন ক্রুসো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবন চরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি বই একে একে পড়া শেষ হলো। তারপর দৃষ্টি পড়লো মেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের আলমারীর উপর। আলমারীর মধ্যে বাঁধানো একখানি ছবিওয়ালা মাসিক পত্রিকা ছিল। বালক সেই বইখানি সংগ্রহ করলেন। বইখানি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থসংগ্রহ।' বইখানিতে গল্প ছিল, উপন্যাস ছিল, নানা তথ্যও ছিল। সবার উপর ছিল সেকালের দুর্লভ বস্তু ছবি। ছুটির দিনে তক্তাপোষের উপর শুয়ে শুয়ে বুকের উপর বইখানি নিয়ে তিনি পড়তেন— কাজীর বিচারের কৌতুককর গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপাখ্যান, তিমি মাছের বিবরণ, আরো কত কি। বার বার পড়তেন আর ছবি দেখতেন। মনটা ভারী খুশি হতো।

তারপর দৃষ্টি পড়লো বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের আলমারীর মধ্যে আরেকখানি বইয়ের উপর। এখানিও একখানি মাসিক পত্রিকা—অবোধবন্ধু। প্রকাশ করতেন যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। অনেকগুলি খণ্ড ছিল। বড়দাদার আলমারী

থেকে সব ক'খানি বের করে নিয়ে বালক দাদার দক্ষিণদিকের ঘরের খোলা দরজার কাছে বসে পড়তেন। সেই কাগজেই তিনি প্রথম পড়েন বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা ও বিলিতি 'পৌলবর্জিনী' গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ। বিহারীলালের কবিতা মনের মধ্যে বাঁশীর সুর জাগিয়ে তুলতো। বর্জিনীর সঙ্গে বালকের মন ঘুরে বেড়াত সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেল বনে, পাহাড়ী উপত্যকার শ্যামল বনপথে।

পড়তে পড়তে বালকের মনে পড়ার নেশা জাগলো। পুরানো বই তো সব শেষ হয়ে গেছে, এখন নতুন বই চাই। এমন সময় একদিন চোখে পড়লো দূর সম্পর্কীয়া এক আত্মীয়া একখানি নতুন বই পড়ছেন—দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'জামাই বারিক'। বালক তাঁকে ধরে বসলেন—বইখানি আমায় দিন, আমি পড়বো।

আত্মীয়াটি বালকের কথায় কান দিলেন না। সে বই পড়ার বয়স তখন বালকের হয় নি। তিনি বইখানি বাক্সে চাবি বন্ধ করে রেখে দিলেন।

বাক্সের চাবি তাঁর আঁচলে বাঁধা থাকতো। একদিন দুপুরে আত্মীয়াটি বসে তাস খেলছেন, খেলা বেশ জমে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিছনে বসে ছিলেন। সেই সুযোগে আঁচল থেকে চাবিটা খুলে নিলেন। কিন্তু কাঁচা হাত, ধরা পড়ে গেলেন। আত্মীয়াটি হেঁসে চাবিটা কোলের উপর রেখে আবার খেলা সুরু করলেন।

বালক কিন্তু আশা ছাড়লেন না। উঠে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু পান ও কিছু দোক্তা সংগ্রহ করে এনে আত্মীয়াটির সামনে রাখলেন। আত্মীয়াটি দোক্তা খেতে ভালবাসতেন। তিনি কোন এক সময় সেই পান মুখে দিলেন এবং পিক্ ফেলার জন্য উঠলেন। আঁচল নীচে লুটিয়ে পড়লো। অভ্যাসমত আঁচলটি তিনি পিঠের উপর ফেললেন। আবার তাস খেলা জমে উঠলো। এবার বালক সুযোগ পেলেন। ফাঁক বুঝে আঁচল থেকে চাবি খুলে নিলেন। এবার আর ধরা পড়লেন না।

বাক্স থেকে বই বেরুলো। এবং পড়ে শেষ করতেও দেরী হলো না। বালক এবার চাবি ও বই আত্মীয়াটির হাতে ফেরত দিলেন। আত্মীয়াটি বকুনি দিলেন, কিন্তু সেই বকুনি বালকের গায়ে লাগলো না। বইখানি পড়া হয়ে গেছে, মন তখন খুশি।

তারপর এলো বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের যুগ।

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন এগারো বছর মাত্র।

বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুর বেলা কারও ঘুম থাকতো না। বঙ্গদর্শন পড়ার আগ্রহ বালককেও পেয়ে বসলো। বঙ্গদর্শনে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি একে একে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই উপন্যাস পড়ার জন্য পাঠক মহলে ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন এই পাঠকদেরই একজন। সারা মাস তিনি প্রতীক্ষা করে থাকতেন কাগজখানির পরের সংখ্যা আসার জন্য। তারপর কাগজখানি বাড়ীতে এলেও প্রতীক্ষা করে থাকতে হতো বড়দের পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

"বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে খুশি সেই অনায়াসে একেবারে এক গ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া—তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতুহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর-কেহ পাইবে না।" [—জীবনস্মৃতি

বঙ্গদর্শনের সঙ্গে আরেকখানি গ্রন্থ বালকের মন হরণ করেছিল, সেটি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ। এই বইখানি খণ্ডে খণ্ডে বেরুতো। সম্পাদনা করতেন সারদা-চরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার।

প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে গল্প-উপন্যাস থাকতো না। সেইজন্য এর পাঠক-সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না। এই বইখানি সংগ্রহ করতে বঙ্গদর্শনের মত বেগ পেতে হতো না। নিরিবিলিতে বসে বালক কবিতাগুলি পড়তেন। সব কবিতা যে বুঝতে পারতেন তা নয়, তবে পড়ে বেশ আনন্দ পেতেন।

"মনে পড়ে ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে
ঝুঁকে পড়ে যেতুম পড়ে তাহার পাতে পাতে,
কিছু বুঝি কিছু নাই বা বুঝি
কিছু না হ'ক পুঁজি,
হিসাব কিছু না থাক নিয়ে লাভ অথবা ক্ষতি,
অল্প তাহার অর্থ ছিল বাকি তাহার গতি।
মনের উপর ঝরণা যেন চলেছে পথ খুঁড়ি
কতক জলের ধারা আবার কতক পাথর হুড়ি।
সব জড়িয়ে ক্রমে ক্রমে আপন চলার বেগে
পূর্ণ হয়ে নদী ওঠে জেগে।" [—আকাশ প্রদীপ

এই সময় বালকের দু'জন গৃহশিক্ষক ছিলেন, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য ও পণ্ডিত রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য। জ্ঞানবাবু যখন দেখলেন যে ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে কোনমতেই ছাত্রের মন বসছে না তখন তিনি অন্যপথ ধরলেন। তিনি সুরু করলেন 'কুমারসম্ভব' ও 'ম্যাকবেথ' পড়াতে। তিনি কুমারসম্ভবের মূল সংস্কৃত থেকে বাংলা মানে ভেঙ্গে দিতেন, বালক মুখস্থ করতেন। দেখতে দেখতে কুমারসম্ভবের তিনটি সর্গ বালকের কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। ম্যাকবেথ পড়ার মত ইংরাজি জ্ঞান তখনও বালকের হয়নি। কিন্তু জ্ঞানবাবু সে কথা চিন্তা করলেন না। তিনি চেয়েছিলেন ছাত্রের মনে পড়ার আগ্রহ জেগে উঠুক। প্রতিদিন তিনি ম্যাকবেথের কিছু কিছু অংশ বাংলায় মানে বলে দিতেন। কিশোর ছাত্রকে সেটি পদ্যে লিখতে হতো। যতক্ষণ না লেখা শেষ হতো ততক্ষণ তিনি ছাত্রটিকে ছুটি দিতেন না। এইভাবে অল্পে অল্পে পুরা নাটকটাই জ্ঞানবাবু বালককে দিয়ে তর্জমা করিয়েছিলেন।

রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশাই সংস্কৃত পড়াতেন। ছাত্রটি তো কোন মতেই ব্যাকরণ মনে রাখতে পারেন না। পণ্ডিতমশাই তখন জ্ঞানবাবুর পথ ধরলেন। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' অর্থ করে পড়াতে সুরু করলেন। নীরস ব্যাকরণ থেকে সরস কাব্যে পৌঁছেই বালকের পড়াশুনার আগ্রহ রীতিমত বেড়ে গেল।

জ্ঞানবাবুর পরে এসেছিলেন মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রজবাবু। তিনি প্রথম দিন থেকেই ছাত্রটিকে গোল্ডস্‌মিথের 'ভিকার অব ওয়েকফীল্ড' তর্জমা করতে দিলেন।

এইভাবেই ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডি পার হয়ে কাব্য ও সাহিত্য পড়ার অভ্যাস রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটা সহজ ধারা হয়ে দাঁড়ালো। পড়ার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বালককে পেয়ে বসলো। অনেক সময় রাত দুটো পর্যন্ত পিদিমের আলোয় তিনি বসে বসে পড়তেন। কোন কোন রাত্রে বড়দিদির চোখে পড়তো ভাইয়ের ঘরে অতো রাত্রেও আলো জ্বলছে। তিনি এসে জোর করে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে বই কেড়ে নিতেন। ভাইকে বিছানায় শুইয়ে তবে যেতেন তিনি ঘর থেকে।

তখনকার দিনে কলিকাতার ঠাকুরবাড়ী ছিল বাংলাদেশের একটি প্রধান সংস্কৃতি কেন্দ্র—সাহিত্য শিল্প সংগীত সম্পর্কে অনেক সুধী ও গুণীজনের সমাগম হতো সেখানে।

"বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত। মনে পড়ে, খুব যখন শিশু ছিলাম বারান্দার রেলিং ধরিয়া এক-একদিন সন্ধ্যার সময় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সম্মুখের বৈঠকখানাবাড়িতে আলো জ্বলিতেছে, লোক চলিতেছে, দ্বারে বড়ো বড়ো গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কী হইতেছে ভালো বুঝিতাম না, কেবল অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সেই আলোকমালার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। মাঝখানে ব্যবধান যদিও বেশি ছিল না, তবু সে আমার শিশু-জগৎ হইতে বহুদূরের আলো।" [—জীবনস্মৃতি

এই 'বহুদূরের আলো' বালকের কল্পনার আকাশে রামধনুর রং ফুটিয়ে তুলতো। সেই কল্পনার রংকে বাইরে প্রকাশ করার গুরু হলেন ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশ। জ্যোতিঃপ্রকাশ সম্পর্কে ছোট হলে কি হবে বয়সে ছিলেন বড়। তিনি একদিন বালক মামাটিকে ডেকে বললেন—তোমাকে পদ্য লিখতে হবে।

ভাগিনেয় মামাকে বুঝিয়ে দিলেন চৌদ্দ অক্ষরে মিল করে কি করে পয়ার লিখতে হয়।

মাত্র চৌদ্দটি অক্ষর হিসাব করে সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখলেই রামায়ণ-মহাভারতের মতো কবিতা! আট বছরের ছেলের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। বালক তাড়াতাড়ি এক কর্মচারীর কাছ থেকে নীল কাগজের একখানি খাতা জোগাড় করলেন। লাইন টানলেন। লাইন আঁকাবাঁকা হলো, তা হোক্, সেই লাইন ধরে ধরে কাঁচা হাতে কবিতা লেখা সুরু করলেন।

কবিতা তো লেখা হলো, কিন্তু কেমন লেখা হচ্ছে তা লোককে শোনানো চাই ত। বালক কবি খাতাখানি হাতে নিয়ে ঘোরেন। শ্রোতা পেলেই বালক খাতা খুলে কবিতা শুনিয়ে দিতেন। বালকের কবিতা শুনে বড় ভাই দ্বিজেন্দ্র-নাথ ভারি খুশি হলেন। বাড়ীতে কেউ এলেই তাকে ডেকে ছোট ভাইয়ের কবিতা শুনিয়ে দিতেন। আর বাড়ীতে লোক তো প্রায়ই আসতো। বালক কবির শ্রোতার অভাব ঘটতো না। যে শুনতো সেই প্রশংসা করতো, বালকের কবিতা শোনানোর উৎসাহ তাতে আরো বেড়ে যেতো।

"হরিণশিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে-সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমি সেইরকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম।...বিশেষত, আমার দাদা (সোমেন্দ্রনাথ) শ্রোতাসংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন।" [—জীবনস্মৃতি

বালক তখন নর্ম্যাল ইস্কুলের ছাত্র। ইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন সাতকড়ি দত্ত। তাঁর কাছে একদিন খবর পৌঁছালো—বালক রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে পারেন। তখনই তিনি বালক-কবিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—শুনলাম তুমি কবিতা লেখ, কি লিখেছ শোনাও তো একটা।

বালক তো সদাই প্রস্তুত, তখনই শুনিয়ে দিলেন তাঁর একটি কবিতা।

সাতকড়ি বাবু উৎসাহ দিয়ে বললেন—বেশ হয়েছে, চমৎকার!

তারপর বালকের প্রতিভা পরীক্ষা করার জন্য তিনি নিজে একটি কবিতার দু'চরণ লিখলেন—

রবিকরে জালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

বললেন—এর বাকি দু'লাইন পূরণ কর দেখি!

বালক কবি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বাকি দু'চরণ পূরণ করে দিলেন—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে॥

সাতকড়িবাবু তো খুব খুশি।

তখনকার দিনে একটা ছোট ছেলে কবিতা লিখতে পারে, এ বড় কম কথা নয়। ইস্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গোবিন্দবাবুর কানে কথাটা উঠতে বেশী দেরী হলো না। একদিন ছুটির সময় বালককে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি নাকি কবিতা লেখ?

গোবিন্দবাবুকে ছেলেরা বড় ভয় করতো, বালক ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়লেন। ভয় হলো এবার বুঝি গোবিন্দবাবু ঘা-কতক বেত মারার আদেশ দেবেন। কিন্তু গোবিন্দবাবু বললেন—কাল সুনীতি সম্বন্ধে একটি কবিতা বাড়ী থেকে লিখে আনবে।

পরদিন রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখে নিয়ে গেলেন।

কবিতাটি পড়ে গোবিন্দবাবু তো ভারী খুশি। কবিকে তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাশে। বললেন—পড়, তোমার কবিতা শুনিয়ে দাও এদেরকে।

বালক-কবি কবিতাটি পড়ে শুনিয়ে দিলেন ক্লাশের ছেলেদের।

ছাত্রেরা শুনলো বটে, কিন্তু সেটি যে বালকের লেখা একথা কেউ বিশ্বাস

করলো না। একটি ছেলে তো স্পষ্টই বলে বসলো—এই কবিতাটি বইয়ে পড়েছি। আমি সে বইখানি এনে দেখাতে পারি।

সকলেই সেকথা বিশ্বাস করলো।

তা ইস্কুলের ছেলেরা যাই বলুক, বালকের কাব্য রচনার উৎসাহ কিন্তু তাতে কিছুমাত্র কমলো না। তার উপর বাড়ীতে উৎসাহ জোগাবার লোকের অভাব ছিল না। সবার চেয়ে বেশী উৎসাহ দিতেন শ্রীকণ্ঠবাবু, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত।

শ্রীকণ্ঠবাবুর বয়স হয়েছিল। মাথা ভরা টাক, দাঁত ছিল না একটিও। সদাই সঙ্গে থাকতো একটি গুড়গুড়ি আর একটি সেতার। তিনি গান গাইতে পারতেন ভালো। বড় বড় দুই চোখ মেলে, হাসিমুখে তিনি বালকের কবিতা শুনতেন।

এমন শ্রোতা সহজে মেলে না। বালক কবিতা লেখেন আর শ্রীকণ্ঠবাবুকে শোনান। একদিন দুটি স্তব রচনা করে শ্রীকণ্ঠবাবুকে শুনিয়ে দিলেন।

আর যায় কোথা, স্তব দুটি হাতে নিয়ে শ্রীকণ্ঠবাবু ছুটলেন মহর্ষির কাছে, স্তবদুটি মহর্ষিকে শুনিয়ে তবে তিনি স্বস্তি পেলেন।

মহর্ষি শুনলেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। অতটুকু ছেলে সংসারের ভালমন্দের সাথে যার ভালমত পরিচয়ই হয়নি, সেই লিখেছে সংসারের দুঃখ-কষ্ট ও ভবযন্ত্রণা নিয়ে পরমার্থিক কবিতা, ব্যাপারটা হাস্যকরই বটে!

এদিকে বালক-কবির বয়স বাড়ছে।

নীল খাতাখানি ছেড়ে এবার তিনি একখানি বাঁধানো লেটসের ডায়েরি যোগাড় করেছেন। বালক এবার পুরোদস্তুর কবি হবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

মহর্ষির সঙ্গে বালক যখন বোলপুরে গেলেন, তখন তিনি রীতিমত কবি। —বোলপুরে একটি শিশু-নারিকেলগাছের তলায় বসে বালক কাব্য রচনায় মন দিলেন। একখানি বীররসাত্মক কাব্য লিখে ফেললেন—পৃথ্বিরাজ পরাজয়।

এবার বালককে রীতিমত কাব্যের নেশায় পেয়ে বসলো। দীর্ঘদিন হিমালয়ে কাটিয়ে বালক যখন কলিকাতায় ফিরলেন, তখন পড়াশুনার প্রতি আর তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বাড়ীর লোকেরা তো পড়াশুনা কিছু হবে না বলে অনেক দিন আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, কাজেই কেউ আর কিছু বলতেন না। বালক আপন মনেই দিনরাত কবিতায় খাতা ভরিয়ে তুলতেন।

কিন্তু কবিতা লিখেই তো শান্তি নেই, কবিতা [illegible] লোক চাই।

খাতাখানি সবসময় কাছে কাছেই থাকে। কাকে কখন শ্রোতা পাওয়া যাবে ঠিক তো নেই। তখন কবিতার খাতা আনতে গেলে হয়তো শোনাবার সুযোগ আর থাকবে না।

প্রথম শ্রোতা ছিলেন গুণদাদা। বালক নতুন কবিতা লিখলেই তাঁর কাছে যেতেন। তিনিও বালকের হাবভাব দেখলেই বুঝতে পারতেন, বলতেন —নতুন কি লিখলে পড়!

বালক নতুন কবিতা পড়ে শুনিয়ে দিতেন, গুণদাদা প্রশংসা করতেন। তবে মাঝে মাঝে কবিতার মধ্যে ছেলেমানুষি এত বেশী প্রকাশ পেত যে তিনি হেসে উঠতেন।

আরেকজন শ্রোতা ছিলেন জ্যোতিদাদার সহপাঠী হাইকোর্টের এটর্নী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। তিনি ইংরাজি সাহিত্যে এম-এ। ইংরাজি সাহিত্য তিনি যথেষ্ট পড়েছিলেন। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে, বৈষ্ণব পদকর্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রামবসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির গান তাঁর ছিল কণ্ঠস্থ। দাদাদের সাহিত্য সভায় তিনি আসতেন। সাহিত্য সভার শেষে অধিক রাত্রে তিনি যখন ফিরে যেতেন, বালক-কবি তখন তাঁকে পাকড়াও করে নিয়ে যেতেন পড়ার ঘরে। সেখানে রেড়ির তেলের মিট্‌মিটে আলোতে বালক তাঁকে শোনাতেন নিজের কবিতা। অক্ষয়বাবু বালকের কাছে বালক ছিলেন। বালকের সঙ্গে তিনি কাব্য নিয়ে আলোচনা করতেন। বালক-কবির লেখার মধ্যে সামান্য কোন গুণপনা দেখতে পেলেই অক্ষয়বাবু তার অপর্যাপ্ত প্রশংসা করতেন।

আরেকজনের কাছে কিশোর-কবি বিশেষ উৎসাহ পেয়েছিলেন, তিনি তখনকার দিনের নামকরা কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা প্রথম পড়েন 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায়। বিহারীলালের কবিতা পড়তে রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগতো। কবির সঙ্গে কিশোরের পরিচয় ছিল। বিহারীলাল মহর্ষির কাছে যাতায়াত করতেন। জ্যোতিদাদার বউ বিহারীলালকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। 'সারদামঙ্গল' রচনা করে বিহারীলাল তখন বাংলা-দেশে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন। বউঠাকুরানী ছিলেন বিহারীলালের একজন ভক্ত, চারমাস ধরে বুনে একখানি আসন তিনি কবিকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই আসনের উপর 'সারদামঙ্গলের' তিনটি চরণ বুনে দিয়েছিলেন।

বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিশোর-কবি দিনে-

দুপুরে যখন-তখন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হতেন। তিনতলার ঘরে মেঝের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে কবি গুণ গুণ করে কবিতা লিখছেন এমন সময় রবীন্দ্রনাথ হয়তো গিয়ে পড়তেন। কবি তখন মোটেই বিরক্ত হতেন না। কিশোরকে কবি শোনাতেন তাঁর কবিতা, শোনাতেন তাঁর গান।

কিশোর-কবির তখনকার দিনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি বিহারী-লালের মত কবিতা লিখবেন। দিনের পর দিন ধরে বিহারীলালের অনুকরণে তিনি কবিতা লেখার চেষ্টা করতেন। একটির পর একটি কবিতা শেষ হয় আর বউঠাকুরানীকে পড়ে শোনান। কিন্তু বউ ঠাকুরানীর মনের মত হয় না। তিনি বলেন—কোন কালেই বিহারী চক্রবর্তীর মত লিখতে তুমি পারবে না।

বউঠাকুরানীর কাছ থেকে উৎসাহ পান আর নাই পান, যিনি স্বভাবকবি তিনি কাব্য লেখার নেশা ছাড়বেন কেমন করে। ভিতরে যে লেখার একটা দুরন্ত তাগিদ ছিল, সেই তাগিদেই কিশোর-কবি কবিতা লিখে যেতেন।

সহসা কিশোর-কবির জীবনে একদিন এক অভাবিত শ্রোতা মিলে গেল।

গৃহশিক্ষক জ্ঞানবাবু ম্যাকবেথের যে কাব্যানুবাদ করাচ্ছিলেন। রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশাই তা দেখে একদিন বললেন—চল, তোমার এই লেখা একদিন বিদ্যাসাগর মশাইকে শুনিয়ে আসি।

রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশাই ছিলেন মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনের হেডপণ্ডিত আর বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন সেই ইস্কুলের সর্বময় কর্তা। কাজেই যোগাযোগ ঘটাতে পণ্ডিত মশাইয়ের বিশেষ দেরী লাগলো না। একদিন তিনি কবি-ছাত্রটিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে।

ঘরভরা বই। তারই মাঝে বসেছিলেন বিদ্যাসাগর মশাই আর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মুখের পানে তাকিয়ে কিশোর-কবির বুক দুরদুর করে উঠলো। প্রণাম সেরে কোনমতে তিনি ম্যাকবেথের কাব্যানুবাদ পড়তে সুরু করলেন—

"দৃশ্য। বিজন প্রান্তর। বজ্র বিদ্যুৎ। তিন জন ডাকিনী।

১ম ডাকিনী—ঝড় বাদলে আবার কখন
মিলব মোরা তিন জনে।

২য় ডাকিনী—ঝগড়া-ঝাঁটি থামবে যখন,
হার জিত সব মিটবে রণে।

৩য় ডাকিনী—সাঁঝের আগেই হবে সে ত ;
১ম ডাকিনী—মিলব কোথায় বলে দে ত।
২য় ডাকিনী—কাঁটা-খোঁচা মাঠের মাঝ।
৩য় ডাকিনী—ম্যাকবেথ সেথা আসছে আজ
১ম ডাকিনী—কটা বেড়াল! যাচ্ছি ওরে!
২য় ডাকিনী—ঐ বুঝি ব্যাঙ ডাকচে মোরে!
৩য় ডাকিনী—চল্ তবে চল্ ত্বরা কোরে!
সকলে—মোদের কাছে ভালই মন্দ,
মন্দ যাহা ভাল যে তাই,
অন্ধকারে কোয়াশাতে
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। প্রস্থান।"

বিদ্যাসাগর মশাই কয়েকটি দৃশ্য শুনলেন।

শুনে তিনি ঠিক কি যে বলেছিলেন তা তখনকার সংকোচে অভিভূত কিশোর-কবি যথাযথ মনে রাখতে পারেন নি। তবে বিদ্যাসাগর মশাই যে-কিশোর-কবিকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, তা কবির জীবনে অবিস্মরণীয় হয়েছিল। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়া তখনকার দিনে নেহাৎ কম কথা ছিল না। কিশোর-কবি সেদিন আত্মবিশ্বাস নিয়েই বাড়ী ফিরেছিলেন।

শুধু কাব্যচর্চাই নয়, রবীন্দ্রনাথের সংগীত চর্চাও স্থরু হয়েছিল শিশুকাল থেকেই॥

"কাঁধের উপর তাম্বুরা তুলে গান অভ্যাস করেছি।······আমার দোষ হচ্ছে শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশি দিন চালাতে পারেনি। ইচ্ছে মতো কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভরতি করেছি তাই দিয়েই। ···যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা, ততদিন বিষ্ণুর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউরেছি। ···সেজদাদা বেহাগে আওড়াচ্ছেন 'অতি গজ গামিনীরে' আমি লুকিয়ে মনের মাঝে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি। সন্ধেবেলায় মাকে সেই গান শুনিয়ে অবাক করা খুব সহজ কাজ ছিল। আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিন রাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। ···তিনি তো গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন, কখন ভুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফূর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে

বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জল জল করত, গান ধরতেন—ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাঁশরী

সংগে সংগে আমি না গাইলে ছাড়তেন না।…

"তারপর যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড়ো ওস্তাদ এসে বসলেন যদুভট্ট। একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই, সেইজন্যে গান শেখাই হোলো না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে চুরিয়ে—ভালো লাগল কাফি সুরে, রুমঝুম বরখে আজু বাদরওয়া, রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সংগে দলবেঁধে।" [—ছেলেবেলা

গানের আসর জমতো জ্যোতিদাদার ঘরের সামনে ছাদের উপর। প্রতি সন্ধ্যায় জ্যোতিদাদা ও বৌঠাকরুন বসতেন সেখানে। জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাতেন, রবীন্দ্রনাথ ধরতেন চড়া সুরে গান।

আবার কোন এক সময় ছাদের ঘরে পিয়ানো বাজিয়ে জ্যোতিদাদা সুর তুলতেন। কিশোর-কবির কাজ ছিল সেই সুরে ভাষা দেওয়া। গান বাঁধবার শিক্ষানবিশি সুরু হয়েছিল এইখান থেকেই।

আর একজন কিশোর-কবির গান শুনতে ভালবাসতেন, তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। কিশোর-কবির কণ্ঠ ছিল অতি সুমিষ্ট। কিশোর নিজেই গান বেঁধে, গেয়ে শোনাতেন পিতাকে। তাল-লয়-মানের শাসনের চেয়ে বড় ছিল অন্তরের অনুভূতির প্রকাশ। মহর্ষি বলতেন—রবি আমাদের বাংলাদেশের বুলবুল!

কবির জীবনে এই প্রশংসা-বাণীর মূল্য নেহাৎ কম ছিল না।

ইতিমধ্যে বালক কবির একটি কবিতা ছাপা হলো তত্ত্ববোধিনী কাগজে। কবিতাটির নাম 'অভিলাষ।' লেখকের কোন নাম ছাপা হয়নি। তা না হোক্, প্রথম রচনা ছাপার অক্ষরে দেখার যে আনন্দ, তা বালকের মনকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তুলেছিল।

সেই প্রথম কবিতা বালকের কাঁচা হাতের লেখা হলেও, তার মাঝে বলিষ্ঠ সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি ছিল।—

"…কৈকেয়ী হৃদয়ে চাপি দুষ্ট অভিলাষ!
চতুর্দশ বর্ষ রামে দিলে বনবাস,
কাড়িয়া লইলে দশরথের জীবন,
কাঁদালে সীতায় হায় অশোক কাননে।

দুর্যোধনচিত্ত হায় অধিকার করি
অবশেষে তাহারেই করিলে বিনাশ
পাণ্ডুপুত্রগণে তুমি দিলে বনবাস
পাণ্ডবদিগের হৃদে ক্রোধ জ্বালি দিলে।
নিহত করিলে তুমি ভীষ্ম আদি বীরে
কুরুক্ষেত্র রক্তময় করে দিলে তুমি
... ...
সকলেই যদি নিজ নিজ অবস্থায়
সন্তুষ্ট থাকিত নিজ বিদ্যা বুদ্ধিতেই
তাহা হলে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে?" [—জীবনস্মৃতি

তারপর ছাপা হলো একটি গান, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকে।—

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন।..."

এটি বালকের বারো বছর বয়সের রচনা। তা বয়স যাই হোক, কনিষ্ঠ ভাইয়ের রচনাটি ভালো লাগতেই জ্যোতিদাদা সেটিকে তাঁর নাটকে ছেপে দিলেন। সেজন্য হয়তো কেউ কেউ তাঁর নিন্দাও করেছে। কিন্তু কনিষ্ঠ সহোদরের প্রতি জ্যোতিদাদার স্নেহকে বাইরের নিন্দা বা প্রশংসা স্পর্শ করতে পারে নি।

কিছুদিন পরের কথা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটক তখন ছাপা হচ্ছে। প্রুফ দেখছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশাই। পণ্ডিতমশাই খুব জোরে জোরে প্রুফ পড়ছেন। পাশের ঘরে বসে রবীন্দ্রনাথ পড়ছেন, সব কথাই তিনি শুনতে পাচ্ছেন। পড়াশুনা বন্ধ করে তিনি একমনে শুনছেন।

প্রুফ দেখা শেষ হলে রবীন্দ্রনাথ এ-ঘরে এসে দাঁড়ালেন, বললেন—আমি পাশের ঘরে বসে শুনছিলাম। নাটকের এখানে এই গদ্য রচনাটা মোটেই খাপ খায়নি, এখানে পদ্য রচনা ছাড়া কিছুতেই জমবে না।

কথাটা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল। তিনি বললেন—কিন্তু এখন কবিতা লেখার সময় কই? বই যে ছাপা হতে সুরু হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—কেন, আমি যদি এখনই লিখে দিই?

—দাও, ভালো হলে ছেপে দোব।

কিশোর কবি তখনই লিখতে বসে গেলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কিশোর কবি ছত্রিশ লাইনের এক কবিতা লিখে ফেললেন, তখনই পড়ে শুনিয়ে দিলেন—

"জ্বল জ্বল চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন!—শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥
... ...
দ্যাখ্ রে যবন! দ্যাখ্ রে তোরা!
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি;
জ্বলন্ত-অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী॥"
... ...

লেখাটি জ্যোতিদাদার ভালো লাগলো, তখনই নাটকের সেই জায়গায় কবিতাটি ছাপার ব্যবস্থা করলেন।

সেইদিন থেকে জ্যোতিদাদা কিশোর ভাইটির কবিপ্রতিভাকে পুরোপুরি স্বীকার করলেন। সংগীত ও সাহিত্যচর্চায় কিশোর কবি হলেন জ্যোতিদাদার সাথী। কিশোর কবির জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

কিশোর কবি জ্যোতিদাদার মজলিশে প্রবেশপত্র পেলেন সেই মজলিশে সাধারণতঃ থাকতেন তিনজন, অক্ষয় চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। তখনকার দিনে সাহিত্যের মজলিশে যে শুধু গুরুগম্ভীর আলোচনাই হতো তা নয়, পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার জন্য সেটা ছিল একটা উপলক্ষ মাত্র। এমন মজলিশে বয়সের পার্থক্য ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে না। কিশোর রবীন্দ্রনাথ এখানে উপেক্ষিত দর্শক মাত্র ছিলেন না, হাস্য-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে সকলের মাঝে তাঁরও একটা স্থান হয়ে গেল।

এই মজলিশে অনেক মজার ঘটনা ঘটতো। একদিন জ্যোতিদাদা অক্ষয়-বাবুকে বললেন—বোম্বাই থেকে একজন পার্শী ভদ্রলোক এসেছেন, ইংরাজি সাহিত্যে তাঁর বেশ দখল আছে। তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে চান।

অক্ষয়বাবু ছিলেন কাব্যরসিক লোক, ইংরাজি কাব্যে তাঁর রীতিমত দখল ছিল। তিনি তখনই রাজী হলেন, বললেন—বেশ।

রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, গোঁপ দাড়ি পরে রীতিমত পার্শী সেজে বসেছিলেন পাশের ঘরে, তখনই তাঁকে ডাকা হলো।

অক্ষয়বাবু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাব্য আলোচনায় মেতে উঠলেন। রবীন্দ্র-নাথকে তিনি কত দেখেছেন, তাঁর কণ্ঠস্বর কত শুনেছেন, কিন্তু তবু তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিনতে পারলেন না। বায়রণ শেলী প্রভৃতির কাব্য থেকে উদ্ধৃতি চললো মুখে মুখে, অক্ষয়বাবু কাব্য আলোচনায় ডুবে গেলেন।

কাব্য আলোচনা যত চলে, উপস্থিত সকলে ততই হাসেন।

এমন সময় তারকনাথ পালিত এসে পড়লেন। ব্যাপার দেখে তিনি হাসলেন, বললেন—এ কে, রবি?

পালিত মশাই রবীন্দ্রনাথের মাথায় এক থাপ্পড় মারলেন। অমনি কৃত্রিম দাড়ি গোঁপ সব খসে পড়ে গেল। অক্ষয়বাবু তো বিস্ময়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন। হাল্‌কা হাসিতে ঘরের আবহাওয়া লঘু হয়ে উঠলো।

এই সময় প্রতিবছর কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন একটি বাগানে 'হিন্দু মেলা' বসতো। এই মেলাতে জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হতো। স্বদেশী জিনিষের প্রদর্শনীর সঙ্গে এখানে সুধী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সম্মেলন বসতো, দেশের কথা নিয়ে আলোচনা হতো, সভা বসতো, জাতীয় সংগীত গাওয়া হতো।

এই মেলার উদ্যোক্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, শিশিরকুমার ঘোষ এবং মনোমোহন বসু।

১৮৭৫ সালে এই মেলার নবম বার্ষিক অধিবেশন বসলো পার্শী বাগানের মাঠে। সেই মাঠের এক গাছ তলায় বসেছিল আলোচনা-সভা। সেই সভার মাঝে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা পাঠ করার সুযোগ পান। কবিতাটির নাম 'হিন্দুমেলা য়উপহার'—

"হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।
... ...
ঝংকারিয়া বীণা কবিবর গায়,
কেনরে ভারত, কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।
... ...
ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায়রে নূতন জীবন,
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি।

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবি রে পুনঃ,
সেদিনের কথা জাগি স্মৃতি পটে
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে?

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্রসূর্য হোক মেঘে নিমগন,
প্রকৃতিশৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

যাক ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।…"

••• •••

কিশোর কবির কণ্ঠ ছিল সুমিষ্ট, আবৃত্তি সকলের মন হরণ করেছিল।

বাংলা কাগজ 'সাধারণী' লিখলো: "আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষছায়ায় দূর্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্র এখনও বালক, তাঁহার বয়স ষোল কি সতের বৎসরের অধিক হয় নাই। তথাপি তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত এবং আর্দ্রিত হইয়াছিলাম, তাঁহার সুকুমার কণ্ঠের আবৃত্তির মাধুর্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে বঙ্গের একটি সুকুমারমতি শিশু ভারতের জন্য এরূপ রোদন করিতেছে, যখন দেখিলাম যে তাহার কোমল হৃদয় পর্যন্ত ভারতের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়াছে, তখন আশাতে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তখন ইচ্ছা হইল রবীন্দ্রের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি—আয় ভাই, আমরা গাইব অন্য গান।"

ইংরাজি খবরের কাগজ লিখলো: "Baboo Rabindra Nath Tagore, the youngest son of Baboo Debendra Nath Tagore, a handsome lad of some 15 had composed a Bengali poem on Bharut (India) which he delivered from memory; The sauvity of his tone much pleased the audience." [—জীবনস্মৃতি

সাধারণীর সম্পাদকের পাশেই ছিলেন তখনকার দিনের প্রখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেন। কিশোর কবির আবৃত্তি শুনে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবে, তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্ন লাভ হইবে।

এই মেলাতেই নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়।

মেলার ভীড়ে এক সদ্য পরিচিত বন্ধু নবীনচন্দ্র সেনকে পাকড়াও করে বললেন—একটি লোক আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়।

বন্ধুটি নবীনচন্দ্রের হাত ধরে মেলার এক পাশে উদ্যানের এক কোণায় এক প্রকাণ্ড গাছতলায় নিয়ে গেলেন। সেখানে সাদা ঢিলে ইজার-চাপকান পরা এক যুবক দাঁড়িয়ে ছিল। বয়স আঠারো-উনিশ, সুপুরুষ, শান্ত, স্থির।

বন্ধুটি পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে নবীনচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। নবীনচন্দ্র দেখলেন—'দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোষাক।'

সহাস্তে নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের করমর্দন করলেন।

রবীন্দ্রনাথ পকেট থেকে একখানি নোট-বই বের করলেন, কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালেন, কয়েকটি গানও গাইলেন।

কিশোর কবির সুমিষ্ট কণ্ঠ ও কাব্য-প্রতিভার পরিচয়ে নবীনচন্দ্র মুগ্ধ হলেন, 'মধুর কামিনীলাঞ্ছনকণ্ঠে এবং কবিতার মাধুর্যে ও ফুটোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম।' [—আমার জীবন

এবার সাহিত্যের মজলিশে কথা উঠলো যে একখানি পত্রিকা বের করতে হবে। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বললেন—আমাদের পত্রিকার একটি নাম ঠিক করে দিন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বললেন—পত্রিকার নাম দাও 'সুপ্রভাত।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এ নাম পছন্দ হলো না, বললেন—আরেকটা নাম বলুন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বললেন—বেশ, 'ভারতী'।

এই নামটি সকলেরই পছন্দ হলো।

ভারতী মাসিক পত্রিকা প্রকাশের তোড়জোড় সুরু হলো। প্রায় প্রতিদিন ভারতীর বৈঠক বসতে সুরু করলো—কোনদিন অক্ষয় চৌধুরীর বাড়ীতে, কোন দিন স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়ীতে, কোনদিন বিহারীলাল চক্রবর্তীর বাড়ীতে। আবার কোনদিন-বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তেতলার ছাদে। সেখানে প্রবন্ধ পড়া হতো, আলোচনা হতো, রবীন্দ্রনাথ গান গাইতেন, শেষে আহারাদির পর বৈঠক শেষ হতো রাত দশটা-এগারোটায়।

ভারতী প্রকাশিত হলো ১২৮৪ সালের শ্রাবণমাসে। সম্পাদক হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতীতে নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রকাশিত হতে লাগলো। প্রথমেই বেরুলো মেঘনাদবধকাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচনা—পরপর ছ'টি সংখ্যায়। তারপর বেরুলো রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোট গল্প 'ভিখারিনী'। তারপর সুরু হলো উপন্যাস 'করুণা'। কিন্তু উপন্যাসখানি শেষ না করেই কবি সুরু করলেন একখানি কাব্য—'কবি কাহিনী'।

কবি কাহিনী কাব্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁর 'বান্ধব' পত্রিকায় লিখলেন—'ইহাতে যথার্থই কবিতা আছে।'

কিশোর কবি সাহিত্য-রসিক সমাজে কবিখ্যাতি লাভ করলেন।

পড়াশুনার কোন চাপ নেই। সাহিত্য ও কাব্যের মধ্যে কিশোর কবি মশগুল হয়ে আছেন। এমন সময় একদিন মেজদাদা পিতার কাছে বললেন—আমি মনে করছি রবিকে বিলাতে নিয়ে যাই, সেখানে পড়াশুনা করুক, একেবারে ব্যারিষ্টারি পাস করে ফিরে আসবে।

মহর্ষি সম্মতি দিলেন।

ছোট ভাইটিকে নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ চলে গেলেন আমেদাবাদে। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই-সি-এস, আমেদাবাদে তখন তিনি জজিয়তি করছেন।

শাহীবাগে জজসাহেব থাকতেন। বাদশাহের জন্য তৈরী বিরাট বাদশাহী প্রাসাদ। প্রাসাদের পাশ দিয়ে বহে চলেছে সবরমতী নদী। সেই নদীর দিকে ছিল প্রকাণ্ড ছাদ। সেই ছাদে কিশোর কবি রাত্রে একা ঘুরে বেড়াতেন আর গুণ গুণ করে গানের সুর ভাঁজতেন।

অত বড় বাদশাহী প্রাসাদে কিশোর কবি একান্ত একেলা হয়ে পড়েছিলেন। মেজবৌদি তখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছিলেন বিলাতে। মেজদাদা সারাটা দিন থাকতেন আদালতে। সেই প্রকাণ্ড বাড়ীতে কথা বলার মত আর মানুষ ছিল না। কিশোর কবি শূন্য ঘরে ঘরে শুধু ঘুরে বেড়াতেন। কখন মেজদাদার ঘরে গিয়ে বসতেন। অনেক বই ছিল তাঁর ঘরে। সেই বইগুলি তিনি নেড়ে-চেড়ে দেখতেন। তার মধ্যে দু'খানি বই কবির ভালো লেগেছিল—একখানি বড় বড় অক্ষরে ছাপা অনেক ছবিওলা টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ, আরেকখানি হেবর্লিন কর্তৃক সংকলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থ। সে বই দু'খানি পড়ে ভালভাবে বোঝার মত ভাষাজ্ঞান তখন কিশোর কবির ছিল না। তবু বইগুলি তিনি পড়ার চেষ্টা করতেন, পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও বাক্যের ধ্বনি ও ছন্দের গতি তাঁর ভালো লাগতো।

কিন্তু এইভাবে মধ্যাহ্নের দীর্ঘ অবসর আর কাটতে চায় না। সকলের উপরের তলায় একখানি ছোট ঘরে তিনি থাকতেন। সেই ঘরখানির মধ্যে বসে বসে নানা চিন্তা তাঁর মনের মাঝে ভীড় করে আসতো। বার বার জেগে উঠতো এক দুর্ভাবনা—ইংরাজি তেমন ভালমত তো জানা নেই,

বিলাতে গিয়ে কি অবস্থায় পড়বেন, কে জানে? বিলাত যাবার আগে ইংরাজি ভাষাটা ভাল মত শিখে নেওয়া প্রয়োজন। মেজদাদাকে একদিন বললেন—আমায় বই এনে দিন। আমি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস লিখবো বাংলা ভাষায়।

সত্যেন্দ্রনাথের কাছে বইয়ের অভাব ছিল না। তিনি রাশি রাশি বই এনে দিলেন। রবীন্দ্রনাথও অভিধান খুলে পড়তে বসে গেলেন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চললো পড়া। আর তারই সঙ্গে বাংলা লেখা।

ইতিমধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ এক নতুন ব্যবস্থা করলেন। ছোট ভাইটির নিঃসঙ্গ জীবনকে সরস করে তোলার জন্য তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন বোম্বাইয়ের এক মারাঠি-বন্ধুর বাড়ীতে। সেখানে রবীন্দ্রনাথকে পাঠাবার আরেকটা কারণও ছিল, মারাঠির বাড়ীতে বাঙালী থাকবে, কথাবার্তা বলতে হবে ইংরাজিতে। তাতে সাধারণ কাজকর্মের চলনসই ইংরাজিটুকু সহজেই রবীন্দ্রনাথের আয়ত্ত হয়ে যাবে। পরে বিলাতে গিয়ে তখন আর রবীন্দ্রনাথকে ঠেকতে হবে না।

রবীন্দ্রনাথ গেলেন বোম্বাইয়ে মেজদাদার বন্ধু আত্মারাম পাণ্ডুরঙের বাড়ীতে। আত্মারাম ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার, বাড়ীর মেয়েরাও ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা। বাড়ীর একটি মেয়ে অন্নপূর্ণা তরখড়কর বিলাত থেকে লেখাপড়া শিখে ফিরেছিলেন। বাড়ীতে তাঁর ডাক নাম ছিল আনা তরখড়। এই মেয়েটির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা হয়েছিল বাড়ীর আর সকলের চেয়ে বেশী। আনা রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, আত্মীয়-স্বজনহীন এই ছেলেটির বিশেষ কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।

আনার সঙ্গে কথাবার্তায় রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি শিখতে লাগলেন, আর আনা রবীন্দ্রনাথের কাছে শিখতে লাগলেন বাংলা কথা।

স্বভাবকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখা বন্ধ হয়নি। অবসর সময়ে বসে বসে তিনি কবিতা লিখতেন, মাঝে মাঝে আবার সেই কবিতা পড়ে শোনাতেন অন্নপূর্ণাকে। ইংরাজি তর্জমা করে বুঝিয়ে দিতেন।

অন্নপূর্ণা শুনতেন, খুশি হতেন, সুমিষ্টকণ্ঠের বাংলা শব্দ-ঝংকার অন্নপূর্ণাকে মুগ্ধ করতো। তরুণ কবির প্রতিভার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জাগতো।

একদিন অন্নপূর্ণা কবিকে বললেন—আমার ডাক নামটা তেমন ভালো নয়। একটি ভালো নাম বল দিকি?

কবি কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন, তারপর বললেন একটি নাম। সেই নামটি অন্নপূর্ণার পছন্দ হলো। কবি তখন সেই নামে একটি গান বেঁধে শুনিয়ে দিলেন অন্নপূর্ণাকে। সংগীতের ভৈরবী স্বর যখন থামলো অন্নপূর্ণা বললেন—কবি, অপূর্ব তোমার কণ্ঠ, তোমার গান শুনলে বোধ হয় আমি আমার মরণ দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।

অন্নপূর্ণা শুধু কবির কাব্য ও কণ্ঠেরই প্রশংসা করতেন না, তাঁর গুণের, তাঁর সুঠাম দেহের, তাঁর লাবণ্যদীপ্ত মুখশ্রীরও প্রশংসা করতেন। একদিন কথায় কথায় বিশেষ করে তিনি বলেছিলেন—কবি, আমার একটা কথা রেখো, তুমি কোনদিন দাড়ি রেখো না, তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে।

সেকথা কবি মনে রেখেছিলেন। দাড়ি রাখতে যখন তিনি সুরু করলেন, অন্নপূর্ণা তার অনেক আগেই এই জীবনের সীমারেখা পার হয়ে চলে গেছেন।

অন্নপূর্ণার স্নেহ কবির নিঃসঙ্গ জীবনের আবেষ্টনকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছিল যে প্রবাস জীবনের রিক্ততা কবি বিস্মৃত হয়েছিলেন।—

"আমাদের ঐ বটগাছটিতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।" [—ছেলেবেলা

অন্নপূর্ণা কিশোর কবির মনে জাগিয়ে দিলেন অজানা সুর, জীবনের চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দিয়েছিলেন, তার রেশটুকু কবির মনের মণিকোঠায় জমা ছিল চিরদিন।

আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ে ছ'মাস কাটলো।

তারপর একদিন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ছোটভাইটিকে নিয়ে জাহাজে উঠে বসলেন। তরুণ কবিও সুরু করলেন তাঁর দিনপঞ্জী লিখতে।

জাহাজ চলে। তটরেখা লীন হয়ে যায় দিগ্বলয়ে। চারিপাশেই নীল জল

আকাশে গিয়ে মেশে। দিনের পর দিন ধরে মনে হয় জাহাজ বুঝি আর এগোয় না। একই দিগন্তের গণ্ডির মাঝে কে যেন জাহাজখানিকে বেঁধে রেখেছে। একই দিগন্তে একই আকাশের কোলে ধাক্কা খেয়ে কবির মন বিকল হয়ে ওঠে। বোম্বাইয়ের সাগর-সৈকতে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের পানে তাকিয়ে সমুদ্রকে কেমন মহান বলে মনে হতো, মনে হতো সামনের ওই দিগন্তের সীমা একবার পার হতে পারলেই চোখের সামনে অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথ্‌লে উঠবে। কিন্তু সমুদ্রের মাঝে এসে, কই সে মহান রূপ তো চোখে পড়লো না।

কবির এক একবার মনে হয়, উত্তাল তরঙ্গ উঠলে ভালো হয়, সমুদ্রের রূপ একবার দু'চোখ ভরে দেখা যায়। কিন্তু ঢেউ যখন ওঠে কবি তখন আর ডেকের উপর দাঁড়াতে পারেন না। মাথা ঘুরতে থাকে, দেখা-শুনা সব ঘুরে যায়, কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়েন।

এইভাবে নিরবচ্ছিন্ন বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে দিয়েই দিন কেটে যায়।

কবি বিলাতে পৌঁছলেন।

ব্রাইটনে মেজবৌদি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাস করছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেইখানে এসে উঠলেন। সেখানকার এক ইস্কুলে ভর্তি হলেন। রীতিমত লেখাপড়া স্থরু হয়ে গেল।

ইস্কুলের অধ্যক্ষ তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে বলেছিলেন—তোমার মাথার গড়নটা চমৎকার!

বাড়ীতে বৌঠাকুরানীর মুখে নিজের চেহারার কোন প্রশংসা কোনদিন শোনেন নি, এবার বিদেশী সাহেবের মুখে নিজের আকৃতির সুখ্যাতি শুনে কবি কিছুটা খুশি হলেন নিশ্চয়ই।

এখানকার ইস্কুলে ছেলেদের ব্যবহার ভাল ছিল। অনেক সময় সহ-পাঠীরা রবীন্দ্রনাথের পকেটের মধ্যে কমলালেবু আপেল প্রভৃতি ফল গুঁজে দিয়ে পালিয়ে যেত।

কিন্তু ব্রাইটনের ইস্কুলে বেশীদিন পড়াশুনা চললো না। স্যার তারকনাথ পালিত তখন ছিলেন বিলাতে, তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে বললেন—রবীন্দ্রনাথকে লণ্ডনের কোন ইস্কুলে ভর্তি করে দাও।

সত্যেন্দ্রনাথ ছোট ভাইকে নিয়ে এলেন লণ্ডনে। সেখানকার এক ইস্কুলে ভর্তি

করে দিলেন। থাকার ব্যবস্থা হলো রিজেণ্ট উদ্যানের সামনে একটি বাড়ীতে। কবি আবার আত্মীয় পরিজন বিবর্জিত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন।

তখন শীতকাল। "নবাগত প্রবাসীর পক্ষে শীতের লণ্ডনের মতো এমন নির্মম স্থান আর-কোথাও নাই। কাছাকাছির মধ্যে পরিচিত কেহ নাই, রাস্তাঘাট ভালো করিয়া চিনি না। একলা ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিবার দিন আবার আমার জীবনে ফিরিয়া আসিল।... আকাশের রঙ ঘোলা, আলোক মৃতব্যক্তির চক্ষুতারার মত দীপ্তিহীন; দশ-দিক আপনাকে সংকুচিত করিয়া আনিয়াছে, জগতের মধ্যে উদার আহ্বান নাই। ঘরের মধ্যে আসবাব প্রায় কিছুই ছিল না। দৈবক্রমে কী কারণে একটা হারমোনিয়ম ছিল। দিন যখন সকাল-সকাল অন্ধকার হইয়া আসিত তখন সেই যন্ত্রটা আপনমনে বাজাইতাম। [—জীবনস্মৃতি

বিলাতে ল্যাটিন না জানলে পরীক্ষা দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ ল্যাটিন পড়তে সুরু করলেন। যাঁর কাছে ল্যাটিন পড়তেন তিনি ছিলেন দার্শনিক মানুষ। তিনি তখন একটি দার্শনিক তত্ত্বকথা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি লিখছিলেন যে, পৃথিবীতে এক একটি যুগে একই সময় ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানব সমাজে একই ভাবের আবির্ভাব হয়ে থাকে। সেই তথ্যই তিনি সবসময় ভাবতেন। কখনো বিমর্ষ হয়ে পড়তেন, কখন-বা কোন্ শূন্যের পানে তাকিয়ে থাকতেন। তিনি যে ল্যাটিন পড়াতে এসেছেন, সে কথা তখন আর তাঁর মনে থাকতো না। পড়াতে তিনি ভুলে যেতেন। ল্যাটিন ব্যাকরণের পড়া থেমে যেত মাঝ পথে।

এমন মানুষকে দিয়ে পড়ার কোন সাহায্য হবে না, রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতে পারতেন, কিন্তু তার সঙ্গে এটুকুও বুঝেছিলেন যে এই মানুষটির অন্নবস্ত্রের অভাব আছে। এঁকে বিদায় দিলে এঁর হয়তো খাওয়া-পরা অচল হয়ে যাবে। সেই জন্য কোন মতেই এঁকে বিদায় দিতে পারছিলেন না।

কিন্তু শিক্ষক মশাই মানুষ ছিলেন খাঁটি। বেতন নেবার সময় তিনি বললেন—আমি কেবল তোমার সময় নষ্ট করেছি, আমি তো কোন কাজ করিনি। আমি তোমার কাছ থেকে বেতন নিতে পারবো না।

কবি অনেক কষ্টে তাঁকে বেতন গ্রহণ করতে রাজী করান।

শিক্ষক নিজেই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। সেই মানুষটির কাছে কবির

রীতিমত ল্যাটিন শেখা হয়নি সত্যি, কিন্তু এই মানুষটি কবির মনে যে রেখাপাত করে যায়, তা কবি কোনদিন ভুলতে পারেননি।

লণ্ডনে যে সব গৃহে কবি ছিলেন, তার মধ্যে দুটি পরিবারের কথাই কবির জীবনে উল্লেখযোগ্য। বার্কার পরিবার ও স্কট পরিবার।

বার্কার সাহেব বাড়ীতে পড়িয়ে ছেলেদের পরীক্ষার জন্ম তৈরী করাতেন। আধ-বুড়ো লোক, সদাই গম্ভীর, বড় খিটখিটে। এক তলায় একখানি ছোট্ট ঘরে তিনি বসতেন। সেই ঘরেই তিনি কবিকে পড়াতেন। ঘরখানির জানালা দরজা সদাই বন্ধ থাকে। ঘরের মধ্যে ঢুকলেই হাঁপিয়ে উঠতে হয়। ঘরখানির চারিপাশ পুরাণো ধুলোবালি মাখা গ্রীক আর ল্যাটিন বইয়ে ভরা। ঘরখানির পরিবেশ ছিল ঘরের মালিকের মতই গম্ভীর।

কবি বার্কারের কাছে পড়তেন। অনেক সময় ঘরে ঢুকেই দেখতেন অকারণে বসে বসে বার্কার সাহেব ভ্রূকুটি করে উ-আঁ করছেন। ঘরে দ্বিতীয় একটি লোক নেই। সদাই একটা বিরক্তভাব ছিল মানুষটির মধ্যে। "আঁট বুটজুতো পরতে বিলম্ব হচ্ছে, বুটজুতোর উপর চটে ওঠেন; যেতে যেতে দেয়ালের পেরেকে তাঁর পকেট আটকে যায়, রেগে ভুরু কুঁকড়ে ঠোঁট নাড়তে থাকেন। তিনি যেমন খুঁতখুঁতে মানুষ তাঁর পক্ষে তেমনি খুঁতখুঁতের কারণ প্রতিপদেই জোটে। আসতে যেতে হোঁচট খান, অনেক টানাটানিতে তাঁর দেরাজ খোলে না, যদি বা খোলে তবু যে জিনিষ খুঁজছিলেন তা পান না।"

[—য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র

বার্কার গৃহিনী কিন্তু স্বামীর মত ছিলেন না। তিনি ছিলেন ভালমানুষ। কবিকে তিনি ভালবাসতেন, মাঝে মাঝে তিনি পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতেন।

স্কট পরিবারে কবি ছিলেন একেবারে ঘরের লোক। মাত্র তিনমাস তিনি সে বাড়ীতে ছিলেন কিন্তু স্কট পরিবারের স্নেহ তিনি ভুলতে পারেননি সারা জীবনে। শীতের দিনে গরম কাপড় গায়ে না দিলে স্কট-পত্নী কবিকে বকাবকি করতেন। খাবার সময় কবি কম খাচ্ছেন মনে হলে আরো খাবার জন্ম পীড়াপীড়ি করতেন। দৈবাৎ দু'বার কাশলে তিনি স্নান বন্ধ করে দিয়ে ওষুধ খাওয়াতেন এবং শোবার সময় গরম জলের ফুটবাথের ব্যবস্থা করে দিতেন।

স্কট সাহেবের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথকে ডাকতো

আর্থার খুড়ো বলে—আংকল আর্থার। আর্থার খুড়োকে নিয়ে ভাইবোনে ঝগড়া বাধতো। ছোট মেয়ে এথেল বলতো—আর্থার খুড়ো শুধু তার একারই খুড়ো।

ছোট ছেলে টম বলতো—না, আর্থার খুড়ো আমার একারই খুড়ো!

এথেল তখন আর্থার খুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে সুরু করতো।

স্নেহের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে রবীন্দ্রনাথ ভুলে যেতেন যে তিনি এ-বাড়ীর ছেলে নন।

কখন কখন আবার ভাইবোনের মনে নানা জটিল সমস্যা দেখা দিত। তারা ছুটে আসতো আর্থার খুড়োর কাছে। গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করতো,—আচ্ছা, আর্থার খুড়ো, ইঁদুররা কি করে?

খুড়ো জবাব দিতেন—তারা রান্নাঘর থেকে চুরি করে খায়।

—চুরি করে? আচ্ছা, চুরি করে কেন?

—তাদের খিদে পায় বলে।

শিশুমনের জটিল সমস্যা মুহূর্তমধ্যে সরল হয়ে যায়।

স্কট সাহেবের বাড়ীতে কবির দিনগুলি ভালভাবেই কাটে। সন্ধ্যাবেলা সপ্তাহে ছ'দিন ছ'রকম বই পালা করে পড়া হয়, কোন কোন দিন বা স্কটের মেয়ে কবিকে ইংরাজি গান শেখান। কোন দিন বা সন্ধ্যাবেলা টেবিল চালা হয়। অবসর সময় স্কটের একটি মেয়েকে কবি বাংলা শেখান।

দিন যায়। সহসা একদিন কথা উঠলো মেজদাদা দেশে ফিরবেন। পিতা লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথকেও তিনি যেন সঙ্গে করে নিয়ে যান।

কাজেই কবিকে সে গৃহ থেকে একদিন বিদায় নিতে হলো। বিদায়কালে শ্রীমতী স্কট সজল চোখে রবীন্দ্রনাথের দুটি হাত ধরে বলেছিলেন—এমন করেই যদি চলে যাবে তবে এতো অল্প দিনের জন্যে তুমি কেন এখানে এলে?

মাতৃহৃদয়ের স্নেহ সেদিন দেশ ও সমাজের সীমারেখার বাইরে আপনাকে প্রকাশিত করেছিল।

"ফুরালো দু-দিন
শরতে যে শাখা হয়েছিল পত্রহীন
এ-দু'দিনে সে শাখা উঠেনি মুকুলিয়া।

অচল শিখর 'পরি যে তুষার ছিল পড়ি
এ দু-দিনে কণা তার যায়নি গলিয়া,
কিন্তু এ দু'দিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া।..." [—সন্ধ্যা সঙ্গীত

মাঝে কিছুদিন কবি ছিলেন ডিভনসায়রে, টর্কি নগরে। সেখানে মেজ-বৌঠাকুরানী থাকতেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। সমুদ্রতীরে পাহাড় ঘেরা স্নিগ্ধ জনপদ। মেঘ নেই, কুয়াসা নেই, অন্ধকার নেই। চারিদিকে সবুজ গাছপালা, চারিপাশে ফুলের মেলা। পাইনগাছের ছায়ায় ঢাকা, ফুল বিছানো প্রান্তর থেকে ভেসে আসে পাখীর কাকলি। সুনীল সমুদ্রতীরে পাহাড়ের বুকে কবির দিনগুলি আনন্দে কেটে যায়। তরুণ কবি যেন খুঁজে পান তাঁর হারানো সুর।

ছোট ছোট কত পাহাড় সমুদ্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ঢেউ লেগে লেগে পাহাড়ের নীচে গুহা তৈরী হয়েছে। যখন ভাঁটা পড়ে তখন সবাই মিলে সেই গুহার মধ্যে গিয়ে বসে থাকেন। কোন কোন দিন-বা সবাই মিলে সেই পাথরগুলোকে ঠেলাঠেলি করে নড়াবার চেষ্টা করেন। নানা ধরণের রঙীন শামুক ঝিনুক কুড়োবার ধুম পড়ে যায় কোন দিন। কোন দিন-বা সমুদ্রের তীরে কোন পাহাড়ের দুর্গম চূড়ায় বসে নীচে ঢেউয়ের ওঠা-নামা দেখেন, শুয়ে শুয়ে গল্প করেন। আবার কোনদিন পাথর দিয়ে ঘেরা ঝোপঝাপে ঢাকা কোন এক জায়গায় বসে বসে বই পড়েন। দিন কেটে যায়।

কবি এই সময় মাত্র তিনমাস ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়েছিলেন। সেই সময় ইংরাজি সাহিত্যের ক্লাশে তাঁর সহধ্যায়ী ছিলেন তারকনাথ পালিতের পুত্র লোকেন পালিত। লোকেনবাবু বয়সে বছর চারেকের ছোট ছিলেন। কিন্তু অন্তরঙ্গতা জমে উঠতে দেরী হয় নি। দু'জনে একসঙ্গে বসতেন, একসঙ্গে বেড়াতেন, একসঙ্গে পড়াশুনা নিয়ে আলোচনা করতেন। প্রথম জীবনের সেই সম্প্রীতি সারা জীবনের বন্ধুতার ভিত্তি হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরলেন, তখন তাঁর বয়স উনিশ বছর পূর্ণ হয়নি। যাঁরা আশা করেছিলেন তিনি ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরবেন, তাঁরা ক্ষুন্ন হলেন।

তবে ইতিমধ্যে কবির প্রকৃতি কিছুটা বদলে গেছে। বিলাতের আবহাওয়ায়

দেহশ্রী হয়েছে আগের চেয়ে সুন্দর, গলার স্বর ও কথা বলার ঢং গেছে বদলে। আগেকার অপ্রতিভ ভাব আর নেই। এখন হয়েছেন প্রগল্ভ। কিন্তু বিলাতের সাহেবিয়ানা কিশোর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সাহেবী ভাবাপন্ন চটকদার বাঙালীদের তিনি ভাল চোখে দেখতে পারতেন না। তিনি তাদের নাম দিয়েছিলেন 'ইঙ্গ-বঙ্গ'।

"ইঙ্গ-বঙ্গদের ভাল করে চিনতে গেলে তাঁদের তিনরকম অবস্থায় দেখতে হয়। তাঁরা ইংরেজদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন, বাঙালিদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন ও তাঁদের স্বজাত 'ইঙ্গ-বঙ্গ'দের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন। একটি ইঙ্গ-বঙ্গ একজন ইংরেজের সম্মুখে দেখো চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। ভদ্রতার ভারে প্রতি কথায় ঘাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছে, তর্ক করবার সময় অতিশয় সাবধানে নরম করে প্রতিবাদ করেন ও প্রতিবাদ করতে হল বলে অপর্যাপ্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, অসংখ্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।...ডিনারের টেবিলে কাঁটা ছুরি উল্‌টে ধরতে হবে, কি পাল্‌টে ধরতে হবে তাই জানবার জন্যে তাঁদের গবেষণা দেখলে তাঁদের উপর ভক্তির উদয় হয়।...ঐ রকম ছোটো-খাটো বিষয়ে একজন বাঙালি যত দস্তুর বেদস্তুর নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, এমন এ দিশি করে না। তুমি যদি মাছ খাবার সময় ছুরি ব্যবহার কর তবে একজন ইংরেজ তাতে বড়ো আশ্চর্য হবেন না, কেন না তিনি জানেন তুমি বিদেশী, কিন্তু একজন ইঙ্গবঙ্গ সেখানে উপস্থিত থাকলে তাঁর স্মেলিং সল্‌টের আবশ্যক করবে।...আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখেছি যে বাঙালিরা ইংরেজদের কাছে স্বদেশের লোকদের আচার-ব্যবহারের যত নিন্দে করেন, এমন একজন ভারতদ্বেষী অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানও করেন না। তিনি নিজে ইচ্ছা করে কথা পাড়েন ও ভারতবর্ষের নানা প্রকার কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রাণ খুলে হাস্য পরিহাস করেন।...তাঁর একান্ত ইচ্ছা তাঁকে কেউ ভারতবর্ষীয় দলের মধ্যে গণ্য না করে।...একজন বাঙালি একবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর একজন ভারতবর্ষীয় এসে তাঁকে হিন্দুস্থানিতে দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করে, তিনি মহা খাপা হয়ে তার উত্তর না দিয়ে চলে যান। তাঁর ইচ্ছে, তাঁকে দেখে কেউ না মনে করতে পারে যে তিনি হিন্দুস্থানি বোঝেন। একজন ইঙ্গবঙ্গ একটি 'জাতীয় সংগীত' রামপ্রসাদী সুরে রচনা করেছেন।...

মা, এবার মলে সাহেব হব ;
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে, পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব।

সাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব,
(আবার) কালো বদন দেখলে পরে 'ডার্কি' বলে মুখ ফেরাব।"

[—য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র

ফিরিঙ্গিয়ানার অন্তঃসারশূন্য চাকচিক্য তরুণ মনকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি, পারেনি প্রলুব্ধ করতে। জাতীয় ভাব ছিল দৃঢ়, বিচারবুদ্ধি ছিল সুসংহত।

আবার কবির জীবনে দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন অবসর নেমে এলো। কর্মহীন একান্ত অবসর। সেই ছাদ, সেই চাঁদ, সেই দক্ষিণ বাতাস, সেই নিজের ঘরে বসে কাব্য রচনা। এই মন্থর দিনগুলির মাঝে একমাত্র ছেদ ছিল শুধু জ্যোতি-দাদার সংগীতের আসর। বিলাত থেকে যে গানগুলি তিনি শিখে এসেছিলেন, তা গেয়ে শোনাতেন সেই আসরে।

বাড়ীতে মাঝে মাঝে সাহিত্যিকদের আসর বসতো—বিদ্বজ্জন সমাগম। কথা উঠলো—এই আসরের বার্ষিক অধিবেশনে একটি নাটক অভিনয় করা হবে, এবং সেই নাটকখানি লিখবেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ লিখতে সুরু করলেন 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্য। গীতিনাট্যে গল্পের চেয়ে গানের অংশই বেশী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাজাতে বসেন, রবীন্দ্র-নাথ সুরের সঙ্গে বাণী রচনা করেন। নাটকের কথোপকথনের ভাষাও থাকে গানে। শুধু দিশি সুরের গান নয়, বিলিতি সুরও দেওয়া হলো।

বাল্মীকি প্রতিভা সম্পূর্ণ হলো, অভিনয়ও হলো। বাল্মীকির ভূমিকায় নামলেন কবি নিজে।

এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয় নয়। এর আগেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দু'খানি নাটকে—'এমন কর্ম আর করব না' ও 'মানময়ী'-তে তিনি দু'বার অভিনয় করেছিলেন। প্রথম নাটকে নেমেছিলেন অলীকবাবুর ভূমিকায় আর দ্বিতীয়টিতে নেমেছিলেন মদনের ভূমিকায়। কাজেই অভিনয়ের সংকোচ তাঁর ছিল না। এবারকার অভিনয় হলো অনিন্দ্যসুন্দর।

দর্শকদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়। তিনজনেই মুগ্ধ হলেন। বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনে লিখলেন—'যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্মীকি প্রতিভা পড়িয়াছেন বা তাঁহার অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না।'

গুরুদাস বাবু একটি গান রচনা করে ফেললেন—

"ওঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞান-তিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।…" [—জীবনস্মৃতি

হরপ্রসাদবাবু কিছুদিন আগে একখানি বই লিখেছিলেন—বাল্মীকির জয়। বইখানির শেষ দিকটা এবার তিনি কিছু কিছু অদলবদল করলেন। বইখানি যখন ছাপা হয়ে বেরুলো, তখন বঙ্গদর্শন লিখলো—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রবাবুর অনুগমন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক রচনার সাফল্য স্বীকৃতি পেল বিদ্বজ্জন সমাজে।

রবীন্দ্রনাথের আবার বিলাত যাবার ইচ্ছা হলো। মহর্ষি কলিকাতায় ছিলেন না, কবি পিতাকে চিঠি লিখলেন—বিলাতে গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে আসবো, অনুমতি দিন।

মহর্ষি অনুমতি দিলেন।

ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে কবি জাহাজে উঠলেন।

কিন্তু কলিকাতা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়েই সত্যপ্রসাদের মন গেল বদলে,—তিনি আর যাবেন না। কিন্তু একা ফিরে গেলে মহর্ষি যদি বিরক্ত হন? তাই রবীন্দ্রনাথকেও সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন।

মহর্ষি তখন মুসৌরী পাহাড়ে। দু'জনে বরাবর গিয়ে মহর্ষির সঙ্গে দেখা করলেন। মহর্ষি কিন্তু তাঁদের ভর্ৎসনা করলেন না, মনে হলো তিনি এই ঘটনাকে মঙ্গলময় ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেই ধরে নিয়েছেন।

এই সময় কবির দু'খানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলো—ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচণ্ড।

ভগ্নহৃদয় কবির আঠারো বছর বয়সের রচনা। কম বয়সের লেখা হলেও অনেকের এতো ভালো লাগে যে কিছু কিছু কণ্ঠস্থ করে ফেলে।

বইখানি পড়ে ত্রিপুরার মহারাজা কবিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর তখন শোকাচ্ছন্ন। কিছুদিন আগে রাজমহিষী মারা গেছেন। ভগ্নহৃদয় কাব্যখানি পড়ে মহারাজা তার মধ্যে নিজের ভগ্নহৃদয়ের প্রতিধ্বনি খুঁজে পান, তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে পাঠিয়ে দেন কবিকে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য।

একদিন সকালে ভৃত্য এসে জানালো—ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে লোক এসেছেন কবির সঙ্গে দেখা করতে।

রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হলেন। সসংকোচে সেক্রেটারীকে অভ্যর্থনা করলেন।

সেক্রেটারী বললেন—ভগ্নহৃদয় পড়ে মহারাজ প্রীত হয়েছেন, তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন কবিকে।

কবির জীবনে এ একেবারে অপ্রত্যাশিত।

এই থেকেই ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে কবির হৃদ্যতার সূত্রপাত হয়।

'ভগ্নহৃদয়' কবি উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীমতী হে-কে।

অনেকে বলেন, কাদম্বরী দেবীর ডাক-নাম ছিল হেকেটি—এক গ্রীক দেবীর নাম। 'হে' সেই নামেরই আদ্যাক্ষর। এই নারীর স্নেহ কবির বাল্য ও কৈশোরের একমাত্র নির্ভর ছিল। এত ভক্তি আর কারও উপর রবীন্দ্রনাথের ছিল না।

'রুদ্রচণ্ড' অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটক। পৃথ্বীরাজের পরাজয় কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। এই নাটকখানি কবি উৎসর্গ করেছিলেন জ্যোতিদাদার নামে—

> "ভাই জ্যোতিদাদা,
> যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা নহে ভাই!
> কোথাও পাইনে খুঁজে যা তোমারে দিতে চাই!···
> ···ছেলেবেলা হতে ভাই, ধরিয়া আমার হাত
> অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।···
> ···যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই,
> তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই!"

জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাতীরে মোরাণ সাহেবের বাগান-বাড়ীতে থাকতেন, কবি কিছুদিনের জন্য সেখানে এলেন।

এর আগে কিছুদিন তিনি গঙ্গার তীরে বাস করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল আট বছর। সে-বছর কলিকাতায় ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। ঠাকুর পরিবারের কেউ কেউ কলিকাতা ছেড়ে ছাতুবাবুদের পেনেটির বাগান-বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও সেখানে কিছুদিন ছিলেন। বাড়ীর বারান্দার সামনে ছিল কয়েকটি পেয়ারা গাছ, সেই পেয়ারা গাছের

অন্তরাল দিয়ে দেখা যায় গঙ্গা। বালক সকাল থেকেই সেই গঙ্গার পানে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকতেন।

"আমি বসে বসে তাই ভাবি
নদী কোথা হতে এল নাবি।
কোথায় পাহাড় সে কোন্‌খানে,
তাহার নাম কি কেহই জানে।
কেহ যেতে পারে তার কাছে,
সেথায় মানুষ কি কেউ আছে।" [—শিশু

বালক বসে দেখতেন নদীর বুকে জোয়ার-ভাঁটার খেলা। সন্ধ্যাবেলা ওপার থেকে সূর্যাস্তের সোনালী আভা ছড়িয়ে পড়তো জলের বুকে, এপারের কালো ছায়া ধীরে ধীরে ঝাপসা করে দিত দিগন্ত। কখনো বা মেঘলা দিনের স্তিমিত আলোকে ম্লান করে দিয়ে ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি নামতো। নদী ফুলে উঠতো, ভিজা হাওয়া চঞ্চল করে তুলতো এপারের গাছপালাকে। ওপারের তটরেখা আর চোখে পড়তো না। বালকের মন কল্পনার রঙে রঙীন হয়ে উঠতো।—

"আরেকটি ছোটো ঘর মনে পড়ে নদীকূলে
সম্মুখে পেয়ারা গাছ ভরে আছে ফলেফুলে
বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশব খেলা,
জাহ্নবী প্রবাহ পানে চেয়ে আছি সারা বেলা,
ছায়া কাঁপে আলো কাঁপে ঝুরু ঝুরু বহে বায়,
ঝর ঝর মরমর পাতা ঝরে পড়ে যায়।
সাধ যেত যাই ভেসে
কত রাজ্য কত দেশে
দুলায়ে দুলায়ে ঢেউ নিয়ে যাবে কত দূর
কত ছোটো ছোটো গ্রাম
নূতন নূতন নাম
অভ্রভেদী অভ্রসৌধ কত নব রাজপুর।" [—প্রভাত সংগীত

প্রথম যৌবনে কবি আবার সেই গঙ্গাতীরে এসে উঠলেন। মোরাণ সাহেবের বাড়ীর সর্বোচ্চ তলায় চারিদিক খোলা একখানি গোল ঘর ছিল। সেই ঘরে কবির থাকবার জায়গা হলো।

"গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণ বিকশিত

পদ্মফুলের মত এক একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।...কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ম-যন্ত্র-যোগে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটির মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিনী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত মুখর জল-ধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মত কাটাইয়া দিতাম; কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; পূরবী রাগিনী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিম তটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ব বনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপর বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলেস্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহর উপর আলো ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।" [—জীবনস্মৃতি

এই ভাবেই দিন যায়।

এইখানে বসে কবি মনের আবেগে যে লেখাগুলি লেখেন, সেইগুলিই পরে 'সন্ধ্যাসংগীত' নামে প্রকাশিত হয়।

তখনকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সাহিত্যের সবসেরা সমঝ্‌দার; সন্ধ্যা-সংগীত বঙ্কিমচন্দ্রের নজরে পড়লো।

রমেশচন্দ্র দত্তের মেয়ের বিয়ে। বিবাহ সভায় যত গণ্যমান্য অতিথির সমাগম হয়েছে। রমেশবাবু সকলকে অভ্যর্থনা করছেন। বঙ্কিমবাবু আসতেই রমেশবাবু তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিতে এগিয়ে এলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পিছনে আসছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমবাবু রমেশবাবুর হাত থেকে মালাটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিলেন, বললেন—রমেশ, তুমি সন্ধ্যা-সংগীত পড়েছ?

রমেশবাবু বললেন—না।

—পড়ে দেখো, বেশ হয়েছে।

বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যা-সংগীতের খুব প্রশংসা করলেন।

তখনকার দিনে বঙ্কিমবাবুর প্রশংসা সাহিত্য জগতে সবচেয়ে মূল্যবান ছিল, তার উপর সেই সভার মাঝে সেই প্রশংসা কবিকে শুধু প্রেরণাই দিল না, দিল আত্মবিশ্বাস।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কবি প্রথম দেখেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের এক বার্ষিক সম্মিলনীতে। তখন বঙ্কিমবাবুকে তিনি চিনতেন না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘকায় দৃপ্ত চেহারা সভার আর পাঁচজনের মধ্যেও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পাশের লোককে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—উনি কে?

—উনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যে মানুষটির লেখা এতদিন বঙ্গদর্শনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। আজ সেই মানুষটিকে প্রত্যক্ষ করলেন। অতো লোকের মাঝেও ওই একটি মানুষের বিশেষত্ব তাঁর চোখে পড়লো। মনে হলো মানুষটীর কপালে যেন রাজতিলক পরানো আছে।

সেইদিন থেকে 'বার বার বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কবির আলাপ করার ইচ্ছা হয়েছে কিন্তু সুযোগ ঘটেনি।

বছর পাঁচেক পরে, বঙ্কিমবাবু তখন হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তরুণ কবি একদিন সাহস করে গেলেন বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে। দেখা হলো। আলাপ করলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেকে বড় নিষ্প্রভ বলে মনে হলো। বাড়ী ফেরার পথে একটী কথাই শুধু মনের মাঝে জাগলো, এমন ভাবে বিনা পরিচয়ে বিনা আহ্বানে বঙ্কিমবাবুর কাছে যাওয়া বোধ হয় ভালো হয়নি।

কিন্তু বঙ্কিমবাবুর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। বছরখানেক পরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রীটে এসে উঠলেন, তখন কবি তাঁর কাছে নিয়মিত যাতায়াত সুরু করলেন। তবে বেশী কথা তিনি বলতেন না, সংকোচ হতো। বঙ্কিমবাবু কথা বলতেন, তিনি বসে বসে শুনতেন।

বঙ্কিমবাবু তরুণ প্রতিভাকে চিনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সংকোচ করলেও তিনি কবিকে স্নেহ করতেন।

কবি এই সময় থাকতেন সদর স্ট্রীটে। যাদুঘরের পাশে দশ নম্বর বাড়ী। জ্যোতিদাদা থাকতেন সেখানে।

বাড়ীর বারান্দায় কবি দাঁড়িয়ে থাকতেন। পথচারীদের পানে তিনি তাকিয়ে থাকতেন। শিশুকাল থেকে চোখ মেলে দেখতেই তিনি অভ্যস্ত। বারান্দা থেকে চৌরঙ্গীর চলমান জনপ্রবাহের পানে তিনি তাকিয়ে দেখতেন শুধু।

"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে, সেইখানে বোধ করি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত বহিয়া চলিল।"—

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে, প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।" [—প্রভাত সংগীত

কবির প্রভাত সংগীত লেখা সুরু হলো।

ইতিমধ্যে জ্যোতিদাদা গেলেন দার্জিলিঙে। কবিও গেলেন সঙ্গে।

সহর থেকে দূরে নিরিবিলি একখানি বাড়ী, রোজভিলা। সেখান থেকে কবি দেবদারু বনের মাঝে দৃষ্টিকে মেলে দেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার মেঘমুক্ত শিখরের পানে তাকান, কিন্তু যে অনুভূতি জেগেছিল কলিকাতা শহরের জনবহুল রাজ-পথের পানে তাকিয়ে, তা হিমালয়ের মহিমার মাঝে আত্মগোপন করে। প্রভাত সংগীতের কবিতা লেখা আর এগোয় না।

কবি গেলেন কর্ণাটে। বোম্বাইয়ের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে কর্ণাটের প্রধান সহর কারোয়ার। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেখানকার জজ্।

সমুদ্র তীরে জজসাহেবের কাঠের বাড়ী। বর্ষাকালে সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে বাড়ীর প্রান্তে। চারিপাশ শৈলমালা বেষ্টিত। অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি যেন দুই বাহু প্রসারিত করে দিয়েছে সমুদ্রের দুই পাশে। বালুতটের প্রান্ত অবধি ঝাউগাছের বন। সেই বনের কোল দিয়ে নেমে আসছে একটি ছোট নদী—কালাবাদী। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য কবির মনকে মুগ্ধ করে।

এখানে জ্যোতিদাদা ও কাদম্বরী দেবী, মেজো বৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী ও দুই ভাইপো-ভাইঝি সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী আছেন। কলহাস্য মুখরিত হয়ে লঘুপক্ষ বলাকার মত দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল।

"মনে আছে একদিন শুক্লপক্ষের গোধূলিতে একটি ছোটো নৌকায় করিয়া আমরা এই কালানদী বাহিয়া উজাইয়া চলিয়াছিলাম। এক জায়গায় তীরে নামিয়া শিবাজীর একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ দেখিয়া আবার নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। নিস্তব্ধ বন পাহাড় এবং এই নির্জন নদীর স্রোতটির উপর জ্যোৎস্না রাত্রি ধ্যানাসনে বসিয়া চন্দ্রলোকের যাদুমন্ত্র পড়িয়া দিল। আমরা তীরে নামিয়া একজন চাষার কুটিরে বেড়া-দেওয়া পরিষ্কার নিকানো আঙিনায় গিয়া উঠিলাম। প্রাচীরের ঢালু ছায়াটির উপর দিয়া যেখানে চাঁদের আলো আড় হইয়া আসিয়া পড়িয়াছে সেইখানে তাহাদের দাওয়াটির সামনে আসন পাতিয়া আহার করিয়া লইলাম। ফিরিবার সময় ভাঁটিতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

"সমুদ্রের মোহানার কাছে আসিয়া পৌছিতে অনেক বিলম্ব হইল। সেইখানে নৌকা হইতে নামিয়া বালুতটের উপর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। তখন নিশীথ রাত্রি, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, ঝাউবনের নিয়ত মর্মরিত চাঞ্চল্য একেবারে থামিয়া গিয়াছে, সুদূর বিস্তৃত বালুকারাশির প্রান্তে তরুশ্রেণীর ছায়াপুঞ্জ নিস্পন্দ, দিক্‌চক্রবালে নীলাভ শৈলমালা পাণ্ডুর নীল আকাশতলে নিমগ্ন। এই উদার শুভ্রতার ও নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি মানুষ কালো ছায়া ফেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে যখন পৌছিলাম তখন ঘুমের চেয়েও কোন্ গভীরতার মধ্যে আমার ঘুম ডুবিয়া গেল।" [—জীবনস্মৃতি

সেই রাত্রেই কবি লিখলেন—

"অনন্ত রজনী শুধু ডুবে যাই, নিবে যাই,
মরে যাই অসীম মধুরে—
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে মিলায়ে মিশায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।" [—জীবনস্মৃতি

এই কারোয়ারতে থাকার সময়েই কবি তাঁর ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ লেখেন।

সত্যেন্দ্রনাথ এলেন কলিকাতায়। ২৩৭ নং লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ীটি তিনি ভাড়া নিলেন। বাগান বাড়ী। কবি কিছুদিন এই বাড়ীতেই ছিলেন।

এই বাড়ীর দক্ষিণ দিকে একটি বস্তি ছিল। কবি দোতলার জানালায় বসে সেই বস্তির মানুষগুলির আনাগোণা দেখতেন। সাধারণ মানুষের সারাদিনের জীবনধারা টুকরো টুকরো গল্পের মত চোখ পড়তো। কবি দেখতেন আর ভাবতেন। দিন কেটে যেত।

এই দেখার মধ্যে মাঝে মাঝে বন্যার মত এসে পড়তো কাব্যের প্রেরণা। কি লিখছেন কেন লিখছেন সে কথা আর মনে থাকতো না, কবি লিখে যেতেন।

এই সময় কবি তাঁর ‘ছবি ও গান’ কবিতাগুলি লেখেন।

এবার কবির বিয়ের কথা উঠলো।

কবির বয়স তখন বাইশ বছর। কনে ছিলেন এগারো বছরের মেয়ে ভবতারিণী দেবী। খুলনা জেলার দক্ষিণডিহির অধিবাসী বেণীমাধব রায়চৌধুরী ছিলেন মহর্ষির এস্টেটের কর্মচারী, ভবতারিণী দেবী বেণীমাধব বাবুর কন্যা।

বিবাহে কবির তেমন কোন আগ্রহ ছিল না, কিন্তু বৌঠানরা যখন বড় বেশী পীড়াপীড়ি সুরু করলেন, তখন কবি বললেন—তোমরা যা হয় কর, আমার কোন মতামত নেই।

বৌঠানরা যশোরে গেলেন মেয়ে দেখতে, বললেন—তুমিও চলো।

কবি বললেন—আমি কোথাও যাব না।

কবি বিয়ে করতে যশোরে গেলেন না। জোড়াসাঁকোতেই বিয়ে হলো।

এর আগে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিয়ের কথা হয়েছিল, সে মেয়েটি অ-বাঙালী। এক পয়সাওয়ালা লোকের মেয়ে। পিতার একমাত্র সন্তান, সাত লাখ টাকার উত্তরাধিকারিণী।

কবি কয়েকজনের সঙ্গে গিয়েছিলেন মেয়ে দেখতে। দুটি মেয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করলো। একটি নেহাৎ সাদাসিদে, জড়ভরতের মত এক কোণে বসে রইল, আরেকটি যেমন চট্‌পটে তেমনি সুন্দরী। সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে ইংরাজিতে আলাপ হলো, পিয়ানো বাজিয়ে শোনালো, সংগীত সম্পর্কে আলোচনা সুরু করলো কবির সঙ্গে।

এমন সময় বাড়ীর কর্তা এসে ঘরে ঢুকলেন। মেয়ে দুটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন—ইনি আমার পত্নী। আর জড়ভরতটিকে দেখিয়ে বললেন—এইটি আমার মেয়ে।

যাঁরা দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা আর কি বলবেন, মুখ চাওয়া-চাইয়ি করে চুপ করে গেলেন। সেই মেয়ে দেখার পর্ব সেইখানেই শেষ হলো।

যাক্ সে কথা, ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে কবির বিয়ে হয়ে গেল। ভবতারিণী নামটি কিন্তু কবির পছন্দ হয়নি। কবি পত্নীর নতুন নাম দিলেন মৃণালিনী।

মৃণালিনী দেবী লেখাপড়ায় ঠাকুরবাড়ীর যোগ্যা ছিলেন না। মহর্ষি তাঁর ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। বালিকা বধূর লরেটো হাউসে পড়ার ব্যবস্থা হলো।

এই বিবাহের উদ্যোগ-পর্ব থেকেই কিন্তু কয়েকটি শোকাবহ ঘটনা ঘটে।

কথা ছিল কবির বিবাহ-উৎসবে একখানি নাটক অভিনয় করা হবে। প্লট ঠিক হলো, কে কে অভিনয় করবেন তাও নির্বাচন করা হলো। অভিনেতারা কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজ নিজ ভূমিকা মনোমত করে লিখে নিলেন। লেখা শেষ করে সবাই কবিকে দিলেন দেখতে। কবি কাট-ছাঁট করে নাটক ঠিক করে দিলেন। নাটকের নাম দেওয়া হলো 'নলিনী', রিহার্স্যাল চলতে লাগলো।

নাটক কিন্তু আর অভিনীত হলো না।

বিয়ের দিন শিলাইদহের জমিদারী থেকে খবর এলো—সত্যপ্রসাদের পিতা কবির জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতি সারদাপ্রসাদের মৃত্যু হয়েছে। আনন্দ উৎসবের মধ্যে পড়লো শোকের ছায়া।

সাড়ে চার মাস পরে বৌঠাকুরানী কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করলেন।

তার দেড়মাস পরে সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ মারা গেলেন।

আনন্দমুখর পরিবারের মধ্যে উপর্যুপরি শোকের ঝড় বহে গেল।

কবিকে সবচেয়ে বেশী আঘাত করলো বউঠাকুরানীর মৃত্যু।

কাদম্বরী দেবী ছিলেন কবির মাতৃসমা। মাকে হারিয়ে কবি বউঠাকুরানীর কাছে মাতৃস্নেহ পেয়েছিলেন। যত আদর-আবদার সবই ছিল এই বউঠাকুরানীর কাছে। সাত বছর বয়স থেকে কবি তাঁর স্নেহের মধ্যে দিয়ে বর্ধিত হয়েছেন। দীর্ঘ সতেরো বছরের পরিচয়। আজ সহসা তার উপর চিরদিনের মত ছেদ পড়লো। বউঠাকুরানীর এই [illegible] সঙ্গে তিনি কোনমতেই জীবনটাকে

মিলিয়ে নিয়ে চলতে পারেন না। জীবনটা কিছুদিনের মত স্মৃষ্টিছাড়া হয়ে ওঠে। বেশভূষার দিকে খেয়াল থাকে না, আহারে রুচি থাকে না। তেতলার ঘরের খোলা বারান্দায় শুয়ে শুয়ে আকাশের তারার পানে তাকিয়ে থাকেন, রাত কেটে যায়। সমস্ত আকাশের পানে তাকিয়ে কবির মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পুঞ্জীভূত হয়, প্রশ্ন ওঠে—

"হায় কোথা যাবে !
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে !
হায় কোথা যাবে !······
মোরা কেহ সাথে রহিব না,
মোরা কেহ কথা কহিব না।
নিমেষ যেমনি যাবে, আমাদের ভালবাসা
আর নাহি পাবে।
হায়, কোথা যাবে !
মোরা বসে কাঁদিব হেথায়।
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায় ;
মহা সে বিজন মাঝে হয়তো বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায়, কোথা যাবে !" [—কড়ি ও কোমল

এই শোকের আঘাত সইতে কিছুদিন সময় গেল। অনন্ত কালস্রোত মানুষের সব কিছু সইয়ে দেয়, মনের চাঞ্চল্যের উপর পড়ে প্রশান্তির প্রলেপ। কবি বুঝতে পারেন—"জীবন যেমন আসে, জীবন তেমনি যায় ; মৃত্যুও যেমন আসে, মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন। ···ছাড়িয়া দাও, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন !···ছাড়িয়া দাও, তাহাকে যাইতে দাও—জীবন মৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিয়ো না। হৃদয়ের দুই দ্বার সমান খুলিয়া রাখ। প্রকাশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক। প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করুক।" [—রবীন্দ্র জীবনী

কবি আবার কাব্যসাধনায় মধ্যে ডুবে গেলেন। কাব্য আলোচনার মধ্যে দিয়ে দিন কাটতে লাগলো। তখনকার দিনে তাঁর সঙ্গী ছিলেন—প্রিয়নাথ

সেন, শ্রীশ মজুমদার, আশুতোষ চৌধুরী ও লোকেন পালিত। সন্ধ্যার পর প্রায়ই এঁরা আসতেন, ঘরের মধ্যে বসে সুরু হতো সাহিত্য আলোচনা। কবি যা কিছু লিখতেন, তাঁদের শোনাতেন। প্রিয়বাবু আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। লোকেনবাবু দিতেন উৎসাহ, শ্রীশবাবু পরিবেশন করতেন সংগীত, আশুবাবুর ভাবুকতা সাহিত্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতো।

মাঝে মাঝে কবি যেতেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে। জ্যোতিদাদা একটা সাহিত্য পরিষৎ গঠন করেছিলেন—'সারস্বত সমাজ', রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন তার সভাপতি। সকালবেলাই কবি যেতেন রাজেনবাবুর বাড়ীতে, রাজেনবাবু তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন।

বঙ্কিমবাবু ছিলেন সারস্বত সমাজের সহঃ সভাপতি। কবি তাঁর কাছেও যেতেন।

আরেকজনের কাছে কবি সান্ত্বনা ও প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি রাজনারায়ণ বসু।

ছেলেবেলা থেকেই রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে কবির পরিচয়। তখনই তাঁর চুলদাড়ি একেবারে পেকে গেছে কিন্তু মন তাঁর ছিল নবীনতায় তাজা। মানুষটি ছিলেন সহজ, সরল, সদাহাস্যময়। বয়সের কোন পার্থক্য তাঁর কাছে ছিল না, কবি সহজেই তাঁর কাছে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন।

কবির বয়স যখন পনেরো বছর তখন জ্যোতিদাদা এক সমিতি সংগঠন করেছিলেন—'সঞ্জীবনী সভা'। সেই সভার সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় সমস্ত হিতকর ও উন্নতিকর কার্য করা। সভার আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল ছোট একখানি ভাঙা টেবিল, কয়েকখানি ভাঙা চেয়ার ও একখানি ছোট টানাপাখা।

"যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি; অর্থাৎ এ-সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না।

"আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তাকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানি পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুইপাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো

ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাই-বার অর্থ এই যে, মৃত ভারতে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র পাঠ করার পর তবে সভার কার্য (অর্থাৎ কিনা গল্পগুজব) আরম্ভ হইত। কার্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লিখিত হইত। এই গুপ্তভাষায় সঞ্জীবনী সভাকে 'হাঞ্চ পাম্ হাফ্' লিখিত হইত।" [—জীবনস্মৃতি

সঞ্জীবনী সভায় কথা উঠলো, জাতিধর্ম নির্বিচারে সবাই মিলে একত্র আহার করতে হবে। গঙ্গার ধারে বনভোজনের ব্যবস্থা হলো। সেদিন বিকালের দিকে উঠলো বিষম ঝড়। সেই ঝড়ের মাঝে সবাইকার মনে উত্তেজনা দেখা দিল। গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে চীৎকার করে গান জুড়ে দিলেন—

"উন্মাদ পবনে যমুনা তর্জিত
ঘন ঘন গর্জিত মেহ
দমকত বিদ্যুৎ পথতরু লুন্ঠিত
থরহর কম্পিত দেহ।
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
বরখত নীরদ পুঞ্জ।
ঘোর গহন ঘন তাল তমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।" [—ভানুসিংহের পদাবলী

রাজনারায়ণ বাবুও সেদিন কিশোর-কবির সঙ্গে গলা ছেড়ে গান গাইলেন।

সঞ্জীবনী সভায় কথা উঠলো ভারতবাসীর একটা সার্বজনীন পোষাক থাকা ভাল। পোষাক নিয়ে চললো গবেষণা। জ্যোতিদাদা পোষাকের একটা নমুনা দেখালেন: "তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটি স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একটি পদার্থ তৈরী হইল যেটিকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না।......জ্যোতিদাদা অম্লান বদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন—আত্মীয় ও বান্ধব, দ্বারী এবং সারথী সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।" [—জীবনস্মৃতি

[illegible] মনের দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ। রাজনারায়ণ বসু এই

দৃঢ়তা পছন্দ করতেন। দেশের সমস্ত খর্বতা ও অপমানকে রাজনারায়ণবাবু দগ্ধ করে ফেলতে চাইতেন।

রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে কবির 'রাজর্ষি'র কাহিনী জড়িত।

রাজনারায়ণবাবু তখন থাকতেন দেওঘরে। রবীন্দ্রনাথ যাচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ট্রেনে যেতে যেতে কোন এক সময় কবি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। ঘুমের ঘোরে তিনি স্বপ্ন দেখলেন। অদ্ভুত এক স্বপ্ন। কোথায় যেন একটি মন্দির। মন্দিরের সিঁড়ির উপর রক্তের দাগ। সেই রক্তের পানে তাকিয়ে একটি বালিকা করুণ স্বরে কাঁদছে। বালিকার পিতা দাঁড়িয়ে আছেন পাশে। বালিকা পিতার মুখের পানে তাকিয়ে বলছে—এ কি, এ যে রক্ত!

কবির তন্দ্রা টুটে গেল। সেই বিচিত্র স্বপ্নকাহিনী কবির মনের মাঝে আলোড়ন তুললো। কবি ঠিক করলেন এই নিয়েই তিনি একখানি উপন্যাস লিখবেন। ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস থেকে গোবিন্দমাণিক্যের কাহিনী অবলম্বন করে সেই স্বপ্নকথা রাজর্ষির রূপ পরিগ্রহ করলো।

'রাজর্ষি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগলো 'বালকে'। বালক তখন ঠাকুরবাড়ী থেকে বেরুতো, ছোটদের মাসিক পত্রিকা, সম্পাদনা করতেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।

হাতে কোন কাজ নেই, কোন কাজের তাড়াও নেই, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কবি বেরিয়ে পড়লেন কলিকাতা ছেড়ে।

প্রথমে গেলেন হাজারিবাগে। সঙ্গে ছিলেন দুই ভ্রাতুষ্পুত্র, সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ। তখন গিরিডি থেকে হাজারিবাগ যেতে হলে মানুষ-ঠেলা গাড়ী 'পুশ্‌পুশে' চড়ে যেতে হতো। কবি সেই ঠেলা-গাড়ী চড়ে দুই ভাইপোকে নিয়ে গিরিডি থেকে হাজারিবাগে গেলেন।

তারপর গেলেন সোলাপুরে। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেখানকার জেলা জজ্।

এখানকার দিনগুলি কেটেছিল আনন্দে। স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশের মধ্যে মন থেকে সমস্ত ভার নেমে গিয়েছিল। জগতের মধুরতার মাঝে কবির নতুন করে পরিচয় ঘটেছিল, কবি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন।

এই সময় মহর্ষির স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ে। তিনি কিছু দিনের জন্য চলে

যান বোম্বাইয়ের দক্ষিণে বন্দোরা সহরে। সেখানকার সমুদ্রতীরে মহর্ষি মাস তিনেক ছিলেন। কবিও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

এই বছর বোম্বাইয়ে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। সভাপতি হন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মহাজাতি সম্মেলন কবির মনে নতুন দিনের ইঙ্গিত দিয়েছিল, কবি এই সম্মেলনে আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন—

"মুছে ফেল ধূলা, মুছ অশ্রুজল,
ফেলো ভিখারীর চীর—
পরো নব সাজ, ধরো নব বল,
তোলো তোলো নত শির।
তোমাদের কাছে আজি আসিয়াছে
জগতের নিমন্ত্রণ—
দীনহীন বেশ ফেলে যেয়ো পাছে —
দাসত্বের আভরণ।…" [—কড়ি ও কোমল

কবি কলিকাতায় ফিরলেন। বিপিনচন্দ্র পাল একদিন এসে দেখা করলেন কবির সঙ্গে। বিপিনচন্দ্র পাল তখন যুবক ও ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট কর্মী। বিপিনবাবু বললেন—হিন্দুসমাজের কয়েকজন নেতা সামাজিক আচার ব্যবহার নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা করছেন, তার প্রতিবাদ করতে হবে।

ব্রাহ্মরা তখন হিন্দু সমাজের অহেতুক গোঁড়ামিগুলোকে অস্বীকার করে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছেন। পুরাণো পন্থীরা এই নবীনতাকে সইতে পারছেন না। সুযোগ-সুবিধা পেলেই তাঁরা এই সংস্কারপন্থীদের আক্রমণ করছেন। চন্দ্রনাথ বসু ও যোগেন্দ্রনাথ বসু এই সম্পর্কে সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী'তে অনেক কথা আলোচনা করছেন। কবি এবার তাঁদের সম্পর্কে কলম ধরলেন। বয়স কম, বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখতে সুরু করলেন 'সঞ্জীবনী'তে—

"রব উঠেছে ভারতভূমে হিন্দু মেলা ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েছেন ভয় নাইক আর!
… … …
লিখছে দোঁহে হিন্দুশাস্ত্র এডিটোরিয়াল,
দামু বলছে মিথ্যে কথা, চামু দিচ্ছে গাল
হায় দামু, হায় চামু!
… … …

দন্ত দিয়ে খুঁড়ে তুলছে হিন্দুশাস্ত্রের মূল
মেলাই কচুর আমদানিতে বাজার হুলুস্থুল।
দামু চামু অবতার!"
... ... [—রবীন্দ্রজীবনী

আবার সংযত ভাষায় আবেদনও জানালেন—

"কোথা গেল সেই প্রভাতের গান
কোথা গেল সেই আশা,
আজিকে বন্ধু, তোমাদের মুখে
এ কেমনতরো ভাষা!
আজি বলিতেছ "বসে থাকো, বাপু,
ছিল যাহা তাই ভালো,
যা হবার তাই আপনি হইবে
কাজ কি এতই আলো!"
... ...
আনন্দে যারা চলিতে চাহিছে
ছিঁড়ি অসত্য-পাশ
ঘর হতে বসি করিছ তাদের
উপহাস পরিহাস।" [—মানসী

কবি প্রবন্ধও লিখলেন। হিন্দু বিবাহ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ তিনি পড়লেন সায়েন্স এসোসিয়েশন হলে। সভায় ছিলেন পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। প্রবন্ধটি শুনে তিনি বললেন—আমি মহেশ, আমি চারিহস্তে লেখককে আশীর্বাদ করছি।

ইতিমধ্যে কবি পুরোপুরি সংসারী হয়ে উঠেছেন।

কবির একটি মেয়ে হয়েছে। কবি তার নাম রেখেছেন মাধুরীলতা। এক-বছরের মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে কবি গেলেন দার্জিলিঙে। সঙ্গে ছিলেন দুই দিদি—সৌদামিনী ও স্বর্ণকুমারী। "শিলিগুড়ি থেকে গাড়ী চলতে লাগল। ক্রমে ঠাণ্ডা, তারপর মেঘ, তারপর সর্দি, তারপর হাঁচি, তারপরে শাল, কম্বল, বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কনকন, হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভার ভার এবং ঠিক তারপরেই দার্জিলিং।" [—রবীন্দ্র জীবনী

দার্জিলিঙে কবি ছিলেন কাসলটন্ হাউসে। মস্ত বড় বাড়ী, প্রশস্ত

হলঘর। সেই হলঘরে সন্ধ্যাবেলা সাহিত্যের আসর বসতো। কবি টেনিসন কি ব্রাউনিং থেকে কবিতা পড়ে সবাইকে শোনাতেন। অপূর্ব ছিল তাঁর কণ্ঠ, সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

কিন্তু এই সাহিত্যের বৈঠক বেশীদিন স্থায়ী হলো না।

দার্জিলিঙের আবহাওয়া কবির সহ্য হলো না। ঠাণ্ডা লেগে কোমরে এমন এক ব্যথা উঠলো যে কলিকাতায় ফিরে এসে তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন। শুয়ে থাকেন আর কবিতা লেখেন, আর ভাগিনেয়ী সরলা দেবীকে শোনান।

সুস্থ হয়ে কিছুদিন পরে কবি গেলেন গাজিপুরে।

সহরে সাহেব পাড়ায় বড় বাংলো। সামনে গঙ্গা। মাইলখানেক জুড়ে গঙ্গার চর, সেখানে ছোলা ও যবের খেত। বাড়ীর গা দিয়ে চলে গেছে লাল পথ, সেই পথ বরাবর চলে গেছে খোলার চালাওয়ালা এক পল্লীতে। বাড়ীর সামনে এক মহানিমগাছ, তারই ছাওয়ায় বসে তাকিয়ে থাকেন গঙ্গার পানে, নিস্তব্ধ রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্ন মুখরিত হয়ে ওঠে কোকিলের ডাকে, পিছনে ঝাউবন থেকে ভেসে আসে উদাসী হাওয়া, সেই হাওয়ায় ভেসে আসে চাঁপা ফুলের সুবাস।

এইখানে এক সিবিল সার্জেন ছিলেন কবির প্রতিবেশী। একদিন কবির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। সাহেব ডাক্তার একদিন কথায় কথায় কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি লেখেন?

—কবিতা লিখি।

—কবিতা লেখেন? আপনার লেখা একদিন শোনাবেন আমাকে।

সাহেবকে বাংলা কবিতা শোনাবেন কি করে? তিনি বুঝবেনই বা কি?

কবি কয়েকটি কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করলেন। তারপর একদিন শোনালেন সেই অনুবাদ—

"বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা।
রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে……"

[—মানসী

All fruitless is the cry,
All vain this burning fire of desire.
The sun goes down to his rest.
There is gloom in the forest
And glamour in the sky.
With downcast look and lingering steps
The evening star comes in the wake of departing day ইত্যাদি।

এইভাবে সুরু হলো কবিতার ইংরাজি অনুবাদ করা। [—রবীন্দ্র জীবনী

ইতিমধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী কলিকাতায় এক 'মহিলা সমিতি' করেছেন, সখী সমিতি। তাঁরা এক 'মহিলা শিল্প মেলার' আয়োজন করলেন। সরলাদেবী মামাকে বললেন—একখানি নাটক লিখে দিন্, আমরা অভিনয় করবো।

কবি লিখে দিলেন মেয়েদের অভিনয়যোগ্য নাটক 'মায়ার খেলা' মেয়েরাই নাটকখানি অভিনয় করলেন। দর্শকরাও সবাই মহিলা।

বাংলা নাট্য-অভিনয়ের ইতিহাসে এ এক নতুন ঘটনা।

মায়ার খেলা আগাগোড়াই গান। কথাবার্তাও গানের সুরে। এর একখানি গান লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে—

"বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।
আজি মধু সমীরণে, নিশীথ কুসুম বনে,
তারে কি পড়িছে মনে বকুলতলে?"

কবি গেলেন সোলাপুরে। সঙ্গে ছিলেন মৃণালিনী দেবী, মাধুরীলতা ও চারমাসের ছেলে রথীন্দ্রনাথ। এখানে বসেই কবি তাঁর 'রাজারাণী' নাটকখানি লেখেন।

সোলাপুর থেকে কবি গেলেন পুনার অন্তঃপাতী খিড়কিতে।

একদিন কবি গেলেন বক্তৃতা শুনতে।

সেদেশে তখন রমাবাইয়ের খুব নাম। মারাঠী ও সংস্কৃত ভাষায় রমাবাই ছিলেন বিশেষ বিদুষী। কলিকাতার পণ্ডিতেরা তাঁর সংস্কৃত বক্তৃতা শুনে 'সরস্বতী' উপাধি দিয়েছিলেন। শ্রীহট্টের এক বাঙালী উকিলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু বছর দেড়েক বাদেই তিনি বিধবা হন। তারপর তিনি চলে

যান বিলাতে। ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে, খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে তিনি ফিরে আসেন। হিন্দু বিধবাদের জন্য তিনি সারদাসদন স্থাপন করেন। তাঁর তেজস্বিতা মারাঠী ব্রাহ্মণরা সইতে পারতো না। তিনি বক্তৃতা করতে উঠলেই তারা সভায় হট্টগোল করতো। রবীন্দ্রনাথ এমনি এক বক্তৃতা সভায় গিয়ে ব্যাপার দেখে বড় ক্ষুব্ধ হলেন, তিনি লিখলেন—"রমণীকে বক্তৃতা করতে শুনে বীরপুরুষেরা আর থাকতে পারলেন না। তাঁরা পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। তর্জন-গর্জনে অবলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে অভিভূত করে জয়গর্বে বাড়ি ফিরে গেলেন। আমি মনে মনে আশা করতে লাগলুম আমাদের বঙ্গভূমিতে যদিও সম্প্রতি অনেক বীরপুরুষের অভ্যুদয় হয়েছে কিন্তু ভদ্র রমণীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে এতটা প্রতাপ কখনও কারও জন্মায়নি।"

(—রবীন্দ্র জীবনী

স্বজাতির মার্জিত রুচির উপর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল।

শিলাইদহ অঞ্চলে ঠাকুর পরিবারের জমিদারী। মহর্ষি এবার সেই জমিদারী দেখা-শোনার ভার দিলেন রবীন্দ্রনাথের উপর। কবিকে কিছুদিনের জন্য যেতে হলো শিলাইদহে।

এর আগেও কবি শিলাইদহে এসেছিলেন জ্যোতিদাদার সঙ্গে। তখন শিলাইদহে ঠাকুর-বাড়ীর নাম ছিল কুঠীবাড়ী। সে বাড়ীতে নীলকর সাহেবদের কুঠী ছিল। .প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী, সামনে নানা ফুলের গাছ, নীচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় থাকবার জায়গা। সামনে মস্ত বড় ছাদ, ছাদের পিছনে বড় বড় ঝাউ গাছ। একসময় এখানে কুঠিয়াল সাহেবদের বাস ছিল, কত ঠাট-ঠমক্ ছিল, এখন আছে শুধু দুটি সাহেবের কবর। কেউ কেউ বলতেন, দুপুর রাতে কুঠী-বাড়ীর বাগানে সাহেব-ভূত ঘুরতে দেখা যায়।

প্রথম যখন কবি এখানে এসেছিলেন, জ্যোতিদাদা কিনে দিয়েছিলেন একটি টাট্টু ঘোড়া। বলতেন—রথতলার মাঠ অবধি ঘোড়া দৌড় করিয়ে এসো।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে এবড়ো-খেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে পড়ি-পড়ি করে বালক ঘোড়া ছুটিয়ে আনতেন। কিন্তু বালক সওয়ার ঘোড়ার পিঠ থেকে কখনও পড়েন নি।

যে ছেলে কোনদিন কোন খেলাধূলায় ছুটোপাটিতে যোগ দেয় নি, সে

যখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে উদ্দাম হয়ে ছুটতো, তার শান্ত বাল্য জীবনে সে এক স্মরণীয় বৈচিত্র্য বৈকি।

সেদিনের আরেক স্মরণীয় ঘটনা, জ্যোতিদাদার বাঘ শিকার।

বিশ্বনাথ শিকারী এসে একদিন খবর দিল—শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ এসেছে।

জ্যোতিদাদার বাঘ শিকারের সখ ছিল খুব। বিশ্বনাথ শিকারীর সঙ্গে তিনি বেরিয়ে পড়লেন বন্দুক নিয়ে। ছোট ভাইটিকেও নিলেন সঙ্গে।

ঘন জঙ্গল। আলো-ছায়া এমন ভাবে মিশেছে যে বাঘ চোখে পড়া খুবই কঠিন। সেই জঙ্গলের মধ্যে এক গাছের গায়ে মাচা বাঁধা হয়েছিল। সবাই মিলে সেই মাচার উপর উঠে বসলেন।

অনেকক্ষণ বসে আছেন তো বসেই আছেন, কোন এক সময় বিশ্বনাথ ইশারা করলো—বাঘ এসেছে। জ্যোতিদাদা নীচের ঝোপের পানে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তাঁর চশমা পরা চোখে বাঘকে ঠাহর করতে সময় লাগলো। শেষে বাঘের গায়ের একটা দাগ দেখতে পেয়ে মারলেন গুলি। সেই গুলি গিয়ে লাগলো বাঘের শিরদাঁড়ায়। বাঘ আর উঠতে পারলো না, লেজ আছড়ে গর্জাতে লাগলো। আর এক গুলিতেই শেষ।

আরেকবার কবি হাতীর পিঠে চড়ে জ্যোতিদাদার সঙ্গে গিয়েছিলেন বাঘ শিকার করতে। আখের খেতের পাশ দিয়ে আখ চিবুতে চিবুতে হাতী গিয়ে ঢুকলো গভীর বনে। ভারিক্কি চালে চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো। সামনেই এক ঝোপের মধ্যে বাঘটা লুকিয়েছিল, সহসা এক লাফে বেড়িয়ে এলো ঝোপের ভিতর থেকে, তারপর বরাবর দৌড় দিল মাঠের উপর দিয়ে। দুপুরের রোদে ফাঁকা মাঠের উপর একটা ঝড়ের ঝাপ্‌টা বহে গেল যেন। এমনভাবে বাঘের দৌড় দেখা জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা।

সে-সব ছেলেবেলার কথা, জীবন তখন ছিল আনন্দমুখর। সংসারের সে পরিবেশ আর নেই। বড় ভগ্নিপতি সারদাপ্রসাদ জমিদারী দেখতেন, তিনি মারা গেছেন। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক মানুষ, তাঁর পক্ষে বৈষয়িক কাজকর্ম দেখা সম্ভব নয়। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশে জজিয়তি করেন। বৌঠাকুরানীর মৃত্যুর পর জ্যোতিদাদার আর মন নেই সংসারের কাজে। হেমেন্দ্রনাথ মারা গেছেন। বীরেন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ অসুস্থ। কাজেই

জমিদারী দেখার দায়িত্ব পড়েছে রবীন্দ্রনাথের উপর। এবার রবীন্দ্রনাথকে আসতে হয়েছে একক, জ্যোতিদাদা আর সঙ্গে নেই।

বড় জমিদারী। তিনটি পরগণা, তিনটি কাছারি—শিলাইদহ, পাতিসর ও সাহাজাদপুর। তিনটি স্থানই নদীর উপর। নদীপথেই কবি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যাতায়াত করতেন। সেজন্য তিনখানি হাউস-বোট ছিল—পদ্মা, চিত্রা ও আত্রাই। কবি বেশীর ভাগ সেই হাউস-বোটেই থাকতেন। পদ্মা বোটখানিই তাঁর কাছে ছিল সবচেয়ে প্রিয়। "এখানে যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন মনে এই আকাশপূর্ণ, আলোকপূর্ণ, আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।" [—পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ

প্রকৃতির প্রশান্ত পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের দিনগুলি এখানে ভালই কাটছিল। হাউস-বোটে বসে দিনে ও রাতে কবি প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করেন।—

"একটি চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর—ধূ ধূ করছে—কোথাও শেষ দেখা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়—আবার অনেক সময় বালিকে নদী বলে ভ্রম হয়। গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই—বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটলধরা ভিজে কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুকনো সাদা বালি।···আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য; নিচে দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা।···হঠাৎ পশ্চিমে মুখ ফেরাবামাত্র দেখা যায় স্রোতহীন ছোটো নদীর কোল, ওপারে উঁচু পাড়, গাছপালা কুটীর, সন্ধ্যাসূর্যালোকে আশ্চর্য স্বপ্নের মতো। ঠিক যেন একপারে সৃষ্টি আর-এক পারে প্রলয়।···ইতিমধ্যে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যায়, আকাশের স্বর্ণ আভা মিলিয়ে যায়, অন্ধকারে চারদিক অস্পষ্ট হয়ে আসে, ক্রমে আপনার পাশের ক্ষীণ ছায়া দেখে বুঝতে পারি বাঁকা কৃশ চাঁদ-খানির আলো অল্প অল্প ফুটেছে। পাণ্ডুবর্ণ বালির উপরে, এই পাণ্ডুবর্ণ জ্যোৎস্নায় চোখে আরো কেমন যেন বিভ্রম জন্মিয়ে দেয়—কোথায় বালি, কোথায় জল, কোথায় পৃথিবী, কোথায় আকাশ, নিতান্ত অনুমান করে নিতে হয়।"

[—ছিন্নপত্র ২৩

একদিকে প্রকৃতির এই প্রশান্তি, আরেকদিকে হাসিকান্না সুখদুঃখ-ভরা সাধারণ মানুষ। একদিকে কবির মন আরেকদিকে জমিদারের বিষয়বুদ্ধি।—

"রসতটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়। প্রজারা যখন সসম্ভ্রমে কাতরভাবে

দরবার করে এবং আমলারা বিনীত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কি মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবন রক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটির উপরে বসে বসে ভাণ করছি যেন এই সমস্ত মানুষ থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তা বিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই সমস্ত ছেলেপিলে—গরু লাঙল—ঘরকন্নাওয়ালা সরল হৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কি ভুলই জানে। আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না।...এই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়।...কি জানি যদি ঐ ভুলে আঘাত লাগে! Prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তাহলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোস পরে থাকতে হয়।"

[—রবীন্দ্রজীবনী

এইখানে বসেই এবার কবি তাঁর 'বিসর্জন' নাটকটি লেখেন।

বাড়ীর ছেলেরা ঠিক করেছিল মাঘোৎসবে তারা একখানি নাটক অভিনয় করবে, এবং সেই নাটকখানি লিখে দেবেন রবীন্দ্রনাথ।

সুরেন্দ্রনাথ একেবারে একখানি বাঁধানো খাতা কাকার হাতে দিলেন, বললেন—আমাদের জন্যে একখানি নাটক লিখে দিন, মাঘোৎসবে আমরা অভিনয় করবো।

হাউস-বোটে বসে সেই খাতায় কবি 'রাজর্ষি'র কাহিনী নাটকে রূপ দিতে সুরু করলেন। নাটক শেষ করে সুরেন্দ্রনাথকে লিখলেন—

"তোরি হাতে বাঁধা খাতা
তারি শ'খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে
মস্তিষ্ক কোটরবাসী
চিন্তাকীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।

প্রবাসে প্রত্যহ তোরে
হৃদয়ে স্মরণ করে
লিখিয়াছি নির্জন প্রভাতে,
মনে করি অবশেষে
শেষ হলে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।…"

সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত যাচ্ছেন, কবি তাঁর সঙ্গী হলেন।

যাবার পথে কবি জাহাজে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সী-সিকনেস্। মাথা ঘুরে গা ঘুরে অস্থির, কিছু মুখে দিলেই বমি হয়। পুরা তিনটি দিন একেবারে অনাহারে কাটলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বার বার শুধু মনে হয়—'বাড়ির মত এমন জায়গা আর নেই—এবার বাড়ি ফিরে গিয়ে আর কোথাও নড়ব না।'

ব্রিন্দিসিতে নামলেন। ইতালি ও ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে, ভুট্টার খেত, আঙুরের খেত, ফলের খেত, জলপাইয়ের বন দেখতে দেখতে কবি লণ্ডনে এসে পৌছলেন। য়ুরোপের সুন্দর পরিবেশের মাঝে নিজের দেশের কথা কবির স্বতঃই মনে পড়ে। কবি বসে বসে ডায়েরীতে লেখেন :

"আমরা তো জঙ্গলে থাকি; খালবিল বনবাদড় ভাঙা রাস্তা এবং পানা পুকুরের ধারে বাস করি। খেত থেকে দু'মুঠো ধান আনি, মেয়েরা আঁচল ভরে শাক তুলে নিয়ে আসে, ছেলেরা পাঁকের মধ্যে নেমে চিংড়ি মাছ ধরে আনে, প্রাঙ্গণের গাছ থেকে গোটাকতক তেঁতুল পাড়ি, তারপরে শুকনো কাঠকুট সংগ্রহ করে এক বেলা অথবা দু'বেলা কোনো রকম করে আহার চলে যায়; ম্যালেরিয়া এসে যখন জীর্ণ অস্থি-কঙ্কাল কাঁপিয়ে তোলে তখন কাঁথা মুড়ি দিয়ে রৌদ্রে পড়ে থাকি, গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় পঙ্ককুণ্ডের হরিদ্বর্ণ জলাবশেষ থেকে উঠে এসে ওলাউঠা যখন আমাদের গৃহ আক্রমণ করে তখন ওলাদেবীর পূজা দিই এবং অদৃষ্টের দিকে কোটর-প্রবিষ্ট হতাশ শূন্যদৃষ্টি বদ্ধ করে দল বেঁধে মরতে আরম্ভ করি। আমরা কি আমাদের দেশকে পেয়েছি না পেতে চেষ্টা করেছি? আমরা ইহলোকের প্রতি ঔদাস্য করে এখানে কেবল অনিচ্ছুক পথিকের মতো যেখানে সেখানে পড়ে থাকি এবং যত শীঘ্র পারি দ্রুতবেগে বিশ-পঁচিশটা বৎসর ডিঙিয়ে একেবারে পরলোকে গিয়ে উপস্থিত হই।

"কিন্তু এ কী চমৎকার চিত্র! পর্বতের কোলে, নদীর ধারে, হ্রদের তীরে পপ্‌লার-উইলো-বেষ্টিত কাননশ্রেণী। নিষ্কণ্টক নিরাপদ নিরাময় ফলশস্য পরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণে মানুষের ভালবাসা পাচ্ছে এবং মানুষকে দ্বিগুণ ভালবাসছে। মানুষের মত জীবের এই তো যোগ্য অবাসস্থান। মানুষের প্রেম এবং মানুষের ক্ষমতা যদি আপনার চতুর্দিককে সংযত সমুজ্জ্বল করে না তুলতে পারে তবে তরুকোটর—গুহাগহ্বর—বনবাসী জন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ কী?" [—ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী

লণ্ডনে পৌঁছে কবি দশবছর আগের জানাচেনা মানুষগুলিকে খুঁজতে বেরুলেন। প্রথমেই গেলেন স্কট পরিবারের বাড়ীতে। শুনলেন—তাঁরা লণ্ডন ছেড়ে চলে গেছেন।

কোথায় গেছেন, সে ঠিকানা কেউ রাখে না।

কবির মনে হলো—'মৃত্যুর বহুকাল পরে আবার যেন পৃথিবীতে ফিরে এসেচি।...আমি মনে করেছিলুম কেবল আমিই চলে গিয়েছিলুম, পৃথিবী-শুদ্ধ আর সবাই আছে! আমি চলে যাবার পরেও সকলে আপন আপন সময় অনুসারে চলে গেচে। তবে তো সেই সমস্ত জানা লোকেরা আর কেহ কারো ঠিকানা খুঁজে পাবে না। জগতের কোথাও তাদের আর নির্দিষ্ট মিলনের জায়গা রইল না।'

জানা চেনা কারও সঙ্গে-ই কবির দেখা হলো না। একা একা কবির মন টিঁকলো না বিলাতে, মাসখানেকের মধ্যেই তিনি আবার জাহাজে চড়ে বসলেন।

জাহাজে এক সাহেবের ঔদ্ধত্য কবিকে ক্ষুব্ধ করে।

জাহাজে স্নানের ঘরে কে একজন স্নান করছিল। কবি দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজার সামনে। সে লোকটি বেরুলে তিনি স্নান করতে ঢুকবেন। কিন্তু ভিতরের লোকটি দরজা খুলতেই পিছন থেকে এক টেকো সাহেব এসে কবিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল, কবির মনে হলো ভিতরে ঢুকে সাহেবকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেবেন, কিন্তু হাঙ্গামা বাধিয়ে নিজেকে ছোট করে ফেলতে রুচিতে বাধলো। তবে একটা পরম সত্য তিনি উপলব্ধি করলেন—'নম্রতা গুণটা খুব ভালো হতে পারে কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের উনবিংশ শতাব্দী পরেও এই পৃথিবীর পক্ষে অনুপযোগী এবং দেখতে অনেকটা ভীরুতার মতো।'

জাহাজ থেকে নামার সময় কবি জাহাজের মধ্যে মনিব্যাগ ফেলে এসেছিলেন। আবার হোটেল থেকে জাহাজে ফিরে গেলেন। অবশ্য মনিব্যাগটি পাওয়া গেল, কেবিনের টেবিলের উপরেই। টাকা হারানোর দুর্ভাবনা আর রইল না।

কবি এলেন শান্তিনিকেতনে।

কবির বয়স যখন দু'বছর তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ খোলা হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদিন বোলপুরে নেমে সুরুলের পথ দিয়ে রায়পুর যাচ্ছিলেন। মহর্ষি পাল্‌কীতে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে মহর্ষির চোখে পড়লো উত্তরের সীমাহীন প্রান্তর, প্রান্তরের মাঝে দুটি ছাতিম গাছ, একটি প্রকাণ্ড দীঘি আর কয়েকখানি কুঁড়ে ঘর। জায়গাটি মহর্ষির ভালো লাগলো। রায়পুরের সিংহরা তখন ছিলেন বোলপুরের জমিদার, মহর্ষি তাঁদের কাছ থেকে সেখানকার বিশ বিঘা জমি কিনে নিলেন। তারপর সেখানে একখানি একতলা বাড়ী তৈরী করালেন। মাঝে মাঝে তিনি সেখানে গিয়ে থাকতেন। এখানেই এগারো বছর বয়সে কবি প্রথম আসেন তাঁর উপনয়নের পর।

১২৯৪ সালে মহর্ষি এখানকার বাড়ী ও জমি সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করে দেন। জমিদারীর কিয়দংশ তিনি দেবত্র করে দেন, তারই আয় থেকে এখানকার অতিথি-সেবা, উপাসনা ও উৎসবের খরচ চলে। চার বছর পরে এখানে শান্তিনিকেতন মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। মহর্ষি নিয়ম করেন যে, এখানে মাছ মাংস মদ খাওয়া নিষেধ, কোন ধর্মের নিন্দা বা প্রতিমা-পূজাও নিষিদ্ধ। বছরে বছরে ৭ই পৌষ এখানে উৎসব, মেলা ও দীপসজ্জার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

এই শান্তিনিকেতন কবির মনের মত জায়গা হয়েছিল।

"এখানকার আকাশ আলো মাঠ, এখানকার শাল তরু শ্রেণী এবং আমলকী বনের সঙ্গে নানাসূত্রে আমার সমস্ত মনের একটা সংযোগ ঘটে গেছে—সেই-জন্য এখানে থাকাটা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ, কোথাও কিছুমাত্র বাধে না; এবং সব জায়গাতেই আরাম পাই। এখানে আমার চারিদিকের দৃশ্যটি আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত বলেই আমার কাছে প্রত্যহ নূতন বলে ঠেকে—যেমন চিরভ্যাসের আরামটি পাই, তেমনি নিয়ত বিস্ময়ের একটা আনন্দ আমার মনকে সর্বদা জাগিয়ে রেখে দেয়, এমন আর কোথাও পাব না মনে হয়। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে কেবল আমার চোখের দেখার সম্বন্ধ নয়, একে আমার

জীবনের সাধনা দিয়ে পেয়েছি—সেইজন্ত এইখানে আমি সকল তীর্থের ফললাভ করি—সেইজন্য এইখানেই পড়ে থাকি এবং পড়ে থেকেই আমার ভ্রমণের কাজ হয়। এখানে আমার অনেক ব্যাঘাত, অভাব এবং অসুবিধাও আছে, সে সমস্তই শিরোধার্য করে নিয়েছি।" [—চিঠিপত্র

এইখানে বসেই কবি তাঁর 'সোনার তরী'র কবিতাগুলি লেখেন আর লেখেন 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'গোড়ায় গলদ'।

গোড়ায় গলদ অভিনীত হয় সংগীত-সমাজে। তখনকার দিনে পেশাদারী থিয়েটার ছিল না। সংগীত-সমাজ ছিল ধনী, জমিদার, বিলাত-ফেরত, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি অভিজাতদের ক্লাব। মাঝে মাঝে তাঁরা সখ করে নাটক অভিনয় করতেন। গোড়ায় গলদ তাঁরাই অভিনয় করেন। রিহার্স্যাল দেবার সময় কবি দেখলেন হাস্যরস তেমন জমছে না, তখন তিনি নাটকখানি আবার নতুন করে লিখে দেন। তিনি নিজে অভিনেতাদের অঙ্গভঙ্গী শেখাতেন, সেজন্য অনেক সময় সন্ধ্যা থেকে রাত দেড়টা-দুটো অবধি সংগীত-সমাজেই কেটে যেত, তারপর তিনি হেঁটে বাড়ী ফিরতেন।

ছত্রিশ বছর পরে কবি এই নাটকখানি আবার নতুন করে লেখেন, নাম দেন 'শেষরক্ষা'।

জমিদারী দেখার ভার ছিল কবির উপর। সেজন্য মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাঁকে কলিকাতার বাইরেই থাকতে হতো। কখনো শিলাইদহে, কখন-বা অন্যত্র।

শিলাইদহ কবির কাছে চির নূতন।

"জল ছল্ ছল্ করছে এবং তার উপরে রোদ্দুর চিক্ চিক্ করছে; বালির চর ধূ ধূ করছে, তার উপর ছোটো ছোটো বনঝাউ উঠেছে। জলের শব্দ, দুপুর বেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ ঝাঁ, এবং ঝাউঝোপ থেকে দুটো-একটা পাখির চিক্ চিক্ শব্দ, সবশুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নাবিষ্ট ভাব।" [—ছিন্নপত্র ৫৫

"সকাল থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্ছে, কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। বোধ হয় এগারোটা কিম্বা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত লেখাপড়া কিম্বা কোনো কাজে হাত দিই নি। সকাল থেকে একটি চৌকিতে স্থির হয়ে বসে আছি। মাথার মধ্যে কত টুকরো টুকরো লাইন এবং কত অসমাপ্ত ভাব

যাতায়াত করছে কিন্তু সেগুলোকে একত্র করে বাঁধি কিম্বা পরিস্ফুট করে তুলি এমন শক্তি অনুভব করছি নে।...তাই চুপচাপ বসে আছি।" [—ছিন্নপত্র ৯৮

সকালের পর দুপুর।—

"আজকাল দুপুর বেলাটা বেশ লাগে। রৌদ্রে চারিদিক বেশ নিঃঝুম হয়ে থাকে, মনটা ভারি উড়ু উড়ু করে, বই হাতে নিয়ে আর পড়তে ইচ্ছে করে না। তীরে যেখানে নৌকা বাঁধা আছে, সেইখান থেকে একরকম ঘাসের গন্ধ এবং থেকে থেকে পৃথিবীর একটা গরম ভাপ গায়ের উপরে এসে লাগতে থাকে—মনে হয়, এই জীবন্ত উত্তপ্ত ধরণী আমার খুব নিকটে থেকে নিঃশ্বাস ফেলছে, বোধ করি আমারও নিঃশ্বাস তার গায় লাগছে। ছোটো ছোটো ধানের গাছগুলো বাতাসে ক্রমাগত কাঁপছে, পাতিহাঁস জলের মধ্যে নেবে ক্রমাগত মাথা ডুবোচ্ছে এবং চঞ্চু দিয়ে পিঠের পালক সাফ করছে। আর কোন শব্দ নেই।...অনতিদূরে একটা খেয়া-ঘাট আছে। বটগাছের তলায় নানাবিধ লোক জড়ো হয়ে নৌকার জন্যে অপেক্ষা করছে, নৌকা আসবামাত্র তাড়াতাড়ি উঠে পড়ছে—অনেকক্ষণ ধরে এই নৌকা-পারাপার দেখতে বেশ লাগে।" [—ছিন্নপত্র ৬৩

তারপর কোন একসময় দিনশেষে ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যা।—

"যখন সন্ধ্যাবেলা বোটের উপর চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি। কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ। এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে; আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি।" [—ছিন্নপত্র ৮৪

তারপর নেমে আসে রাত্রি।—

"আজকাল আমার এখানে এমন চমৎকার জ্যোৎস্নারাত্রি হয় সে আর কী বলব।...একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারিনে।...মাথাটা জানালার উপর রেখে দিই; বাতাস প্রকৃতির স্নেহ-হস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছলছল শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্‌ঝিক্ করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়'।" [—ছিন্নপত্র ৬২

"নদীর মাঝখানে বসে আছি, দিনরাত্রি হুহু করে বাতাস দিচ্ছে, তুই দিকের তুই পার পৃথিবীর তুটি আরম্ভরেখার মতো বোধ হচ্ছে—ওখানে জীবনের কেবল আভাসমাত্র দেখা দিয়েছে, জীবন সুতীব্রভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি।"

[—ছিন্নপত্র ১০১

এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নব-যৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন্ এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসা-বাসি চলছে, তাই এই আলো এবং বাতাস, এই অর্ধ-উদাস অর্ধসুখের ভাব, গাছের পাতা এবং ধানের খেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন—জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা।" [—ছিন্নপত্র ১১৯

"চারিদিকে একটা স্পন্দন কম্পন, আলোক আকাশ, মৃদু কলধ্বনি, একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্যের একটি নিত্য উৎসব উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, তখন আবার নতুন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়। এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিন-কার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের তুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্র-স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি তুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র-ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে—তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নব-শিশুর মতো একটা অন্ধ-জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়-গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত, এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি।

আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।" [—ছিন্নপত্র ১৩৯

কবি লেখেন— "আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগযুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। তাই আজি
কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবন-রসধারা অহর্নিশি ধরে
করিতেছে সঞ্চরণ, কুসুম-মুকুল
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে, নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদ-রসে উঠে হরষিয়া,
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্ত হিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।…" [—বসুন্ধরা

এই নদীর মাঝে কবি একবার অত্যন্ত বিপদে পড়েন।

সকাল বেলা নৌকা করে তিনি চলেছিলেন গড়ুই নদী দিয়ে। একটা ব্রিজ পার হতে হবে; নৌকার উপরে একটা মাস্তুল ছিল। মাস্তুলটা ব্রিজে ঠেকবে। মাস্তুলে পাল খাটানো ছিল। মাঝিরা ঠিক করলো ব্রিজের কাছে গিয়ে মাস্তুল নামিয়ে নেবে। কিন্তু ব্রীজের সামনে এসে দেখা গেল সেখানে

একটি 'আওড়' (ঘূর্ণী) আছে। তার টানে জলের টান বেড়েছে। মাস্তুল নামাবার আর অবসর পাওয়া গেল না, আবর্তের টানে বরাবর নৌকা গিয়ে লাগলো ব্রিজের গায়। মাস্তুল ব্রিজে লেগে মড় মড় করে উঠলো, নৌকাও কাত হয়ে পড়লো। কবি লিখছিলেন, মাঝিমাল্লার চীৎকারে বেরিয়ে এলেন। মাস্তুল তখন প্রায় ভেঙে পড়ে আর কি! তাড়াতাড়ি তিনি চীৎকার করে উঠলেন—তোরা মাস্তুলের নীচে থেকে সর, মাথায় মাস্তুল ভেঙে মরবি নাকি!

মাঝিরা হৈচৈ করে উঠলো।

আর একটু হলেই বোটখানি আবর্তে পড়ে ডুবে যেত, এমন সময় আরেক-খানি নৌকা তাড়াতাড়ি গিয়ে কবিকে তুলে নিলে। তারপর দড়ি বেঁধে টানতে লাগলো এই নৌকাখানিকে।

তপসি এবং আর একজন মাল্লা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো, নৌকায় আর একটি দড়ি বেঁধে দড়িটা দাঁতে কামড়ে, সাঁতরে ডাঙায় উঠে টানতে লাগলো। আরো অনেকে মিলে টেনে নৌকা ফেরালো।

পাড়ে তখন অনেক লোক জমে গিয়েছিল। কবি তীরে গিয়ে নামতে তারা বললো—আল্লা বাঁচিয়ে দিয়েছেন, নইলে বাঁচবার কোনো আশা ছিল না।

নিজে জমিদার হয়েও কবি জমিদারী প্রথাকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি লেখেন—"আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে, ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায়, আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়, এর মধ্যে পৌরুষও নাই, গৌরবও নাই।" [—রায়তের কথা

প্রজাদের সম্পর্কে তিনি ম্যানেজারকে বলেছিলেন—"এই গরীব চাষীরা প্রায়ই কলাই সিদ্ধ খেয়ে দিন কাটায়, একজনের ভাত তিনজনে বেঁটে খায়, শীতকালে খড়ের গাদায় রাত কাটায়, চরের শুকনো ঝাউ দুই ক্রোশ দূরে বয়ে বেচে চারিটি মাত্র পয়সা পায়—আমি অনেক দেখেছি নিজের চোখে। এদের উপর যেন কোন রকমেই অত্যাচার না হয়। এদের পালন করাই তোমাদের ধর্ম। ধর্ম বলে আর কোন জিনিষ নেই জেনো।" [—সহজ মানুষ...

জমিদারীর নিষ্করুণ কর্মধারার সঙ্গে কবি কোনদিনই নিজেকে ঠিকমত মিলিয়ে নিতে পারেন নি, পুরোপুরি জমিদার বনতে তিনি পারেন না।

"আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায়, তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে—কোনোমতে একটুখানি ক্ষুধা ভাঙলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়। সোশিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিভাগ করে দেয় সেটা অসম্ভব কি সম্ভব ঠিক জানি নে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগ্য। কেননা পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে।" [—ছিন্নপত্র ১৫৯

অসহযোগ আন্দোলনের সময় কবি একবার দীনবন্ধু এণ্ড্রুজকে নিয়ে শিলাইদহে যান, তখন এণ্ড্রুজ সাহেবকে হাসতে হাসতে কবি বলেছিলেন—"The Zemindars and the pleaders now sail on the same boat. We suck the life blood of our tenants and the pleaders—their clients." [—পল্লীর মানুষ…

দিন যায়। প্রতিদিনের কাজকর্মের ফাঁকে নানা ছোট ছোট কাহিনী জমে ওঠে। কবি সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশে যান।

পালানের মা গয়লানী, দুধে জল মেশায় খুব। কিন্তু সেকথা বললে আর রক্ষা নেই, ঝগড়া করে পাড়া মাথায় করে। পালানের মার খাজনা বাকি পড়েছে তিন বছরের। ম্যানেজার জরিমানা করলেন। পালানের মা এক দরখাস্ত নিয়ে এলো কবির কাছে, বললো—আমার জরিমানা মাপ করতে হবে।

কবি বললেন—সময়মত খাজনা দাও নি কেন?

—কেন দিইনি?—পালানের মা গরগর করে বলে গেল অনেক কথা।

কবি বললেন—তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করবো না।

পালানের মা বেজায় বদরাগী, ক্ষেপে উঠলো, বললো—কী, মাপ করবি না? তাহলে আমি ডুবে মরবো।

কবি গম্ভীর ভাবে বললেন—না, আমি মাপ করবো না।

পালানের মা আর সইতে পারলো না, ‘আমি তাহলে ডুবে মরি,’ বলে তখনই বোট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীর জলে।

কবি পালানের মা’র মেজাজের কথা শুনেছিলেন কিন্তু এতটা আশা করেননি।

মাঝিরা হৈ চৈ করে উঠলো।

পালানের মা কিন্তু ডোবেনি, সে বোটের পাশে ভেসে উঠলো, মাথা তুলে বললো—বাবু, জরিমানা মাপ না করলে আমি ডুবে মরবো।

কবি বললেন—মাপ করবো, তুই ডুবিস্ নে, উঠে আয়।

—আগে বল মাপ করেছি, নইলে এই ডুবে মরলুম।

কবি জানতেন পালানের মা ডুববে না, সে সাঁতার জানে, তবু বললেন—তুই উঠে এসে ছাখ, তোর দরখাস্ত মঞ্জুর করেছি।

পালানের মা এবার জল থেকে উঠে এলো।

একদিন গোরাই নদীর ওপার থেকে প্রজারা এসেছিল কবির কাছে দরবার করতে। তারা চলে যাবার পর দেখা গেল একগাছা লাঠি পড়ে আছে। নানা কারুকাজ করা একগাছি কালো লাঠি। কবি জিজ্ঞাসা করলেন—লাঠি কার? কে ফেলে গেল?

একজন বরকন্দাজ লাঠি দেখে চিনলো, বললো—ওটা লালনসাঁই ফকিরের।

লাঠিটা ফেরৎ দিতে হবে, কবি ফকিরকে ডেকে পাঠালেন।

লালন এলো, হাতে তার একতারা।

কবি বললেন—তুমি গাইতে জানো?

—আমি বাউল বাবুমশাই।

—তোমার একখানি গান শোনাও।

ফকির একতারা বাজিয়ে গান ধরলো—

“সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।
যদি সুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান,
বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ, বামনী চিনি কিসেরে?…”

লালনের কণ্ঠ ছিল ভাল। কবি মুগ্ধ হলেন। সেদিন থেকে লালনের

সঙ্গে হলো কবির ঘনিষ্ঠতা। কবি শিলাইদহে গেলেই লালনের ডাক পড়তো। লালন গান গাইত, কবি বোটের ছাদে বসে শুনতেন।

লালনের মৃত্যুর পর কবি তার সমাধির উপর স্মৃতিমন্দির তৈরী করে দিয়েছিলেন।

একদিন কবি গেছেন ধোবড়াকোল এস্টেটে, যেখানে একটি মানুষ কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সে রসিক দাস, এস্টেটের একজন সাধারণ পিয়াদা। তার বেশ-ভূষা ছিল বিচিত্র। মাথায় লম্বা চুল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে তাগা, পরণে লাল কাপড়। প্রথম নজরেই কবি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি? কি কর এখানে?

—আজ্ঞে, আমার নাম রসিক দাস, পিয়াদাগিরি করি।

—তোমার এ সন্ন্যাসীর বেশ কেন?

—আজ্ঞে, আমি বাবা তেরনাথের স্তাবক।

—তুমি কি কি কাজ কর?

—হুজুর, পেরজা-টেরজা ডাকি, চালান নিয়ে শিলাইদহে যাই, বাবুদের জন্যে রাঁধি, আর সময় পেলে বাবা তেরনাথকে ডাকি, বলি—হে বাবা, আমার ভবযন্ত্রণা মোচন করে দাও।

—তুমি বরকন্দাজী কর কেমন করে? তুমি তো সাদাসিদে মানুষ, প্রজারা তোমাকে মানে?

—হুজুর, আমাকে কেউ মানে কি না জানিনে, তবে সবাই আমাকে ভালবাসে, দাদা বলে ডাকে, আমার গান শুনতে চায়। আমি তো কারুর মনে কষ্ট দিই না।

কবি শুনে খুশি হলেন। রসিকের সঙ্গে সুরু করলেন ঘর-সংসারের কথা।

কবি বললেন—তোমার কে আছে, রসিক?

—আমার সবাই আছে হুজুর। কিন্তু বাবা তেরনাথ ছাড়া আমার কেউ নেই এহকালে। আমি বাবা তেরনাথের গান গেয়েই জীবন কাটাব।

—তুমি গান গাইতে পার? আমাকে একখানা গান শোনাও দিকি।

রসিক হাতে তালি দিয়ে গান ধরলো—

কলিতে তেলনাথের মেলা।
খোঁড়ায় নাচে, কানায় ত্থাখে, বোবায় বলে বম্‌ভোলা।

সাধুরে ভাই, দিন গেলে তেননাথের নাম লইও।—
তেল খায় ব্রহ্মারে ভাই, বিষ্ণুর খায় রে পান।
মহাদেবের সিদ্ধি খাইলে শীতল হয় রে প্রাণ॥

গান শেষ হলো, কবি বললেন—তুমি বেশ গাও, তোমার গান শুনে আনন্দ পেলাম।

—হুজুর, আমায় যদি খানিকটা জমি দয়া করে দেন, আমি এখানে একটা আখড়া বানাবো।

—আখড়া তো বানাবে, খাবে কি? ভক্তদের খাওয়াবে কি?

—সে তো হুজুর, ওই জমি থেকেই হবে। তাই তো বাবা তেরনাথের কৃপায় হুজুরকে এতো কাছে পেয়ে গেছি। দেবেন হুজুর, খানিকটা জমি?

কবি রসিকের আবেদন রাখলেন, সেখান থেকে আসার দিন বললেন—রসিক, তোমার আখড়ার জন্য আর ভরণ-পোষণের জন্য তোমায় বেশ ভাল জমি দশ বিঘে দিয়ে গেলাম। ত্রিনাথ তোমার মঙ্গল করুন।

কর্মচারীরা বললেন—হুজুর, রসিক গাঁজা খায়, পাগল, খেয়ালী লোক!

কবি সে কথায় কান দিলেন না। গাঁয়ের সাধারণ মানুষকে তিনি ভালবাসতেন।

লালা পাগলার সঙ্গেও কবির আলাপ হয় এমনি আকস্মিক ভাবেই।

শিলাইদহের পথ দিয়ে কবি চলেছিলেন কর্মচারীদের সঙ্গে বৈষয়িক কথা বলতে বলতে। এমন সময় কোথা থেকে এক পাগল এসে কবিকে সেলাম করলো। কিন্তু কবি তার দিকে তখন মোটেই মনোযোগ দিলেন না। পাগল বললো—হুজুর, পাগল বলে আমার সেলামটা নিলেন না। আমি কি হুজুরের পেরজা নই?

কবি বৈষয়িক চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, চমকে উঠলেন, বললেন—বেশ, বেশ, চল, তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই।

পাগল মহা খুশি, ছড়া কাটলো—

"হুজুর, আমি হচ্ছি পাগল,
আমায় দেখে গাঁয়ের লোকের মাথায় ধরে গোল।
সত্যি কথা হুজুর,
আমি আপনার মজুর,

পাকা দাড়ি ধরে
মিথ্যা কথা কব ক্যামন করে ?…”

ছড়া শুনে কবি হাসলেন। কথায় কথায় লালা পাগলার সঙ্গে দিব্যি আলাপ জমে উঠলো। লালা বললো—হুজুর, এই শীতে বড় কষ্ট, একখানা কাপড় পেলে গায় দিয়ে বাঁচি।

কবি তাকে একখানি কম্বল দিলেন। বললেন—কিন্তু একটা কাজ তোকে করতে হবে লালা। আজ থেকে তুই আর গাঁজা খাবি না, তামাক খাবি।

লালা পাগলা প্রতিজ্ঞা করলো সে আর গাঁজা খাবে না।

লালা সত্যি গাঁজা ছাড়লো। গাঁজা খেয়েই লালা পাগলার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল, গাঁজা ছাড়তেই মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মানুষটি ছিল বড় গরীব, কবি সে খবর রেখেছিলেন, কবি তাই বাড়ীতে বলে দিয়েছিলেন—লালা এলেই তাকে যেন খাইয়ে তবে ছাড়া হয়।

কবি এলেই লালা এসে দেখা করতো। বাবুমশাই তাকে ভালবাসেন এইটাই ছিল লালার জীবনে সবচেয়ে আনন্দের কথা। যখন তখন সুর করে সে গাইত—

“আমার দয়াল জমিদার,
(হায়) নাই তুলনা তাঁর।
তাঁর মুখখানি হয় চাঁদের নাগাল
হাত দুটি সোনার।” [—সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ

কবি শিলাইদহে নানা কাজের ভীড়ে যখন অবসর পান তখন বসে বসে গল্প লেখেন, কবিতা লেখা তো আছেই। আবার নানা ধরনের মানুষ, তাদের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের ঘটনা কবির জীবনে বৈচিত্র্য এনে দেয়।

একবার বর্ষার দিনে, পদ্মার বুকে তখন জলঝড়ের তুফান উঠেছে, মাঝি-মাল্লারা এক চরে বোট লাগিয়ে আকাশ ফরসা হবার আশায় অপেক্ষা করছে। উদ্দাম পদ্মার পানে তাকিয়ে কবি বসে আছেন জানালার ধারে। সহসা কবির চোখে পড়লো একটি মানুষ চরের ধানগাছগুলির মাঝে যেন আটকে আছে, হাত পা নাড়ছে কিন্তু উঠতে পারছে না। কবি ভালো করে ঠাহর করে দেখলেন, না, ভুল হয় নি। তখনিই মাঝিকে বললেন—ওরে, ঐ একটা মানুষ ওখানে পড়ে আছে, বেঁচে আছে দেখছি, লোকটাকে তুলে আন্।

মাঝিরা লোকটিকে তুলে আনলো। মানুষটি সত্যি বেঁচে আছে।

কবি হোমিওপ্যাথির রীতিমত চর্চা করতেন। ওষুধের বাক্স ছিল হাতের কাছে। লোকটিকে তিনি ওষুধ দিলেন। গরম দুধ খাওয়ালেন, শুকনো কাপড় দিলেন পরতে। লোকটি ধীরে ধীরে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলো।

কবি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

সে বললো—আমি নৌকার মাঝি। কলেরা হয়েছিল, নৌকার বাবুরা আমাকে চরে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। তারপর আমার আর জ্ঞান ছিল না।

—তোর কে আছে এখানে? বাড়ী কোথায়?

—সংসারে আমার আপনার বলতে কেউ নেই।

—কোথায় যাবি এখন?

—তা তো জানি নে, তবে যাব কোথাও।

—বেশ, তুই তাহলে আমার বোটেই থাক্, আজ থেকে আমি তোকে চাকরীতে বহাল করলাম। তোর নাম কি?

—ত্রিবেণী।

এই ত্রিবেণী পরে হেড-মাঝি হয়েছিল। কথায় কথায় সে বলতো—বাবুমশাই আমার জান, আমি তাঁর পায়েই মরবো।

আরেক দিনের কথা।—

পদ্মার বুকের উপর দিয়ে বোট ছুটছে কালোয়ার দিকে। কবি বসে আছেন বোটের ছাদে। সূর্যকিরণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে আকাশে, উদ্দাম বাতাসের ঝাপ্‌টা এসে লাগছে গায়। বর্ষার ভরা নদীর পানে তাকিয়ে আছেন। সহসা চোখে পড়লো একটি মানুষের দেহ ভেসে যাচ্ছে। কবি বললেন—মাঝি, দেখতো, একটা মানুষ ভেসে যায় না?

—হ্যাঁ হুজুর, মড়া বোধ হয়।

—ওকে তোল্, গ্যাখ্ মরেছে কি না?

—হুজুর, জলের যে তোড়, কি করে তুলি?

—যেমন করেই হোক্ ওকে তুলতে হবে। চোখের সামনে একটা মানুষকে মরতে দেখবো? তপসী, জালিবোট নামিয়ে দে।

কিন্তু সেই স্রোতের টানে মাঝিরা নামতে ইতস্ততঃ করলো।

কবি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। জামা খুললেন, জুতো খুললেন, জালিবোট

নামাবার জন্য নিজেই দড়ি খুলতে আরম্ভ করলেন। বললেন—পাঁচ টাকা করে বকশিষ দোব, তোল ওকে।

কবির উত্তেজনা দেখে মাঝিরা তৎপর হলো। তারণ ও রামগতি বোট নিয়ে ছুটলো, নৌকার ছাদ থেকে কবি উৎসাহ দিতে লাগলেন—সাবাস, হ্যাঁ, আরো এগিয়ে যা, আরো একটু—

উত্তাল তরঙ্গের মাঝে প্রায় আধঘণ্টা চেষ্টা করে মাঝিরা মানুষটিকে তুললো। এক স্ত্রীলোক। দেহে তখনও প্রাণ ছিল। কবি নিজেই তার প্রাথমিক চিকিৎসা সুরু করলেন।

গরম দুধ আর ব্রাণ্ডি খাইয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটির জ্ঞান হলো। লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে নৌকার এক কোণে বসে সে কাঁদতে সুরু করলো। কবি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কোন কথাই সে বললো না।

শেষে কবি সদর কাছারি থেকে ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন।

ম্যানেজারকে দেখে মেয়েটি এবার ভয় পেল, কাঁদতে কাঁদতে পরিচয় দিল—কায়স্থ ঘরের বৌ সে, স্বামীর দুর্ব্যবহারের জন্য পদ্মায় ঝাঁপ দিয়েছিল।

কবি তার স্বামীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—এই মেয়েটিকে তুমি চেনো?

—আমার স্ত্রী।

—তোমার লজ্জা করে না, পরিচয় দিতে?

খুব খানিকটা ধমকে দিয়ে কবি তাকে বললেন—ঘরে নিয়ে যাও একে।

—হুজুর, আমার বৌ জলে ডুবেছে একথা রাষ্ট্র হয়ে গেছে; এখন একে নিয়ে গেলে গাঁসুদ্ধ লোক আমাকে একঘরে করবে—ধোপা নাপিত বন্ধ হবে!

কবি গাঁয়ের সমাজপতিদের ডাকলেন। তাঁদের সব কথা বুঝিয়ে বললেন, তারপর পাল্‌কী করে বৌটিকে পাঠিয়ে দিলেন তার স্বামীর সঙ্গে।

[—পল্লীর মানুষ···

শিলাইদহে কবির জীবন ছিল বিচিত্র, অভিজ্ঞতায় পূর্ণ।

জমিদারীর কাজ শুধু শিলাইদহেই নয়, মাঝে মাঝে কবিকে অন্যত্র যেতে হয়। একবার তিনি কটকে গেলেন। কটক থেকে পুরী। তখন পুরী অবধি ট্রেন হয় নি। ঘোড়ার গাড়ীতে কাঠজুড়ী পর্যন্ত গিয়ে উঠতে হলো পাল্‌কীতে।

"আম অশ্বত্থ বট নারিকেল এবং খেজুর গাছে ঘেরা এক একটি গ্রাম দেখা যাচ্ছে।···ভিক্ষুকের দল নতুন যাত্রী ও গাড়ি পলকী দেখবামাত্র বিচিত্র কণ্ঠে ও ভাষায় আর্তনাদ করতে আরম্ভ করছে।···যত পুরীর নিকটবর্তী হচ্ছি তত পথের মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা বেশী দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা গোরুর গাড়ি সারি সারি চলেছে। রাস্তার ধারে গাছের তলায়, পুকুরের পাড়ে লোক শুয়ে আছে, রাঁধছে, জটলা করে রয়েছে। মাঝে মাঝে মন্দির, পান্থশালা, বড়ো বড়ো পুষ্করিণী। পথের ডানদিকে একটা খুব মস্ত বিলের মতো—তার উপরে পশ্চিমে গাছের মাথার উপর জগন্নাথের মন্দির চূড়া দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ এক জায়গায় গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েই সুবিস্তীর্ণ বালির তীর এবং ঘন নীল সমুদ্রের রেখা দেখতে পাওয়া গেল।" [—ছিন্নপত্র ১৪৫

কটকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জেলা-জজ্ বিহারীলাল গুপ্তের বাড়ীতে। পুরীতে বিহারীবাবু সস্ত্রীক কবির সহযাত্রী ছিলেন।

বিহারীলাল গেলেন পুরীর ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে গিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে খবর দিলেন। পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর আরদালী এসে খবর দিল—আজ দেখা হবে না, কাল সকালে এলে দেখা হবে।

বিহারীবাবু কটকের জেলা-জজ্ আর ম্যাজিস্ট্রেট সামান্য ম্যাজিস্ট্রেট মাত্র। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট খাঁটি সাহেব আর বিহারীলাল ভারতীয়। 'কালা' জজকে ফিরে আসতে হলো 'ধলা' ম্যাজিস্ট্রেটের দরজা থেকে। বিহারীলাল অপমান বোধ করলেন। কবিও ক্ষুব্ধ হলেন।

পরে ম্যাজিস্ট্রেট যখন খবর পেলেন যে জজ সাহেব এসেছিলেন তখনই ছুটে এলেন, ত্রুটি স্বীকার করে নিমন্ত্রণ করে গেলেন জজসাহেবকে, রবীন্দ্রনাথকেও। কবির সে নিমন্ত্রণে যাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বিহারীবাবু ক্ষুণ্ণ হবেন বলেই গেলেন। কিন্তু কবির মনে যে ভাবটুকু সেদিন জেগেছিল, কবির লেখনী তা লিখে রাখলো—"হে মৃৎপাত্র, ঐ কাংস্যপাত্রের কাছ থেকে দূরে থেকো; ও যদি রাগ করে তোমাকে আঘাত করে তাতেও তুমি চূর্ণ হয়ে যাবে, আর ও যদি সোহাগ করে তোমার পিঠে চাপড় মারে তাতেও তুমি ফুটো হয়ে অতলে মগ্ন হয়ে যাবে—অতএব বৃদ্ধ ঈশপের উপদেশ শোনো তফাৎ থাকাই সার কথা।"

ঘুরতে ঘুরতে কবির মনে জাগে অবসাদ। মনে পড়ে স্ত্রীর কথা, মনে জাগে ছোট্ট মেয়ে মীরার কথা। কাজ থেকে একটু অবসর পেতে ইচ্ছা করে,

ঘরের নিরালা কোণে নিরিবিলিতে একটু হাত পা ছড়াতে মন চায়। ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি উদয়গিরি দেখে কবি ফেরেন কলিকাতায়।

রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন হলো। এবার পুত্রের শিক্ষা সম্পর্কে কবি সচেতন হলেন। গতানুগতিক শিক্ষা তিনি ভাল চোখে দেখতেন না। ছেলেকে নিজের কাছে রেখে লেখাপড়া শেখানোর জন্য নিয়ে এলেন শিলাইদহে। এখানে রথীন্দ্রনাথ বাড়ীতে পড়তে লাগলেন, কবি দু'জন গৃহ-শিক্ষক রাখলেন—লরেন্স সাহেব ও জগদানন্দ রায়।

জগদানন্দবাবু তখন কবির জমিদারীতে কাজ করতেন।

আর লরেন্স সাহেব গিয়েছিলেন কলিকাতা থেকে।

এঁরা দু'জনেই ছিলেন শিক্ষাবিদ ও আত্মভোলা লোক। লরেন্স সাহেব তো শিলাইদহে পিঁড়ি পেতে বসে খেতেন, হুকায় তামাক খেতেন, গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে মিশতেন অবাধে।

শিলাইদহে এবার কবি রীতিমত চাষ-আবাদ নিয়ে মেতে উঠলেন। আমেরিকা থেকে এলো ভুট্টার বীজ, মাদ্রাজ থেকে এলো সরু ধানের বীজ, রাজসাহী থেকে এলো রেশমের গুটি। সুরু হয়ে গেল চাষ-আবাদের পরীক্ষা।

রেশমের গুটির ব্যাপারেই কবি খুব বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় শিলাইদহে বেড়াতে গিয়ে গোটা কুড়ি রেশমের গুটি রেখে আসেন। সেই কুড়িটি গুটি বাড়তে বাড়তে ক্রমে অসংখ্য হয়ে ওঠে। দশ-বারো জন লোক লাগাতে হয় তাদের ডালা সাফ করতে আর খাবার পাতা সংগ্রহ করতে। সেই কীটসেবার কাজে লরেন্স সাহেবকেও স্নানাহার ছাড়তে হলো।

ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ কুষ্টিয়াতে এক কারবার সুরু করেছিলেন—ঠাকুর কোম্পানী। এই কোম্পানীর প্রধান কাজ ছিল ভুষোমাল পাট কেনা-বেচা করা। কবিও এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বছর তিনেক কারবার চলার পর বলেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কবির উপরেই কারবারের সব দায়িত্ব এসে পড়লো।

বলেন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্যিক, আদর্শবাদী মানুষ; তিনি সবাইকেই বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে কোম্পানীর ম্যানেজার এমন সুব্যবস্থা করেছিলেন যে কোম্পানী ডুবতে বসেছিল। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন

সমবায় ও জীবন-বীমার কাজে ব্যস্ত, তিনিও এদিকে বিশেষ নজর দিতে পারতেন না। এদিকে ঠাকুর কোম্পানী পাটের কাজ ছাড়াও আখ-মাড়াই কলের কারবারে হাত দিয়েছিল। তখন বাংলাদেশে আখের চাষ হতো রীতিমত। গাঁয়ে গাঁয়ে আখমাড়াই হতো। সেই আখমাড়াইয়ের কল সরবরাহ করতো একটিমাত্র ইংরেজ কোম্পানী, ঠাকুর কোম্পানী এবার সেই কল সরবরাহের কাজ হাতে নিয়েছিল। কিন্তু এতো করেও কারবারে লাভ হচ্ছিল না। তার উপর বলেন্দ্রনাথ যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তো আর কথাই নেই।

অকস্মাৎ বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলো।

বলেন্দ্রনাথকে কবি নিজের মনের মত করে গড়ে তুলেছিলেন, বলেন্দ্রনাথের উপর তাঁর বড় আশা ছিল। কবি মনে বড় আঘাত পেলেন।

কবি সব দেখে-শুনে ঠিক করলেন—কারবার গুটিয়ে ফেলবেন।

দেনা-পাওনার একটা হিসাব-নিকাশ করতে বসলেন। ধরা পড়ার ভয়ে ঠিক এই সময় ঠাকুর কোম্পানীর ম্যানেজারও ফেরার হলো।

কবি হিসাব করে দেখলেন ঠাকুর কোম্পানীর দেনা প্রায় সত্তর-আশী হাজার টাকা। এই সমস্ত দেনার দায় এসে পড়লো কবির উপর।

ঋণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য কবি লোকেন পালিতের কাছে টাকা চাইলেন। লোকেনবাবুর টাকা ছিল না, টাকা দিলেন তাঁর বাবা তারকনাথ পালিত। বেণী সাহা নামে আর এক ধনীর কাছ থেকে কবি ধার নিলেন এক লাখ টাকা। তখন মুখের কথার দাম ছিল, দলিলপত্র কিছু দরকার হলো না।

এদিকে ঠাকুর কোম্পানীর অংশীদার জুটে গেল, এক মাড়োয়ারী আর তার সঙ্গে এক ইংরাজ। তারা কলিকাতার আফিস চালাবে, কুষ্টিয়ায় যে মাল খরিদ হবে তার অর্ধেক খরচ তারা দেবে। মাল কিনবে কুষ্টিয়ায় ঠাকুর কোম্পানী, অংশীদাররা সেই মাল বেচবে কলিকাতায়।

তবুও কোম্পানী চললো না।

কবি ঠিক করলেন কোম্পানী তুলে দেবেন।

সহসা একদিন কবি কর্মচারী যজ্ঞেশ্বরবাবুকে ডেকে নিয়ে গেলেন কুঠীবাড়ীর মাঠে, সোজা প্রশ্ন করলেন—এই কোম্পানী আমি তোমাকে দিতে চাই, তুমি নেবে?

যজ্ঞেশ্বরবাবু সামান্য কর্মচারী, অবাক হয়ে বললেন—এই এতো সব কলকব্জা আমায় দেবেন? এর যে অনেক দাম, এতো টাকা আমি কোথায় পাব?

কবি হাসলেন, বললেন—পুরো দাম তোমায় দিতে হবে না। তিন হাজার টাকা তুমি আমাকে দেবে বার্ষিক কিস্তিবন্দীতে আর ফ্যাক্টরী ও বাসাবাড়ী বাবদ দু'বিঘে জমি তোমাকে দোব বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা খাজনায়।

যজ্ঞেশ্বরবাবু এতটা আশা করেন নি। তিনি কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

কবি বললেন—তোমার যোগ্যতা আমি দেখেছি, তুমি এই কারবার ঠিক চালাতে পারবে, সেই জন্য তোমাকেই আমি সুযোগ দিতে চাই।

দলিল তৈরী হয়ে গেল।

তিন হাজার টাকা দিয়ে যজ্ঞেশ্বরবাবু ঠাকুর কোম্পানী কিনে নিলেন।

একটা গুরু দায়িত্বের বোঝা নামিয়ে কবি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কবি একখানি চিঠিতে লিখলেন—"আমরা সকল অবস্থাতেই যদি দৃঢ় বলের সঙ্গে সরল সত্যপথে চলি তাহলে অন্যের অসাধু ব্যবহারে মনের অশান্তি হবার কোন দরকার নেই—বোধ হয় একটু চেষ্টা করলেই মনটাকে তেমন করে তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে। একলা বসে বসে সংকল্প করেছি আমি সেই রকম চেষ্টা করব—অবিচলিতভাবে আপনার কর্তব্য করে যাব—তারপরে যে যা বলে যে যা করে কিছুতেই তিলমাত্র ক্ষুন্ন হব না—কতদূর কৃতকার্য হতে পারব জানি নে। প্রতিদিন নিরলস হয়ে নিজের সমস্ত কাজগুলি নিজের হাতে সম্পূর্ণরূপে সমাধা করলে এ রকম নিজের প্রতি এবং চারিদিকের প্রতি অসন্তোষ জন্মাতে পাবে না—যেখানেই পড়া যায় সেখানেই বেশ প্রফুল্ল সন্তুষ্টভাবে আপনার নিত্য কাজ করে কাটানো যেতে পারে। মনে যদি কোন কারণে একটা অসন্তোষ এসে পড়ে সেটাকে যতই পোষণ করবে ততই সে অন্যায়রূপে বেড়ে উঠতে থাকে—সেটা যে কিছুই নয়, এই রকম ভাবতে চেষ্টা করা উচিত—তার যতটুকু প্রতিকার করা আমাদের সাধ্য তা অবশ্য করব—যতটুকু অসাধ্য তা ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা স্মরণ করে অপরাজিত চিত্তে বহন করবার চেষ্টা করব। পৃথিবীতে এ ছাড়া যথার্থ সুখী হবার আর কোন উপায় নেই।" [—ছিন্নপত্র ১১

ঠাকুর কোম্পানী হস্তান্তর করেছিলেন বটে কিন্তু এই কোম্পানীর পূর্বকৃত ঋণ শোধ করতে কবির দীর্ঘকাল লেগেছিল। তারকনাথ পালিত সমস্ত সম্পত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে যান, তখন সেই ঋণও কলিকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের উপর গিয়ে বর্তায়। কবি বিশ্ববিদ্যালয়কে কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে ঋণমুক্ত হন।

এদিকে বেণী সাহাও একদিন এসে প্রণাম করে বললেন—হুজুর, আমার টাকাটা আর কয়েক সপ্তাহ পরে তামাদি হয়ে যাবে।

কবি হেসে বলেছিলেন—ভদ্রলোক যে টাকা ধার করেন, তা কি কখনও তামাদি হয়, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো বেণী।

তামাদি হবার আগেই বেণী সাহার লাখ টাকা কবি শোধ করেছিলেন।

তবে কবির একটা সান্ত্বনা ছিল, মানুষ চিনতে তাঁর ভুল হয় নি। যজ্ঞেশ্বর-বাবু ধীরে ধীরে যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে কবি যখন শেষবার শিলাইদহে যান তখন যজ্ঞেশ্বরবাবু সেখানকার একজন বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী। কবি ট্রেনে যাবেন যজ্ঞেশ্বরবাবু আগেই সে খবর পেয়েছিলেন, ট্রেন স্টেশনে এসে থামতেই যজ্ঞেশ্বরবাবু দেখা করতে ছুটে এলেন। প্রণাম করে বললেন—এখানে একবার নামবেন না হুজুর, আমার বাড়ীতে একবার পায়ের ধুলো দিন!

কবি বললেন—কেমন যজ্ঞেশ্বর, কাজ বেশ ভালো চলছে তো?

যজ্ঞেশ্বর বললেন—দেবতার আশীর্বাদে যজ্ঞেশ্বরের সিদ্ধিলাভ হয়েছে হুজুর!

—আমার কথা ফলেছে তো? সেই ত্রিশ বছর আগেও তোমাকে চিনতে আমার দেরী হয় নি।

—পায়ের ধুলো কি একটি বার পাবনা হুজুর?

—সেদিন আর নেই যজ্ঞেশ্বর, আজ আমি ভূতের বোঝা বয়ে ক্লান্ত, চললাম।

ট্রেন ছেড়ে দিল। যজ্ঞেশ্বর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল চট্টগ্রাম মেলের পানে তাকিয়ে।

চলমান চট্টগ্রাম মেলের ছোট কামরাখানির মধ্যে বসে কবি তখন ভাবছিলেন,—"জীবন বেশীদিনের নয়। এবং সুখদুঃখও নিত্য পরিবর্তনশীল। স্বার্থহানি, ক্ষতি, বঞ্চনা—এসব জিনিষকে লঘুভাবে নেওয়া শক্ত, কিন্তু না নিলে জীবনের ভার ক্রমেই অসহ্য হতে থাকে এবং মনের উন্নত আদর্শকে অটল রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই যদি না হয়, যদি দিনের পর দিন অসন্তোষে, অশান্তিতে, অবস্থার ছোট ছোট প্রতিকূলতার সঙ্গে অহরহঃ সংঘর্ষেই জীবন কাটিয়ে দিই—তাহলে জীবন একেবারে ব্যর্থ। বৃহৎ শান্তি, উদার বৈরাগ্য, নিঃস্বার্থ প্রীতি, নিষ্কাম কর্ম—এই হলো জীবনের সফলতা।···আজকাল আমার মনের একমাত্র

আকাঙ্খা এই, আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক্, আমাদের চতুর্দিক প্রশান্ত এবং প্রসন্ন হোক্, আমাদের সংসারযাত্রা আড়ম্বরশূন্য এবং কল্যাণপূর্ণ হোক্, আমাদের অভাব অল্প, উদ্দেশ্য উচ্চ, চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক্।" [—চিঠিপত্র ১৬

কবি লেখেন, সঙ্গে সঙ্গে একখানি কাগজেরও সম্পাদনা করেন। পত্রিকা-খানির নাম 'সাধনা'।

কিন্তু দীর্ঘদিন বাঁধা-ধরা কাজে নিযুক্ত থাকা কবির স্বভাব নয়। দু'মাস সাধনার সম্পাদনা করেই কবি হাঁপিয়ে ওঠেন। বললেন—বছরে ছ' মাস আমি আর ছ' মাস যদি আর কেউ সাধনার সম্পাদক থাকে তাহলেই সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়।

এক বছর চালানোর পর তিনি সাধনা বন্ধ করে দিলেন। পত্রিকাখানি চালানোর সমস্ত খরচ তাঁরই উপর পড়েছিল। আদায় হতো না কিছুই, শুধু ঋণ বাড়ছিল, কবি ঋণ বাড়াতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

তখন 'ভারতী' সম্পাদনা করছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। দশবছর চালাবার পর তিনি ছেড়ে দিলেন, হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী হলেন সম্পাদিকা। তাঁরাও দু'বছর পরে কবির উপর ভার দিলেন পত্রিকা সম্পাদনার।

বছর খানেক সম্পাদনা করে কবিও ভারতী ছেড়ে দিলেন।

এর কয়েক বছর পরে কবি আরেকখানি পত্রিকার সম্পাদক হন,—বঙ্গদর্শন। বঙ্গদর্শন আঠারো বছর প্রকাশ বন্ধ ছিল, কবির সম্পাদনায় তা আবার প্রকাশিত হলো। তবে এ কাগজও কবি বেশীদিন সম্পাদনা করেন নি।

ইতিমধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে কবির সখ্যতা হয়েছে। আচার্য তখন নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করে বেশ নাম করেছেন। মাঝে মাঝে শিলাইদহে গিয়ে তিনি কবির অতিথি হতেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে কবির শিক্ষা ও সাহিত্য নিয়ে নানা আলোচনা হতো। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায় কবি নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়ে যেতেন।

জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করতেন, কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে তিনি গেলেন বিলাতে বিজ্ঞান গবেষণার কাজে। কিন্তু শেষে কলেজ আর ছুটি মঞ্জুর করতে চাইল না। ছুটি মঞ্জুর নাহলেই বেতন বন্ধ। টাকার

অভাবে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হলো। কবি তখন বৈজ্ঞানিককে চিঠি লিখলেন—'তোমার কার্য অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না। তুমি তোমার কার্যের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে-ভার আমি লইব।'

ত্রিপুরার মহারাজার সঙ্গে কবির হৃদ্যতা হয়েছিল, কবি মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে জানালেন সব কথা। শেষে লিখলেন—'আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনার দোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হয়ে না থাকিতাম, তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারো দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না। আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম।'

বিজ্ঞানীর সম্মান রক্ষার জন্য মহারাজা কবির হাতে দশ হাজার টাকা দিলেন। কবি নিশ্চিন্ত হলেন। জগদীশচন্দ্রকে আর অর্থের জন্য চিন্তা করতে হলো না।

এই সময় কবির ছবি আঁকার সখ হলো, তিনি অবসর সময় কলম ছেড়ে তুলি নিয়ে বসলেন। জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন—'আমার চারিদিকে আমন ধান এবং আখের ক্ষেত আসন্ন শরতের শিশিরাক্ত বাতাসে দোদুল্যমান। শুনে আশ্চর্য হবেন একখানা sketch-book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকচি। বলা বাহুল্য, সে ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্য তৈরী করচি নে, এবং কোন দেশের ন্যাশান্যাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্‌স্ বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই।······যখন প্রতিজ্ঞা করলুম এবারে ষোল আনা কুঁড়েমিতে মন দেব তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে।'

জগদীশচন্দ্র কবিকে অনুরোধ করলেন তাঁর লেখাগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ করতে। তিনি লোকেন পালিতকেও চিঠি লিখলেন কবির লেখাগুলি অনুবাদ করার জন্য। লিখলেন—'তোমার লেখা তর্জমা করিয়া এদেশের বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাহারা অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে এখনও জানি না।'

আষাঢ় মাসে বড় মেয়ে মাধুরীলতার বিয়ে হয়ে গেল। জামাই হলেন কবি বিহারীলালের চতুর্থ পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। শরৎচন্দ্র দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। মজঃফরপুরে ওকালতি করতেন।

মেয়ে এতদিন কাছে ছিল, এবার কাছ-ছাড়া হলো। কবি নিজেই মেয়েকে রাখতে গেলেন মজঃফরপুরে। দূর দেশে মেয়েকে ছেড়ে আসার সময় পিতৃ-হৃদয় উতলা হয়ে উঠলো।—"কাল সমস্তক্ষণ বেলার শৈশবস্মৃতি আমার মনে পড়ছিল। তাকে কত যত্ন করে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলুম। তখন সে তাকিয়াগুলির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কি রকম দৌরাত্ম্য করত—সমবয়সী ছোট ছেলে পেলেই কি রকম হুঙ্কার দিয়ে তার উপর গিয়ে পড়ত—কি রকম লোভী অথচ ভালমানুষ ছিল—আমি নিজে পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে স্নান করিয়ে দিতুম—দার্জিলিঙে রাত্রে উঠিয়ে উঠিয়ে দুধ গরম করে খাওয়াতুম—সে সময় ওর প্রতি সেই প্রথম স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল, সেই সব কথা বার বার মনে উদয় হয়। কিন্তু সে-সব কথা ও ত জানে না—না জানাই ভাল।"

[—চিঠিপত্র ৩৪

এই সময় মজঃফরপুরে প্রবাসী বাঙালীরা এক সভা করে মুখার্জী সেমিনারীতে। সেই সভায় কবিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে একটা মানপত্র দেওয়া হয়।

কবির জীবনে এই প্রথম মানপত্র।

এই সময় হিন্দি পাঠকদের দৃষ্টি পড়লো কবির উপর, কবির 'মুক্তির উপায়' গল্পটি হিন্দিতে অনুবাদ হলো।

কবির রচনার এই প্রথম অনুবাদ।

মাসদেড়েক পরে মেজো মেয়ে রেণুকারও বিয়ে হয়ে গেল।

রেণুকার বিয়েটা আকস্মিক। তার বয়স তখনও বারো বছর পূর্ণ হয়নি। বিবাহের কথা উঠলো। পাত্র ডাক্তার, বললেন—বিয়ে করবো।

কবি সম্মতি দিলেন।

তিনদিন পরেই ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে রেণুকার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরেই জামাই চলে গেলেন আমেরিকায় হোমিওপ্যাথি পড়তে।

মেয়ে দুটির তো বিয়ে হয়ে গেল, এবার ছেলেদের সুশিক্ষিত করার দিকে কবি মন দিলেন।

কবির মনে জাগলো ভারতীয় শিক্ষার আদর্শের কথা।—

"ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে

না। এই শিক্ষার জন্ত আশ্রমের দরকার, সেখানে আছে সমগ্র জীবনের সজীব ভূমিকা।"

কবি মহর্ষিকে গিয়ে বললেন—শান্তিনিকেতন লোকশূন্য, সেখানে একটা আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারলে বেশ.হয়।

মহর্ষি তখনই সম্মতি দিলেন।

ইতিপূর্বে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে একটি ব্রাহ্মবিদ্যালয় করার জন্ত একখানি একতলা বাড়ী করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যু ঘটায় সে পরিকল্পনা আর কার্যকরী হয়নি। কবি এবার সেখানে বোর্ডিং ইস্কুলের পত্তন করলেন। প্রধান সহায়ক হলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং তাঁর খৃষ্টান শিষ্য সিন্ধি যুবক রেবাচাঁদ। লরেন্স সাহেব, জগদানন্দ রায় ও শিবরতন বিদ্যার্ণবও ছিলেন।

অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে বিদ্যালয় সুরু হলো। স্থির হলো, প্রাচীন কালের মত ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হবে না; ছাত্রদের জুতা ও ছাতার ব্যবহার করা চলবে না; নিরামিষ আহার করতে হবে; সব রকম কাজই ছেলেদের করতে হবে শুধু রান্না করা ছাড়া। তপোবনের আদর্শে মুক্ত আকাশের নীচে গাছের ছায়ায় ক্লাশ বসলো। কবি রথীন্দ্রনাথকে ভর্তি করে দিলেন এখানে।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাধারার আদর্শ কি হবে কবি তা স্থির করলেন। সে আদর্শ হলো প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষাধারার বিরুদ্ধে এক বিপ্লব। কবি বললেন—"কোনোমতে সাড়ে ন'টা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যাশিক্ষার হরিণবাড়ীর মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশলাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেওয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দরোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে। শিশু যে এলজেব্রা না কষিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেজন্ত সে কি অপরাধী। তাই সে হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ বাতাস, তাহাদের আনন্দ অবকাশ, সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে?......হরিণবাড়ির প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলো। মাতৃগর্ভের দশমাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিও না—তাহাদিগকে দয়া করো।

"……আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে, নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই।…অনুকুল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাশ বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্র পরিচয়ে, সংগীত চর্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।……

"এই আদর্শকে যদি মানি তবে প্রথম দরকার বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এখানকার শিশুদের আন্তরিক যোগ সাধন।……

"এই আশ্রমের গাছপালা পশুপাখী যা কিছু আছে ছাত্রেরা তাদের সম্পূর্ণ-ভাবে জানবে এটি খুবই দরকার। বাহিরের প্রতি আমাদের সকলেরই এই যে একটা স্বাভাবিক উদাসীন্য আছে তার দ্বারা আমাদের মনকে বঞ্চিত করি। আমাদের অধ্যাপনায় পুঁথিগত বিদ্যার পরেই আমাদের একান্ত সতর্কতা কিন্তু কত বিদ্যা আমাদের চোখের কাছে, কানের কাছে, হাতের কাছে, আমাদের মনোযোগের প্রতি অপেক্ষা করে প্রত্যহই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তাতে করে কেবল যে একটা দেশ জোড়া চিত্ত-দৈন্য ঘটচে তা নয়, দেশের প্রতি আমাদের অনুরাগের সম্পূর্ণতাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।……

"শিক্ষার এই যেমন জানার দিক তেমনি আবার কাজের দিকও আছে। আশ্রমের গাছপালা পশুপাখীকে সেবা করাও একটা বড় সাধনা। বিশেষ বিশেষ ছেলে আশ্রমে বিশেষ বিশেষ গাছের ভার নিয়ে তাতে জল দেওয়া, তার গোড়া খুঁড়ে দেওয়া, সার দেওয়া প্রভৃতি প্রাত্যহিক কাজের দ্বারা তার প্রতি মমতার চর্চা করে এরও একটা বড় শিক্ষা আছে। তেমনি স্থানে স্থানে কাঠবিড়ালী, পাখী প্রভৃতির জন্যে তারা পানীয় ও নিজের খাদ্যের অংশ রেখে দেবার ব্যবস্থা করে দেয়—এটাও চাই।

"এই যেমন প্রকৃতির সঙ্গে যোগের কথা হল তেমনি লোকালয়ের সঙ্গে যোগও চাই। ভুবনডাঙ্গা গ্রাম ও সাঁওতাল পাড়াগুলির সম্যক পরিচয় যাতে ছেলেরা পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

"আশ্রমে ব্রতী বালক সম্প্রদায় গড়া হয়েছে।…ব্রতীকৃত্য শিক্ষা আমাদের অন্য কোন শিক্ষার চেয়ে কম গুরুতর নয়।

"আশ্রমের মধ্যে যেখানে জঙ্গল বা গর্ত ডোবা আছে, যেখানে চলাচলের রাস্তা ভেঙেচুরে গেছে, যেখানেই কোথাও জল জমে মশার ও ময়লা জমে

যাছির উৎপত্তির কারণ হয়েছে সেখানেই সংস্কার কার্যের ব্রতীরা যেন মনোযোগ করে।...

"দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষারও প্রবাহ বেগ পায় না। অনেক ছেলেকে ক্লাশে জড়বুদ্ধি দেখি তার কারণই এই যে শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবী কোনোই আমল পায় না, সেই অনাদরে তাদের মনের দৈন্য ঘটে। দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলচিনে। দেহের দ্বারা আমরা যেসব কাজ করতে পারি সেই সব কাজের চর্চা—সেই চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়। সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়—সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটে।

"প্রত্যেক ছাত্রকেই কোনো না কোনো হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল কথা এই রকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চায় মনও সজীব সতেজ হয়ে ওঠে। যেমন ছেলেকে আমরা নির্বোধ বলে মনে করি তাদের অনেকেরই সুপ্ত চিত্তে এই দৈহিক কর্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা করে আছে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ করে নেয়। তাছাড়া যার দেহ শিক্ষিত হয় নি সে যত বড় পণ্ডিতই হোক্, সংসার ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবন ধারণ করতে হয়—সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বাঁচাতে হবে।..." [—শিক্ষা

এই আদর্শের উপর শান্তিনিকেতনের কার্যক্রম ঠিক হলো।

কবি নিজের কাছ থেকেই সব খরচ চালাতে লাগলেন। কিন্তু ঠাকুর কোম্পানীর ব্যাপারে কবির অর্থাভাব দেখা দিয়েছিল। অর্থের অসঙ্গতির জন্ম কবিকে আদর্শের কিছুটা সংকোচ করতে হলো। ছাত্রদের কাছ থেকে তিনি বেতন নেবার ব্যবস্থা করলেন, মাসিক তেরো টাকা।

কবি এবার সপরিবারে এসে উঠলেন শান্তিনিকেতনে। আর কোন বাড়ী ছিল না, অতিথিশালায় তিনি নিজের থাকার ব্যবস্থা করলেন। আর রথীন্দ্রনাথের থাকার ব্যবস্থা হলো আর সব ছেলের সঙ্গে বোর্ডিংএ। মেয়ে-ইস্কুলে মীরাও আর সব মেয়ের সঙ্গে রইল। নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে অন্ত ছেলেমেয়েদের কোন পার্থক্য তিনি রাখলেন না।

কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী বিকালে নিজে রান্না করতেন। সব ছেলেমেয়েদের একত্রে খাওয়াতে তিনি খুব ভালবাসতেন।

স্বামীর আদর্শকে সার্থক করে তোলার জন্য, স্বামীর কর্মভার লঘু স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য মৃণালিনী দেবী সদাই নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন।

কিন্তু সহধর্মিণীর এই সখ্যতা কবির জীবনে স্থায়ী হলো না।

কবিপত্নী অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

কবি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশ্বাস করতেন। প্রথমে তিনি পত্নীর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করালেন। কিন্তু বিশেষ কোন ফল পাওয়া গেল না।

কবি তখন তাঁকে কলিকাতায় নিয়ে এলেন। রীতিমত এলোপ্যাথিক চিকিৎসা সুরু হলো। অসুখ কিন্তু সারলো না। কয়েক মাস অসুখে ভুগে কবিপত্নী ইহলোক ত্যাগ করলেন। মৃণালিনী দেবীর বয়স তখন ঊনত্রিশ, কবির বয়স একচল্লিশ, রথীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ, রেণুকার বারো, মীরার দশ, শমীন্দ্রনাথের আট বছর মাত্র।

মৃণালিনী দেবীর উপর কবি অনেকখানি নির্ভর করতেন। সংসারের ভারটুকু তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে কবি ছিলেন নিশ্চিন্ত।—

"তোমাদের এখনকার মত আমরা এত বড় মানুষ ছিলাম না। এখন তো তোমাদের দেখি কিছুতেই কুলায় না। আমার বরাদ্দ ছিল ২০০৲ কি ২৫০৲, তাই এনে ছোট বৌকে দিয়ে দিতুম, ব্যাস। তিনি যা খুসি করতেন, সংসার চালাতেন। আমায় সেদিকে কখনো কিছু ভাবতে হোতো না।..

"যখন তিনি চলে গেলেন তখন আমার এক মুহূর্ত অবসর ছিল না। শান্তিনিকেতন শুরু হয়েছে, হাতে পয়সা নেই, ঋণের পর ঋণ বোঝার মত চেপে রয়েছে। কাজের অন্ত নেই। তখন নিজের সুখদুঃখকে কেন্দ্র করে মনকে আবদ্ধ করবার অবসরই বা কোথায়। মেজো মেয়ে মৃত্যুশয্যায় আলমোড়ায়। তাকে ফেলেও বারে বারে আসতে হোতো শান্তিনিকেতনের কাজে। যাওয়া-আসা ছুটোছুটি চলেছেই। তবে সবচেয়ে কি কষ্ট হোতো জানো, যে এমন কেউ নেই যাকে সব কথা বলা যায়। সংসারে কথার পুঞ্জও অনবরত জমে উঠতে থাকে—ঠিক পরামর্শ নেবার জন্য নয়, শুধু বলা, বলার জন্যই। এমন কাউকে পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব কথা বলা যায়—সে তো আর যাকে তাকে হয় না। যখন জীবনের এই যুদ্ধ চলেছে, কাজের বোঝা জমে উঠেছে, মেয়ে

মৃত্যুর পথে অগ্রসর হচ্ছে তখন সেইটেই সব চেয়ে কষ্ট হোতো যে এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়।" [—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

পত্নীর মৃত্যু কবিকে অন্তরে-বাহিরে সঙ্গীহীন নিঃসহায় করে দিল।

"ঝড়ের মুখে যে ফেলেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
সব সুখজালে বজ্র জ্বালালে,
সেই আলো মোর, সেই আলো।
সাথি যে আছিল নিলে কাড়ি,
কী ভয় লাগালে গেল ছাড়ি।
একাকীর পথে চলিব জগতে,
সেই ভালো মোর সেই ভালো।" [—উৎসর্গ

রেণুকা ভুগছিল কিছুদিন ধরে। চিকিৎসা করে বিশেষ ফল পাওয়া গেল না দেখে কবি হাওয়া বদলের জন্ত তাকে নিয়ে গেলেন হাজারিবাগে। সঙ্গে শমী ও মীরাও গেল।

হাজারিবাগে কোন সুফল হলো না। কবি তখন রেণুকাকে নিয়ে গেলেন আলমোড়ায়। আলমোড়ায় মাসখানেক থাকার ফলে রেণুকার কিছু উপকার হলো। এদিকে কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথের বিয়ে, বোলপুর ও শিলাইদহে জরুরী প্রয়োজন দেখা দিল। মেয়েকে মামার কাছে রেখে কবি চলে এলেন।

ক'দিন পরেই আলমোড়া থেকে টেলিগ্রাম এলো—রেণুকার অসুখ বেড়েছে।

কবি তখনই গেলেন আলমোড়ায়। ক'দিন রইলেন। রেণুকার অবস্থার উন্নতি হলো। কিন্তু রেণুকা আর সেখানে থাকতে চাইলেন না। কবি মেয়েকে নিয়ে কলিকাতায় ফিরলেন। কলিকাতায় অসুখ আবার বাড়লো। দিন কয়েক ভুগেই রেণুকা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পত্নীবিয়োগের ন'মাসের মধ্যে কবি আরেক মর্মান্তিক শোক পেলেন।

কিন্তু শোক করার মত অবসর তখন কোথায়। কাজ রয়েছে শান্তিনিকেতনে, কাজ রয়েছে শিলাইদহে।

কবিকে যেতে হলো শান্তিনিকেতনে।

শান্তিনিকেতনে সেবার বসন্তের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বসন্তরোগে অধ্যাপক

সতীশচন্দ্র মারা গেলেন। বিদ্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়ে কবি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে চলে গেলেন শিলাইদহে।

শিলাইদহ থেকে কবি গেলেন মজঃফরপুরে।

মজঃফরপুর থেকে তিনি ফিরলেন শান্তিনিকেতনে। কিন্তু মন তখন শোকার্ত। সেখানকার কাজের চাপ সহতে পারলেন না। শরীর ভেঙে পড়লো। কবি কিছুদিনের জন্য চলে গেলেন গিরিডিতে। গিরিডিতে তিনি রয়ে গেলেন প্রায় বছরখানেক।

এই সময় শান্তিনিকেতনের ভার নিলেন অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন। এতদিন এটি ছিল না-আশ্রম না-ইস্কুল। মোহিতবাবু এটিকে রীতিমত বিদ্যায়তন করে তুললেন। ছাত্র-সংখ্যা বাড়লো, পঠন-পাঠন লিপিবদ্ধ হলো। কিন্তু সেই অনুপাতে ব্যয়ও বেড়ে গেল। শুধু ছাত্রদের বেতনের টাকায় বিদ্যালয় চালানো সম্ভব হলো না।

কবি বাইরে থেকে টাকা তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ত্রিপুরার মহারাজা বছরে বছরে হাজার টাকা করে দেন, শান্তিনিকেতন-ট্রাস্ট থেকে কিছু টাকা পাওয়া যায়, তবু টাকার প্রয়োজন মেটানো যায় না।

মোহিতবাবু বিদায় নেবার দিন কবির কাছে এসে বললেন—আমি এখানে থাকতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতুম, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। এখানে সামান্য কিছু আমি শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়ে যেতে চাই।

অধ্যাপক একটি কাগজের মোড়ক দিলেন কবির হাতে। কবি মোড়কটি খুলে দেখেন, তার মধ্যে হাজার টাকার একখানি নোট। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকরূপে এই টাকাটা তিনি পেয়েছিলেন, তার সবটাই তিনি শ্রদ্ধার নিদর্শন রূপে দিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে কবির তপোবনের স্বপ্ন তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সময় পার্ক স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতেন। তাঁর শরীর কিছুদিন যাবৎ ভাল যাচ্ছিল না, জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল। ১৯০৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী তিনি দেহত্যাগ করলেন।

মহর্ষির কাছে থাকতেন বিপত্নীক দ্বিজেন্দ্রনাথ, ও বিধবা কন্যা সৌদামিনী দেবী। দ্বিজেন্দ্রনাথ এবার চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। সঙ্গে এলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ।

কবি এবার শান্তিনিকেতনের পরিচালন ব্যাপারের কিছু অদল-বদল করলেন। বিদ্যালয়ের ভার দিলেন ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের উপর। শিক্ষক রইল মাত্র ছ'জন। বারো বছরের বেশী বয়সের ছেলেদের আর রাখা হলো না। তাতে ছাত্র সংখ্যা এসে দাঁড়ালো বারো-তেরোটি। সমস্ত খরচ চালাবার জন্য কবি ভূপেন্দ্রবাবুর হাতে মাসে মাসে পাঁচশো টাকা দিতেন। তাইতেই ভূপেনবাবু সব কিছু চালাতেন।

ছেলেমেয়েদের থাকার অসুবিধা হচ্ছিল কবি তাদের জন্য একখানি খড়ের বাড়ী তৈরী করালেন। নিজের থাকার জন্যও তৈরী করালেন দু'কামরার একখানি দোতলা বাড়ী, নাম দিলেন 'দেহলি'। কবি চেয়েছিলেন দেহলির ঘর দু'খানি হবে স্বল্প পরিসর, ঘরে একখানি খাট ও একটি লেখবার জলচৌকি ছাড়া আর কিছু রাখা চলবে না। অবশ্য যাঁরা তৈরী করেছিলেন, তাঁরা ঘর দু'খানি তার চেয়ে বড়ো করেই করেছিলেন, না হলে তেমন ঘরে কবি থাকতে পারতেন না।

কবি আবার পূর্ণোৎসাহে শান্তিনিকেতনের কাজকর্ম দেখতে সুরু করলেন।

ইতিমধ্যে কবি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। বাঙালী তখন নিজের দেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে চিন্তা করতে সুরু করেছে, এবং এই চিন্তাধারার পুরোভাগে ছিলেন কলিকাতার ঠাকুর-পরিবার।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের প্রথম প্রবর্তন হলে নাটোরে

রবীন্দ্রনাথ বলেন—প্রাদেশিক কনফারেন্স হওয়া উচিত বাংলা ভাষায়।

অবনীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য যুবকেরা বললেন—নিশ্চয়ই।

আলোচনা হলো। অবনীন্দ্রনাথ বললেন—আমরা শেষ পর্যন্ত লড়বো।

তরুণেরা প্রবীণদের বললেন—প্রাদেশিক সম্মেলন বাংলা ভাষায় হবে।

প্রবীণেরা বললেন—তা হয় না। যেমন কংগ্রেসে হয় তেমনি ইংরাজিতে সব হবে।

বিতর্ক বাধলো। দুটি দল হয়ে গেল। তরুণেরা গিয়ে বসলো প্যাণ্ডেলে। সভা সুরু হলো।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথ একখানি গান গাইলেন

তারপর সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উঠলেন বক্তৃতা দিতে। ইংরাজিতে

যেই-না তিনি বলতে স্থরু করেছেন, অমনি তরুণের দল সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—বাংলা, বাংলা!

ইংরাজিতে বলা অভ্যাস, বাংলা আর কেউ বলতে পারেন না। দু-একটা কথা যদি কেউ বলতে চেষ্টা করেন চেঁচামেচিতে তা শোনা যায় না। বাংলা না বললে তরুণেরা শুনবে না।

শেষে লালমোহন ঘোষ বাংলায় বক্তৃতা দিলেন। ইংরাজিতে তিনি বলতে পারতেন চমৎকার, বাংলাও বলতেন সুন্দর।

তরুণদের জয় হলো। প্রাদেশিক সম্মেলনে বাংলা ভাষার চলন হলো।

লোকমান্য তিলক গ্রেপ্তার হলেন। কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর তিলক ছিলেন বিরোধী। নিয়মতান্ত্রিক-পন্থী জাতীয় নেতাদের পন্থা কবিরও ভালো লাগতো না। তিনি স্পষ্টভাষায় বললেন—"রাজদ্বারে আবেদনের থালা লইয়া বৎসরের পর বৎসর কেবলমাত্র কাঁদুনির সুরে 'কিছু দাও, কিছু দাও' করিয়া প্রার্থনা করিলে কিছু পাইবে না। গুরুতর দুঃখকে শিরে বহন করিয়া, কারাদণ্ডে অবিচল থাকিয়া, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবার পূর্বে বাহুবলে উহা আমাদের অর্জন করিতে হইবে।"

[—জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

বাংলাদেশে এলো স্বদেশী ভাবের জোয়ার। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের এক সভায় কবি 'স্বদেশী সমাজ' গড়ে তোলার কথা বললেন। স্বদেশী সমাজের প্রতিজ্ঞা-পত্রের একটি খসড়াও কবি তৈরী করে দিলেন।—

১। আমাদের সমাজের ও সাধারণতঃ ভারতবর্ষীয় সমাজের কোনো প্রকার সামাজিক বিধি ব্যবস্থার জন্য আমরা গবর্মেন্টের শরণাপন্ন হইব না।

২। ইচ্ছাপূর্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না।

৩। কর্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালিকে ইংরেজিতে পত্র লিখিব না।

৪। ক্রিয়াকর্মে ইংরেজি খানা, ইংরেজি সাজ, ইংরেজি বাদ্য, মদ্য-সেবন এবং আড়ম্বরের উদ্দেশ্যে ইংরেজ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ নিমন্ত্রণ করি, তবে তাহাকে বাংলা-রীতিতে খাওয়াইব।

৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারি ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশী চালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।

৬। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কোনোপ্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না গিয়া সর্বাগ্রে সমাজনির্দিষ্ট বিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

৭। স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিব।

৮। পরস্পরের মধ্যে মতান্তর ঘটিলেও বাহিরের লোকের নিকট সমাজের বা সামাজিকের নিন্দাজনক কোনো কথা বলিব না।

এই প্রতিজ্ঞা-পত্রটি দেখলেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা তাঁর যুগের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী ছিল।

মিনার্ভা মঞ্চের সেই সভায় এতো ভীড় হয়েছিল যে দরজা ভাঙার উপক্রম হয়। শেষে পুলিশ এসে ভীড় সামলায়।

সখারাম গণেশ দেউস্কর বাংলাদেশে 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তন করলেন। টাউন হলের সভায় কবি উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর কবিতা পড়লেন।—

"মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বল জয়তু শিবাজি।
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক সাথে চল মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব দক্ষিণে ও বামে।
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব এক পুণ্য নামে।..."

১৯০৫ সালের ১৬ই অকটোবর বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হলো। কবি বঙ্গদর্শনে লিখলেন—'আগামী ৩০ আশ্বিন (১৩১২) বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই, তাহাই বিশেষ রূপে স্মরণ করিবার জন্য এই দিনকে আমরা বাঙালির রাখি-বন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখি-বন্ধনের মন্ত্রটি এই 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'।'

প্রাতে বাগবাজার থেকে শোভাযাত্রা বেরুলো, নেতৃত্ব করলেন কবি। হাজার হাজার লোক প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে গঙ্গাস্নান করে একে অপরের হাতে রাখী বেঁধে দিল। সমবেত কণ্ঠে কবির গান ধ্বনিত হলো—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান!

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান!
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান!"

গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চললো। কবি চলেছেন সবার আগে। বাড়ীর ছাদ থেকে মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে, বিরাট জনতা দাঁড়িয়ে আছে পথের দু'পাশে।

পাথুরেঘাটা দিয়ে মিছিল চলেছে। বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কয়েকটি সহিস ঘোড়া মলছিল, কবি গিয়ে তাদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন, কোলাকুলি করলেন। সহিসগুলো তো হতভম্ব।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—চলো সব, চীৎপুরে বড় মসজিদে যাব!

সবাই গিয়ে উঠলো বড় মসজিদে, যত মুসলমান দেখলো সবার হাতে রাখী পরিয়ে দিল। মসজিদের সবাই তো ভারী খুশি। তারা সহাস্য মুখে জনতাকে আনন্দে অভিসিঞ্চিত করলো।

সেদিন বিকালে বিরাট সভা বসলো, আপার সার্কুলার রোডে। সেই সভায় অসুস্থ আনন্দমোহন বসু প্রায় শায়িত অবস্থায় এসে সভাপতিত্ব করলেন। তাঁর ইংরাজি ভাষণ পাঠ করলেন আশুতোষ চৌধুরী, তার বাংলা তর্জমা পাঠ করলেন রবীন্দ্রনাথ। আনন্দমোহন 'ফেডারেশন হলে'র ভিত্তি স্থাপনা করলেন। তারপর বিপুল জনতার মিছিল করে বেরুলো। মিছিল চললো বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ী, কণ্ঠে তাদের রবীন্দ্রনাথের গান—

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এতই শক্তিমান
মোদের ভাঙা-গড়া তোমার হাতে এতই অভিমান।"

বাগবাজারের সভায় কবি প্রস্তাব করলেন এক জাতীয় ভাণ্ডার স্থাপনের। সঙ্গে সঙ্গে ওই সভাতেই পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগৃহীত হলো।

ইতিমধ্যে সরকারী শিক্ষাবিভাগ এক সার্কুলার জারী করলেন—কোন ছাত্র স্বদেশী সভায় যোগ দিলে বা বন্দেমাতরম গান গাইলে তাকে সরকারী শিক্ষালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই 'কার্লাইল-সার্কুলারের' বিরুদ্ধে সারা বাংলা

দেশে প্রতিবাদ উঠলো। পটলডাঙ্গায় মল্লিকবাড়ীর সভায় কবি বললেন—
—"আমাদের সমাজ যদি নিজের বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করেন, তবে একদিন ঠকিতেই হইবে।...গবর্মেণ্ট এদেশে অনুকূল শিক্ষা কখনো দিতে পারেন না। ইহার কারণ অক্ষমতাও হইতে পারে, অনিচ্ছাও হইতে পারে। অক্ষমতা কেন না, যেখানে হৃদয়ের যোগ থাকে না, সেখানে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় না; অনিচ্ছা—কেন না গবর্মেণ্ট জানেন যে তাঁহাদিগের সাহিত্য ও ইতিহাস প্রভৃতি হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আমাদের চিত্ত যেভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা তাঁহাদের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল নহে। বিদেশী অধ্যাপক অশ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষা দেন। শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা এমন একটী জিনিষ পাই, যাহা আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে।" [—রবীন্দ্রজীবনী

বিজয়া সম্মেলনীতে পশুপতিবাবুর বাড়ীতে কবি বললেন—"যে-চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর—যে-রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে-পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে-মুসলমান নামাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর।...আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে, সেই নিস্তব্ধ শুচিরুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম্' গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আরেক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক্—একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।"

১৯০৫ সালে যুবরাজ পঞ্চম জর্জ এলেন ভারতবর্ষে। কংগ্রেসী নেতারা গোখেলের নেতৃত্বে যুবরাজকে অভিনন্দন জানাবার সিদ্ধান্ত করলেন। প্রবীণ নেতাদের এই মনোভাবের সঙ্গে কবি সুর মেলাতে পারলেন না। কবি লিখলেন—"ভারতবর্ষীয় প্রজার এই যে হৃদয় প্রত্যহ ক্লিষ্ট হইতেছে, ইহাকেই কতকটা সান্ত্বনা দিবার জন্য রাজপুত্রকে আনা হইয়াছিল—আমাদিগকে দেখানো হইয়াছিল যে আমাদেরও রাজা আছে। কিন্তু মরীচিকার দ্বারা

সত্যকার তৃষ্ণা দূর হয় না।…হে ভারতবর্ষ, সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত লাঞ্ছনার উর্ধ্বে তোমার মস্তককে অবিচলিত রাখো—এই সমস্ত বড় বড় নামধারী মিথ্যাকে তোমার সর্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার করো, ইহারা যেন বিভীষিকার মুখোস পরিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে লেশমাত্র সংকুচিত করিতে না পারে। তোমার আত্মার দিব্যতা, উজ্জ্বলতা, পরমশক্তিমত্তার কাছে এই সমস্ত তর্জন-গর্জন, এই সমস্ত উচ্চপদের অভিমান, এই সমস্ত শাসন-শোষণের আড়ম্বর তুচ্ছ ছেলেখেলা মাত্র—ইহারা যদি বা তোমাকে পীড়া দেয় তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেখানেই নত হওয়ায় গৌরব—যেখানে সে সম্বন্ধ নাই সেখানে যাহাই ঘটুক অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিয়ো, দীনতা স্বীকার করিয়ো না, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়ো, নিজের প্রতি অক্ষুন্ন আস্থা রাখিয়ো। কারণ, নিশ্চয়ই জগতে তোমার একান্ত প্রয়োজন আছে—সেইজন্য বহু দুঃখেও তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হও নাই।" [—রবীন্দ্রনাথ

কবি 'ভাণ্ডার' নামে একখানি পত্রিকার সম্পাদক হলেন। তাতে জাতি পুনর্গঠন সম্পর্কে নানা দিক থেকে আলোচনা হতো। লিখতেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পৃথ্বীশ রায় প্রভৃতি। ইংরাজ শাসনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে কবি লিখলেন—"ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন বাদশাহ ছিল তাহার পর একটি কোম্পানী বসিয়াছিল…এখন ইংরেজ জাত জানে ভারতবর্ষ তাহাদের সকলেরই। একটি রাজ পরিবার নহে। সমস্ত ইংরেজ জাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।…মোটকথা একটা আস্ত জাত নিজের দেশে বাস করিয়া অন্য দেশকে শাসন করিতেছে। ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই।…একটা দেশ যত রসালো হউক না, একজন রাজাকেই পালিতে পারে, দেশশুদ্ধ রাজাকে পারে না।"

[—রবীন্দ্রজীবনী

পরপর কয়েকটি সাহিত্য সম্মেলন হলো—ত্রিপুরা, বরিশাল, বহরমপুর। কবি হলেন সভাপতি। তারপর বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে সাহিত্য-অধিবেশনে কবি সভাপতি হলেন। কিন্তু পুলিশের অত্যাচারে সভা বন্ধ হয়ে গেল। কবি নৌকা করে গিয়েছিলেন, নৌকাতেই রহে গেলেন। এই

সময় কবি অর্থের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন। কলিকাতায় এসে তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন।

কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবসর তিনি পেলেন না। ঠিক সেই সময় মুঙ্গের থেকে টেলিগ্রাম এলো—ছোটছেলে শমীন্দ্রনাথের কলেরা হয়েছে।

কবি ছুটলেন মুঙ্গেরে।

কবি সেখানে গিয়েও কিছু করতে পারলেন না, তেরো বছরের ছেলে বোনের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিল, সেখান থেকে আর ফিরলো না। সেই-খানেই দুরারোগ্য রোগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। পাঁচ বছর আগে ঠিক ওই দিনটিতেই মৃণালিনী দেবীও দেহত্যাগ করেছিলেন।

কবি শোকার্ত মনে অসুস্থ দেহে শিলাইদহে চলে গেলেন সঙ্গে এলো দুই মেয়ে মীরা ও বেলা। পুরানো গৃহের চারিপাশে পরিচিত স্মৃতি ভীড় করে আসে, কবির বিষন্ন মনে নেমে আসে অবসাদ।—

"আমি যখন এলেম, সেদিন দীপ জ্বলে না ঘরে,
বহুদিনের শিখার কালি আঁকা ভিতের 'পরে।
শুষ্কজলা দীঘির পাড়ে, জোনাক ফিরে ঝোপে ঝাড়ে,
ভাঙা পথে বাঁশের শাখা ফেলে ভয়ের ছায়া।
আমার দিনের যাত্রা শেষে কার অতিথি হলেম এসে,
হায়রে বিজন দীর্ঘরাত্রি, হায়রে ক্লান্ত কায়া।" [—খেয়া

কিন্তু জীবন বড় নির্মম। কর্মক্ষেত্রে শোকেরও অবসর নেই। নাটোর রাজাদের ছোট তরফের সঙ্গে মামলা চলছে। সেই মামলা সম্পর্কে পরামর্শ করতে হয়, আলোচনা করতে হয়। কবি সেই কর্মব্যস্ততার মাঝে সান্ত্বনা খুঁজে ফেরেন।—"কাজের সংসারের দিকে চেয়ে দেখি, কেউ চাকরি করছে, কেউ ব্যবসা করছে, কেউ চাষ করছে, কেউ মজুরি করছে; অথচ এই প্রকাণ্ড কর্মক্ষেত্রের ঠিক নীচে দিয়েই প্রত্যহ কত মৃত্যু, কত দুঃখ গোপনে অন্তঃশীলা বহে যাচ্ছে, তার আবরু নষ্ট হতে পারছে না—যদি সে অসংযত হয়ে বেরিয়ে আসত তাহলে কর্মচক্র একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। ব্যক্তিগত সুখদুঃখটা নীচে দিয়ে ছোটে যার উপরে অত্যন্ত কঠিন পাথরের ব্রিজবাঁধা; সেই ব্রিজের উপর দিয়ে লক্ষ লোকপূর্ণ কর্মের রেলগাড়ী আপন লৌহপথে হু হু শব্দে চলে যায়, নির্দিষ্ট স্টেশনটি ছাড়া আর কোথাও কারো খাতিরে মুহূর্তের জন্যে থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠুরতায় মানুষের কঠোর সান্ত্বনা।" [—ছিন্নপত্র ২৭৩

কাজ মনকে ব্যস্ত রাখে সত্য। কিন্তু বিষাদকে তো জয় করতে পারে না। দিনের কাজ যখন শেষ হয়, লোকের ভীড় যখন কমে, রাত্রির অখণ্ড অবসর মনকে উন্মনা করে দেয়, কবি বোট ছেড়ে নেমে আসেন, জনবিরল নিস্তব্ধতার মাঝে শান্তি খুঁজে পেতে চান। দমকা বাতাসের হু হু শব্দ ও পাতার মর্মর ধ্বনির সঙ্গে শোকার্ত পিতৃহৃদয়ের অব্যক্ত বেদনার সুর গুমরিয়ে ওঠে। নির্জন চরের বুকে কবি উন্মনা উদাস হয়ে ঘুরে বেড়ান। রাত গভীর হয়। দূর থেকে মালখানার পেটা ঘড়িতে একটা বাজে। শিয়াল ডেকে ওঠে। জ্যোৎস্নালোকিত নির্জনতার মাঝে ঘুরতে ঘুরতে কোন এক সময় কবি এসে পড়েন কাছারির সামনে, অভ্যাসের বশে পূর্ব দিকে মেস বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন, ডাকলেন—সতীশ, সতীশ!

সতীশবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে এসে দেখেন, জ্যোৎস্নালোকিত প্রাঙ্গণে কবি দাঁড়িয়ে আছেন। বিস্মিত হলেন, তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলেন। আর যাঁদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তাঁরাও এলেন সতীশবাবুর

কবি সবাইকে দেখে বললেন—তোমরা সবাই উঠে পড়েছ! আমি বড় ক্লান্ত, একটু বসবো এখানে?

সতীশবাবু দেখলেন, কবি কাঁপছেন।

পাড়াগাঁয়ের মেস, একখানি ভাঙা চেয়ার ছিল ঘরে, সতীশবাবু তাড়াতাড়ি চেয়ারখানি বের করে দিলেন। কবি বসলেন।

সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—হুজুর, এই রাতে এতখানি পথ হেঁটে এলেন, এমন জরুরী কি দরকার হলো?

কবি কোন জবাব দিলেন না, সতীশবাবুর প্রশ্ন তিনি শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হলো না। আকাশের পানে, সামনে দীঘির পানে, দূরে স্তিমিত অন্ধকারের পানে উদাস চোখে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর সহসা হেসে উঠলেন, মুখ ফিরিয়ে বললেন—সতীশ, কি আশ্চর্য, আমি তোমাদের যে কি কথা বলতে এলুম তাই মনে করতে পারছি না, কথাগুলি সব ভুল হয়ে গেল, এ কি হলো? আচ্ছা, আমি এখন উঠি, তোমরা সবাই শোও গে। দেখ তো, আমার কি ভুল, এই নিশুতি রাতে মিছামিছি তোমাদের সবার ঘুম ভাঙিয়ে কী কাণ্ড করলুম আমি!

কবি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সতীশবাবু বললেন—আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কবি হেসে বললেন—কেন মিছামিছি কষ্ট করবে, আমি একাই যেতে পারবো। তোমরা সবাই শোও গে। আচ্ছা, দক্ষিণা চল, তোমার রাত জাগা অভ্যাস আছে, তুমি তো রাত জেগে যাত্রা-গান গাও।

দক্ষিণাবাবু সঙ্গে গেলেন।

সারা পথে কবি আর কোন কথা বললেন না। নীরবে দু'জনে যখন বোটে এসে পৌঁছলেন কাছারির ঘড়িতে তখন রাত তিনটে বাজালো।

[—পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ

"তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া: যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানি, এই গভীর বেদনাটুকু যারা রইল এবং যে গেল উভয়েই ভুলে যাবে,...বেদনাটুকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী, কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্য, বিস্মৃতি সত্যি নয়। এক-একটি বিচ্ছেদ এবং এক একটা মৃত্যুর সময় মানুষ সহসা জানতে পারে এই ব্যথাটা কী ভয়ংকর সত্য।" [—ছিন্নপত্র ৭২

মনের এই অবস্থায় কবি রাজনীতি থেকে সরে এলেন। তাছাড়া রাজনীতিক দলাদলি তাঁর ভাল লাগতো না। তবুও একদিন সুরেন্দ্রনাথের জামাতা যোগেশ চৌধুরী এলেন শিলাইদহে, বললেন—বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনী বসবে পাবনায়, কবিকে সভাপতিত্ব করতে হবে।

কবিকে যেতে হলো, কবি সেখানে বাংলায় ভাষণ দিলেন, তিনি বললেন গ্রাম সংগঠনের কথা।—"কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কার্যের ভার এবং মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীটিকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারেন, তবেই স্বায়ত্ত সম্মেলনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজেদের পাঠশালা, শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে। সেখানে কার্য ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিশের দ্বারা বিবাদ ও মামলা মিটাইবে।...আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই, তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।...তোমরা যে পার এবং যেখানে পার একটি গ্রামের ভার

গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও।...এই কার্যে খ্যাতির আশা করিবে না; এমন কি গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা, অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোন উত্তেজনা নাই, কোন বিরোধ নাই, কোন ঘোষণা নাই; কেবল ধৈর্য ও প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এইটুকুমাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী, তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।" [—জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু নীরব কর্ম অনেকের কাছেই প্রিয় নয়, কবির কথা তাঁদের ভালো লাগলো না।

সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে সংঘাত বেধে গেল, নিরপেক্ষভাবে কবি তার সমালোচনা করলেন—"মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয়দলই কংগ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্তভাবে মনে না করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকিতেন—দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্নের অভাবমোচন করিবার জন্য যদি ইহারা নিজের শক্তিকে নানাপথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন, দেশের সত্যকার সাধনা ও সত্যকার সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি পাইতেন এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে, দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কংগ্রেস-সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না।"

[—রবীন্দ্র-জীবনী

এই দলাদলির পরিণতি কি হতে পারে, কবি স্পষ্ট কথায় তাও ব্যক্ত করলেন—"দুইপক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘায়ের উপর দুইদলে মিলিয়াই নূনের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা করিবে না,—আত্মীয়কে পর করিয়া তুলিবার যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবে। কিছুদিন হইতে গবর্মেণ্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে—এখন আর সিডিশনের সময় নাই—যেটুকু উত্তাপ এতদিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজেদের ঘরে আগুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে।...এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিন পক্ষ দাঁড়াইয়াছে—চরমপন্থী, মধ্যমপন্থী, এবং মুসলমান—চতুর্থ পক্ষটি গবর্মেণ্টের

প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচ্‌কি হাসিতেছে।...আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্ম আর কারো প্রয়োজন হইবে না—মর্লিও নয়, কিচেনারও নয়, আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।" [—রবীন্দ্র জীবনী

মজঃফরপুরে বোমা ফাটলো, প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেন, ক্ষুদিরাম বসু ধরা পড়লেন। মানিকতলার বাগান-বাড়ীতে বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হলো। এই হিংসা নীতিকে কবি স্বীকার করে নিতে পারলেন না, বললেন—"একটি কথা আমরা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচার বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়।...দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্‌খানে ঠেকাব?...দেশহিতৈষীর ভয়ংকর হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে দুঃখকর সমস্যা হইয়া পড়িবে।...ধর্মহীন ব্যাপারে প্রণালীর ঐক্য থাকে না, প্রয়োজনের গুরু-লঘুতা বিচার চলিয়া যায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সুসংগতি স্থান পায় না, একটা উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে।...ধর্মের পথ দুর্গম। এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, ইহার পাথেয় সংগ্রহ করিতেই আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে, ইহার সফলতা অন্যকে পরাস্ত করিয়া নহে, নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া।" [—রবীন্দ্র জীবনী

কবি দেশের যুবকদের সত্যপথের নির্দেশ দিলেন—"দেশের যে সকল যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি একটিমাত্র পরামর্শ এই আছে—সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেল, স্থির হও, কোনো কথা বলিও না, অহরহ অত্যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্বল করিও না। আর কিছু না পার খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া, যাহাকে কেহ কোনদিক ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আলো দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে—সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে; সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন

করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও, তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধ সংস্কার হইতে রক্ষা কর।" [—জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু উত্তেজনা যখন প্রবল, শক্তি সংগঠনের কাজ তখন আমল পায় না।

কবি নিজের আদর্শ কার্যে পরিণত করার জন্য নিজেই নামলেন দেশের কাজে।—

"আমাদের পল্লীর ভিতর সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করে এমন সুগভীর নিরুদ্যম যে, সে দেখলে স্বরাজ স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কথাকে পরিহাস বলে মনে হয়—ও-সকল কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ হয়।…আমি গ্রামে গ্রামে যথার্থ স্বরাজ স্থাপন করতে চাই—সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত ঠিক তারই ছোটো প্রতিকৃতি।" [—রবীন্দ্র জীবনী

কবি জমিদারীর একটি পরগণায় কাজ সুরু করে দিলেন।

পরগণাকে পাঁচটি মণ্ডলে ভাগ করলেন। প্রত্যেক মণ্ডলে এক একজন করে অধ্যক্ষ বসালেন। অধ্যক্ষ পল্লীসমাজ স্থাপন করলেন। সমাজের কাজ হলো—পথঘাট সংস্কার করা, জঙ্গল সাফ করা, জল কষ্ট দূর করা, ঝগড়া-বিবাদের নিষ্পত্তি করা, বিদ্যালয় স্থাপন করা, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা স্থাপন করা ইত্যাদি।

রথীন্দ্রনাথকে কবি পাঠিয়েছিলেন আমেরিকায়। সেখানে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনবছর রথীন্দ্রনাথ কৃষি ও গোপালন সম্পর্কে পড়াশুনা করেন। বি-এস্ (ব্যাচিলর অফ্ সায়েন্স) ডিগ্রি নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন।

কবি পুত্রকে নিয়ে এলেন শিলাইদহে।

রথীন্দ্রনাথের বয়স তখন একুশ বছর মাত্র।

কবির কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হলো শিলাইদহে। কুঠীবাড়ী ভাঙ্চুর করে কিছু কিছু অদল-বদল করা হলো। কয়েক হাজার টাকা খরচ করে কবি সেখানে কৃষি-গবেষণার জন্য ল্যাবরেটারী করলেন। একটি লাইব্রেরীও করা হলো। গ্রাম সংগঠনের কাজ পূর্ণোদ্যমে সুরু হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মাঘোৎবের দিনে রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়ে গেল।

এই বিবাহের ছোট একটু ইতিহাস আছে। বেলার সমবয়সী তিনটি মেয়ে এসে পড়েছিলেন কবির আশ্রয়ে শান্তিনিকেতনে—প্রতিমা, ছায়া ও লাবণ্যলেখা।

রেণুকা মারা যাবার বছর পাঁচেক পরে কবি নিজেই উদ্যোগী হয়ে মেজো জামাই সতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের আবার বিয়ে দেন পাথুরিয়াঘাটার সতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যা ছায়ার সঙ্গে। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ, কয়েকমাসের মধ্যে কয়েকদিন মাত্র জ্বরে ভুগে সতীন্দ্রনাথ মারা গেলেন।

প্রতিমা ও লাবণ্যলেখা, দু'জনেই অল্পবয়সে বিধবা হয়ে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। প্রতিমা দেবী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোন বিনয়িনী দেবীর কন্যা। এঁদের ভবিষ্যৎ কি হবে তাই নিয়ে কবির বিশেষ চিন্তা ছিল, একদিন কথায় কথায় এঁদের সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে কবি বলেন—আমি রথীর বিয়ে দোব হয় অসবর্ণে, নাহয় বিধবার সঙ্গে।

কবি রথীন্দ্রনাথের বিবাহ দেন প্রতিমা দেবীর সঙ্গে।

লাবণ্যলেখার বিবাহ হয় অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে। কবি নিজে কন্যা সম্প্রদান করেন।

নতুন সমাজগঠনের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ছিল কবির মনে, আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে তাই তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না।

ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে আরো কয়েকটি মেয়ে এসে পড়লো। কবি মেয়েদের শিক্ষার জন্য শ্রীভবন বিদ্যালয়ের পত্তন করলেন।

মেয়েদের দেখাশুনা করার ভার নিলেন প্রথমে অজিত চক্রবর্তীর মা সুশীলা দেবী, তারপরে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মা গিরিবালা দেবী। কাজকর্ম চলতে লাগলো ক্রমোন্নতির পথে।

কিন্তু আর্থিক অসংগতি বাড়তে লাগলো।

দু'বছরের মধ্যে এমন অবস্থা হলো যে কবি আর চালাতে পারলেন না, বিভাগটি তুলে দিতে বাধ্য হলেন।

কবি এবার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন শান্তিনিকেতনে।

বিদ্যালয় জমে উঠলো, ছাত্র সংখ্যা বাড়লো, উৎসাহী কর্মীও এসে জুটলো।

কবি শান্তিনিকেতনের শিক্ষাধারাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করলেন—শিশু, আদ্য ও মধ্য। প্রত্যেক পর্যায়ের কর্তা হলেন এক একজন অধ্যক্ষ, সবার উপর কর্তা হলেন সর্বাধ্যক্ষ। গতানুগতিক শিক্ষাধারায় সেখানে পড়ানো হতো না। পড়ানোর রীতি ছিল বর্গপ্রথায়। সব ছেলে সব বিষয় এক বর্গেই পড়বে এমন কোন কথা নয়। কোন ছেলে বাংলায় ভালো, সে বাংলা পড়ে এক বর্গে,

আবার ইংরাজিতে কাঁচা বলে ইংরাজি পড়ে অন্য বর্গে। ছেলেদের জেলখানার মতো ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হতো না, তপোবনের আদর্শে গাছতলায়, উন্মুক্ত আকাশের নীচে, সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে ক্লাশ বসতো। ইংরাজি সাহিত্য পড়াতেন অজিত চক্রবর্তী, সংস্কৃত পড়াতেন বিধুশেখর শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন সেন এবং বিজ্ঞানের রীতিমত পরীক্ষা দেখিয়ে পড়াতেন জগদানন্দ রায়। অনেক সময় রাত্রে বিরাট এক দূরবীণ নিয়ে জগদানন্দবাবু ছেলেদের আকাশের তারা দেখাতেন, নক্ষত্র চেনাতেন। সন্ধ্যার পর অধ্যাপকেরা ছাত্রদের কাছে সাহিত্যের গল্প বলতেন। প্রতি মঙ্গলবার সাহিত্য-সভা বসতো, সেই সভায় ছাত্রেরা নিজেদের লেখা পড়তো। প্রতি বুধবার ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হতো, ওজন নেওয়া হতো। পরপর দু'সপ্তাহ কারও ওজন কমলে, তার তদারক করা হতো। সকালে স্নান ও ব্যায়াম এবং বিকালে খেলাধূলা প্রত্যেক ছাত্রেরাই আবশ্যিক ছিল। ছাত্রদের পালা করে বাগানের কাজও করতে হতো।

কবির শিক্ষার আদর্শ ছিল গতানুগতিক থেকে একেবারে ভিন্ন। এই শিক্ষাধারা সম্পর্কে কবি বললেন—'বোলপুর বিদ্যালয়ে ভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে অভদ্র এবং অভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে ভদ্র করে উভয় শ্রেণীর বিচ্ছেদ দূর করবার চেষ্টা করছি।'

কবি শান্তিনিকেতনকে আরো বড় করতে চাইলেন। ভাবলেন একটা কলেজ করবেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক। কবি তাঁর সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করলেন। কিন্তু কলেজ করতে হলে যে টাকা খরচ হবে বলে শুনলেন, সে টাকা খরচ করার মত সামর্থ্য তখন কবির ছিল না। বিদ্যালয়ের আয় ছিল তখন অতি সামান্য—ছাত্রদের বেতন, ত্রিপুরার মহারাজার দান বার্ষিক হাজার টাকা, আর শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের টাকা। এই টাকাতে বিদ্যালয়েরই খরচ সংকুলান হতো না,—কবিকে মাঝে মাঝে ঋণ করতে হতো, বইয়ের কপি-রাইট বেচতে হতো। এই সময়কার অবস্থা সম্পর্কে কবি এক চিঠিতে লেখেন—'পাঁচ-ছয় দিন হইল বিশেষ চেষ্টায় বিদ্যালয়ের জন্য তিন হাজার টাকা শতকরা বারো টাকা সুদে ধার লইয়াছি। কি উপায়ে শোধ করিতে হইবে এখন হইতে তাহা চিন্তার বিষয়।'

কবি একবার কথায় কথায় বলেছিলেন—"কী দুঃখের সে সব দিন গেছে, যখন ছোট বৌর (মৃণালিনী দেবীর) গহনা পর্যন্ত নিতে হয়েছে। চারিদিকে ঋণ বেড়ে চলেছে, ঘর থেকে খাইয়ে পরিয়ে ছেলে যোগাড় করেছি, কেউ ছেলে তো দেবেই না, গাড়ি ভাড়া করে অন্যকে বারণ করে আসবে। এই রকম সাহায্যই স্বদেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছি। আর তখন চলেছে একটির পর একটি মৃত্যু-শোক, সে দুঃখের ইতিহাস সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। লোকে জানে উনি শৌখীন বড়লোক। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হয়েছিলুম, আমার সংসারে কিছুমাত্র বাবুয়ানা ছিল না। ছোট বৌকেও অনেক ভার সইতে হয়েছে, জানি সেকথা তিনি মনে করতেন না। কিন্তু এত বাধা যদি দেশের লোকের কাছ থেকে না পেতুম তাহলে শুধু অর্থাভাবে এত কষ্ট পেতে হত না। সাহায্য পাইনি সে সামান্য কথা, কিন্তু কী বাধা।" [—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

দেশবাসীর কাছ থেকে তেমন ভাবে সাড়া পাননি সত্য, দেশবাসীর দৃষ্টি তাঁর মত সুদূর প্রসারী ছিল না। কিন্তু গবর্মেণ্টের কাছ থেকে কবি পেলেন আঘাত। কবির রাজনৈতিক মত ও পথ গবর্মেণ্ট ভাল চোখে দেখতো না, তার উপর এই মানুষ-গড়ার শিক্ষাধারা বিদেশী সরকার সইবে কেমন করে? সরকারী কর্তারা একখানি ইস্তাহার পাঠিয়ে দিলেন গোপনে সরকারী কর্মচারীদের কাছে। জানিয়ে দিলেন—শান্তিনিকেতন সরকারী কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার একান্ত অনুপযোগী। উপরওয়ালার ইস্তাহার অধস্তনদের কাছে হুকুম-নামা। সরকারী কর্মচারীরা ছেলেমেয়েদের ছাড়িয়ে নেবার জন্য তৎপর হলেন। দলে দলে ছাত্র বিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেল। চোখের জলে তারা বিদায় নিল। সেই সজল কিশোর চোখগুলির পানে তাকিয়ে কবির দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে উঠলো। কিন্তু কবি নিরুপায়।

ক'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছিলেন মার্কিন আইনজীবী মেরিয়ান ফেল্‌প্‌স্‌। তিনি কখনও দেখেননি যে, বিদ্যালয় ছেড়ে যাবার সময় ছাত্ররা চোখের জল ফেলে। বিস্মিত হলেন, বললেন—ছাত্ররা বিদ্যালয়কে এমন আপন করে দেখে তা কখনও কোথাও দেখিনি।

কিন্তু এই চোখের জল সম্বল করে, শুধু স্নেহ প্রীতির পাথেয় নিয়ে তো বিদ্যালয় চলে না, টাকা চাই। টাকা নেই, দেশবাসীর সহানুভূতিও দুর্লভ। কবি বিদেশ থেকে কিছু টাকা তোলার কথা ভাবতে লাগলেন। শান্তি-নিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে শুয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে কবি

হ্রত কি ভাবতেন, যেন শুনতে পেতেন বাইরের জগৎ, সমস্ত পৃথিবীর নদনদী-গিরিপর্বত তাঁকে ডাকছে, বলছে—বেরিয়ে পড়, পথে বেরিয়ে পড়!

কথা উঠলো, রথীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক তিন-চার মাসের জন্ম বিলাত যাচ্ছেন, কবিও যাবেন তাঁদের সঙ্গে।

কবির কিন্তু শেষ অবধি যাওয়া হলো না, রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী চলে গেলেন।

পাঁচ-ছ'মাস পরে কবি আবার যাবার উদ্যোগ করলেন। টিকিট কেনা হয়ে গেল, বাক্স্-পেঁটরা সব জাহাজে এসে উঠলো। কবি বাড়ী থেকে বেরুবার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় সহসা মাথাটা ঘুরে গেল, পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে সামলে নিলেন। তখনই ডাক্তার ডাকা হলো, ডাক্তার বললেন—এখন শরীরের যা অবস্থা তাতে বাইরে যাওয়া চলে না।

কবির আর যাওয়া হলো না।

জাহাজঘাটায় যারা কবিকে বিদায় জানাবার জন্ম ফুল ও মালা নিয়ে অপেক্ষা করছিল, তারা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। কবি চলে গেলেন শিলাইদহে।

কবি কিন্তু বিদেশ যাবেন বলে সব স্থির করে ফেলেছিলেন, দু'মাসের মধ্যেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

কবি লণ্ডনে এসে পৌছলেন ১৯১২ সালের ১৬ই জুন।

এবারকার লণ্ডন আর আগের মত নয়। এবার নতুন উপসর্গ জুটেছে,—মোটরগাড়ী, বাস, লরী। আগের চেয়ে মানুষের ব্যস্ততা বেড়ে গেছে অনেক বেশী।—'দ্রুত দেখা, দ্রুত শোনা, ও দ্রুত চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবার শক্তি কেবলি বাড়িয়া উঠিতেছে। দেখিতে, শুনিতে ও ভাবিতে যাহার সময় লাগে সে-ই এখানে হটিয়া যাইবে।'

কবি দেখা করলেন শিল্পী রদেনস্টাইনের সঙ্গে।

রদেনস্টাইনের সঙ্গে কবির দু'বছর আগে আলাপ হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের বাড়ীতে। রদেনস্টাইন তখন এসেছিলেন ভারত ভ্রমণে।

প্রথম দর্শনেই কবির ব্যক্তিত্ব রদেনস্টাইনকে মুগ্ধ করে। ধুতি চাদর পরা দীর্ঘ সুঠাম সুদর্শন কবি শিল্পীর সৌন্দর্য-বোধ সজাগ করে তোলে, শিল্পী বললেন—আমি আপনার একখানি ছবি আঁকবো।

শিল্পী কাগজ পেনসিল নিয়ে বসে যান কবির ছবি আঁকতে।

তারপর মডার্ণ-রিভিয়ু পত্রিকায় কবির 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়, রদেনস্টাইন বিলাতে বসে তা পড়েন। গল্পটি তাঁর ভালো লাগে। সে কথা তিনি চিঠি লিখে জানালেন অবনীন্দ্রনাথকে।

সেই চিঠির উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ কবির কয়েকটি কবিতার ইংরাজি অনুবাদ পাঠিয়ে দেন বিলাতে। সেগুলি পড়ে শিল্পীর ভাল লাগে। সে কথা তিনি বলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ তখন বিলাতে গিয়েছিলেন রোমের আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ব সম্মেলনে। সে কথা ব্রজেন্দ্রনাথ চিঠিতে জানিয়েছিলেন কবিকে।

কবি তাই বিলাতে আসার আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিলেন, বিলাতের বন্ধুদের শোনাবার জন্য নিজের আরও কবিতার ইংরাজি তর্জমা করেছিলেন। বিলাতে এসে কবি সেই খাতাখানি দিলেন রদেনস্টাইনের হাতে।

শিল্পী খাতাখানি আগাগোড়া পড়লেন। মুগ্ধ হলেন। এমন লেখা তিনি কখনও পড়েন নি, একা পড়ে তাই তাঁর তৃপ্তি হলো না, খাতাখানির কয়েকটি নকল টাইপ করালেন, তারপর এক এক কপি পাঠিয়ে দিলেন মনীষী বন্ধুদের কাছে।

কবি ইয়েট্স্ রদেনস্টাইনকে জানালেন—কবিতার খাতাখানি আমি সঙ্গে সঙ্গে রাখি। ট্রেনে, বাসে, রেষ্টুরেণ্টে কবিতাগুলি আমি বারবার পড়েছি। পড়তে পড়তে বিচলিত হয়ে পড়েছি, অন্য লোকে আমার মুখের পানে তাকিয়ে কি মনে করবে ভেবে খাতাখানি মাঝে মাঝে বন্ধ করে রাখি।

ষ্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক লিখলেন—কবিতাগুলি আমাকে আনন্দ দিয়েছে, সৌন্দর্যের উপলব্ধি জাগিয়েছে।

ব্রাডলি লিখলেন—কবিতাগুলি পড়ে বুঝলাম, আমাদের মধ্যে আবার একজন মহাকবির আবির্ভাব হয়েছে।

রদেনস্টাইন নিজের গৃহে একদিন সাহিত্য-সম্মেলন ডাকলেন। সেই সম্মেলনে এলেন যত নামকরা লোক—আইরিশ কবি ইয়েট্স্, ইংরাজ কবি মেন্স্‌ফীল্ড, আর্ণেষ্ট রীস, মেসিন্‌ক্লেয়ার, এভেলীন আণ্ডারহিল্, রবার্ট টেভেলিন, ফক্স্ স্ট্রাংওয়েজ, এজরা পাউণ্ড, এলিস মেনেল, হেনরি নেভিনসন এবং রেভারেণ্ড চার্লস. এফ্. এণ্ড্রুজ। রদেনস্টাইন সকলকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দিলেন এই সভায়। ইয়েট্স্ নিজেই পড়লেন রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা—গীতাঞ্জলির কবিতা।

রবীন্দ্রনাথ খুব সংকোচ বোধ করছিলেন—কে কি বলবে!

সবাই চুপ করে শুনলেন। কারও মুখে কোন কথা নেই। কোন সমালোচনা হলো না। কোন প্রশংসার কথাও কেউ বললেন না, চুপচাপ সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কবি ভাবলেন, ইংরাজি তর্জমা বোধ হয় ঠিক হয় নি, মনে মনে বোধ হয় ওঁরা হাসলেন। সবার শেষে মাথা হেঁট করে তিনি বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু পরদিন থেকে আসতে লাগলো চিঠি—চিঠির স্রোত। প্রত্যেকের কাছ থেকে এক একখানি প্রশংসা-উচ্ছ্বসিত চিঠি। কবি এতো চিঠি—এমন চিঠি প্রত্যাশা করেন নি, কল্পনাও করেননি।

কবি এবার বিলাতের মনীষী মহলে পরিচিত হলেন।

ক'দিন পরেই বিলাতের ইণ্ডিয়া সোসাইটি কবিকে সম্বর্ধনা জানালো ট্রোকাডেরো হোটেলে।

সভাপতি হলেন উইলিয়ম বাটলার ইয়েট্স্। কবির পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি প্রথমেই বললেন—একজন শিল্পীর জীবনে সেই দিনটিই বিশেষ স্মরণীয় যেদিন তিনি এমন কোন প্রতিভাকে আবিষ্কার করেন যাঁর কথা তিনি আগে জানতেন না। আমার জীবনে কবি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তেমনি এক স্মরণীয় ঘটনা। এঁর একশোটি গীতি-কবিতার একখানি খাতা আমার সঙ্গে আছে, এগুলি তাঁর বাংলা কবিতার ইংরাজি অনুবাদ। আমাদের সমকালীন এমন কোন কবি নেই যাঁর লেখার সঙ্গে এই কবিতাগুলির তুলনা হতে পারে।

এই সভায় ইয়েট্স্ রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতার ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ বিলাতের সুধীসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।

কবির 'দালিয়া' অভিনীত হলো রয়েল এলবার্ট হল্ থিয়েটারে। এটি একটি গল্প, নাট্যরূপ দিয়েছিলেন কেদারনাথ দাসগুপ্ত। এই নাটকটির জন্য কবি একটি মৌলিক ইংরাজি কবিতা লিখে দিলেন—

"The bee is to come and the bee is to hum
till the heart of the flower comes out.

The bud says 'yea' and the bud says 'nay',
She sways with a fear and a doubt !...." [—রবীন্দ্র জীবনী

এইটিই কবির একমাত্র ইংরাজি কবিতা রচনা।

কবির 'রাজা'র ইংরাজি অনুবাদ করলেন ক্ষিতীশচন্দ্র সেন নামে ক্যামব্রিজের এক ছাত্র। কবি নিজে অনুবাদ করলেন চিত্রাঙ্গদা, মালিনী ও ডাকঘর।

নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলির ১০৩টি কবিতার ইংরাজি অনুবাদ Song-Offerings নামে প্রকাশিত হলো। বিলাতের ইণ্ডিয়া সোসাইটি বইখানি প্রকাশ করলেন। বইখানির ভূমিকা লিখে দিলেন কবি ইয়েট্স্।

বইখানি নিয়ে বিলাতে সাড়া পড়ে গেল। টাইম্স্ লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট-এ বইখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো। কবি রদেনস্টাইনকে জানালেন—আমার এই সাফল্য আপনারই সাফল্য। আমি জানি আমার এই প্রশংসা আপনাকে সমধিক আনন্দ দেবে।

কবি গেলেন আমেরিকায়।

ছোট সহর আর্বানা। সেখানে কবি চুপচাপ বাস করছিলেন। কিন্তু আর্বানার লোকেরা কবিকে একদিন আবিষ্কার করলো, ইউনিটি ক্লাবের সদস্যরা এসে ধরে বসলো,—কবিকে কিছু বলতে হবে।

কবি প্রথমে রাজী হলেন না, কবির ধারণা ছিল ইংরাজি ভাষায় তাঁর তেমন দখল নেই, কিছু বলতে হলে সম্মান বজায় রাখতে পারবেন না। কিন্তু ক্লাবের সদস্যরা তাঁকে ছাড়লো না। শেষ অবধি কবি একটা প্রবন্ধ লিখলেন সভায় পড়বেন বলে।

কবি জানতেন ক্লাবের সভ্যসংখ্যা সামান্য কিন্তু গিয়ে দেখেন হল-ঘর লোকে ভরে গেছে, কবি নিজেকে বিপন্ন বোধ করলেন। কোনমতে প্রবন্ধটি তো পাঠ করলেন। কিন্তু পড়া শেষ হতেই সবাই বললো—চমৎকার, যেমন ভাষা তেমনি কণ্ঠ।

কবি এবার সাহস পেলেন।

ক'দিন পরে ক্লাবের সদস্যরা আবার এলো। এবার আর কবির সংকোচ নেই, কবি আবার একটি প্রবন্ধ পড়লেন তাদের সভায়। সেটিও প্রশংসা পেল।

পরপর আরো তিনটি প্রবন্ধ কবিকে পড়তে হলো সেই ক্লাবে।

আমেরিকানদের বক্তৃতা শোনার সখ বড় বেশী। তারপর থেকে কেবলই বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আসতে লাগলো কবির কাছে।—শিকাগো, রচেস্টার, হার্ভার্ড।

বক্তৃতা দিয়ে কবির ভয় একেবারে ভেঙে গেল। আত্মবিশ্বাস এলো—তিনি ভালো বক্তৃতা করতে পারেন। পরপর বক্তৃতা দিলেন রচেস্টারে, তারপর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। একটির পর একটি বক্তৃতা চললো।

রচেস্টারের বক্তৃতাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে তখন বিশ্বের নানা-দেশের মনীষীরা সম্মেলিত হয়েছিলেন, কবি তাঁদের সভায় 'জাতিবিরোধ' নামে এক প্রবন্ধ পড়লেন। তাতে তিনি মানুষের সংস্কৃতির বিশ্বজনীন ভিত্তির কথা বললেন—"রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে বা ব্যাপকতর বাণিজ্যের আয়োজনে কিংবা সামাজিক কোনো যন্ত্রবদ্ধ নূতন ব্যবস্থায় মানুষের মুক্তি নাই। জীবনের গভীরতর রূপান্তর সাধনে, চৈতন্যকে সব বাধা হইতে প্রেমের মধ্যে মুক্তি দানে এবং নরের মধ্যে নারায়ণের সম্পূর্ণ উপলব্ধিতেই মানুষের যথার্থ মুক্তি।"

[—রবীন্দ্র জীবনী

কবি অর্শে কষ্ট পাচ্ছিলেন। আমেরিকায় কিছুদিন তিনি চিকিৎসা করালেন, কিন্তু বিশেষ কোন উপকার পেলেন না। ডাক্তার বললেন—অপারেশন করাতে হবে।

কবি অস্ত্র-চিকিৎসা করাতে রাজী হলেন না।

আমেরিকা থেকে কবি এলেন বিলাতে। বিলাতের ডাক্তাররাও ওই একই কথা বললেন—অপারেশন করিয়ে নেওয়াই ভাল।

কবি নার্সিং-হোমে ভর্তি হলেন। রদেনস্টাইন চিকিৎসক ঠিক করে দিলেন। বিলাতের সর্বশ্রেষ্ঠ শল্য-চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথের নাম শুনে, নামমাত্র ফী নিয়ে অপারেশন করলেন।

প্রথম কয়েকটি দিন খুব কষ্ট হলো, তারপর কবি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। বিছানায় শুয়ে শুয়েই কবি বই পড়তেন, কিছু কিছু লিখতেনও। তবে এই কয়েকদিন কবি বাইরের লোকদের উৎপাত থেকে স্বস্তি পেয়েছিলেন।

একমাস পরে নার্সিং-হোম থেকে বেরিয়ে কবি বললেন—'নিতান্ত মন্দ ছিলুম না। লোকজনের নিয়ত উৎপাত থেকে ঐ ক'টা দিন রক্ষা পেয়ে বিশ্রাম করতে পেয়েছিলুম।'

ইতিমধ্যে গীতাঞ্জলির সমালোচনা বেরিয়েছে সব কাগজে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বইখানির বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

এজরা পাউণ্ড লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনা।

শ্রীমতী মে সিনক্লেয়ার লিখেছেন—সুইনবার্ণের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা মধুর, শেলীর চেয়েও রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা গভীর। ইউরোপের কোন কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনাই হয় না।

জার্মান দার্শনিক অয়কেন বললেন—আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্র-কাব্যের তুলনা নেই।

কবি সম্পর্কে বিলাতে সাড়া পড়ে গেল।

গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে গেল। ম্যাকমিলান কোম্পানী ছাপলেন দ্বিতীয় সংস্করণ।

কবি এবার ভারতে ফেরার উদ্যোগ করলেন।

যাবার দিনে সাংবাদিকেরা এসে ভীড় করলো জাহাজ-ঘাটায়। কবির হাতে ছিল একখানি 'বেংগলি' কাগজ। তাতে বর্ধমানে প্রবল বন্যার খবর বেরিয়েছিল। কবি সাংবাদিকদের দেখিয়ে বললেন—এতো বড় খবরটা বিলাতের কোন কাগজে বেরোয়নি। বিলাতের কোন সংবাদপত্র ভারতের কোন সংবাদ ঠিকমত পরিবেশন করে না।

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জেন কবির এই অভিমত সম্পর্কে মন্তব্য করলেন—যে দেশের মানুষের জন্য কবি বাংলা ছন্দে কাব্য রচনা করেন, সেই দেশের মানুষের উপর যদি আমাদের দরদ না থাকে তাহলে কবির কাব্য পাঠের অধিকার আমাদের নেই।

কবি এলেন কলিকাতায়। কিন্তু জোড়াসাঁকোয় তিনি টিঁকতে পারলেন না। একদিকে অভিজাত সমাজের আদর-আপ্যায়ন, আরেক দিকে বিরোধী সাহিত্যিকদের সমালোচনা, তার উপর ছিল পারিবারিক অশান্তি। এতো উপদ্রব সইবার মত শরীর তখন নয়, দু'দিন কলিকাতায় থেকেই কবি চলে গেলেন বোলপুরে।

কবি শান্তিনিকেতনের জন্যই টাকা তুলতে গিয়েছিলেন বিলাতে, কিন্তু তিনি ফিরে এলেন খালি হাতে। বিলাতে গিয়ে তিনি হাত পাততে পারলেন না।

বললেন 'দশজনের কাছে প্রচার করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ানো আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। নিজের দেশের কাজের জন্য এদেশের লোকের মুখাপেক্ষী হইতে এত লজ্জা বোধ হয় যে আমি মুখ ফুটিয়া স্পষ্ট করিয়া অভাব জানাইতে পারি না। আমি যদি আরেকটু মুখর ও প্রখর হইতে পারিতাম তবে এখান হইতে সকল অভাব মোচন করিয়া ফিরিতে পারিতাম। কিন্তু আমার দ্বারা সে বোধ হয় ঘটিয়া উঠিবে না।'

এদিকে শান্তিনিকেতনের অবস্থা অর্থাভাবে চরমে গিয়ে উঠেছিল। বাজারে দেনা হয়েছিল আঠারো শো টাকা। খাদ্যদ্রব্য পর্যন্ত ধার পাওয়া মুস্কিল হয়ে পড়েছিল। কবি বিলাতে বসে চিঠিতে যখন সেই খবর পেলেন, তখন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। ম্যাকমিলান কোম্পানী থেকে গীতাঞ্জলির রয়্যালটির টাকা নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আট সপ্তাহে ক্যাক্স্টন হলে আটটি বক্তৃতার ফী বাবদ যা পেলেন, তা-ও পাঠিয়ে দিলেন শান্তিনিকেতনে। সব সুদ্ধ নব্বই পাউণ্ড এসে পড়লো, তখনকার অর্থসংকট থেকে শান্তিনিকেতন রক্ষা পেল।

কিন্তু কবি যে আশা নিয়ে গিয়েছিলেন, তার কিছুই করে উঠতে পারলেন না।

কবি শান্তিনিকেতনে এসে স্বস্তি পেলেন। মধুর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তাঁর কবি-মন আবার সচেতন হয়ে উঠলো, তিনি ডুবে গেলেন কাব্য রচনায়

দিন যায়। নগরের জন কোলাহল থেকে বহুদূরে, শান্তিনিকেতনের স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে কবির দিন কাটে। বৎসর ঘুরে চলে।

একদিন শীতের বিকালে কবি চলেছেন চৌপাহাড়ি শালবনে বেড়াতে, সঙ্গে আছেন ভ্রাতুষ্পুত্র দিনেন্দ্রনাথ। পথে পিওন এসে একখানি টেলিগ্রাম দিল। কবি টেলিগ্রামটি পড়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। সরকারী টেলিগ্রাম: কবি রবীন্দ্রনাথকে ১৯১৩ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সুইডিস আকাডেমি ১৩ই নভেম্বর এই পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

নোবেল পুরস্কার বিশ্বের সুধী সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। এতদিন এই সম্মান পাশ্চাত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, প্রাচ্যদেশে কবি রবীন্দ্রনাথই হলেন এই সম্মানের প্রথম অধিকারী।

শান্তিনিকেতনে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

চারিদিক থেকে আসতে লাগলো টেলিগ্রাম ও অভিনন্দন।

কবি প্রথমেই চিঠি লিখলেন রদেনস্টাইনকে—'আমি জানি আমার বন্ধুদের মধ্যে এই সংবাদে আপনার মতো তৃপ্ত আর কেহ হইবেন না।...গত কয়েক দিনের টেলিগ্রাম ও পত্রের চাপে আমার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। যেসব লোকের আমার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই, বা যাহারা আমার রচনার একটি ছত্রও পড়ে নাই, তাহারাই তাহাদের আনন্দ জ্ঞাপনে সর্বাপেক্ষা অধিক মুখর। এই সব উচ্ছ্বাস আমাকে যে কি পরিমাণে ক্লান্ত করিয়াছে আমি বলিতে পারি না।' [—রবীন্দ্রজীবনী

কলিকাতায় কবিকে সম্বর্ধনা জানানোর বিশেষ আয়োজন হলো। একখানি স্পেশ্যাল ট্রেণ ছাড়লো শান্তিনিকেতনের জন্য। পাঁচশো বিশিষ্ট নরনারী শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছলেন। আম্রকুঞ্জে এক সভা করে তাঁরা কবিকে জানালেন অভিনন্দন। এই দলে ছিলেন বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, পূরণচাঁদ নাহার, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রেভারেণ্ড মিলবার্ণ, মৌলবী আবদুল কাসেম প্রভৃতি। কবি এই অভিনন্দনকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না, স্পষ্টভাষায় তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—'আজ আপনারা এখানে কেন আসিয়াছেন? যাঁহাদিগকে এতদিন আমি তুষ্ট করিতে পারি নাই,আজ আমি অকস্মাৎ এমন কোন্ শক্তির অধিকারী হইয়াছি যে, তাঁহারা আমার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন? আজ হঠাৎ আপনারা আমাকে এই সম্মান দেখাইতে আসিয়াছেন, আমার নিজস্ব শক্তির প্রতি শ্রদ্ধার বশে নয়, বিদেশী আমার শক্তি স্বীকার করিয়াছে দেখিয়া আপনারা আজ ছুটিয়া আসিয়াছেন। আপনাদের মহানুভবতার জন্য ধন্যবাদ; কিন্তু গিল্‌টি করা পিয়ালায় যে বিদেশী মদ্য আপনারা আমার মুখে তুলিয়া ধরিতে চাহেন, তাহা পান করিবার ইচ্ছা আমার নাই। আমাকে ক্ষমা করিবেন।'

[—রবীন্দ্রনাথ (দে. ব.)

কথাটা বেশী করে বাজলো তাঁদেরকে যাঁরা ইতিপূর্বে কবির প্রতিভাকে স্বীকার করেননি, আর যাঁরা কবির কাব্যের সঙ্গে কোন পরিচয় না রেখেই নোবেল পুরস্কারের নাম শুনেই ভাবে গদগদ হয়ে উঠেছিলেন।

২৩শে ডিসেম্বর সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হোল্‌মে পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান হলো। সুইডেনের রাজা সুইডিস আকাডেমির পক্ষ থেকে পুরস্কার দিলেন।

ভারত সম্রাটের প্রতিনিধি কবির পক্ষ থেকে সেই পুরস্কার গ্রহণ করলেন। কবি সুইডিশ আকাডেমিকে জানালেন তাঁর কৃতজ্ঞতা—'দূরকে নিকট করার, অপরিচিতকে আত্মীয় করার শুভবুদ্ধির যে ব্যাপকতা, সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।'

জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় লাটের বাড়ীতে বসলো এক সভা। সেই সভায় লর্ড কারমাইকেল কবিকে মানপত্র ও পুরস্কার দিলেন।

নোবেল পুরস্কার এক লাখ বিশ হাজার টাকা।

কবি সব টাকাটা জমা দিলেন পাতিসর কৃষি-ব্যাঙ্কে।

অখ্যাত অজ্ঞাত ব্যাঙ্কে এত টাকা রাখা! শুভানুধ্যায়ীরা বললেন—কাজটা কি ঠিক হলো?

কবি বললেন—ঠিকই হয়েছে। গাঁয়ের ব্যাঙ্ক যদি টাকা না পায় তাহলে গাঁয়ের উন্নতির জন্য চাষী কোথায় টাকা পাবে? আমার টাকায় আমার পরিবারের লোকের যেমন দাবী, আমার প্রজাদের দাবী তার চেয়ে কম নয়।

কবি ছিলেন খাঁটি মানুষ, যা বিশ্বাস করতেন তা করতে দ্বিধা করতেন না।

প্রজাদের কবি ভালবাসতেন, তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তিনি অবিরত চেষ্টা করতেন। এক সময় প্রজাদের কাছে প্রায় এক লাখ টাকা খাজনা বাকী পড়ে। কবি দেখলেন প্রজাদের অতো টাকা শোধ দেবার সামর্থ্য নেই, কবি তখন সেই লক্ষ টাকা মাপ করে দিয়েছিলেন। অবশ্য কাজটা সহজ হয়নি, সেজন্য তাঁকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল।

প্রজাদের কল্যাণ করতে গিয়ে কবির অনেক সময় অনেক ক্ষতি সইতে হয়েছে, ঋণের বোঝা বেড়েছে, কিন্তু কবি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। বরাহিমপুরে তিনি সাধারণের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় করেছিলেন, অর্থাভাবে যখন সেটি তুলে দেবার কথা উঠলো, তখন কবি বড় দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন—'এই ডাক্তার এবং ডাক্তারখানায় আমাদের জমিদারীর এবং তারও চতুষ্পার্শ্বের লোকের বিশেষ উপকার হয়েছে এই কথা যখন শুনতে পাই তখন সকল অভাবের দুঃখের উপর এই সুখটাই বড় হয়ে ওঠে। বরাহিমপুরে প্রজাহিতের এই একটিমাত্র কার্য সফল হয়েছে।...আমাদের যা কিছু দেনা হয়েছে তা যদি আমাদের জমিদারীর এই রকম কাজের জন্য হত আমি এক মুহূর্তের জন্যও শোক করতুম না—কেন না এই ঋণ অন্যদিকে এমনভাবে সেটপার্সেন্ট

সুদের উপর শোধ হত যে খাওনোট লিখে আনন্দ করতুম। আমার ত সবচেয়ে দুঃখ হয় এই জন্যে যে প্রজাদের জন্যে লোকসান করার পূর্ণ অধিকার আমার হাতে নেই, তাহলে আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে ওদের মধ্যে গিয়ে বসতুম—মনের সাধে বিষয় নষ্ট করতে করতে সুখে মরতুম।” [—চিঠিপত্র ৫ম

ভালবাসলেই ভালবাসা পাওয়া যায়। সহানুভূতি ও সমবেদনা কখনও ব্যর্থ হয় না। প্রজারা তাদের কবি-জমিদারকে চিনতো, তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। নানা টুকরো টুকরো ঘটনা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার মাঠের মাঝখান দিয়ে কবি চলেছেন পাল্‌কী চড়ে। দুপুর বেলা, প্রচণ্ড রোদ। দু'পাশের ক্ষেতে চাষীরা কাজ করছে। কবি বাহিরের পানে তাকিয়ে আছেন। টুকরো টুকরো কবিতা ভেসে উঠছে মনে, মাঝে মাঝে কবি সেগুলি লিখছেন। মন্থর গতিতে পাল্‌কী চলছে।

এক চাষী মাঠের মাঝে কাজ করছিল। জমিদার বাবুর পাল্‌কী দেখে হৈ হৈ করে ছুটে এলো, বেহারাদের বললো—পাল্‌কী থামা! একটু দাঁড়া।

কবি বললেন—দাঁড়াবো কি রে! আমার গাড়ীর সময় হয়ে যাবে যে?

—একটু দাঁড়ানা বাবু, আমি এখুনি আসছি, যাব আর আসবো।

—দাঁড়া তবে!

বেহারারা পাল্‌কী নামিয়ে রাখলো পথের উপর।

চাষী ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আঁকা-বাঁকা আলের পথ ধরে ছুটলো, অদৃশ্য হয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

কবি পাল্‌কীতে বসে আছেন, তাকিয়ে আছেন সেই চাষীর চলে যাওয়া পথের পানে।

একটু পরেই লোকটিকে আবার দেখা গেল। সেই আলের পথ ধরে সে দৌড়ে আসছে। বরাবর পাল্‌কীর পাশে এসে একটি টাকা কবির পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলো।

কবি বললেন—এ টাকা কি হবে? এর জন্য শুধু শুধু আমাকে দাঁড় করালি?

চাষী বললো—বারেঃ, দোব না? 'আমরা না দিলে তোরা খাবি কি?'

চাষীর মুখে সরল সহজ সত্য কথা। কবি টাকাটি আর ফিরিয়ে দিতে পারলেন না। তুলে নিলেন। সামান্য চাষীর ওই সরল সত্যটি তিনি কোন-দিন ভুলতে পারেন নি—'আমরা না দিলে তোরা খাবি কি?'

"সেই যে ভালো-লাগাটি তার যাক্ সে রেখে গিছে
কীর্তি যা সে গেঁথেছিল, হয় যদি হোক্ মিছে ;
না যদি রয় নাই বা রহিল নাম,
এই মাটিতে রইল তাহার বিস্মিত প্রণাম।" [—সেঁজুতি

এই বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২৬শে ডিসেম্বর এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসব করলো। তাতে দেশবিদেশের চারজন মনীষীকে 'সাহিত্যাচার্য' (ডক্টর অব লিটারেচার) উপাধি দেওয়া হলো : ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভি, জার্মান পণ্ডিত হার্মান যাকোবি, রুশ আইনজ্ঞ পলভিনোগ্রাডোভ ও কবি রবীন্দ্রনাথ।

ওদিকে ইউরোপের কাগজগুলি সুইডিস আকাডেমিকে আক্রমণ সুরু করলো—একজন এসিয়াবাসীকে—একজন ভারতীয়কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো কেন ?

ইংরাজরা বললো—টমাস হার্ডির মত ইংরাজ লেখক থাকতে বৃটিশ ভারতের এক কবিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পুরস্কার দেওয়া হলো কেন ?

ফরাসীরা বললো—আনাতোল ফ্রাঁসের মত ফরাসী ঔপন্যাসিক থাকতে একজন এসিয়াবাসীকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া হলো কেন ?

জার্মানরা বললো—য়ুরোপের সব জাতই রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলবে।

আবার আরেক দিকে জার্মান মনীষী কাউণ্ট কাইসারলিঙ ভারত ভ্রমণে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করে লিখলেন—আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ এমন মনীষী আমি আর দেখিনি।

ভারতীয় সংগীত বিশারদ ফক্স্ স্ট্রাংওয়েজ লর্ড কার্জনের কাছে প্রস্তাব করলেন—অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কবিকে সম্মানসূচক ডিগ্রি দেওয়া হোক্।

কার্জন তার উত্তরে বললেন—ভারতে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শক্তিশালী লেখক অনেক আছেন।

কিন্তু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রাপ্ত কবিকে ইংরাজ জাতি উপেক্ষা করতে পারলো না। ১৯১৫ সালের ৩রা জুন সম্রাট পঞ্চম জর্জের জন্মতিথিতে কবিকে 'নাইটহুড' উপাধি দেওয়া হলো, কবি হলেন—স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এদেশে আর কোন সাহিত্যিক 'স্যার' উপাধি পাননি।

কবি এবার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন শান্তিনিকেতন ও শিলাইদহে—বিদ্যালয় বড় করতে হবে, ভালো করতে হবে, জমিদারীর প্রজাদের কল্যাণ করতে হবে!

বিলাতে থাকার সময় সুরুলে একখানি ভাঙাবাড়ী তিনি আট হাজার টাকায় কিনেছিলেন। সেই বাড়ীর সঙ্গে ছিল এক প্রকাণ্ড বাগান। কবির পরিকল্পনা ছিল সেইখানে রথীন্দ্রনাথের 'বোটানির' ল্যাবরেটরী হবে। কবি বলেন—'রথীকে যে জিনিষ নিয়ে আলোচনা করতে হবে তার জন্য ঐ বাড়ি ও বাগানের দরকার।...এই জন্য আর্থিক দুর্গতি সত্ত্বেও এই বাড়ি কিনতে হলো।'

সেই উদ্দেশ্যেই আমেরিকা পৌঁছেই তিনি রথীন্দ্রনাথকে ইলিনয়ে উদ্ভিদ-বিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা পড়ার জন্য ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল পরে এই বিষয়ে ক্যামব্রিজে পড়া শেষ করে রথীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে শান্তিনিকেতনে রীতি-মত ল্যাবরেটরী খুলে বসবেন।

সুরুলের সেই কুঠীবাড়ী এবার বিশহাজার টাকা খরচ করে বাসোপযোগী করা হলো। ১৯১৪ সালের পয়লা এপ্রিল কবি সেখানে গৃহ-প্রবেশ করলেন।

রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী সুরুলে সংসার পেতে বসলেন, কবিও সেইখানে রইলেন।

সুরুল থেকে প্রতিদিন অপরাহ্নে গরুর গাড়ী চড়ে আসেন শান্তিনিকেতনে। বেণুকুঞ্জে একখানি খড়ের ঘরে থাকেন দিনেন্দ্রনাথ, সেখানে গানের আসর জমে। দিনেন্দ্রনাথকে কবি নিত্য নতুন গান শেখান, গানের সুর দেন। কবি প্রতি-দিন দু-তিন খানি নতুন গান রচনা করেন।

এদিকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টিও বেশ জমে উঠেছে।

কবি বেড়াতে ভালবাসেন, সুবিধা সুযোগ পেলেই তিনি বেরিয়ে পড়েন।

রথীন্দ্রনাথ নৈনিতালের কাছে রামগড়ে এক সাহেবের একখানি বাগানবাড়ী কিনেছিলেন, কবি সেখানে গিয়ে দিনকতক রইলেন। জায়গাটি কবির খুব ভাল লাগে, বলেন—দিব্যি সুখে আছি।

গয়া, এলাহাবাদ, দিল্লী ও আগ্রা ঘুরে কবি যান দার্জিলিঙে। বাংলার লাট-সাহেব লর্ড কারমাইকেল তখন ছিলেন দার্জিলিঙে। কবিকে নিমন্ত্রণ করে তিনি তিব্বতী নাচ দেখালেন। কিন্তু সেখানকার হোটেলে ভক্তের এতো ভীড় দেখা দিল, যে কবি সেখানে টিঁকতে পারলেন না।

আগ্রায় থাকার সময় মডার্ণ-রিভিয়ু পত্রিকায় কবি একটি খবর পড়লেন : পিয়ার্সন ও কালীমোহন পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। সেখানকার পাট-চাষীদের দুঃখ-দুর্দশা তাঁরা চোখে দেখে এসেছেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা তাঁদের মুখ থেকে সেই দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে ব্যথিত হয়েছে। তাদেরকে অর্থ সাহায্য করবে বলে ছাত্রেরা ঠিক করেছে—তাদের প্রতিদিনের খাদ্য থেকে ঘি ও চিনি তারা বাদ দেবে, তা থেকে যে পয়সা বাঁচবে সেই পয়সা তারা পাঠিয়ে দেবে পূর্ববঙ্গে।

কবি বিস্মিত হলেন। এণ্ডরুজ সাহেব ছিলেন শান্তিনিকেতনে, কবি তাঁকে লিখলেন—'যে উপকরণগুলি শরীর গঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা ত্যাগ করিবার স্বাধীনতা তাহাদিগকে দেওয়া যায় না।…এই শ্রেণীর আত্ম-ত্যাগের অর্থ নাই, তাহাদের পক্ষে যথার্থ আত্মত্যাগ হইবে অর্থোপার্জনের জন্য কোনো কঠোর শ্রমসাপেক্ষ কর্মগ্রহণ।…'

কবির এই কথায় শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা মাটি কেটে অর্থ সঞ্চয় করার দিকে সচেষ্ট হলেন। এবং সেই টাকা পাঠালেন পূর্ববঙ্গে।

কবির আদর্শ ছিল শান্তিনিকেতনে মানুষ গড়ার কল্যাণকেন্দ্র গড়ে তোলা। জাতি ও ধর্মের বিচার থাকবে না, মানুষকে শুধু মানুষ বলে গণ্য করা হবে। এই সময় এক মুসলমান ছাত্রকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করা নিয়ে কথা উঠলো। কবি তখন শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বললেন—'এটি একটি আশ্রম। এখানে দল নেই, সম্প্রদায় নেই। সাম্প্রদায়িক বিভেদ বুদ্ধি নিয়ে আমরা সত্যে পৌঁছাতে পারবো না। এখানে যে ধর্মের দীক্ষা আমরা গ্রহণ করবো, সে মানবতার ধর্ম। যে কোন দেশের যে কোন ধর্মের মানুষ এখানে আসতে পারে। আমরা তাকে গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করবো না। সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস আমাদের চিত্তকে যেন সংকীর্ণ না করে।' [—রবীন্দ্রনাথ—সু. দা.

শান্তিনিকেতনের খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করলো, সুরু হলো গুণীজন সমাগম। পার্লামেণ্টের সদস্য র‍্যামসে ম্যাকডোন্যাল্ড সাহেব বেড়াতে এলেন শান্তি-নিকেতনে। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। ছাত্ররা সাঁওতালদের জন্য একটি বিদ্যালয় চালাচ্ছে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। বিলাতে গিয়ে তিনি সে কথা লিখলেন ডেলি ক্রনিকল-এ।

গান্ধিজী এলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর সঙ্গে এলেন কস্তুরবা, এলো ফিনিক্স্ আশ্রমের ছেলেরা আর অধ্যাপকেরা।

কবি বিশেষ কাজে তখন গিয়েছিলেন শিলাইদহে। পাঁচদিন পরে তিনি যখন ফিরলেন, গান্ধিজী তখন চলে গেছেন পুণায়। মহামতি গোখলের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলেন।

ক'দিন পরে গান্ধিজী পুণা থেকে ফিরলেন। ভারতের দুই মহাপুরুষের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হলো। ১৯১৮ সালের ৬ই মার্চ।

শান্তিনিকেতন গান্ধিজীর ভাল লাগলো। শিক্ষক ও ছাত্রদের সারল্য, রুচি ও প্রীতি তাঁকে মুগ্ধ করলো।

এখানে পাচক ও ভৃত্যদের উপর ছাত্র ও শিক্ষকেরা নির্ভর করেন দেখে গান্ধিজী একদিন কবিকে বললেন—শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যদি নিজেরাই নিজেদের রান্না করেন, সব কাজকর্ম করেন তো বেশ হয়, স্বাবলম্বনের শিক্ষাও হয়।

কবি শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। শিক্ষকেরা রাজী হলেন। ১০ই মার্চ আশ্রমের ছাত্রেরা সব কাজের দায় নিজেরাই গ্রহণ করলো।—রান্না করা, জল তোলা, বাসন মাজা, ঝাড়ু দেওয়া, মেথরের কাজ—সব।

অধ্যাপকেরা যোগ দিলেন ছাত্রদের সঙ্গে।

কিন্তু বেশীদিন এইভাবে কাজ চালানো সম্ভব হলো না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে দিয়ে কোন কাজ করানোর পক্ষপাতী কবি ছিলেন না।

কিন্তু সেই থেকে প্রতিবছর ১০ই মার্চ আশ্রমে গান্ধী-দিবস পালন করাই রীতি হয়ে গেল। সেদিন আশ্রমিকেরা নিজেদের কাজ সব নিজেরাই করেন।

এখানেই প্রথম দর্শনে দ্বিজেন্দ্রনাথ গান্ধিজীকে 'মহাত্মা' বলে সম্বোধন করেন, পরে তারই প্রতিধ্বনি ওঠে সারা ভারতে।

গান্ধিজী চলে গেলেন রেংগুনে।

সেখান থেকে ফিরে এসে ফিনিক্স্ ছাত্রদের নিয়ে তিনি হরিদ্বারে চলে গেলেন কুম্ভমেলা দেখতে।

এর পর শান্তিনিকেতন দেখতে এলেন বাংলার লাটসাহেব লর্ড কারমাইকেল।

আম্রকুঞ্জে একটি বেদী তৈরী হলো, সেখানে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হলো। সেই বেদী এখনও আছে—কারমাইকেল বেদী।

আবার কবি বেরিয়ে পড়লেন। গেলেন কাশ্মীরে। সঙ্গে গেলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কিন্তু কাশ্মীরে কবি স্বস্তি পেলেন না।

পনেরো দিনের মধ্যে কবি ফিরে এলেন। বললেন—'কিছুমাত্র ভাল লাগল না—যেখানে যাই কেবলি গোলমাল—লোকজনের উৎপাত…শ্রীনগরে নৌকায় ছিলুম—কিন্তু একটুও শান্তি বা আনন্দ পাইনি বলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলুম।' [—চিঠিপত্র ৪র্থ

এদিকে পল্লীসংস্কারের কাজ চলছে। পাতিসরে পল্লীসমাজ গড়ে তুলেছেন। ছ'শো পল্লী নিয়ে কাজ স্বরু হয়েছে।—

"আমরা যে টাকা দিই ও প্রজারা যে টাকা উঠায় তাহাতে আমাদের ১১০০০৲ টাকার আয় দাঁড়াইয়াছে। এই টাকা ইহারা নিজে কমিটি করিয়া ব্যয় করে। ইহারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে।" [—চিঠিপত্র ৫ম

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সভাপতি হিসাবে কবি জনকল্যাণের কর্মসূচী নির্ধারণ করেছিলেন।—

নিরক্ষরদিগের যৎসামান্য লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখানো।

ছোট ছোট ক্লাশ করে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সেবাশুশ্রূষা সম্বন্ধে শিক্ষাদান।

ম্যালেরিয়া যক্ষ্মা অজীর্ণ উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধের জন্য সমবেত ভাবে চেষ্টা করা।

শিশুমৃত্যু নিবারণের চেষ্টা করা।

গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।

গ্রামে যৌথ ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠা করা।

দুর্ভিক্ষ বন্যা মড়ক প্রভৃতি দুর্যোগে দুঃস্থদিগের সাহায্যদান।

—এই আদর্শ জমিদারীতে কার্যকরী করার জন্য কবি সচেষ্ট হয়েছিলেন।

ঠাকুর-পরিবারের জমিদারীর মধ্যে একটি পরগণা ছিল কালীগ্রাম। প্রকাণ্ড পরগণা, আটটি রেলস্টেশন ছিল এই পরগণায়—আত্রাই, রঘুরামপুর, রাধানগর, সান্তাহার, তিলকপুর, আদমদীঘি, নসরৎপুর ও তালোয়া। এখানে তিনটি কেন্দ্র করলেন—পাতিসর, কামতা ও রাতোয়াল। প্রধান কর্মী হলেন অতুল সেন; উপেন ভদ্র, বিশ্বেশ্বর বসু প্রভৃতি হলেন তাঁর সহকারী। পাঁচটি কার্যসূচী নিয়ে কাজ স্বরু হলো: চিকিৎসা বিধান; প্রাথমিক শিক্ষা;

কূপ খনন, রাস্তা ও জঙ্গল সংস্কার; ঋণদায় থেকে চাষীকে উদ্ধার; সালিশী বিচার।

তিনটি কেন্দ্রে তিনটি হাসপাতাল স্থাপিত করা হলো। বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হতো, দু-একটি বেডেরও ব্যবস্থা হলো, ডাক্তারেরও ব্যবস্থা হলো। এর খরচ চালাতেন কবি ও প্রজারা। খাজনার টাকা পিছু রবীন্দ্রনাথ দিতেন এক আনা আর প্রজারা দিত এক আনা।

দিনে ও রাত্রে অবৈতনিক প্রাথমিক ইস্কুল খোলা হলো।

তারপর পুকুর প্রতিষ্ঠা, কূপ খনন, রাস্তা মেরামত, জঙ্গল সাফ প্রভৃতি কাজে অনেক টাকার দরকার। এতো টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? প্রজারা কায়িক পরিশ্রমে চাঁদা দিতে লাগলো, অর্থাৎ তারা 'জন' খেটে মজুরীটা সমিতির চাঁদার খাতায় জমা করলো। নগদ টাকা আর লাগলো না। সাত-আট মাসের মধ্যে অনেক কাজ হয়ে গেল।

ঋণদান সমিতি থেকে বিপন্ন প্রজাদের ঋণ দেওয়া হতে লাগলো।

ঝগড়া-বিবাদের ব্যাপারে অতুলবাবু সালিশী হয়ে সুরাহা করে দিতেন।

কালীগ্রামে ধীরে ধীরে স্বদেশী সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

কবির সংগঠন ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে সরকারী কর্মচারী মিষ্টার এস্. এস্. ওম্যালি রাজসাহীর 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার-এ লিখলেন—'ক্ষমতাশালী জমিদার যে সব সময়েই প্রজাপীড়ক ও নির্দয় হন এ ধারণা ঠিক নয়। কবি রবীন্দ্রনাথের জমিদারী এই সম্পর্কে একটা চমৎকার উদাহরণ। তাঁর কাব্য-প্রতিভার সঙ্গে জমিদারী পরিচালনার প্রত্যক্ষ ও কল্যাণকর চিন্তাধারা যুক্ত হয়েছে। স্থানীয় জমিদারদের কাছে ইহা অনুকরণীয়। কবি নিজে জমিদারীর কাজকর্ম দেখাশুনা করেন। কর্মচারী প্রজাদের সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করলে তার কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা ঘটে। যাদের সত্যই খাজনা দেবার সামর্থ্য নাই তাদের খাজনা মাপ করে দেন। ১৩১২ সালে তিনি প্রায় ৫৭৫৯৫৲ টাকা খাজনা মাপ করেন। তিনি অনেকগুলি পাঠশালা স্থাপন করেছেন, পাতিসরে একটি হাইস্কুল করেছেন, তাতে বর্তমানে ২৫০টি ছাত্র পড়ে। একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও করেছেন। এই সব কাজে জমিদার বার্ষিক ১২৫০৲ টাকা দেন, প্রজারা দেয় খাজনার টাকা পিছু দু'পয়সা। পঙ্গু ও অন্ধদের সাহায্যের জন্য একটি ফাণ্ড আছে, তাতে বার্ষিক ২৪০৲ টাকা বরাদ্দ হয়। চাষীদের শতকরা ১২৲ টাকা সুদে কৃষিঋণ দেওয়া হয়। টাকা দেয় এখানকার ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কে

কবির কলিকাতাস্থ বন্ধুদের টাকা খাটে। আমানতকারীরা শতকরা ৭৲ হারে সুদ পান। এই ব্যাঙ্ক বর্তমানে ৯০০০০৲ টাকা ঋণে লগ্নী করেছে।'

কিন্তু কবির এই বিরাট কর্মপ্রচেষ্টা পরিপূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠার আগেই বিদেশী সরকার আঘাত হানলো। পুলিশ একদিন অতুলবাবুকে সদলবলে গ্রেপ্তার করলো, তাঁদেরকে বিপ্লবী বলে অন্তরীণ বা নজরবন্দী করে রাখা হলো।

লোকাভাবে কাজ বন্ধ হয়ে গেল।

ব্যর্থকাম কবি অতুলবাবুর স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখলেন—'তোমার স্বামীর অন্তরীণ সংবাদ আমি পূর্বেই শুনিয়াছি। কি কারণে এই বিপত্তি ঘটিল তাহা কিছুই জানি না। এ সম্বন্ধে রাজপুরুষদের নিকট আমি পত্র লিখিয়াছি। তাহার কোন ফল হইবে কি না বলা যায় না। তোমরা যে দুঃখ ভোগ করিতেছ ভগবান তোমাদের সেই দুঃখকে কল্যাণে পরিণত করুন. এই কামনা ছাড়া আর আমাদের কিছু করিবার নাই।' [—জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

কবি কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। শান্তিনিকেতনে তিনি নতুন উৎসাহে পল্লী সংগঠনের কাজে মন দিলেন। শ্রীনিকেতনের কাজ সুরু হলো। স্বাস্থ্য-সংস্কার, পল্লীশিল্পের পুনরুদ্ধার, লোকশিক্ষা বিস্তার, সমবায় সমিতি গঠন—এ সবই ছিল শ্রীনিকেতনের লক্ষ্য।

সাংবাদিকদের এক সভায় কবি বললেন—'তোমরা বড় বড় রাজনীতির কথা লেখ, কিন্তু ওসবে আমার মন ভরে না। এই যে প্রতিদিন গ্রামবাসীদের দুঃখ-দারিদ্র্য চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি, এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে হয়। তোমাদের হাতে শক্তিশালী অস্ত্র সংবাদপত্র আছে। তোমরা সেই অস্ত্র এদের জন্য প্রয়োগ কর। দেশের লোককে জানাও এদের দুঃখ-দুর্দশা কিরূপ অপরিমেয়, কি ভাবে এই দুঃখ মোচন করতে হবে তার পথ দেখিয়ে দাও। তবেই তোমাদের সংবাদপত্র সেবা সার্থক হবে।' [—ঐ

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রফুল্লকুমার সরকারকে কবি বলেছিলেন—'দেশের সবচেয়ে বড় দুর্গতি গ্রামবাসীদের এই ঘোর দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য। তাহারা কুকুর বিড়ালের মত না খেয়ে মরে, বিনা চিকিৎসায় মরে, এমন কি চৈত্রের কাঠফাটা রৌদ্রে এক ফোঁটা পানীয় জলও তাদের পক্ষে দুর্লভ হয়ে ওঠে। যদি এই গ্রামবাসীদেরই বাঁচানো না গেল, তাদের দুঃখদুর্দশা দূর করা না গেল, তবে আর দেশোদ্ধারের বড় বড় কথা বলে লাভ কি?' [—ঐ

রবি-বাসরের সাহিত্যিক ও সুধীজনদের কবি বললেন—'লোকে মনে করে আমি শুধু কল্পনাবিলাসী কবি, কিন্তু বাস্তব কর্মক্ষেত্রে আমি যে জিনিষ সারা জীবন ধরে গড়ে তুললাম তার পরিচয় নিতে কেউ চায় না। তোমরা সব সাহিত্যিক, আমার এই সব গঠনমূলক কার্য যদি তোমরা নিজেরা দেখ এবং দেশের লোকের কাছে উহার কথা প্রচার কর, তাহলে আমি আনন্দিত হব।'

[—ঐ

শান্তিনিকেতন, জমিদারী ও কাব্যসাহিত্য কবিকে একান্তভাবে কর্মব্যস্ত রেখেছিল সত্য, কিন্তু সেজন্য বাইরের ব্যাপারে তিনি উদাসীন ছিলেন না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধলো, বিরাট হত্যাযজ্ঞে কবি-মন ব্যথিত হলো। মানবতার আবাহন করে কবি বললেন—"সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে —কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল।...এক এক জাতি নিজনিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে উঠবার জন্য চেষ্টা করেছে।...

"মানুষের এই যে প্রচণ্ড শক্তি এ বিধাতার দান। তিনি মানুষকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েছেন এবং দিয়ে বলে দিয়েছেন, 'যদি তুমি একে কল্যাণের পক্ষে ব্যবহার কর তবেই ভালো—আর যদি পাপের পক্ষে ব্যবহার কর তবে এ ব্রহ্মাস্ত্র তোমার নিজের বুকেই বাজবে।' আজ মানুষ মানুষকে পীড়ন করবার জন্য নিজের এই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যবহার করেছে; তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র আজ তারই বুকে বেজেছে।...

"...মা মা হিংসীঃ। মরছে মানুষ, বাঁচাও তাকে।...পিতা নোহসি। তুমি যে আমাদের সকলের পিতা, তুমি বাঁচাও।...বিনাশ থেকে রক্ষা করো।"

[—শান্তিনিকেতন

"একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি,
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি—
ঘাতক সৈন্যে ডাকি
'মারো মারো' উঠে হাঁকি।

গর্জনে মিশে স্তবমন্ত্রের স্বর—
মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন, 'হে ঈশ্বর,
এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা।।.. [—গীতিবিতান ৩য়।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ হলো।

কবি 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের আয়োজন করলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। টিকিট বিক্রী হলো। বিক্রয়লব্ধ সব টাকা গেল দুর্গতদের সাহায্যে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেন সাহেব ক্লাশে পড়াতে পড়াতে ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে অভদ্র মন্তব্য করলেন। ছাত্রেরা প্রতিবাদ তুললো। কিন্তু ওটেন সাহেব সে উক্তির প্রত্যাহার করলেন না। ছাত্রেরা কলেজের সিঁড়িতে চাদর চাপা দিয়ে ওটেনকে প্রহার দিল। কলেজের কর্তারা কয়েকজন ছাত্রকে সন্দেহ করে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। বিতাড়িত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। কবি কর্তৃপক্ষের এই নীতির সমালোচনা করেন মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায়।—

"যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা, ড্রিলসার্জেণ্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছাত্রদের মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তারাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন, যাঁরা জানেন 'শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা', যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।...

"যদি ছাত্রেরা প্রতিনিয়ত বিদেশী অধ্যাপকের কাছ হইতে দেশের, জাতির, ধর্মের অপমানের কথা শোনে, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই—যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।" [—রবীন্দ্র জীবনী

"তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন,
ভাব্‌বে, এ কী বিষম কাণ্ডখানা

সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয়রে আমার কাঁচা॥
শিকল-দেবীর ঐ যে পুজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া,
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি।" [—বলাকা

কবির আমেরিকা যাবার কথা উঠলো।

আমেরিকার লোকেরা পয়সা দিয়ে বক্তৃতা শোনে। আমেরিকায় অনেক বক্তৃতা কোম্পানী আছে, যাদের কাজ হলো নামকরা লোকদের বক্তৃতা শুনিয়ে লাভ করা। এক কোম্পানী কবির সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিল—কবি আমেরিকায় গিয়ে বক্তৃতা করলে তারা কবিকে বারো হাজার ডলার দেবে।

কবির টাকার প্রয়োজন, তিনি রাজী হলেন।—

"আমার যা কাজ সে আমাকে করতেই হবে—আরাম করা, বিশ্রাম করা, লোক-লৌকিকতা করা বিধাতা আমার জন্যে কিছুতেই মঞ্জুর করবেন না। অতএব পথিকের প্রশস্ত রাজপথে সর্বলোকের মাঝখানে চললুম—"

[—চিঠিপত্র ৪র্থ

কবি বেরুলেন, জাপান হয়ে আমেরিকা যাবেন।

"ওরে যাত্রী, ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী,
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণিপাকে বক্ষেতে আবরি
ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি,
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।
ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।"

জাহাজ এসে ভিড়লো রেংগুনে।

নদীর ঘাটে লোকে লোকারণ্য।

কবি গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। তিন মাইল দূরে হোটেল। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে জনতা চললো, সাড়া তুললো—বন্দেমাতরম! জয় রবীন্দ্রনাথকি জয়!

কবি এতটা আশা করেননি।

বিকালে এক সভায় কবিকে তু'খানি মানপত্র দেওয়া হলো। একখানি বর্মীদের পক্ষ থেকে, আর একখানি বাঙালীদের পক্ষ থেকে। বর্মী ভাষায় মানপত্রটি পড়লেন ব্যারিস্টার উ-ব-থিয়েন, বাংলা মানপত্র পড়লেন ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র সেন। সভাপতি হন ভারতীয় ধনী ব্যবসায়ী আবদুল করিম জামাল।

রেংগুনে কবি ছিলেন তু'দিন, ব্যারিস্টার পি, কে, সেনের বাড়ীতে। কিন্তু রেংগুন সহর দেখে কবি খুশি হতে পারেন নি।—"রাস্তাগুলি সোজা, চওড়া, পরিষ্কার, বাড়িগুলি তক্‌তক্ করছে, রাস্তায় ঘাটে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যে হঠাৎ কোথাও যখন রঙীন রেশমের কাপড়-পরা ব্রহ্মদেশের পুরুষ বা মেয়ে দেখতে পাই, তখন মনে হয় এরাই বুঝি বিদেশী। আসল কথা গঙ্গার পুলটা যেমন গঙ্গার নয়, বরঞ্চ সেটা গঙ্গার গলায় ফাঁসী—রেংগুন সহরটা তেমনি ব্রহ্মদেশের সহর নয়, ওটা সমস্ত দেশের প্রতিবাদের মত।······কোনো ফাঁক দিয়ে ব্রহ্মদেশের কোনো চেহারাই দেখতে পেলুম না। মনে হোলো রেংগুন ব্রহ্মদেশের ম্যাপে আছে কিন্তু দেশে নাই।"

[—জাপানে পারস্যে

কবি বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির দেখলেন—সোয়েডাগং প্যাগোডা।—"সে মন্দিরে গাম্ভীর্য নেই, কারুকার্যের ঠেসাঠেসি ভিড়—সমস্ত যেন ছেলেমানুষের খেল্‌নার মতো। এমন অদ্ভুত পাঁচমিশেলি ব্যাপার আর কোথাও দেখা যায় না—এ যেন ছেলেভুলানো ছড়ার মতো;···তার মধ্যে যা-খুসি-তাই এসে পড়েছে, ভাবে পরস্পর-সামঞ্জস্যের কোনো দরকার নেই।" [—ঐ

পেনাঙ্ হয়ে কবি এলেন সিঙাপুর।

এক জাপানী মহিলা মোটরে করে কবিকে বরারের ক্ষেত ও গ্রাম অঞ্চল দেখিয়ে আনলেন।

সিঙাপুর থেকে জাহাজ ছাড়ার সময় একটি বিড়াল জাহাজ থেকে জলে পড়ে গেল। সমস্ত জাহাজের খালাসীরা চঞ্চল হয়ে উঠলো বিড়ালটিকে বাঁচাতে। জাহাজটি যে ছাড়তে হবে এ-কথা তারা ভুলে গেল। বিড়ালটি বাঁচানোই হলো তাদের তখন সবচেয়ে বড়ো কাজ। নানা কৌশলে

বেড়ালটিকে জল থেকে তোলা হলো। তারপর জাহাজ ছাড়লো। নির্দিষ্ট সময় তখন পার হয়ে গেছে।

একটা নগণ্য ছোট বিড়ালকে রক্ষা করার জন্য এক জাহাজ লোকের কর্ম-ব্যস্ততা, সময়ানুবর্তিতার ব্যতিক্রম দেখে কবির আনন্দ হলো।

হংকং।

সারি সারি চীনাদের যত নৌকা। সেই সব নৌকায় চীনারা সপরিবারে থাকে; মাল বয়, যাত্রীও বয়—ছেলেমেয়ে সবাই মিলে কাজ করে।—"কাজের সেই ছবিই আমার কাছে সকলের চেয়ে সুন্দর লাগল। কাজের এই মূর্তিই চরম মূর্তি, একদিন এরই জয় হবে।…ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখতে পাব? যেদিন কাজের সঙ্গে নিয়মের বিরোধ থাকবে না। আচারধর্মের সঙ্গে কালধর্মের দ্বন্দ্ব শেষ হবে।" [—জাপানে পারস্তে

জাহাজ বরাবর চলে এলো জাপানের কোবে বন্দরে।

কোবে সহরে অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী আছেন, তার মধ্যে দু-চারজন বাঙালীও আছেন। ভারতবাসীরা জাহাজে এসে কবিকে অভ্যর্থনা জানালেন।

জাপানীরাও এলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, এককালে শান্তিনিকেতনের যুযুৎসু শিক্ষক সানো, পুরানো বন্ধু চিত্রকর টাইকান ও কাট্‌স্‌টাকে।

দু'দলই কবিকে নিজেদের অতিথি করার জন্য জিদ ধরলেন।

তারপর এলো খবরের কাগজের রিপোর্টাররা।

"দেশ ছাড়বার মুখে বঙ্গ সাগরে পেয়েছিলুম বাতাসের সাইক্লোন, এখানে জাপানের ঘাটে এসে পৌঁছেই পেলুম মানুষের সাইক্লোন! দুটোর মধ্যে যদি বাছাই করতেই হয়, আমি প্রথমটাই পছন্দ করি। খ্যাতি জিনিষের বিপদ এই যে, তার মধ্যে যতটুকু আমার দরকার কেবলমাত্র সেইটুকু গ্রহণ করেই নিষ্কৃতি নেই, তার চেয়ে অনেক বেশি নিতে হয়; সেই বেশিটুকুর বোঝা বিষম বোঝা।" [—ঐ

অনেক কষ্টে ভীড় কাটিয়ে কবি জাহাজ থেকে নামলেন। ভারতীয়দের আমন্ত্রণ তিনি আগে স্বীকার করেছিলেন। বরাবর গেলেন গুজরাটি বণিক মোরারজির বাড়ীতে।

জাপানে কবি প্রথম অভিনন্দন পেলেন ওসাকা নগরে। সেখানে টানোজি

হলে কবি বক্তৃতা করলেন। ভারত ও জাপানের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের উল্লেখ করলেন। সভাগৃহ আনন্দধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো।

তারপর টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি দু'দিন বক্তৃতা দিলেন।

কবি নেগুচি ছিলেন শ্রোতাদের একজন। কবির কণ্ঠ, বাচনভঙ্গী ও ভাষা তাঁকে মুগ্ধ করলো। সভার শেষে কবি নেগুচি একটি কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথের হাতে দিলেন—

"Oh ! to have thy song without Arts rebellion,

To see thy life gracing a simple force that is itself creation

Thou stoopeth down from high throne

To sit by people in simple garb and speech," [—বিশ্বভ্রমণে··

জাপানের যত জ্ঞানী ও গুণীজন কবিকে একদিন সম্বর্ধনা জানালেন। জাপানী ভাষায় অভিনন্দন-পত্র পাঠ করলেন জাপানের প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট ওকুমা। কবি উত্তর দিলেন বাংলা ভাষায়, বললেন—জাপানী ভাষা আমি জানি না, কিন্তু বিদেশীর ধার করা ভাষায় আমি উত্তর দিতে অনিচ্ছুক।

অধ্যাপক কিমুরা সেই বক্তৃতার জাপানী অনুবাদ করে দিলেন।

কবির সে বক্তৃতা কিন্তু জাপানীদের খুশি করতে পারলো না। কবি সেই বক্তৃতায় জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সা, চীনকে লাঞ্ছিত করার প্রচেষ্টা, কোরিয়ায় অত্যাচার প্রভৃতির উল্লেখ করলেন। সে বক্তৃতা রাষ্ট্র-নায়কদের মনপূতঃ হবার কথা নয়।

নির্মম সত্য উচ্চারণ করার জন্য কবির বিরুদ্ধে জাপানীদের মনে অসন্তোষ দেখা দিল। কবি যেদিন জাপান থেকে বিদায় নিলেন সেদিন জাহাজ-ঘাটায় আর লোক এলো না, ভীড় হলো না।

জাপান কবির ভাল লাগালো। প্রথমেই চোখে পড়লো, এখানকার শান্ত সংযত আচরণ। এখানকার মানুষ জোরে কথা বলে না। পথে এক গাড়ীর চালক আরেক গাড়ীর চালককে চীৎকার করে গালি দেয় না। সবাই সংযত।

জাপানী শিল্প কবিকে মুগ্ধ করলো। শিমোমুরা ও টাইকানের দু'খানি ছবি তিনি নকল করিয়ে নিলেন পনেরো-শো টাকা খরচ করে। আরাই নামে চিত্রকরকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন কলিকাতার বিচিত্রা-শিল্পবিদ্যালয়ে আসার জন্য।

জাপান তখন প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ গর্বোন্নত জাতি, তাদের সঙ্গে স্বদেশবাসীর তুলনা করে কবি লেখলেন।—

"বাঙালীর প্রতিভা যথেষ্ট আছে কিন্তু উদ্যাম ও চরিত্রবল নেই।...আমরা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, অলস, আমরা নিজের একাকীত্বের বাইরে পা বাড়াতে পারিনি—আমাদের আনন্দ সমস্ত মানুষটিকে নিয়ে নয়, নিজের কোণটুকুকে নিয়ে আমাদের যা কিছু অর্থ এবং সামর্থ্য সমস্তই আমরা নিজের উপর খরচ করি—কৃপণতার অন্ত নেই।...সেই দীনতার ভারেই আমাদের দেশ ডুবেচে।... যে ঔদার্য যে মহদাশয়তা থাকলে সেই শক্তি চিরন্তন হতে পারে, সর্বদেশে ও নিত্যকালে সফল হয়ে উঠতে পারে আমাদের সেই তেজ, সেই আত্মোৎসর্গ নেই।" [—চিঠিপত্র ৪র্থ খণ্ড

ক্যানেডা থেকে কবির কাছে নিমন্ত্রণ এলো, কবি যেন একবার সেখানেও যান।

ক্যানেডা সরকার তখন ভারতীয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে কুখ্যাতি লাভ করেছিল। আইন করে সেদেশে ভারতীয়দের প্রবেশ বন্ধ করেছিল। তার প্রতিবাদে ভারতীয়েরা কামাগাটামারু নামে একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করে ক্যানেডায় যায়। কিন্তু তাদের জাহাজ থেকে নামতে দেওয়া হয় না, তারা দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ভারত সরকার তাদেরকে বিপ্লবী বলে অভিযুক্ত করেন । সরকারী অনাচারের ফলে কয়েকজন মারা যায়। কবি সেই নিমন্ত্রণের উত্তরে বললেন—'যতদিন ক্যানেডা সরকার ভারতীয়দের নির্যাতন করবে ততদিন তিনি সে দেশের মাটি মাড়াবেন না। কামাগাটা-মারু হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্যানেডা সরকার আংশিক ভাবে দায়ী। এই ভেদনীতি, অবজ্ঞা ও নির্যাতন যতদিন চলবে, ততদিন সে দেশে কবি পদার্পণ করতে পারেন না। একথা ক্যানেডা-বাসীকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় এই তাঁর অনুরোধ।'

কবি আমেরিকায় পৌছলেন।

'পণ্ড লিসিয়াম' কোম্পানীর সঙ্গে কবির কথা হয়েছিল, প্রতি বক্তৃতায় কবি পাঁচশো ডলার বা দেড় হাজার টাকা করে পাবেন।

রথীন্দ্রনাথকে কবি লিখলেন—'খরচা বাদে ত্রিশ হাজার টাকা আমার হাতে

জমলেই আমি তোকে পাঠিয়ে দোব। তারকবাবুর (তারকনাথ পালিত) যে টাকাটা ধারি এখন সে দেনাটা কলিকাতা য়ুনিভারসিটির হাতে গিয়ে পৌঁচেছে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তার মেয়াদ ফুরাবে,—অতএব আগামী বৎসরেই এই টাকাটা শোধ করে দিয়ে মাসিক সুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নিস্। মাসিক এই দেনা বাদে যা কিছু টাকা জমবে বিদ্যালয়ের কাজে দিতে হবে। সেখানে একটি ভালরকমের হাসপাতাল এবং টেকনিকাল বিভাগ খোলবার ইচ্ছা আছে।" [—চিঠিপত্র ৪র্থ

কবি বক্তৃতা করে চললেন দিনের পর দিন।

সিয়াট্‌লে 'সানসেট ক্লাবে' দু'দিন বক্তৃতা দিলেন।

নিউইয়র্কে কার্ণেগী হলে বহু নরনারী স্থানাভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কবির বক্তৃতা শুনলো।

আমষ্টারডাম নাট্যশালায় হাজার হাজার লোক পথে দাঁড়িয়ে রইল কবিকে একবার দেখবার জন্য।

ক্লীভল্যাণ্ড নগরে সেক্‌স্‌পীয়র-উদ্যানে কবি বৃক্ষরোপণ করলেন সেক্‌স্‌পীয়রের জন্মোৎসবের দিনে।

কবি সম্বর্ধনায় আমেরিকার বড় বড় নগরীগুলি মুখর হয়ে উঠলো।

বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট হ্যাডলি বললেন—সত্য ও আলোক সন্ধানী কবি, তোমাকে আমি স্বাগত জানাই!

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হপকিন্স সাহেব কবিকে সংস্কৃত ভাষায় অভিনন্দিত করেন।

নিউ ইয়র্কের একখানি পত্রিকা লিখলো—আজ এই নগরের স্মরণীয় দিন।··· নিউইয়র্ক-বাসীরা এমন বক্তৃতা দীর্ঘকাল শোনেনি। বহুদিক থেকে এই বক্তৃতা স্মরণীয়।

বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলছে, টাকাও পাচ্ছেন।

সহসা কবির বক্তৃতা উত্তেজনা সৃষ্টি করলো। কবি জাতীয়তাবাদের নিন্দা করলেন, মার্কিন ধনতান্ত্রিকেরা তা সইতে পারলো না। জাতীয়তাবাদ না থাকলে যুদ্ধ করা চলে না। যুদ্ধ ছাড়া ধনিকদের বিদেশী স্বার্থ বজায় থাকে না। কিন্তু কবি তো ধনিকদের মুখের পানে তাকিয়ে কথা বলেন না। তিনি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের কথা ভাবেন। তিনি বললেন—'আমাদের জীবনের ভিত্তি পর্যন্ত প্রাণ-হীন সংস্কার লৌহ মুষ্টি আমরা অনুভব করছি। মানবতার জন্য এর বিরুদ্ধে

আমাদের দাঁড়াতে হবে। বর্তমান যুগে জাতীয়তাবাদের যে নিষ্ঠুর মহামারী, নীতি ও মনুষ্যত্বকে জগৎ থেকে মুছে দিতে চাইছে তাকে প্রতিরোধ করতে হবে।…শক্তি ও সমৃদ্ধি, পতাকা ও পবিত্র সংগীত, এবং স্বদেশপ্রেমের মিথ্যা আস্ফালন এ-কথা গোপন করতে পারে না যে, এক জাতি আরেক জাতির প্রধানতম শত্রু। পৃথিবীতে কোন নতুন জাতি গড়ে উঠলেই, অন্য জাতি নতুন সংকটের ভয়ে শঙ্কিত, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য ব্যস্ত।…'

কবির কাছ থেকে আমেরিকা দর্শন ও সাহিত্যের কথা শুনতে চেয়েছিল; এ-কথা শুনতে চায় নি। 'সানফ্রানসিস্কো কল' লিখলো—'রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন ভারতের জন্য কি করেছে? আর আমাদের কি দশা হতো যদি আমরা সেই তত্ত্ব জীবনে গ্রহণ করতাম। বৃদ্ধ ভারত ক্ষুব্ধ, অর্ধভুক্ত, ছিন্নকন্থা পরিহিত, বোধিদ্রুমতলে বসে আছে আর অনন্তের চিন্তায় ধ্যাননিমগ্ন। আত্মসমর্পণ বড় গুণ—তা সে খৃষ্টানের মধ্যেই হোক আর পৌত্তলিকের কাছেই হোক। ভারতবর্ষ আত্মসমর্পণ মন্ত্র প্রচার করুন—আমরা আমেরিকানরা দৃঢ়সংকল্পকে ভাল বলে সাধন করি।'

'ডেট্রয়েট জার্ণাল' লিখলো—'টেগোর রুগ্ন তিক্ত মানসিক বিষ দিয়ে আমাদের মহান যুক্তরাষ্ট্রের যুবকদের মনকে কলুষিত করছে।'

'লস্ এঞ্জেল্‌স্ এক্‌স্‌প্রেস' নেমে এলো অনেক নীচে, তারা লিখলো—ধন খুবই হীন পদার্থ, ধনোপার্জন বৃত্তিও অত্যন্ত গর্হিত,…কিন্তু আমাদের এই সান্ত্বনা যে আমাদের এই তুচ্ছ ধন—যা তিনি এতই ঘৃণা করেন তাই তাঁকে এতদূরে টেনে এনেছে। তিনি যা নিন্দা করেন তাই পাবার জন্য এসেছেন, এবং এখানে এসে সেই কাজই নিজে করছেন যার জন্য এত নিন্দাবাদ।'

কবি জানতেন, সত্যের আবাহন করতে হলে অসত্যের আঘাত সইতে হবে। এই সব বিরূপ সমালোচনার জন্য কবি প্রস্তুত ছিলেন, তিনি আরো নির্মম সত্য উচ্চারণ করলেন আমেরিকানদের সম্পর্কে—'এসিয়াবাসীদের প্রতি তোমাদের ব্যবহার তোমাদের জাতীয় জীবনের চরম কলঙ্ক।'

এদিকে ক্যালিফোর্নিয়া সহরে কবির হোটেলের সামনে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে একটা মারামারি হয়ে গেল। বিষম সিং নামে এক পাঞ্জাবী এসেছিলেন কবিকে এক সম্বর্ধনা সভায় যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে। কিন্তু হোটেলের সামনে দু'টি লোক তার পথ রোধ করলো। তারা বিপ্লবী গদর-পার্টির লোক,

তারা চায় না, কোন ভারতীয় সভায় কবিকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। গদর দলের ধারণা, 'স্যার' উপাধি নিয়ে কবি নিজেকে বৃটিশ গবর্মেণ্টের কাছে বিক্রী করেছেন।

রীতিমত একটা মারামারি হয়ে গেল। তারপর গুজব রটলো,—গদর-পার্টি কবিকে হত্যা করবে।

কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত পুলিশ ও গোয়েন্দার ব্যবস্থা করলেন। গোয়েন্দার পাহারায় কবিকে সভায় যেতে হয়, গোয়েন্দারা সভা শেষে কবির সঙ্গে আসে, হোটেলের পিছনের দরজা দিয়ে কবিকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে যায়। অনেক হিন্দু শ্রোতাকে পুলিশ কবির বক্তৃতা সভায় ঢুকতে দেয় না। কবি ক্ষুব্ধ হলেন, কাগজে বিবৃতি দিলেন—'আমার দেশবাসীর বুদ্ধির প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, এবং আমি আমার সমস্ত কাজ পুলিশের সহায়তা ব্যতীতই করিব। আমি এখানে স্পষ্ট বলিতেছি যে আমাকে হত্যা করিবার কোন ষড়যন্ত্র হইয়াছিল—তাহা আমি বিশ্বাস করি না।'

সেই বিবৃতির উত্তরে গদর-পার্টির নেতা রামচন্দ্র লিখলেন—'আমাদের দলের এইরূপ কোনো অভিসন্ধি নাই। প্রথমত রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ, তাঁহার কাজ কাব্য, রাষ্ট্রনীতি নহে। সেইজন্য তাঁহাকে আমরা বিশেষ গ্রাহ্য করি না। তাঁহার ক্ষতি করিলে আমেরিকায় আমাদেরই সর্বনাশ, সেকথা আমরা জানি। পথে মারামারির কারণ এই যে, আমরা চাই না যে লোকটি এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র আপত্তি এই যে, বৃটিশের সম্মান তাঁহাকে কিনিয়া ফেলিয়াছে। তিনি বৃটিশ 'নাইট' হইয়া আজ পৃথিবীর কাছে দেখাইতে চান যে, বৃটিশ শাসন ভারতের কত মঙ্গল করিয়াছে; কিন্তু এই আন্তর্জাতিক মহিমা পাইবার পূর্বে তিনি বিদেশীদের বিরুদ্ধে ষাটখানি বই লিখিয়াছিলেন।' [—রবীন্দ্র জীবনী

যাক্, এই ব্যাপারের এইখানেই যবনিকা পড়লো।

চারমাস আমেরিকায় কাটিয়ে কবি দেশে ফিরলেন।

পথে হাওয়াই দ্বীপের হনলুলুতে নেমে একদিন বক্তৃতা করতে হলো।

কলিকাতায় কবিকে সম্বর্ধনা জানালো বিচিত্রা শিল্প-বিদ্যালয়। শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীরা সম্বর্ধনা জানালো দমদমের এক বাগানে।

কিন্তু দেশবাসী এবার কবির সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলো।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কবির বক্তৃতার নানা ত্রুটি দেখিয়ে সমালোচনা করলেন। অজিত চক্রবর্তী ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তার উত্তর দিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও রেহাই দিল না। ম্যাট্রিকুলেশনের বাংলা প্রশ্নপত্রে কবির 'ছিন্নপত্র' থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করে পরীক্ষার্থীদের সাধু ভাষায় লেখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

কবি চলে গেলেন শহরের ভীড় ছেড়ে—তিনধরিয়া, বোলপুর,...... শিলাইদহ...।

কবির মতবাদ সম্পর্কে সাধারণের মনে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, অল্প দিনের মধ্যেই তা দূর হয়ে গেল।

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করার জন্য ইংরাজ সরকার ভারতরক্ষা-আইন পাস করলো। সেই আইনের জোরে দেশে ব্যাপক ধরপাকড় সুরু হয়ে গেল। বোম্বাইয়ে তিলক ও মাদ্রাজে আনি বেশান্ত গ্রেপ্তার হলেন। শুধু বাংলা দেশেই বারো শো যুবককে আটক করা হলো। কবি চুপ করে থাকতে পারলেন না, এই ধরণের শাসন-নীতির নিন্দা করলেন।

সেই লেখা পড়ে বিলাতের এক বন্ধু প্রতিবাদ জানালেন।

তার উত্তরে কবি একখানি খোলা চিঠি লিখলেন বেংগলি কাগজে—'আমাদের কষ্টভোগ আপনার কাছে সামান্য মনে হলেও আমাদের দুঃখভোগের তীব্রতা কিছু কমবে না। আমাদের নৈতিক সমস্যা পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম।...একা বাংলা দেশেই শত শত লোককে বিনা বিচারে অন্তরীণ করা হয়েছে। তাদের অধিকাংশকেই জেলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং নির্জন কক্ষে রাখা হয়েছে। কয়েকজন পাগল হয়ে গেছেন, অথবা আত্মহত্যা করেছেন। বহু গৃহে দুঃখের ছায়া পড়েছে, সবচেয়ে বেশী কষ্টভোগ করছেন শিশু ও রমণীরা, তাঁদের দেখবার কেউ নেই।...আমরা বিশ্বাস করি যে, যাঁরা এই ভাবে শাস্তি ভোগ করছেন, তাঁরা অধিকাংশই নিরপরাধ, আত্মত্যাগের মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এঁরা গুপ্তচরের নজরে পড়েন। এই দায়িত্বহীন শাসন-নীতির অনিবার্য পরিণাম পাশ্চাত্য সব কিছুর উপরেই ব্যাপক ভাবে ঘৃণার বিস্তার করবে।...'

কবির লেখনী জনমতের প্রতিধ্বনি তুললো। কবি আবার প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়লেন রাজনীতিতে। বক্তৃতা দিতে হলো রামমোহন লাইব্রেরীতে,

ও আলফ্রেড থিয়েটারে এবং কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করতে হলো। কিন্তু চরম ও নরম পন্থীদের মিলনের উদ্দেশ্যে শেষ অবধি তিনি পদত্যাগ করলেন।

কংগ্রেসের সভায় কবি তাঁর 'ইণ্ডিয়ান প্রেয়ার' পাঠ করলেন—

"They fight and kill for self-love giving it Thy name,
They fight for hunger that thrives on brother's flesh,
They fight against Thine anger and die,
But let us stand firm and suffer with strength,
For the true, for the Good, for the Eternal in man,
For Thy Kingdom which is in the union of hearts,
For the Freedom which is of the soul···" [—রবীন্দ্রজীবনী

স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কবি বললেন—"বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায় এমন ভুল যদি মনে আঁকড়াইয়া ধরি, তবে বড় দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। যে হাত দিতে পারে, সেই হাতই লইতে পারে। আমার দেশকে আমরা অতি সামান্যই দিতেছি, সেইজন্যই আপনার দেশকে পাই নাই। বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব একথা যে বলে সে-লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না। আপন লোককে যে দুঃখ দিই, অপমান করি, অবজ্ঞা করি, বঞ্চনা করি, বিশ্বাস করি না,—সেইজন্যই আপন পর হইয়াছে—বাহিরের কোন আকস্মিক কারণ হইতে পারে না।" [—ঐ

কিন্তু রাজনীতিই তো রবীন্দ্র-মানসের সবটুকু নয়। বিচিত্রায় ডাকঘরের অভিনয় হলো। আনি বেশান্ত, লোকমান্য তিলক, মদনমোহন মালব্য, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হলেন অভিনয় দেখার

লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যানসেলর স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার এলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করতে। তিনি শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করলেন। কবির সঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কে নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন। কবি মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য বললেন।

স্যাডলার সাহেব লিখলেন—'স্যার রবীন্দ্রনাথের মতে শুধু ইস্কুলেই নয়, কলেজেও মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত।···শিক্ষার কাজ হলো চরিত্রের গুণাবলীকে বিকাশ করা, আবৃত্তি, কথকতা, সংগীত, শিল্পকাজ, কল্পনা-শক্তি ও মনোভাব প্রকাশের শক্তি দেওয়া, সেই সঙ্গে জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতা সংশোধন করা, সদ্‌গুণকে সজাগ করে তোলা, সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা এবং সমষ্টিগত ও সামাজিক উন্নতির জন্য সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি বোলপুরে নিজ বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করেছেন, সংগীত, অভিনয় কথকতা ও হাতের কাজকে শিক্ষার কাজে প্রয়োগ করেছেন, অনুন্নত প্রতিবেশীদের সেবার কাজ ও বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন করেছেন।'

কবি এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন রামমোহন লাইব্রেরীর এক জনসভায়।—

"বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমতো মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটি এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজ করিয়া সহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রফ্‌তানি করাইবার দুরাশা বৃথা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা সহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।

"এখন কথাটা এই, যেমন বাঙালীর ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে, যে জন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আণ্ডামানে চালান হইবার যোগ্য? ইংলণ্ডে একদিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মূলাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত—কিন্তু এ যে তার চেয়ে কড়া আইন। এ-যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি। কেন না মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায় সেই বা কম কী করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্য রকমে চুরি করে অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?

"আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাশ পর্যন্ত এক রকম পড়াইয়া তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানাপ্রকারের সুবিধা হয় না? একে তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

"আমি জানি তর্ক এই উঠিবে—তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষার উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে সৌখীন লোকে সখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে,—কিম্বা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে।" [—শিক্ষার বাহন

এদিকে কবি যে শিক্ষাধারা প্রবর্তন করেছেন শান্তিনিকেতনে সাধারণ গতানুগতিক শিক্ষাধারার সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনে একই ছেলে শিক্ষার তারতম্য অনুসারে, এক এক বিষয় উচ্চতর বা নিম্নতর শ্রেণীতে পড়িতে পাইত। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসকে যদি প্রথম শ্রেণী বলা যায়, তবে দশম শ্রেণী নিম্নতম। কোনো ছেলে বাংলা-ইংরেজিতে হয়তো সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে, গণিতে সে অষ্টম শ্রেণীভুক্ত। বছর শেষে সব বিষয়ে যাহাতে ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযুক্ত হইতে পারে, সেদিকে কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন।···

"শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের মারিবার নিয়ম ছিল না।···

"···খুব ভোরে আমাদের উঠিতে হইত, উদ্‌বোধনের জন্য একটা ঘণ্টা বাজিত। শীতকালে আর ভোর নয়···তখন রীতিমত অন্ধকার, আকাশে তখনো তারা আছে। খুব ছোট ছেলেরা কিছুক্ষণ পরে উঠিত। বয়সের কমবেশি অনুসারে ছাত্ররা তিনভাগে বিভক্ত ছিল, আগুবিভাগে বয়স্ক ছেলেরা, মধ্য-বিভাগে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ছেলে, শিশু বিভাগে একেবারে ছোটর দল।

"শয্যা ত্যাগ করিয়া হাতমুখ ধুইবার পালা। তারপরে পালাক্রমে ছেলেদের নিজের নিজের ঘর ঝাঁট দিতে হইত, আশপাশ পরিষ্কার করিতে হইত। তারপর মিনিট পনেরো সারিবদ্ধ ভাবে ব্যায়ামের সময়। ব্যায়ামের পরে স্নান; স্নানের পরে উপাসনা। উপাসনার সময় প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে মিনিট দশেকের জন্য নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে হইত। কে কি ভাবিবে তাহার কোন নির্দেশ ছিল না, যাহার যা খুশি ভাবিত।···

"উপাসনার পর সকলকে একসঙ্গে দাঁড়াইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হইত। তারপর জল খাওয়ার পালা—সকলকে সারিবদ্ধ ভাবে নিজের বাটি হাতে রান্নাঘরে দিকে যাইতে হইত।

"প্রত্যেক কাজের জন্য ঘণ্টা বাজিত।...কোনো কাজ আমাদের যথেচ্ছ ভাবে করিবার উপায় ছিল না; প্রত্যেক কাজের জন্যই কাপ্তেনের নির্দেশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইতে হইত।...উপাসনার জন্য লাইন, জল খাইতে যাইবার জন্য লাইন, ভাত খাইতে যাইবার জন্যও লাইন; লাইন ছাড়া এক পা চলিবার উপায় ছিল না।...

"জল খাওয়ার পরে ও ক্লাস আরম্ভ হইবার আগে, আশ্রমের ছোট বড়, ছাত্র অধ্যাপক সকলে একত্র হইত; গানের দল সময়োচিত একটি গান করিলে সকাল বেলাকার ক্লাস আরম্ভ হইত।...পঁয়তাল্লিশ মিনিট করিয়া এক এক পর্ব, এমন পাঁচ-ছয়টা পর্ব। তারপরে আবার ঘণ্টা। আবার লাইন, আবার মধ্যাহ্নভোজনের পালা।...

"দুপুর বেলা খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ এঘরে ওঘরে গল্প-গুজব করিতে যাওয়া চলিত। কিন্তু ঘরে ফিরিবার ঘণ্টা বাজিলেই আপন-আপন জায়গায় ফিরিয়া আসিতে হইত। ঘণ্টা দুই পাঠ ও বিশ্রামের পর বিকালবেলা আবার ক্লাসের ঘণ্টা পড়িত। বিকালে তিন চারটা পর্বের বেশী হইত না।...

"ক্লাস শেষ হইলে নিজ নিজ ঘর ঝাঁট-দেওয়া; আবার ঘণ্টা, আবার লাইন, জল খাওয়া। জল খাওয়া শেষ হইলে আবার ঘণ্টা, আবার লাইন; তারপরে খেলিবার পালা।

"শীতকালে ক্রিকেট, অন্য সময় ফুটবল।...সপ্তাহে...একদিন সকলকে ড্রিল শিখিতে হইত; আর একদিন জঙ্গল-পরিষ্কার বা ঐ-জাতীয় কোনো কাজ করিতে হইত।...

"খেলার পরে হাত পা ধুইয়া, আবার উপাসনা। উপাসনার পর গল্পগুজব করিবার জন্য খানিকটা সময়—এটার ভদ্র নাম বিনোদন পর্ব। বড় ছেলেরা ছাড়া রাত্রে কেহ পড়িতে পাইত না। কোনো-না কোনো বিশ্রম্ভ-ব্যাপারে যোগ দিতে হইত। এই সময়ে নানা রকম সভা-সমিতি হইত, কোনোদিন বা ছোটখাটো অভিনয় হইত, কিংবা কোন অধ্যাপক গল্প বলিতেন।......

"বিনোদনের পরে আহার, আহারান্তে বৈতালিকদলের গান; নারীভবন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পালাক্রমে একদিন ছেলেরা, একদিন মেয়েরা গান

কর্তেন। বৈতালিক শেষ হইয়া গেলে আশ্রম নিদ্রানীরব হইয়া যাইত। কেবল পরীক্ষার্থীদের ঘরের আলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাইত।…

"ছাত্রদের কার্য পরিচালনের জন্য একটি সভা ছিল; ইহার নাম আশ্রম-সম্মিলনী। ইহাকে ছাত্রদের পার্লামেন্ট বলা যাইতে পারে। সমস্ত ছাত্রই ইহার সদস্য। সকলে মিলিয়া একটি কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচিত করিয়া দিত। এই সমিতিই প্রকৃতপক্ষে শাসন কর্তা।…

"গুরুতর অপরাধের বিচারের জন্য একটি বিচারসভা ছিল। সম্পাদক ও কাপ্তেনগণ বিচারক। রাত্রে আহারান্তে কোন নিভৃতস্থানে বিচারসভা বসিত।

"মাসে আশ্রম সম্মিলনীর দুটি অধিবেশন হইত। অমাবস্যার রাত্রে একটি, পূর্ণিমার রাত্রে একটি। ঐ দুইদিন বিকাল বেলায় অনধ্যায় থাকিত। অমাবস্যার সভায় কেবল কাজের কথা হইত। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিলে সভাপতি হইতেন। ছাত্রেরা বিতর্ক করিত, ভোট দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইত। ছাত্রেতর সকলে দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন।

"পূর্ণিমার অধিবেশন আনন্দোৎসবের। গান বাজনা, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি হইত। আশ্রমের ছোটবড় সকলেই এই আনন্দের অংশভাক্ ছিল।

"প্রত্যেকদিন একজন ছাত্র পাক্‌শালার অধ্যক্ষকে সকলপ্রকার কাজে সাহায্য করিত। সেদিন ক্লাসের পড়া হইতে তাহার ছুটি।

"আবার প্রত্যেকদিন পালাক্রমে চার-পাঁচজন ছাত্র অতিথিদের পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত হইত।…

"আশ্রমের ছেলেদের অনেকগুলি হাতে লেখা পত্রিকা ছিল। তাহারা নিজেরাই লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক—ছবি নিজেরাই আঁকিত।…বড় ছেলেদের কাগজ ছিল 'শান্তি'।…বড়দের আর একখানি পত্রিকা ছিল 'বীথিকা'।…মাঝারি ছেলেদের দু'খানা কাগজ ছিল—'প্রভাত' ও 'বাগান'। ছোট ছেলেদের কোনো কাগজ ছিল না, কয়েকজন উৎসাহী জুটাইয়া 'শিশু' বলিয়া একখানি পত্রিকা বাহির করিয়া ফেলিলাম। তারপরে একসময় দৈনিক কাগজ বাহির করিবার হুজুক পড়িয়া গেল। একখানা লম্বা কাগজে নিজেদের মন্তব্য লিখিয়া আশ্রমে প্রকাশ্য স্থানে টাঙাইয়া দেওয়া হইত, সকলে পড়িত।…

"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন বলিলে কম বলা হয়—এখানকার জীবনের বাহন বাংলাভাষা। সভাসমিতি; বক্তৃতা, তর্ক, প্রবন্ধ রচনা, চিঠি-পত্র, এমনকি একটু চিরকুট লেখাও বাংলায় হইয়া থাকে। ইংরেজি পঠনের

ভাষাও বাংলা। এই প্রথা সেখানে আছে বলিয়া অতি অনায়াসে শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ছেলেরা প্রবেশ করিতে পারে।

"এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার আর একটি লক্ষ্যণীয় বস্তু আছে। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাহারা দিবার রীতি এখানে নাই। ছাত্ররা প্রশ্নপত্র পাইয়া যাহার যেখানে খুশি গিয়া বসে, লেখা শেষ হইলে খাতাখানি নির্দিষ্ট স্থানে দিয়া যায়। আমার অভিজ্ঞতায় কখনো নকল করার অভিযোগ শুনি নাই। ছাত্রদের বিশ্বাস করিলে তাহারাও বিশ্বাস রক্ষা করিতে জানে।"

[—রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

কবির শিক্ষাপদ্ধতি ছিল যুগের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী। কবি চেয়েছিলেন সত্যিকারের শিক্ষা। সে শিক্ষায় মানুষ কাব্যের মাঝে রসগ্রহণ করতে পারবে, শিল্পের মাঝে সৌন্দর্য খুঁজে পাবে, প্রকৃতির মাঝে নিজের আনন্দময় স্বত্বাকে উপলব্ধি করবে। শিশু-মনকে বিকসিত করে তোলাই ছিল কবির বাস্তব কাব্য। ছেলেরা আনন্দ পেলে কবিও আনন্দ পেতেন। কবি বলেছিলেন—"বিধাতা আমাকে বর দিয়েছেন আমি বুড়ো হয়ে মরব না। সেইজন্যে যৌবন মধ্যাহ্ন পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশুদিগন্তের দিকে নেমেছে।···আমার মনিব এসেছেন শিশু হয়ে;···আগামী কালে যারা যুবক হবে আমি এখন তাদের সঙ্গ নিয়েচি। তাদের সেই ভাবী যৌবন নির্মল হবে, নির্ভয় হবে, বাধামুক্ত হবে, জড়তা, স্বার্থ, বা অনাদরের প্রবলতা বা প্রলোভনে আভিভূত না হয়ে সত্যের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করবে এই যে আমি কামনা করেচি সেই কামনা যদি আমার কিছু পরিমাণেও সিদ্ধ হয় তাহলেই আমার জীবন চরিতার্থ হবে।" [—চিঠিপত্র ৫ম

কবি আরেকটি শোক পেলেন।

জ্যৈষ্ঠা কন্যা বেলা দীর্ঘকাল অসুখে ভুগছিলেন, কবি প্রায়ই যেতেন তাঁকে দেখতে, একদিন দুপুর বেলা গিয়া শুনলেন—বেলা মারা গেছে।

কবি গৃহদ্বারে থমকে দাঁড়ালেন। ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়লেন। গৃহের মধ্যে আর ঢুকলেন না, মৃতা কন্যাকে দেখবার মত সাহস আর হলো না, গৃহদ্বার থেকেই কোনরকমে তিনি ফিরে এলেন।

একজন বললেন—একবার শেষ দেখা দেখবেন না?

কবি বললেন—আমি গিয়ে তার মুখের পানে তাকাতে পারি এমন শক্তি

আমার নেই। আমি এইখানে থেকে বেলার জন্য যাত্রাকালের কল্যাণ কামনা করছি। জানি আমার আর কিছু করবার নেই।

একে একে তিনটি ছেলেমেয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। শোকার্ত অন্তরের মাঝে কবি সান্ত্বনা খুঁজে ফেরেন।

"এই কথা শুনি সদা 'গেছে চলে' 'গেছে চলে'।
তবু রাখি বলে
বোলো না, 'সে নাই।'
সে কথাটা মিথ্যা, তাই
কিছুতেই সহে না যে,
মর্মে গিয়া বাজে।
মানুষের কাছে
যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে।
তাই তার ভাষা
বহে শুধু আধখানা আশা।
আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে সমুদ্রে আছে নাই পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।" [—পলাতকা

মুহ্যমান কবি ব্যথা ও বেদনাকে ভুলবার জন্য কাজের মাঝে নিজেকে ব্যস্ত করে তুললেন। শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন।

সকালে তিনটি ক্লাশে পড়ান।

তারপর স্নানাহার শেষ করে চিঠি লিখতে বসেন।

তারপর ছেলেদের কি পড়াবেন তাই তৈরী করে রাখেন।

সন্ধ্যাবেলা ছাদে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন, কোন কোন দিন ছেলেদের কবিতা শোনান। কখনো বা একাকী দিগন্তের পানে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকেন অন্ধকারের মাঝে। অতীত দিনের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলি তখন হয়তো মনের মাঝে যাওয়া-আসা করে, বেদনা ও আনন্দ মিশে যায় অন্ধকারের স্নিগ্ধতার মধ্যে। অনন্য সাধারণ প্রতিভা একান্ত সঙ্গীহীন অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকেন নিঃসীম অন্ধকার দিগন্তের পানে।

শান্তিনিকেতনের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে বাংলার বাইরে।

গুজরাট থেকে কয়েকটি ছাত্র এলো।

কয়েকজন গুজরাটি ব্যবসায়ী কবিকে কয়েক হাজার টাকা দিলেন।

শান্তিনিকেতনের সুদূর প্রসারী সম্ভাবনা এবার কবির মনে জাগলো। বললেন—"স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসচে—ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলন-যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।" [—চিঠিপত্র ২য়

১৯১৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর কবি বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপনা করলেন।

কবি বিরাট আদর্শকে রূপ দিতে চান কিন্তু অর্থাভাবে মাঝে মাঝে হতাশা দেখা যায়।—"আমার অবস্থা কোনো দিনই স্বচ্ছল হবে না। এক একবার ভ্রান্ত হয়ে ভাবি একটা সেক্রেটারি রাখা যাক্ কিন্তু সে আয়েসীটুকুও হিসাবে কুলায় না দেখতে পাই। কেননা রথীর সংসারেও দেখি অনটন, আমার ইস্কুলেও দেখি তাই, অতএব ডাইনে বাঁয়ে হিসাবের নিষ্ঠুর খাতার দিক থেকে দৃষ্টি বাঁচিয়ে চক্ষু বুজে মনের শান্তি রাখতে চেষ্টা করি। ঠিক এমন সময় যখন ১০ পার্সেণ্ট সুদে হ্যাণ্ডনোট সই করতে হয় তখন কোথায় যে দাঁড়িয়ে আছি ঠাওর পাইনে।" [—চিঠিপত্র ৫ম

কবি বেরুলেন দক্ষিণভারত ভ্রমণে।

মাদ্রাজে তিনি আনি বেশান্তের অতিথি হলেন। কবি তখন বেশান্তের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানসেলর। সেখানে কবিকে বক্তৃতা করতে হলো।

তারপর বাঙালুর, মহীশূর, উটী, কোইম্বটোর, পালঘাট, নেলোর, তাঞ্জোর, —কবি যেখানে যান, সেখানেই সভা, সম্বর্ধনা ও বক্তৃতা।

জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড সারা ভারতকে স্তম্ভিত করে দিল।

কবি সেই সংবাদ শুনে মূহ্যমান হয়ে পড়লেন।

"কেবল মনে হতে লাগলো এর কোন উপায় নেই, কোন প্রতিকার নেই, কোন উত্তর দিতে পারব না? এও যদি নীরবে সইতে হয় তাহলে জীবন-ধারণ যে অসম্ভব হয়ে উঠবে।"

সারারাত কবি ঘুমুতে পারলেন না।

শেষ রাত্রে বসে বসে তিনি একখানি চিঠি লিখলেন বড়লাটের কাছে। রাত চারটের সময় চিঠি লেখা শেষ হলো, তবে তিনি শুতে গেলেন।

কবি লিখলেন—"The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human life, we must strongly assert that it can claim no political expediency far less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence reaching every corner of India and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers—possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutory lessons.......................................

.........Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I, for my part wish to stand shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen, who, for their so called insignificancy are liable to suffer a degradation not fit for human beings and these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency with due reference and regret to relieve me of my tittle of Knighthood which I had the

honour to accept from His Majesty the King at the hands of Your Predecessor for which nobleness of heart I still entertain great admiration."

(—Rabindranath, the poet & philosopher)

এই চিঠির সঙ্গে কবি তাঁর 'স্যার' খেতাব ও পদক বড়লাটের কাছে ফেরৎ পাঠালেন।

এইটুকু করেই কবি থামলেন না, বড় বড় নামকরা নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন, বললেন—এই ব্যাপার নিয়ে একটি দেশব্যাপী আন্দোলন করুন।

কিন্তু নেতারা কেউ রাজী হলেন না।

তখন নেতাদের সঙ্গে গবর্মেণ্টের কোন একটা সুবিধা-সুযোগের পরামর্শ চলছিল, নেতারা সেই সুযোগ নষ্ট করতে চাইলেন না।

একজন নেতাকে কবি বললেন—একটা প্রতিবাদ সভার ব্যবস্থা করুন। আমিও বলবো, আপনারাও বলবেন।

নেতা বললেন—আপনিই সভা ডাকুন, আমরা না হয় সেই সভায় উপস্থিত থাকবো।

কবি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এত বড় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরে নেতাদের এই কি রাজনীতি?—"একে কি বলতে চাও? এই সব হোল পলিটিসিয়ানদের পলিটিক্স্! সুবিধা বুঝে চলতে হবে, এর সঙ্গে কখনো মন মেলাতে পারিনি। অবশ্য এ সব প্রটেস্ট মিটিং-এ যে বিশেষ কিছু ফল ছিল তা নয়, তবু অন্যায়ের প্রতিবাদ যথাসময় না করলে সেটা নিজের প্রতিও অন্যায়।" [—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে ॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।" [—গীতবিতান

গুজরাট সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হবার জন্য গান্ধিজী কবিকে আমন্ত্রণ জানালেন। কবি সবরমতী আশ্রম, আমেদাবাদ, ভবনগর, লিম্বডি, বোম্বাই সুরাট প্রভৃতি ঘুরে এলেন কয়েকদিন।

লিম্বডির মহারাজা কবিকে দশহাজার টাকা দিলেন শান্তিনিকেতনের জন্য।

এণ্ডরুজ ও পিয়ার্স'ন।

এণ্ডরুজ সাহেবের সঙ্গে কবির পরিচয় হয় বিলাতে রদেনস্টাইনের মাধ্যমে। আর পিয়ার্স'ন ছিলেন এ দেশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এঁরা দু'জনেই কবির ব্যক্তিত্বে ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন।

দু'জনেই বয়সে তরুণ, দু'জনেই উচ্চশিক্ষিত, দু'জনেই ছিলেন আদর্শবাদী। সেই আদর্শকে সফল করে তোলার জন্য উচ্চবেতনের চাকরী ছেড়ে দিয়ে তাঁরা চলে এলেন।

এঁরা দু'জনেই ছিলেন মহৎ ব্যক্তি। পিয়ার্স'ন ছিলেন শান্ত প্রকৃতির মানুষ। গৃহকোণে ছাত্র ও বন্ধুদের নিয়ে শান্তির পরিমণ্ডলে বাস করতেই তিনি ভালবাসতেন। মানব সেবার কাজে তাঁর উৎসাহ কম ছিল না। কিন্তু সেই সেবার গণ্ডি ছিল সংকীর্ণ। শান্তিনিকেতনের আশেপাশে যেসব সাঁওতাল পল্লী আছে সেখানে শিক্ষাপ্রসারে তাঁর অসীম উৎসাহ ছিল। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনেও তিনি ছিলেন সচেষ্ট। সেখানে তিনি নিজে গিয়ে তাদের শিক্ষা দিতেন। তাঁর কাছে নগণ্য কেউ ছিলেন না, যার পানে কেউ তাকায় না, তেমন মানুষেরও আদর ছিল পিয়ার্স'নের কাছে।

পিয়ার্স'ন স্থায়ী ভাবেই শান্তিনিকেতনে ছিলেন, ভালোমত বাংলা শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসখানির ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন। 'ফর ইণ্ডিয়া' নামে ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে তিনি একখানি বই লিখেছিলেন।

এণ্ডরুজ সাহেব ছিলেন সচল প্রকৃতির লোক। ছুটাছুটি, দেশবিদেশে যাওয়া, রাজকর্মচারীদের সঙ্গে দেখাশুনা করা, আলোচনার মাধ্যমে জটিল বিষয়ের সমাধান করা,—এসব ব্যাপারে এণ্ডরুজ সাহেবের বিশেষ দক্ষতা ছিল। আর্তত্রাণের জন্য তিনি সদাই উন্মুখ ছিলেন। ফিজি থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, দিল্লী থেকে অমৃতসর, আর্তত্রাণে সর্বত্রই তিনি ছুটে বেড়াতেন। মহাত্মা গান্ধী এজন্য তাঁকে 'দীনবন্ধু' আখ্যা দিয়েছিলেন, দীনবন্ধু এণ্ডরুজ নামেই তিনি এদেশে প্রসিদ্ধ। গান্ধিজীর সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা করিয়ে দিয়েছিলেন দীনবন্ধু এণ্ডরুজ, এবং তিনিই ছিলেন এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র।

পিয়ার্সন ও এণ্ডরুজ দু'জনেই ছিলেন অতি সরল মানুষ। শান্তিনিকেতনে যখন তাঁরা থাকতেন, তাঁরা দু'জনেই ধুতি পাঞ্জাবী চাদর পরতেন। একবার এণ্ডরুজ সাহেবের এক পায়ে ঘা হয়েছিল সে পায়ে তিনি জুতো পরতে পারতেন না, তখন তিনি এক পায়ে জুতো পরেই সারা আশ্রমে ঘুরে বেড়াতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন শেষ বয়সে হাঁটতে পারতেন না, তখন তিনি রিক্সা চড়ে আশ্রমে আসতেন, অনেক সময় এণ্ডরুজ সাহেব সেই রিক্সা টেনে নিয়ে আসতেন।

এণ্ডরুজ সাহেব ফিজি ও অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন, ফিরে এসে কবিকে বললেন, অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা কবিকে দেখতে চায়, সেখানে একবার যেতে হবে।

কবি যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। পাসপোর্টের জন্য এণ্ডরুজ সাহেব লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী গুরলের সঙ্গে দেখা করলেন। গুরলে বললেন—কবির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে, লোকে বলে কবি জাপানে ও আমেরিকায় গিয়ে ন্যাশান্যালিজমের উপর যে বক্তৃতা করেন তাতে দেশের যুবকদের মন ঘুরে গেছে। তখন নাকি তাঁকে টাকা জুগিয়েছিল জার্মানরা। তাছাড়া কয়েকজন ভারতীয় সানফ্রানসিস্‌কোতে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁদের কাছে যেসব কাগজপত্র পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এসব বিচার করলে কবির এখন বিদেশে না যাওয়াই ভাল।

কবি যাবার অনুমতি পেলেন না।

ইতিমধ্যে পিয়ার্সনকে পিকিং-এ ইংরাজ পুলিশ বন্দী করলো। ইতিপূর্বে পিয়ার্সন জাপান ও আমেরিকান কাগজে যে-সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেগুলি ভারত সরকারের মনোমত হয়নি। এই তাঁর অপরাধ।

এণ্ডরুজ সিমলায় গেলেন, বড়লাটের সঙ্গে দেখা করলেন। ফিরে এসে বললেন—বড়লাট পিয়ার্সনের উপর সন্তুষ্ট নন। কবিকে তিনি ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন। গদর পার্টির যে মামলা হয়েছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নামও যুক্ত হয়েছে, এ-কথাও বড়লাট বলেছেন।

গদরদের সঙ্গে কবির কোন যোগ ছিল না। কবি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি নিজে গিয়ে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। কবি তখনকার মত বিদেশে যাবার ইচ্ছাই ত্যাগ করলেন।

কয়েকটা মাস কেটে গেল, কবি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, বেরিয়ে পড়লেন।

কবি গেলেন বিলাতে। সঙ্গে পুত্র ও পুত্রবধূ।

পিয়ার্সন তখন মুক্তি পেয়েছেন; বিলাতে কবিকে পিয়ার্সন অভ্যর্থনা জানালেন প্লিমাউথে। কবি দেখা করলেন তাঁর পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে—রদেনস্টাইন, হার্ডসন, ফক্স্ স্ট্রাংওয়েজ, কানিংহাম, গ্রেহাম, নিকোলাস্ রোয়েরিক্, বার্নার্ডশ', গিলবার্ট মারে, প্রভৃতি।

ক্যামব্রিজে ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট সমিতি কবিকে সম্বর্ধনা জানালো। কবি লরেন্স বিনিয়ন একটি কবিতা রচনা করে দিলেন কবির প্রশস্তি করে, সেটি সেই সভায় পাঠ করেন বিখ্যাত অভিনেত্রী সিবিল থর্ণডাইক্। সেখানকার খ্যাতনামা অধ্যাপকদের সঙ্গে কবির আলাপ হলো। তাঁদের হৃদ্যতা কবিকে অভিভূত করে। কবি ভাবেন—'পর যখন আপন বলে মানে, তখন সেই মানার মধ্যে খুব বড় সত্য থাকে—সেই সত্যকে কোন কারণে অগ্রাহ্য করা চলে না।... যারা আইডিয়া নিয়ে কাজ করে তাদের পক্ষে সেই দেশই দেশ যেখানে সেই সব আইডিয়া বীজ-ক্ষেত্র পায়, সফল হয়—চাষী যদি সমস্ত সাহারা মরুভূমির মালেক হয় তাহলে যে তার পক্ষে ফাঁকী। [—চিঠিপত্র ৪র্থ খণ্ড

কবি সেই সভায় যে ভাষণ দিলেন, তাতে বললেন—প্রাচ্য ও প্রাতীচ্যের মিলনেই বিশ্বের শান্তি।

কবি গেলেন ব্রিস্টলে রাজা রামমোহনের সমাধি দেখতে।

এই সময় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলোচনা চলছিল। কবি গেলেন সেই আলোচনা শুনতে।

আলোচনা শুনে কবি বড় ব্যথা পেলেন, বললেন—"পার্লামেণ্টে ডায়ারের আলোচনায় ইংরাজ রাজনীতিকদের যে নীচ মনোবৃত্তির নগ্নমূর্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের ভারতবাসীর উপর যে জঘন্য উপেক্ষা, দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি মূর্ত হইয়াছে—তাহা আমার চিত্তকে নিদারুণ ব্যথা প্রদান করিয়াছে।" [—বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ

কবি ভারতসচিব মণ্টেগু ও সহকারী সচিব লর্ড সিংহের সঙ্গে দেখা করলেন এবং পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হলো না।

কবি চলে গেলেন ফ্রান্সে।

কবি আলবার্ট কানের অতিথি হলেন।

মহিলা-কবি কাউণ্টেস্ নোয়েইল (Comtesse de Noailles) এলেন কবির সঙ্গে আলাপ করতে। কথায় কথায় কবি নোয়েইল বললেন—১৯১৪ সালে যেদিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধলো, সেদিন ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রীর গৃহে কবি নোয়েইল অতিথি। জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করেছে। দেশের সর্বত্রই প্রবল উত্তেজনা। প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেন্সো চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, সারাদিন কর্মব্যস্ততা ও উত্তেজনার মধ্যে তিনি অশান্ত হয়ে কাটিয়েছেন। সন্ধ্যা বেলা কবি নোয়েইল প্রধান মন্ত্রীকে কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালেন, কবিতাগুলি গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদ। কবিতা পড়তে পড়তে মনের সব অশান্তি শান্ত হয়ে গেল। এই সংগ্রাম যে অন্তর্যামীর লীলার একটি খণ্ড-প্রকাশ, এবং তাঁর কাছে নতমস্তকে আত্মসমর্পণ করাই যে একমাত্র সত্য, সেই উপলব্ধি জাগলো মনে।

একজন বিদেশী কবি ও একটি শক্তিমান রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর উপর কবির কাব্যের এই প্রভাব, কবির অনন্য সাধারণ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি বলে অবশ্য স্বীকার্য।

কবি গেলেন ফ্রান্সের রণক্ষেত্র দেখতে।

মাইলের পর মাইল যুদ্ধবিধ্বস্ত প্রান্তর। সারি সারি ক্রুশ, হাজার হাজার অখ্যাত সাধারণ সৈনিকের সমাধি। একদল প্রাণ দিল প্রতিবেশীকে খর্ব করার জন্য, আরেকদল জীবন দিল আত্মরক্ষা করার জন্য—দু'দলই অকালে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ধরণীর বুক থেকে। মৃত্যু তাদের বিরোধের সমাপ্তি করলো। মাটির নীচে থেকে তাদের দীর্ঘশ্বাস উঠছে বুঝি, বাতাসের শনশন শব্দে বুঝি তারই প্রতিধ্বনি।

কবি গেলেন ফ্রান্সের সমুদ্রতীরে।

দিনকয়েক সমুদ্রতীরে থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ, ট্রেন থেকে নেমেই দেখেন কাপড়-জামার তোরঙ্গ চুরি হয়ে গেছে। যা পরে আছেন তা ছাড়া আর কোন সম্বল নেই। কাজেই যে ধনীর বাড়ীতে তিনি অতিথি হয়েছিলেন, সেখানে মাত্র তিনটি দিন কাটিয়েই তাঁকে আবার প্যারিসে ফিরতে হলো, জামা-কাপড় কিনতে হবে, নইলে ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

কবি গেলেন হল্যাণ্ডে।

রটারডাম সহরে ডাঃ জে, জে, ভাণ্ডার লোরেঞ্জের গৃহে কবি অতিথি হলেন।

ভাণ্ডার লোরেঞ্জ কবিকে নিয়ে হল্যাণ্ডের নানা পল্লী ও নগরে ভ্রমণ করেন। আমষ্টারডাম, হেগ্ ও রটারড্যামে কবি বক্তৃতা করলেন। হল্যাণ্ডের লোকেরা কবিকে গির্জার বেদী থেকে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী নন, এমন লোক আজ অবধি এই সম্মান পান নি।

ইউট্রেক্‌ট্-এর সুধীমণ্ডলী কবিকে সংস্কৃত ভাষায় অভিনন্দন-পত্র দেন।

সর্বত্রই শত শত লোক কবির কথা শুনতে আর তাঁকে দেখতে ছুটে আসতো।

কবি গেলেন বেলজিয়ামে।

ব্রুসেল্‌সে বেলজিয়ামের রাজা কবিকে সাদর সম্বর্ধনা জানালেন।

কবি ফিরে এলেন প্যারিসে। এবার প্যারিসের লোকেরা কবিকে সম্বর্ধনা জানালো। প্যালেস্-ডি-জাষ্টিস্ গৃহে জজের আসনে বসানো হলো কবিকে। কবি বললেন—'এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ ইউরোপের নিকট সেই শুভ-ইচ্ছা ও ভ্রাতৃভাব এবং সম-ব্যবহারের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন যাহার দ্বারা সমগ্র বিশ্বে চির শান্তি ও কল্যাণ বিরাজ করিবে।'

প্যারিসের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা সমিতি কবিকে ৩৫০ খানি মূল্যবান ফরাসী গ্রন্থ উপহার দিলেন শান্তিনিকেতনের জন্য।

কবি লিখলেন—'আমার ইউরোপ আসিবার পূর্ব পর্যন্ত কোন ধারণাই ছিল না যে আমার অভ্যর্থনার জন্য এতো আশাতীত আয়োজন হইবে। আমি দেখিতেছি পাশ্চাত্য দেশবাসী আমাকে কায়মনবাক্যে আত্মীয় করিয়া লইয়াছে।'

বিশ্বভারতীর জন্য টাকার দরকার। কবি সেই উদ্দেশ্যে আমেরিকা যাত্রা করলেন। সঙ্গে চললেন পিয়ার্সন।

যাবার সময় বিশ্বভারতীর জন্য জাহাজেই তিনি প্রায় ছ'শো টাকা সংগ্রহ করলেন। জাহাজে কবির ব্যক্তিত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে যাত্রীরা কবিকে অনুরোধ করেন একটা বক্তৃতা করার জন্য। কবি বক্তৃতা করেন ও বক্তৃতার শেষে সকলের কাছ থেকে বিশ্বভারতীর জন্য কিছু কিছু চাঁদা নেন, তাতেই ছ'শো টাকা ওঠে।

কিন্তু আমেরিকায় গিয়ে কবি অসুবিধায় পড়েন। আমেরিকানদের মধ্যে তখন প্রচারিত হয়েছে যে কবি বৃটিশ বিদ্বেষী ও জার্মানীর প্রতি সহানুভূতি

সম্পন্ন। তার ফলে কবির সভা করতে ও টাকা তুলতে পদে-পদে বাধা পেতে হয়।

কবি আমেরিকা থেকে লণ্ডনে ফিরে এলেন।

লণ্ডন থেকে কবি এলেন ফ্রান্সে। প্যারিসের প্রসিদ্ধ জহরৎ ব্যবসায়ী শ্রীধর রাণার একটি সুনির্বাচিত গ্রন্থাগার ছিল, তিনি সেটি কবিকে বিশ্বভারতীর জন্য দান করেন।

স্ট্রাসবুর্গে গিয়ে কবি সিলভাঁ লেভির সঙ্গে দেখা করলেন।

আলসেস্-এ-লোরেন-এর এক সভায় কবি বিপুল ভাবে সম্বর্ধিত হন। রবীন্দ্রনাথকে দেখবার ও তাঁর কথা শুনবার জন্য বিপুল জনতা হয়েছিল। যখন কবি জনতার মধ্য দিয়া যাচ্ছিলেন তখন চারিদিক থেকে বিপুল হর্ষধ্বনি উঠে দালানটি বিদীর্ণ হবার উপক্রম হয়—কিন্তু যখনই কবি আসন গ্রহণ করলেন অমনি মুহূর্তমধ্যে বিরাট সভাগৃহ—একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি কবিকে পরিচিত করিয়ে দিলেন, বললেন—রবীন্দ্রনাথের লেখা সমস্ত বিশ্বে আজ পরিচিত ও আদৃত। বুদ্ধ বশিষ্ঠ ব্যাস বাল্মীকি অগস্ত্য কালিদাস প্রভৃতির ন্যায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সুধীসমাজে অমর হয়ে থাকবেন।

মুসে গীমে ইনষ্টিটিউট-ডি-ফ্রান্সের সভায় ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সম্মান-পদক 'রিপাব্লিক ফ্রান্স' কবিকে দিলেন এমিলি সেনার্ট।

কবি গেলেন জেনিভা।

জেনিভা থেকে জার্মানী।

প্রিন্স অটো বিসমার্ক কবিকে সম্বর্ধনা জানালেন তাঁর দুর্গপ্রাসাদ ফ্রিড্রিক রূহে।

জার্মানীতে বিপুল সমারোহে কবির ৬১তম জন্মোৎসব পালিত হয়।

জার্মানী থেকে ডেনমার্ক।

কোপেনহেগেনে কবি যখন ট্রেন থেকে নামলেন তখন তাঁকে দেখবার জন্য স্টেশনে এতো ভীড় হয়েছিল যা আর কারও জন্য কখনও হয় নি।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার শেষে ছাত্রছাত্রীরা কবিকে নিয়ে মশাল-মিছিল বের করে। সেই মিছিল ডেনিশ জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে নানা রাজপথ ঘুরে কবিকে হোটেলে পৌছে

দেয়। রাত দশটা অবধি বিরাট জনতা হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে কবির জয়ধ্বনি দিতে থাকে। কবি বাতায়নে এসে জনতাকে প্রত্যাভিবাদন জানান বাংলা ভাষায়—জয় ডেনমার্কের জয়!

জনতা প্রত্যুত্তরে গগন বিদীর্ণ করলো—কবি রবীন্দ্রনাথের জয়!

কবি গেলেন সুইডেনে।

সুইডেনের শত শত চাষী পল্লী-শিল্প-সংগ্রহশালায় নৃত্যোৎসবের মধ্যে দিয়ে কবিকে সম্বর্ধনা জানালো।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিকে নোবেল-সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতে হয়। কবিকেও পুরস্কার-বক্তৃতা দিতে হলো। জ্ঞানী ও গুণীজনদের সেই সভায় উপসালার প্রধান ধর্মযাজক বললেন—সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার তাঁকেই দেওয়া উচিত যিনি সাহিত্যে সৃষ্টির শিল্পী ও ভাববাদী। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা আর কেহ সেই গুণের অধিকারী হতে পারেন নি।

সেই সভায় স্বেন হেডিন, সেল্‌মা লেগারলফ্‌, হালস্ট্রম, প্রভৃতি গুণীজন উপস্থিত ছিলেন।

উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিকে বক্তৃতা করতে হয়। কবিকে বিরাট শোভাযাত্রা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন আর্কবিশপ, তারপর মশালধারী, তারপর কবি, পিছনে বিভিন্ন শিক্ষা-সম্মান-পোষাক পরা পণ্ডিতগণ ও ধর্মযাজকগণ।

সুইডেনের রাজা রাজপ্রাসাদে কবিকে সম্বর্ধনা জানালেন।

সেখান থেকে বার্লিন।

এখানে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির বক্তৃতা শোনার জন্য দশহাজার লোক সমবেত হয়েছিল। সভাগৃহে স্থান সংকুলান হয়নি বলে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল আরও পনেরো হাজার লোক। সেই লোকের ভীড় ঠেলে সভামঞ্চে পৌছাতে কবির সময় লেগেছিল প্রায় আধ ঘণ্টা।

প্রুশিয়ার গ্রন্থাগারে রাজকীয় দলিলপত্র সংরক্ষণের যিনি ডাইরেক্টার ছিলেন, তিনি কবির কণ্ঠস্বর ফনোগ্রাফিক্ যন্ত্রে ধরে রাখার ব্যবস্থা করেন। কবির বনবাণী—'মেসেজ অফ ফরেষ্ট' বক্তৃতাটির রেকর্ড করা হয়। তারই সঙ্গে ধরা হয় কবির একখানি সংগীত—

"মোর বীণা উঠে কোন্ সুরে বেজে,
কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে…"

মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানালো।

মিউনিকে লেখক টমাসম্যানের সঙ্গে কবির পরিচয় হলো।

এই সময় মিত্রশক্তি জার্মানীতে অবরোধ-নীতি প্রয়োগ করে, তার ফলে জার্মানীতে খাবার যাওয়া বন্ধ হয়। দুধের অভাব দেখা দেয়। বহু শিশুর মৃত্যু ঘটে। শিশু-মঙ্গলের জন্য সারা দেশ জুড়ে অর্থসংগ্রহ করার চেষ্টা চলছিল। ছোট ছেলে-মেয়েদের এই কষ্টের কথা শুনে কবি স্থির থাকতে পারলেন না। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার দিনে টিকিট বিক্রি করে দশহাজার মার্ক সংগ্রহ হয়েছিল। সেই টাকাটা তিনি শিশুমঙ্গলের জন্য দিয়ে দিলেন।

কবি গেলেন ফ্রাংক্‌ফোর্টে। সেখান থেকে হেসের গ্রাণ্ড ডিউক রাজকীয় মোটরে কবিকে নিয়ে যান ডার্মষ্টড্‌ট্‌-এ। এক সপ্তাহ ধরে সেখানে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের আয়োজন হয়। সেই উৎসবের সময় গ্রাণ্ড ডিউকের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে নিত্য শত শত ব্যক্তির সমাগম হতো,—কেউ কবিকে দেখেই চলে যেত, কেউ শুনতে চাইত কবির মুখের কথা। কবি সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। কবির কথা ইংরাজি ভাষা থেকে জার্মান ভাষায় তর্জমা করে দিতেন কাউণ্ট কাইসারলিঙ। তিনি কবির পাশে পাশে থাকতেন।

কবি এখানে জার্মান শ্রমিকদের এক সভায় বক্তৃতা করেন।

কবি এলেন অস্ট্রিয়াতে। ভিয়েনায় কবি রাষ্ট্রপতির গৃহে অতিথি হন, সম্মান পান রাজার মত।

প্রেসিডেণ্ট ম্যাসারিক কবিকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান চেকোস্লোভাকিয়ায়। প্রাগে অধ্যাপক উইণ্টারনিজ ও ডক্‌টর স্টেলা ক্যাম্‌রিসের সঙ্গে কবির আলাপ হলো।

কবি এবার ফ্রান্সে ফিরে এলেন। সেখান থেকে দেশে ফিরলেন।

ইতিমধ্যে প্যারিস প্রবাসী ভারতীয়েরা ঠিক করলেন কবির জন্মদিনে একখানি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করবেন। ভারতীয় ও ইউরোপীয় সুধীজনদের লেখা থাকবে সেই গ্রন্থে। কিন্তু ফরাসী লেখকেরা যখন শুনলেন যে এই গ্রন্থে জার্মান লেখকেরাও লিখবেন তখন তাঁরা বললেন—তা চলবে না।

ভারতীয়রা সে-কথা মেনে নিতে পারলেন না। ফলে স্মারকগ্রন্থ আর প্রকাশ করাই হলো না; বিশ্বযুদ্ধ তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে, জাতি-বিদ্বেষ তখনও অত্যন্ত প্রবল।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দেশ-বিদেশের কাগজে রীতিমত আলোচনা সুরু হয়েছে।

অস্ট্রিয়ায় একখানি পত্রিকা লিখলো—'একজন ঋষিকে আমরা মুখোমুখি দেখলাম।...তাঁর হাতের একটি ইঙ্গিতেই মন্দিরের সামনের যবনিকা অপসারিত হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ দেউলের দৃশ্য প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারে আমাদের মানব চোখে। শত সহস্র মানুষ তাঁর বাণীর সম্মুখে নতজানু হয়ে বসতে পারে—তাঁর পরিধেয়ের প্রান্ত চুম্বন করতে পারে। সমগ্র মানব সমাজ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে শোনে—শত শতাব্দীর বাণী উচ্চারিত হচ্ছে।'

জার্মানদের এই প্রশংসা ফরাসীরা সইতে পারলো না, তারা লিখলো—'রবীন্দ্রনাথ যেন একজন হিন্দু টলস্টয়। যেমন আশা করা যায় তেমনিই জার্মানী তাঁকে প্রোপাগাণ্ডার জন্য ব্যবহার করছে। তিনি জার্মানীকে নিয়ে মাতামাতি করেছেন—যার জন্য রাইনের পশ্চাতের প্রেসগুলি গত কয়েক দিন ধরে সমস্বরে তাঁর জয়গান করছে।'

ইংরাজরাও ছাড়লো না, তারা লিখলো—'হামবুর্গে কবির প্রতি যে সম্বর্ধনা হয়েছে তা মূলতঃ প্রচারমূলক। এর জন্মদাতা হলো সেই সব জার্মান শিল্পপতি যারা এইভাবে ভারতীয় বিদগ্ধ সমাজের কাছে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে যা ভারতের বাজারে একচ্ছত্র বাণিজ্য অধিকারের পথ করে দেবে জার্মানীকে।'

আবার জার্মানীর বামপন্থীরা কবির উদ্দেশ্যে লিখলো—'তুমি তাদের দেখতে পাও না, যারা তোমায় খোঁজে—যারা তোমার লেখার মধ্যে দিয়ে তোমার সান্নিধ্যে পৌছেচে। এর পরিবর্তে তুমি দিন কাটাচ্ছ যত সব ধনী লোক আর আড়ম্বরসার মেয়েদের সাহচর্যে—তাদের দেওয়া সম্মানে তুমি খুশি হচ্ছ।... যদিও কবি বুর্জোয়াদের উদ্দেশ্যেই তাঁর বক্তৃতা দিচ্ছেন তবুও আমরা তাঁকে অপ্রশংসা করব না। এই বুর্জোয়া শ্রেণী তাঁকে নিজের দলে টানছে—চেষ্টা করছে তাঁর প্রাচুর্য নিয়ে নিজেদের সত্ত্বাহীনতা ভরিয়ে তুলতে। য়ুরোপ তোমাকে কবি বলে সত্যদ্রষ্টা বলে সম্মান করে। কিন্তু সে তোমার পথ জানে না—তোমার পথ সন্ধান করে না। যারা সে পথ খোঁজে তাদের পায়ে শৃঙ্খল। শৃঙ্খলিত তারা আর্তনাদ করে—মাথা তোলার চেষ্টা করে—একদিন তারা এই শৃঙ্খল চূর্ণ করবে। 'স্বাধীনতা'র জয়ধ্বনিতে সেদিন পৃথিবী কেঁপে উঠবে।...

[—বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

কবিকে নিয়ে ইউরোপে যখন এইভাবে রাজনীতিক আলোড়ন চলছে, কবির রচনার পাঠক সংখ্যা তখন বাড়ছে।

'ঘরে বাইরে'র অনুবাদ বেরিয়েছিল, দেড় লক্ষ বই দু'মাসে বিক্রী হয়ে গেল।

'সাধনার' জার্মান অনুবাদ পঞ্চাশ হাজার বই তিন সপ্তাহে শেষ হয়ে গেল।

'লণ্ডন ইভ্নিং-পোষ্ট' খবর দিল—১৯২১ সালের অক্টোবরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের আট লক্ষ কপি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

বার্মিংহামের 'দি মেল' খবর দিল—১৯২১ সালের গ্রীষ্মকালে জার্মান প্রকাশকেরা আমেরিকায় কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড কাগজের অর্ডার দিয়েছিল টেগোরের বই ছাপার জন্য। এই কাগজে ত্রিশ লক্ষ কপি বই ছাপা হয়।

ইংরাজরা চমকে উঠলো। এ শুধু জার্মানীর হিসাব। রবীন্দ্রনাথের বইয়ের দাম কম নয়। যুদ্ধে পরাজিত নিঃশেষিত জার্মানী সেই দাম দিয়েও যে এত বই কিনে পড়তে পারে, অস্ট্রেলিয়ার ধনীরাও তা ভাবতে পারেনি। সেখানকার পত্রিকা 'দি এডভারটাইজার' খবর দিল—টেগোরের এই সাফল্য চমকপ্রদ। এ বছরের সেরা কাটতি তাঁর বইয়ের।...সব থেকে সস্তা বইয়ের দাম হলো পনেরো মার্ক, আর তাঁর গ্রন্থাবলী আড়াইশ'-তিনশ' মার্ক মূল্যেরও আছে।

পরাধীন জাতির এক কবির পক্ষে এ বড় কম কথা নয়।

বিশ্বের সুধীজনদের শ্রদ্ধা নিয়ে কবি দেশে ফিরলেন।

ভারতে ইতিমধ্যে দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু হয়েছে—মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই নীতিকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না। এণ্ড্রুজ সাহেবকে তিনি লিখলেন—"যে লজ্জা অন্যায় ও অসম্মানে আমরা ক্ষুব্ধ তাই ফিরিয়ে দিতে চাইছি ইউরোপকে, কিন্তু সেকাজ করতে গিয়ে আমরা নিজেকে ছোট করে ফেলছি।...নৈতিক শক্তিকে অন্ধশক্তিতে পরিণত করা অপরাধ।...মহাত্মাজী সেবার জন্য আহ্বান করুন, আত্মোৎসর্গের জন্য ডাক দিন, যা প্রীতি ও নবজীবনে পরিণতি লাভ করবে। তিনি যদি আমাকে নির্দেশ দেন আমার দেশবাসীর সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সেবার কাজে সহযোগিতা করতে, আমি তাঁর পদতলে বসে সে নির্দেশ মত কাজ করতে রাজী আছি।

কিন্তু বিদ্বেষের আগুন জালিয়ে ঘরে ঘরে তা ছড়িয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের অপচয় করতে আমি সম্মত নই।" [—রবীন্দ্রনাথ—সু. দা.

এণ্ডরুজ সাহেব কিন্তু তখন মহাত্মাজীর নীতির পূর্ণ সমর্থক। তিনি কবিকে লিখলেন—"আমি আশাকরি আত্মোৎসর্গের উৎসাহ ও কষ্টস্বীকার করার আগ্রহ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ভারতের নিঃস্ব অপমানিত মূক জনগণের অন্তরে যে অতুল শক্তি অপেক্ষা করছে, তাকে আহ্বান জানিয়ে মহাত্মা ঠিক কাজ করেছেন। ভারতের ভাগ্য সহায় হিসাবে পেশীশক্তিকে গ্রহণ করেনি, আত্মশক্তিকে গ্রহণ করেছে। এবং ভারতবর্ষ মানুষের ইতিহাসকে দৈহিক বিরোধের কর্দমাক্ত স্তর থেকে উচ্চতর নৈতিক শক্তির স্তরে পৌঁছে দেবে।"

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে পরপর দুটি সভা হলো, কবি সেই সভায় নিজের ভাবধারা সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করলেন। কবি বললেন—"মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডীর মধ্যে সত্যকে পায় বলেই সত্যের পূজা ছেড়ে গণ্ডীর পূজা করে; দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে মানে; রাজাকে ভোলে দারোগাকে কিছুতেই ভুলতে পারে না। পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে; কিন্তু ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ সত্য নয়,…যুদ্ধ যখন পূরোদমে চলছিল তখন সকলেই ভাবছিল যুদ্ধ মিটলেই অকল্যাণ মিটবে। যখন মিটল তখন দেখা গেল ঘুরে-ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধিপত্রের মুখোস পরে।…পশ্চিমের মনীষী লোকেরা ভীত হয়ে বলেছেন যে, যে দুর্বুদ্ধি থেকে ঘটনার উৎপত্তি এত মারের পরেও তার নাড়ী বেশ তাজা আছে।…এই দুর্বুদ্ধির নাম ন্যাশনালিজ্‌ম্‌, দেশের সাবজনীন আত্মম্ভরিতা।..

"স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা।…

"এই জন্যই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-নিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটেনি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই।…

"…ভারত আজ সমস্ত পূর্ব ভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে তার আসন পড়বে।" [—শিক্ষার মিলন

"...আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।...দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্ম্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি, তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, এই জন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।...

"...স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কাল-সাধ্য; তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যাঁরা যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্ম্মে লাগতে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগ্রত হতে হবে।.. এই যে দেশের বিচিত্র শক্তিকে তলব দেওয়া এবং তাকে নিজের নিজের কাজে লাগানো, এ পারে কে?...মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন...কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন—কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতা কাটো, কাপড় বোনো। এই ডাক কি সেই 'আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা!' এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক? ...চরকা কাটা একদিকে অত্যন্ত সহজ, সেইজন্যেই সকল মানুষের পক্ষে তা শক্ত।...চরকা যেখানে স্বাভাবিক সেখানে সে কোন উপদ্রব করে না, বরঞ্চ উপকার করে—মানব মনের বৈচিত্র্যবশতই চরকা যেখানে স্বাভাবিক নয় সেখানে চরকার সুতা কাটার চেয়ে মন কাটা যায় অনেকখানি। মন জিনিষটা সুতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।...কাপড় পোড়ানোর হুকুম আমাদের 'পরে এসেছে। সেই হুকুমকে হুকুম বলে আমি মানতে পারব না।...যে কলের দৌরাত্ম্যে সমস্ত পৃথিবী পীড়িত মহাত্মাজি সেই কলের সঙ্গে লড়াই করতে চান, এখানে আমরা তাঁর দলে। কিন্তু যে মোহমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধ বাধ্যতা আমাদের দেশের সকল দৈন্য ও অপমানের মূলে তাকে সহায় করে এ লড়াই করতে পারব না। কেন না, তারই সঙ্গে আমাদের প্রধান লড়াই—তাকে তাড়াতে পারলেই তবে আমরা অন্তরে বাহিরে স্বরাজ পাব।" [—রবীন্দ্রনাথ

গান্ধিজী এর উত্তর দিলেন ইয়ং ইণ্ডিয়াতে 'গ্রেট সেন্টিনেল' নামে এক প্রবন্ধ লিখে। তারপরেই মহাত্মাজী নিজে এলেন কবির কাছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কবির সঙ্গে মহাত্মাজীর প্রায় চার ঘণ্টা ধরে আলোচনা

হলো। কি আলোচনা হলো, দুই মহামনীষীর আদর্শবাদের সংঘাত কোথায় কিভাবে একীভূত হলো, তা বাইরের কেউ জানলো না। সেই ঘরের মধ্যে সেই আলোচনার একমাত্র সাক্ষী ছিলেন দীনবন্ধু এণ্ডরুজ।

কবি গ্রাম-উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু যতটা সাধ থাকে তত সাধ্য থাকে না। যে টাকার প্রয়োজন তা সবসময় কবির কাছে থাকে না। কিন্তু কবির কর্মশক্তির উৎস ছিল মনোবল। কোন কাজে হাত দিয়ে হতাশ হবার মানুষ তিনি ছিলেন না। সুরুলের গ্রাম উন্নয়নের জন্য কবি নিজে দিলেন আঠারো হাজার টাকা। তারপর এল্‌মহার্ষ্ট সাহেব এনে দিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা, এই টাকাটা দিয়েছিলেন শ্রীমতী স্ট্রেট নামে এক মহিলা।

কবি কাজ করে চললেন।

স্যার রতনজী টাটা দিলেন পঁচিশ হাজার টাকা শান্তিনিকেতনে অতিথি-শালা তৈরী করার জন্য, সেখানে বিদেশী অধ্যাপকেরা থাকবেন। অতিথি-শালার ভিত্তিস্থাপনা করলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তারা-পুরওয়ালা। কবি দাতার নামে অতিথিশালার নাম রাখলেন—'রতনকুঠি।'

কিন্তু কবির কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে এখনও যে অনেক টাকা চাই! অর্থাভাব কবির চিত্তকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।—"যখন মন শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন বিশ্বভারতীকে মরীচিকা বলে মনে হয়—তখন বুঝতে পারি যখন কবিত্ব রচনা করেছি সেই ছিল আমার বাস্তবিক কাজ আর আজ যখন শুভানুষ্ঠানের পাকা ভিত্তি পত্তন করতে বসেছি এই হচ্ছে মায়া। এ কি টিঁকবে? আইডিয়া জিনিষটা সজীব কিন্তু কোনো ইনষ্টিট্যুশনের লোহার সিন্ধুকে ত তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না—মানুষের চিত্তক্ষেত্রে যদি সে স্থান পায় তবেই সে বর্তে গেল। দেশের চিত্তের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি, তখন দেখতে পাই বিপুল কাঁটাবন—সেখানে খোঁচার আইডিয়ার মধ্যে ফসলের আইডিয়া কি স্থান পাবে?

[-চিঠিপত্র ৫ম

কবি স্থির করলেন বিশ্বভারতীকে জাতীয় সম্পত্তি করে দেবেন। ৮ই পৌষের উৎসব-সভায় আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এলেন সভাপতি হয়ে। সেই সভার মাঝে কবি সর্বস্ব দান করে দিলেন বিশ্বভারতীর নামে—নোবেল পুরস্কারের টাকা, সমস্ত সম্পত্তি, শান্তিনিকেতনের জমি, বাড়ী, লাইব্রেরী এবং সমস্ত গ্রন্থের স্বত্ব হলো বিশ্বভারতীর।—

"শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু করো না সঞ্চয়,
নাহি শোক, নাহি ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।
যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।"

শান্তিনিকেতনে উৎসবের সমারোহ। ৭ই মে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব। 'মুক্তধারা' অভিনয়ের আয়োজন চলছে, এমন সময় সংবাদ এলো—গান্ধিজী গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁর ছ' বছর কারাদণ্ড হলো।

কবি অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। শান্তিনিকেতনে কবি-জন্মোৎসবে কোন আড়ম্বর হলো না।

ভারাক্রান্ত মনে কবি একদিন বেরিয়ে পড়লেন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে।
দক্ষিণ ভারত থেকে কবি গেলেন সিংহলে।

চীন যাবার ইচ্ছা কবির অনেক দিনের কিন্তু হাতে টাকা নেই। কে যেন কথাটা বললো শেঠ যুগলকিশোর বিড়লাকে। টাকার জন্য কবির চীন দেশে যাওয়া হবে না? যুগোলকিশোরবাবু তখনই কবিকে দশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন। সেই টাকা নিয়ে কবি বেরুলেন চীনভ্রমণে। সঙ্গী হলেন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, ডাঃ কালিদাস নাগ ও এল্‌মহার্স্ট সাহেব।

কবি রেংগুনে পৌছতেই জাহাজঘাটা থেকে শোভাযাত্রা করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো জুবিলী হলে। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো সভাগৃহ। ব্রহ্মবাসীরা অভিনন্দন জানিয়ে বললো—হে এশিয়ার রাজকবি, আপনার প্রতিভার খ্যাতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে সমুজ্জল করে তুলেছে, আপনি বিশ্বের নাগরিক, আপনাকে এই সার্বজনীন নগরে স্বাগতম জানাই।

কেমেনডাইন চীনা ইস্কুলে কবিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে চীনারা বললেন—আপনি বাংলা দেশে জন্মেছেন, কিন্তু বিশ্বের আপনি পালিত পুত্র।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি শাখা আছে রেংগুনে। পরিষদের সদস্যরা কবিকে সম্বর্ধনা জানালেন। সভাপতি হলেন 'রেংগুন মেলের' সম্পাদক এন, সি, চ্যাটার্জী।

তারপর পেনাং। পেনাং থেকে সাতাশ মাইল পথ মোটরে অতিক্রম করে কবি গেলেন কুয়ালালামপুরে।

তারপর হংকং। হংকং-এর এক সভায় কবি চীনাদের বললেন—"আমার স্মরণপথে সেই কথাই বার বার উদয় হইতেছে—ভারত যখন তার প্রেম ও জ্ঞান লইয়া চীনের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন আচার্যেরা আসিয়ছিলেন ভ্রাতৃভাবে আপনাদের সহিত আবদ্ধ হইতে। সে সম্বন্ধ এখনও রহিয়াছে, তবে তাহা চীনবাসীদের অন্তরের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মতন। বহু শতাব্দীর ঔদাসীন্যে সেই পথ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আছে। কিন্তু তাহার চিহ্ন এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সেই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন দৃঢ় করিতে আমি আপনাদের সাহায্য চাই। যুগের পর যুগ এশিয়া বহু মহাপুরুষের জন্মদান করিয়াছে, যাঁহারা বিশ্বশান্তি ও ভ্রাতৃত্বের দূতস্বরূপ ছিলেন। আমার আশা অচিরে তেমনই একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে।"

পিকিন-এ কবিকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানো হলো।

তারপর সুরু হলো একটির পর একটি সম্বর্ধনা সভা ও কবির ভাষণ। প্রথম বক্তৃতা হলো ওয়াগনস্লিট্স্ হোটেলে। সেখানে কবির বাণী শোনার জন্য এতো বেশী জনসমাগম হয়েছিল যা এখানে কোনদিনই হয়নি। কবি এখানে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বললেন।

তারপর এংলো-আমেরিকান এসোসিয়েশনে সম্বর্ধনা। কবি এখানেও বিশ্বমৈত্রীর আহ্বান জানালেন—"প্রকৃত স্বাধীনতার বীজ শিক্ষা ও মানবের সাম্য-মৈত্রী-ভাবের মধ্যে নিহিত আছে, ইহাই আমি অনুভব করিয়াছি।"

[—বিশ্বভ্রমণে · ·

ভূমিদেবীর মন্দিরে চীনবাসীর এক সভায় কবি শোনালেন প্রাচ্যের মর্মকথা—"এক সময় এ জগৎকে বর্বরতা হইতে এশিয়াই উদ্ধার করিয়াছে। জানি না কোন অপরাধে য়ুরোপ আজ এশিয়ার উপর আধিপত্য করিতেছে। আমরা এশিয়াবাসীরা মনে করি আমাদের কিছুই নাই, তাই আমরা

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ভিক্ষুকেরই মতন গ্রহণ করিতেছি। আমাদের এই অজ্ঞান এই মোহাচ্ছাদিত অবস্থা হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। আমরা যে দীন ভিক্ষুক নই, তাহাই প্রমাণ করিতে হইবে। ইহাই আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব। তোমার নিজের গৃহে যে অমর অমূল্য সামগ্রী আছে তাহাই সন্ধান কর। তাহা হইলে তুমিও বাঁচিবে এবং বিশ্বমানবকেও বাঁচাইতে পারিবে। পরস্বাপহরণ ও পরজাতি শোষণ করিয়া পাশ্চাত্য দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আমাদের জন্মগত স্বার্থরক্ষা করিতে চাই। প্রাচ্যবাসী পশ্চিমকে নির্বিচারে কেবল অনুকরণ করিবে, আমি তাহা বিশ্বাস করি না, পাশ্চাত্য যাহা বাহির করিয়াছে—তাহা পাশ্চাত্য দেশেরই উপযোগী স্বধর্ম। আমরা প্রাচ্যদেশের অধিবাসীরা পাশ্চাত্য মনোভাব ও বৃত্তির অনুকরণ কখনও করিতে পারিব না। পশুশক্তি পৃথিবীতে আজ সর্বাপেক্ষা বলবান। এই শক্তি নিজেকেই ধ্বংস করে। মেসিনগান ও এরোপ্লেন মানবের সকল সৃষ্টি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলে। এইজন্য পাশ্চাত্য দেশ আজ ধূলিকণায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। আমরা কখনও প্রতিযোগিতায়, নৃশংসতায়, স্বার্থপরতায় পাশ্চাত্যবাসীর পদানুসরণ করিব না।" [—ঐ

চীনদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত লিয়াং-চি-চাও-এর সঙ্গে কবির পরিচয় হলো।

চীন সম্রাট কবিকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন সুয়ানটুং রাজপ্রাসাদে।

চীন সম্রাটের বিরাট প্রাসাদ। প্রধান তোরণ থেকে রাজপ্রাসাদে যেতে প্রায় একঘণ্টা সময় লাগে। এঁকে-বেঁকে ঘুরে-ফিরে প্রাঙ্গণের পর প্রাঙ্গণ পার হয়ে যেতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যান তাঞ্জামে, আর সকলে পিছনে পদব্রজে অনুগমন করেন।

একে একে সারি দিয়ে সবাই এসে দাঁড়ান সভাগৃহে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সামনে। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী দণ্ডায়মান হয়ে অভ্যর্থনা করেন সকলকে। কবির সঙ্গে ছিল ঢাকাই শাঁখা, কবি সেই শাঁখা সম্রাজ্ঞীকে উপঢৌকন দিলেন। আশীর্বাদ করলেন—চিরসাধ্বী হোন্, সুখ-শান্তিতে জীবন সমুজ্জ্বল হোক্!

এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেব কবির পুস্তকাবলী সম্রাটকে উপঢৌকন দিলেন।

নন্দলালবাবু কতকগুলি ছবি দিলেন।

সম্রাট স্বয়ং এবার অতিথিদের নিয়ে প্রাসাদের ঘরগুলি দেখালেন, প্রাচীন মূল্যবান যত সংগ্রহ। এ সমস্ত দেখার সৌভাগ্য কারও হয় না। শেষে সম্রাট কবিকে একটি মূল্যবান বুদ্ধমূর্তি উপহার দিলেন।

কবি গেলেন লুংমেন-এ। লুংমেন বৌদ্ধতীর্থ। এখানে হাজারখানেক গুহা মন্দির আছে। সেই সব মন্দিরের গায় বুদ্ধের শত শত জীবন-কাহিনী খোদাই করা আছে।

এই সময় কবির জন্মদিন এসে পড়লো। চীনদেশে মহাসমারোহে কবির জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হলো। ৮ই মে এক বিরাট সভায় ডাঃ হুসী হলেন সভাপতি। লিয়াং-চি-চাও চীনবাসীর পক্ষ থেকে কবিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে, কবির নূতন নাম দিলেন 'চ্যু-চেন-তান' অর্থাৎ ভারতের বজ্রঘোষিত প্রাতঃকাল।

এই সভায় কবি উপস্থিত হয়েছিলেন বাঙালীর পরিচ্ছদে।

ক্ষিতিমোহনবাবু বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে শুভানুষ্ঠানকে পূর্ণাংগ করেছিলেন। কালিদাসবাবু কবির বাংলা কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন সমবেত সুধীজনদের। অনুষ্ঠানের শেষে চীনারা 'চিত্রা' অভিনয় করে।

চীনদেশ থেকে কবি গেলেন জাপানে।

জাপান-প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সেদেশে কবিকে নানাভাবে সহায়তা করেন। আন্তর্জাতিক মিলন সম্পর্কে কবি কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। কবি বললেন—'তোমাদের আমি ভালবাসি। কিন্তু অপর জাতির সঙ্গে ব্যবহারে তোমরা সেই নিষ্ঠুরতা অনুকরণ করছ পাশ্চাত্যজাতিরা যে পদ্ধতিতে কৃতিত্ব অর্জন করেছে।...তোমরা যদি শান্তি চাও এই 'নেশান' রূপ দৈত্যের বিরুদ্ধে তোমাদের সংগ্রাম করতে হবে।'

জাপান তখন এশিয়া জয়ের স্বপ্ন দেখছে, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের কথা তাদের ভাল লাগলো না।

কবি ফিরলেন স্বদেশে। শান্তিনিকেতনের নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তির মধ্যে কয়েকটা দিন কেটে গেল।

ইতিমধ্যে লর্ড লিটন ঢাকায় এক বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি পুলিশের কাজের প্রশংসা করলেন এবং তারই সঙ্গে বাংলার মেয়েদের সম্পর্কে এক কুৎসিৎ মন্তব্য করলেন। সেই মন্তব্যে সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ উঠলো। কবিও ব্যথিত হলেন, এক চিঠি লিখলেন লাটসাহেবের কাছে।

সেই চিঠির উত্তরে লাটসাহেব দুঃখ প্রকাশ করলেন।

দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু রাজ্য। সেখানে স্বাধীনতার শত-বার্ষিকী

উৎসব। তারা কবিকে আমন্ত্রণ জানালো সেদেশে যাবার জন্য। কবি বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু জাহাজে কবি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পেরু অবধি কবির যাওয়া হলো না, ডাক্তাররা বললেন—এই শরীরে পাহাড়ী পথে ট্রেণে যাওয়া চলবে না।

বুয়োনিস্-এয়ারিসে কবিকে নামতে হলো।

বুয়োনিস্-এয়ারিস্ আর্জেন্টিনার রাজধানী। এখানে কবিকে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম করতে হলো দু' মাস। নাগরিকেরাই সব-কিছু ব্যবস্থা করে দিলেন। সঙ্গে রইলেন এল্‌মহার্ষ্ট আর ম্যাডাম ভিক্‌টোরিয়া ওকুম্পা। মাঝে কিছু দিনের জন্য ম্যাডাম ভিক্‌টোরিয়া ওকুম্পার বাগান-বাড়ীতে তিনি অতিথি হয়েছিলেন। এই মহিলার সেবা কবিকে মুগ্ধ করে, কবি তাঁর বাংলা নাম দেন 'বিজয়া'। সেদেশ থেকে কবি লিখলেন—"এখানে এসে কিছুকাল ধরে ডাক্তারের হাতে ছিলুম। এখন আর কোন উপদ্রব নেই। কিন্তু বক্তৃতা প্রভৃতি সব বন্ধ। সহরের বাইরে সুন্দর জায়গায় একটি বাড়ি আমাদের জন্যে ঠিক করে দিয়েছে। মস্ত একটা নদীর ধারে। আমাকে খুব নিকট আত্মীয়ের মতন এরা যত্ন করে—আমার যা কিছু দরকার সমস্ত এরা জুগিয়ে দিচ্ছে। আমি সমস্ত দিন খোলা জানালার কাছে বসে কুঁড়েমি করে কাটাচ্ছি। একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, এখানে ঘরে ঘরে সবাই আমার বই পড়েছে, আর আমাকে একান্ত শ্রদ্ধা করে।...এ পর্যন্ত আমি কোন মিটিং-এ যাইনি, অনেকেই আমাকে এখন দেখতে পায়নি—চারদিক থেকে কেবল চিঠি আসচে, ফুল আসচে, আর আমার নাম সই নেবার জন্যেই বই আসচে।" [—চিঠিপত্র ৪র্থ

পেরুর শতবার্ষিকী উৎসবে কবির আর যাওয়া হলো না।

কবি ফিরলেন। ফেরার পথে কবি নামলেন ইতালীতে। মিলানের সভায় কবিকে দেখবার জন্য অভূতপূর্ব জনতা হয়েছিল। পিপ্‌লস্ থিয়েটারে চার হাজার ছেলেমেয়ে কবিকে সম্বর্ধনা জানালো। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী 'রিয়েভি' এসে বললেন—আমি আপনার ছবি আঁকবো।

প্রতি সহর থেকে নিমন্ত্রণ এলো কিন্তু কবি যেতে পারলেন না কোথাও। অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক'দিন মিলানে বিশ্রাম করে গেলেন ভিনিসে। স্টেশনে স্টেশনে শত শত ছাত্রছাত্রী কবিকে অভিনন্দন জানালো—Viva la Poeta Indien, Viva Tagore!

ভিনিস থেকে যেদিন জাহাজে উঠলেন, একটি মেয়ে এলো একরাশ ফুল

আর আঙুর নিয়ে, বললো—সতেরো বছর বয়সে আপনি এসেছিলেন, তখন যে বাগানে আপনি এসেছিলেন এগুলি সেই বাগানের; আপনার জন্য এনেছি।

অসুস্থতার জন্য কবিকে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে হলো।

কবি দেশে ফেরার ক'দিনের মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মারা গেলেন রাঁচিতে। এক বছরের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ মারা গেলেন শান্তিনিকেতনে। লখনৌতে নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনীর অধিবেশন বসেছে, কবি হয়েছেন তার সভাপতি। সেই সম্মেলনীর অধিবেশনের মধ্যেই কবি সংবাদ পেলেন যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে মারা গেছেন।

বছর তিনেক আগে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে।

কবির একান্ত আপনার জন, কৈশোর যৌবন ও বার্ধক্যের অন্তরঙ্গ সাথী আর কেউ রইল না। একান্ত সঙ্গীহীন কবি অনিবার্য শোককে মাথা পেতে গ্রহণ করলেন।—

"তাই ত যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে বারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ন বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,—
বলে নে ভাই, এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো, এই ভালো!
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্না-হাসির গঙ্গাযমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।......"

দেশবন্ধু মারা গেলেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কবিকে বললেন—একখানি ফটোর নীচে কিছু লিখে দিন, সেই ফটো বিক্রী করে স্মৃতিরক্ষা তহবিলের জন্য কিছু টাকা তুলতে হবে।

কবি লিখে দিলেন—"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

এই বৎসর কলিকাতায় নিখিল ভারত দর্শন সম্মেলন বসে, কবি তার সভাপতি হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে কবি আমন্ত্রিত হলেন। সেখানকার অনেকগুলি সভায় তাঁকে বক্তৃতা করতে হয়েছিল।

ফেরার পথে কুমিল্লায় অভয় আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। সেখানকার নমঃশূদ্র সম্মেলনেও যোগ দেন ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদাররা কবিকে দেড় হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দিলেন।

৭ই মে কবির ৬৫ বৎসর পূর্ণ হলো। কবির জন্মোৎসবে পোর-বন্দরের মহারাজা শান্তিনিকেতনের কলাভবনের জন্য কবিকে কয়েক হাজার টাকা উপহার পাঠিয়ে দিলেন।

জেনেভা থেকে জাতি-সঙ্ঘের প্রতিনিধি এলেন শান্তিনিকেতনে—লেখক এফ. এম. মার্ভিন।

ইতালী থেকে মুসোলিনীর দু'জন দূত এলেন শান্তিনিকেতনে—অধ্যাপক কার্লে ফার্মিকি ও অধ্যাপক টুচ্চি। তাঁদের হাতে মুসোলিনী উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন প্রচুর বই। মুসোলিনীর পক্ষ থেকে তাঁরা কবিকে নিমন্ত্রণ জানালেন ইতালী যাবার জন্য।

কবি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সঙ্গে চললেন পুত্র, পুত্রবধূ, নন্দিনী, অধ্যাপক, গৌরগোপাল ঘোষ, রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ, প্রেমচাঁদ লাল, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও তাঁর পত্নী, এবং প্রশান্ত মহালনবিশ ও তাঁর পত্নী।

নেপল্‌সে জাহাজ থেকে নামতেই স্পেশ্যাল ট্রেনে কবিকে রোমে নিয়ে যাওয়া হলো। মুসোলিনী এসে কবিকে অভ্যর্থনা জানালেন, বললেন—ইতালীয় ভাষায় আপনার যে-সব বই অনূদিত হয়েছে, তার সবগুলি পড়েছেন বলে যাঁরা গর্ব করতে পারেন, আমি তাঁদেরই একজন, আমি আপনার একজন প্রধান ভক্ত। বর্তমান পৃথিবীর মধ্যে আপনি একজন শ্রেষ্ঠ ও মহান্‌ ব্যক্তি, আপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হওয়ায় আজ আমি আনন্দিত।

ইতালীর রাজা কবিকে সম্বর্ধনা জানালেন রোমের রাজপ্রাসাদে।

ইতালিয়ান ভাষায় 'চিত্রা'র অভিনয় করে কবিকে দেখানো হলো।

রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সম্বর্ধনা সভায় রেক্টর বললেন—আজ রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরম শুভদিন। বর্তমান যুগের মনীষী-কুলের মধ্যে একজন পবিত্র, উদার, যুগপ্রবর্তক মহাপ্রাণ আজ এখানে পদার্পণ করে আমাদের ধন্য

করেছেন।…নিখিলের সুখে দুঃখে আন্দোলিত তাঁর কবিতা কেবলমাত্র হৃদয়োচ্ছ্বাস নয় তা আজ সমগ্র মানবের জীবন-দর্শন।…

শ্রীমতী ভেরাচার্টা নামে একটি মেয়ে ছাত্রদের পক্ষ থেকে কবিকে একটি ফুলের তোড়া দিয়ে একটি সংস্কৃত শ্লোক বলে শ্রদ্ধা জানালো—"ভদন্ত তানি পুষ্পানি অস্মাকম স্নেহম্ মানম্ চ। পুষ্পানি এতানি তু ম্লানম্ গমিষ্যন্তি নতু অস্মৎ স্নেহম্ মানম্ চ॥"

রোমের শিশুরা কবিকে সম্বর্ধনা জানালো এক শিশু-উৎসবে। রোমের কলোসিয়ামে পঁচিশ হাজার দর্শকের সামনে এক হাজার ছেলে-মেয়ে ঐক্যতান বাজনা বাজিয়ে কবিকে অভিনন্দিত করলো।

ইতালীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচেকে রাখা হয়েছিল নির্বাসনে। কবি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। মুসোলিনী তখনই বিশেষ নির্দেশ দিয়ে ক্রোচেকে আনালেন রোমে। দুই দেশের দুই বিশিষ্ট চিন্তানায়কের মধ্যে সাক্ষাৎ হলো।

তারপর ফ্লোরেন্স ও তুরিণ। ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বর্ধনা সভায় অধ্যাপক পাভোলিনি কবিকে একটি সংস্কৃত শ্লোক বলে অভিনন্দিত করলেন।

তুরিণে সংগীত বিদ্যালয়ে শ্রীমতী ম্লাডা লিপোভেৎস্কা নামে এক গায়িকা কবির তিনখানি গান বাংলায় গেয়ে শুনিয়ে দিলেন।

বয়স হয়েছে, দিনের পর দিন বক্তৃতা করতে করতে কবি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, কিছুদিন বিশ্রাম করার জন্য তিনি গেলেন সুইট্জারল্যাণ্ডে। 'ভিলেন্যুভ্'-এ হোটেল বাইরোনে যে ঘরে একদিন ভিক্টর হিউগো থাকতেন, সেই ঘরেই কবিকে থাকতে দেওয়া হলো। হ্রদের তীরেই হোটেল। জানালা দিয়ে হ্রদ দেখা যায়। চারিপাশে পাহাড়ের সারি ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত অবধি। কবি আত্মসমাহিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন সেই পাহাড়ের পানে, সেই হ্রদের পানে, সুনীল আকাশের পানে, পাইন গাছের ঘোমটায় ঢাকা স্তিমিত দিগন্তের পানে। সেই শান্ত পরিবেশের মাঝে কবি-চিত্ত প্রশান্ত হয়ে ওঠে।

বারোদিন সেইখানে কবি ছিলেন।

এই পল্লীতে থাকতেন রমঁ্যা রোলাঁ। কবির সঙ্গে নিত্য তাঁর দেখা হতো। দু'জনের মধ্যে সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নানা আলোচনা হতো। দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠলো বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গতা। রোলাঁ একদিন কবিকে বললেন—ইতালীর ফ্যাসিষ্ট কাগজগুলি কবির মতামত বিকৃত করে ছাপছে।

তারপর নির্বাসিত স্যাল্‌ভাডোরির পত্নীর সঙ্গে জুরিখে কবির আলাপ হলো। মহিলার মুখ থেকে কবি শুনলেন ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারের নানা কাহিনী।

ভিয়েনায় গিয়ে কবির সঙ্গে পরিচয় হলো ডাঃ এঞ্জেলিকা বালবানোফ ও সিনিয়র মডিগলিএলির সঙ্গে। এঁদের মুখ থেকেও কবি ফ্যাসিজ্‌মের আরো অনেক অত্যাচারের কাহিনী শুনলেন।

এবার কবি বুঝতে পারলেন মুসোলিনী তাঁকে যে সম্মান দিয়েছেন, তার পিছনে ছিল রাজনীতিক উদ্দেশ্য। তিনি সরকারী অতিথিরূপে ইতালী ভ্রমণ করেছেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে ফ্যাসিজ্‌মের রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি। কবি এই সম্পর্কে একখানি চিঠি লিখলেন এণ্ডরুজ সাহেবের কাছে। সেই চিঠি ছাপা হলো 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়েন'-এ। এর ফলে ইতালীয় গবর্মেণ্টের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

কবি এলেন ভিয়েনায়, সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

একটু সুস্থ হয়েই কবি গেলেন প্যারিসে। এম-এ-কাঁনের মনোরম বাগান-বাড়ীতে কয়েকটি দিন কবি বিশ্রাম করলেন। এখানে সুইডিশ শিল্পী হগ্‌ম্যান, হগ্‌ম্যানের পত্নী ফরাসী শিল্পী আঁদ্রে প্রভৃতির সঙ্গে কবির হৃদ্যতা হলো। হগ্‌ম্যান্ কবির একখানি প্রতিকৃতি আঁকলেন এবং তাঁর নিজ বাসগৃহের নাম দেলেন,—'চিত্রা'।

কবি গেলেন লণ্ডনে। দিন কয়েক রইলেন এল্‌ম্‌হার্ষ্ট দম্পতির গৃহে। তারপর এক সপ্তাহ কাটালেন কর্ণওয়াল প্রদেশের কর্বিশ-বে'র তীরে। এখানে তখন বার্ট্রাণ্ড রাসেল সপরিবারে বাস করছিলেন। সেখানে তাঁদের সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গতা হলো।

বিখ্যাত মার্কিন শিল্পী জ্যাকব এপ্‌স্টাইন কবির সঙ্গে দেখা করলেন, কবির একটি মূর্তি তিনি তৈরী করলেন।

এবার বিলাতে কবি একটা বিরোধী মনোভাব উপলব্ধি করলেন; স্যার উপাধি ফেরৎ দেবার অপমান তখনও ইংরাজরা ভুলতে পারেনি।

কবি গেলেন নরোয়েতে। কবির সঙ্গে ছিলেন লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। নরোয়ের রাজা এক সভায় কবিকে সম্বর্ধনা জানালেন। ওখানকার অস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে কবিকে একটি বক্তৃতা দিতে হলো। স্টানসেন, বির্ক্সন, জোহান্-বোয়ার প্রভৃতির সঙ্গে কবির পরিচয় হলো। বিখ্যাত শিল্পী গুস্টাভ ভিজিল্যাণ্ড কবিকে এসে বললেন—আমি পঁচিশ বছর ধরে

যা কিছু ভাস্কর্য তৈরী করেছি তা কাউকে দেখাইনি, আপনি হবেন তার প্রথম দর্শক।

শিল্পী তাঁর পঁচিশ বছরের সাধনা প্রথম উন্মুক্ত করলেন কবির সামনে।

নরোয়ে থেকে সুইডেন।

জগৎ বিখ্যাত ভূপর্যটক স্বেন হেডিন কবিকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানালেন। স্বেন হেডিনের গৃহে সুইডিশ আকাডেমির সদস্যরা কবিকে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করলেন।

সুইডেন থেকে ডেনমার্ক।

কবি এসেছেন শুনে প্রবীণ সমালোচক জর্জ ব্রাণ্ডেস্ একবার কবির সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। বৃদ্ধ ব্রাণ্ডেস্ তখন মৃত্যুশয্যায়। কবি সে কথা শুনে ছুটে গেলেন ব্রাণ্ডেসের গৃহে, মৃত্যুপথযাত্রীর শয্যাপার্শ্বে গিয়ে কবি বসলেন, মৃত্যুপথযাত্রীকে শোনালেন অনন্তলোকের কথা, মুমূর্ষুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

কবি গেলেন জার্মানীতে।

রাষ্ট্রনায়ক ভন হিণ্ডেনবার্গ কবিকে সম্বর্ধনা জানালেন। অধ্যাপক আইনস্টাইন এক ঘরোয়া বৈঠকে কবিকে আপ্যায়িত করলেন। তারপর সুরু হলো জার্মানীর নগরে নগরে কবি সম্বর্ধনা—হামবুর্গ, বার্লিন, মিউনিক, নুরেনবার্গ, ষ্টুটগার্ট, কোলন, ডুসেলডর্ফ, লাইপ্‌জিগ্, ড্রেসডেন, ব্রেসলাউ, রস্টক্ প্রভৃতি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখন ছিলেন জার্মানীতে, তিনি লিখেছেন—"ড্রেসডেনে দেখিলাম, কবিকে সকাল সন্ধ্যা তাঁহার নানা জার্মান সংস্করণের বই-এ অজস্র নাম স্বাক্ষর করিতে হইতেছে। তাঁহার অটোগ্রাফে সহি করিতে হইতেছে। ভিজিটিং-কার্ডে দস্তখত করিতে হইতেছে। হোটেলের চাকর-চাকরানী প্রভৃতি অবস্থার লোকেরাও তাঁহার বই কিনিয়া দস্তখত করাইতেছে। তাছাড়া ফটোগ্রাফার ও চিত্রকরকেও আসিতে দেখিলাম। একজন চিত্রকর অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার ছবি আঁকিল। সেটি ঠিক না হওয়ায় আবার আঁকিল।......

"সন্ধ্যার সময় বক্তৃতার কিছুপূর্বে আমরা একটি প্রকাণ্ড হলে গেলাম। হলে একটুও জায়গা খালি নাই। বহুলোক দাঁড়াইয়া আছে। শ্রোতাদের মধ্যে বেশী অংশই স্ত্রীলোক। ইংরাজিতে বক্তৃতা বুঝিবার লোক অনেক ছিল

ইংরাজি না জানা লোকরা পণ্ডিত তারাচাঁদ রায়ের অনর্গল জার্মান অনুবাদ হইতে কবির বক্তৃতা বুঝিল। রিপোর্টার অনেক ছিল, তাঁহাদের মধ্যে নারী রিপোর্টারের সংখ্যাও কম নয়। বক্তৃতার পর কবি তাঁহার কয়েকটি ইংরাজি ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি করিলেন; যতগুলি আবৃত্তি করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। বক্তৃতা ও আবৃত্তির পর আমরা ভিড় ঠেলিয়া কষ্টে গাড়িতে উঠিলাম এবং থিয়েটার গৃহে গেলাম, সেখানেও একটু জায়গা খালি ছিল না। অভিনেতা অভিনেত্রী কাহারও কাহারও পোষাক বেশ মজার হইয়াছিল—বিশেষতঃ সুধার সাড়ী (ডাকঘর)··· অভিনয়ের পর থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ সাতিশয় সম্মানের সহিত কবির উদ্দেশ্যে একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন এবং দর্শকেরাও তাঁহার প্রতি বিপুল সম্মান প্রদর্শন করিলেন।" [—বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ

কবি গেলেন চেকোশ্লোভাকিয়ায়।

রাষ্ট্রনায়ক ডক্টর্ মাসারিক কবিকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং কবির ব্যবহারের জন্য একখানি বিমান-পোত নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় চেক ও জার্মানদের বাস। কিন্তু দুই জাতির মধ্যে সম্প্রীতি ছিল না। তাদের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান ছিল পৃথক। সেইজন্য কবিকে পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানে আলাদা করে বক্তৃতা করতে হয়, কবির 'ডাকঘর'ও চেক ও জার্মান ভাষায় দু'দিন দুই থিয়েটারে অভিনীত হয়।

কবি গেলেন অস্ট্রিয়াতে।

ভিয়েনায় পৌঁছেই কবির জ্বর হলো। বিখ্যাত চিকিৎসক ওয়েংকাব্যাক চিকিৎসা করে কবিকে সুস্থ করিলেন।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, তাঁর পত্নী ও কন্যা এলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে।

তারপর কবি গেলেন হাংগেরিতে।

বুডাপেস্টের এক সভায় কবি 'জন-গন-মন-অধিনায়ক' গানটি গাইলেন। ভারতের জাতীয় সংগীত শুনে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী দাঁড়িয়ে উঠে সম্মান দেখালেন।

এক জলসায় বিখ্যাত জিপ্‌সী গায়িকা বেলা-রেডিক কবিকে বেহালা বাজিয়ে শোনালো।

কবি তখনও ভালোমত সুস্থ হননি। কবির চিকিৎসা করছিলেন ডাক্তার ব্যারণ কোরানী। কবির অবস্থা দেখে তিনি কবিকে বিশ্রাম করতে পরামর্শ

দিলেন। কবি কয়েক দিনের জন্য চলে গেলেন ব্যালাটান ফ্যুরেড-এ। ইউরোপের সুবৃহৎ হ্রদের তীরে মনোরম এই পল্লীটি কবির মনে ও দেহে প্রশান্তি এনে দিল।

কবি গেলেন সার্বিয়া।

সার্বিয়ায় পি-ই-এন ক্লাবের এক সভায় কবি বললেন—'সমগ্র পৃথিবীকে মাতৃভূমি জ্ঞান করিয়া এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে এক উন্নত দেশাত্মবোধ সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাই বিশ্বশান্তির মূলমন্ত্র।'

বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির বক্তৃতা শোনার জন্য অত্যধিক ভিড় হয়েছিল। যারা টিকিট কিনতে পারেনি শেষ অবধি তারা দরজা ভেঙে হলে ঢুকে পড়ে কবির বক্তৃতা শোনার জন্য।

কবি গেলেন বুলগেরিয়ায়।

সোফিয়ায় ট্রেন থেকে নামামাত্র নাগরিকেরা এক মাইল দীর্ঘ এক মিছিল করে কবিকে হোটেলে পৌঁছে দিল। সেদিন ইস্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কবির সম্মানে ছুটি দিয়েছিল। বুলগেরিয়ার রাজা বরিস কবিকে প্রাসাদে সম্বর্ধনা জানালেন।

কবি গেলেন রুমানিয়ায়।

রুমানিয়ার রাজা ফার্ডিনাণ্ড অসুস্থ ছিলেন, তিনি রাজপ্রাসাদে কবিকে আহ্বান করলেন, রোগশয্যায় শুয়েই কবিকে জানালেন স্বাগতম।

বুখারেস্টে সারা সহর ভেঙে পড়লো কবির বক্তৃতা শোনার জন্য।

কবি গেলেন তুরস্কে।

কিন্তু জাহাজে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, জাহাজ থেকে আর নামা হলো না। নিমন্ত্রণ একটিও তিনি রক্ষা করতে পারলেন না। বহু সুধীজন এসে জাহাজেই কবির সঙ্গে দেখা করে গেলেন।

কবি গেলেন গ্রীসে।

গ্রীসের রাজা কবিকে সম্বর্ধনা জানালেন, উপাধি দিলেন—'কম্যাণ্ডার অফ দি অর্ডার অফ্ দি রিডীমার।' এথেন্সের ঐতিহাসিক স্থানগুলি কবি ঘুরে দেখলেন।

কবি গেলেন মিশরে।

কবির সম্মানে মিশরীয় লোকসভার একটি অধিবেশন স্থগিত রাখা হলো। সেদিন মিশরীয় মন্ত্রীরা এক সংগীত অনুষ্ঠানে কবিকে অভ্যর্থনা জানালেন।

প্রধানমন্ত্রী জগলুল পাশা কবির সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন। রাজা ফুএদ কবিকে আরবী ভাষায় কয়েকখানি মূল্যবান পুস্তক উপহার দিলেন বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের জন্য।

মিশর থেকে কবি বরাবর ফিরে এলেন স্বদেশে।

হাওড়া স্টেশনে কবি ট্রেন থেকে নামতেই কলিকাতার নাগরিকদের পক্ষ থেকে মেয়র দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন কবিকে অভ্যর্থনা জানালেন।

কয়েকটা দিন কবি শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম করলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে অর্থের অনটন তখনও চলছে। কিভাবে অর্থ সংকুলান করা যায়, কবি সেই কথাই চিন্তা করেন।

পর পর কয়েকটি নিমন্ত্রণ এসে পড়লো, কবিকে বেরুতে হলো।

প্রথমে গেলেন মহারাজ কিষেণ সিংহের আমন্ত্রণে হিন্দী-সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য ভরতপুরে। কবি বললেন—'হিন্দীভাষাকে লোকে রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। রাষ্ট্রীয় ভাষা কেবল রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তায় হয় না, সাহিত্যের দিক হইতে তাহাকে তাহার উপযোগিতা দেখাইতে হইবে।··· ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি কেবল সাহিত্যের দাবি পূরণ করিয়া মিটানো যায়।···" [—রবীন্দ্র জীবনী

আগ্রা ও জয়পুর ঘুরে তিনি ফিরলেন আমেদাবাদ।

তারপরেই একদিন যেতে হলো চন্দননগরে, প্রবর্তক-সঙ্ঘের প্রার্থনা-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনা করতে। এই অনুষ্ঠানে চন্দননগরের মেয়র কবিকে হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দিলেন।

কলিকাতায় 'নটীর পূজা' অভিনয় করে কিছু টাকা তোলার চেষ্টা হলো। শান্তিনিকেতনে হলো 'নটরাজের' অভিনয়।

কর্মের চাপে কবি অবসন্ন হয়ে পড়লেন। শান্তিনিকেতনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখলেন না। কিন্তু তখন এদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের যুগ, শিক্ষার দিকটা তেমনভাবে লোকের মনে সাড়া তোলেনি। অর্থের ব্যাপারে কবির তাই তেমন আনুকূল্য ঘটে নি। কবি ক্লান্ত হয়ে বললেন—এ কাজটা আমার শরীর ও মনের পক্ষে অনুকূল নয়—কিন্তু এ দুঃখটাকে এড়াবার জো নেই।

কবি কয়েকদিনের জন্য চলে গেলেন শিলং-এ।

নিরবচ্ছিন্ন অবসরের মাঝে কবির স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা লেখনীমুখে উৎসারিত হয়ে উঠলো, তিনি 'তিনপুরুষ' উপন্যাসখানি লিখলেন। পরে এই বইখানির নাম হয়—'যোগাযোগ'।

ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। কলিকাতায় দাঙ্গা বেধে গেল মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়ে। কবি দুঃখ করে বললেন—'আমরা নাকি ধর্মপ্রাণ জাতি! তাইতো আজ দেখছি ধর্মের নামে পশুত্ব দেশ জুড়ে বসেছে। বিধাতার নাম নিয়ে একে অন্যকে নির্মম আঘাতে হিংস্র পশুর মত মারছে। এই কি হল ধর্মের চেহারা।'

"বিধর্ম বলি মারে পর ধর্মেরে,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিকো জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্ত মাখানো ধ্বজা,
দেবতার নামে এযে শয়তান ভজা।"

দিল্লীর সর্বজনমান্য নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অসুস্থ ছিলেন। একজন মুসলমান যুবক জরুরী কাজের অজুহাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে রিভলভার দিয়ে তাঁকে হত্যা করলো। কবি সেই খবর শুনে বললেন—"মুসলমান সমাজ ঈশ্বরের নামে স্বধর্মীদের ডাক দিলে সমস্ত মুসলমান সাড়া দেয়, সমবেত হয়, প্রতিকারের জন্য প্রাণ দেয়। কিন্তু আমরা যখন ডাকি, 'হিন্দু এসো'—তখন কেহ আসে? যে দুর্বল সেই প্রবলকে প্রলুব্ধ করে পাপের পথে টেনে আনে। পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব যদি মুসলমান মারে, আমরা পড়ে পড়ে মার খাই—তবে জানব এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা।... দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে—কেউ বাধা দিতে পারে না।" [—রবীন্দ্রজীবনী

কবির অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করতে যাবেন। এবার সেখান থেকে আমন্ত্রণ এলো। সেখানকার ওলন্দাজ সরকার কবিকে ভ্রমণের খরচ দিতে চাইলেন, কিন্তু বিদেশী গবর্মেণ্টের কাছ থেকে টাকা নিতে তিনি স্বীকৃত হলেন না। অথচ টাকার অভাবে যেতেও পারছেন না।

কথাটা উঠলো শেঠ শ্রীযুগলকিশোর বিড়লার কানে। তিনি তখনই কবিকে

দিলেন দশহাজার টাকা। আরো হাজার টাকা দিলেন শ্রীনারায়ণদাস বাজোরিয়া। কবি এবার বেরিয়ে পড়লেন। যাবার আগে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের এক বিরাট সভায় কবিকে শুভেচ্ছা জানানো হলো। কবিকে অভিনন্দন জানালেন বৃহত্তর ভারত সমিতির পক্ষ থেকে আচার্য যদুনাথ সরকার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এবং ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মনীষীরা।

এবার কবির সঙ্গে চললেন সুরেন্দ্রনাথ কর, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কবি প্রথমে পৌছলেন সিঙাপুরে।

লাটসাহেবের বাড়ীতে কবি অতিথি হলেন। সারা শহর ভেঙে পড়লো কবির বক্তৃতা শোনার জন্য। সর্বজাতীয় এক জনসভায় কবি হিন্দীতে বক্তৃতা করলেন।

সিঙাপুরে অনেক চীনার বাস। চীনা ছাত্র ও শিক্ষকেরা এক সভা করলেন প্যালেস-গে-থিয়েটারে। সেখানে কবি বললেন—"মানুষ যে দেশে জন্মায় সে তার জন্মসূত্রেই সেই দেশের সমস্ত অতীতের তার সমস্ত ইতিহাসের সহজ অধিকারী হয়ে থাকে। কলিকাতার এক কোণে জন্ম নিয়ে আমি তেমনি ভারতের সমস্ত কৃতিত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছি। তেমনি আমার চীনা বন্ধুগণও চীনা সভ্যতার জগতের শ্রেষ্ঠ অধিকার পেয়েছেন। ভারতের এই প্রাচীন ইতিহাস আর সংস্কৃতি, তার মধ্যে তার এক কোণে চীনার সঙ্গে একটু যোগ আছে।" [—বিশ্বভ্রমণে···

এখানকার রবার ব্যবসায়ী মিঃ কামিন কবিকে এক হাজার ডলার দিলেন বিশ্বভারতীর জন্য।

তারপর মালাক্কা।

এখানে মল্লবীর গোবরবাবুর ভাইপো শ্রীশ গুহ, ব্যারিস্টার মনোজ মল্লিক প্রভৃতি কবিকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। জোহোরের সুলতান-পুত্র টুংকু কবিকে নিয়ে যান মুআর-এ। কুয়ালালামপুরে বিশ্বভারতীর সাহায্যের জন্য টিকিট বিক্রী করে এক বিরাট জলসার আয়োজন করা হয়। কবি যখন সেই সভার মাঝে 'শিশুর বিদায়' কবিতাটি পড়েন, তখন ইংরেজ মহিলারা কেঁদে ফেলেন।

তারপর পেনাং, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ।

বলিদ্বীপের বাংলিতে রাজা পুঙ্গব-এর প্রাসাদে কবি-সম্বর্ধনার এক সভ হয়। সেই সভায় কবি প্রবেশ করামাত্রই সমবেত দর্শকেরা দাঁড়িয়ে উঠে সাড় তোলে—মহাগুরু আসছেন!

কারেন-আসেমের রাজা কবিকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে যান। রাণীরা কবিকে স্বহস্তে প্রস্তুত বস্ত্র ও পুস্তকাদি উপহার দেন। সেই বস্ত্র গায়ে দিয়ে কবি রাজার পাশে বসে ফটো তোলেন। রাজার একটি চিত্রশালা ছিল, তার মধ্যে কবিরও একখানি প্রতিকৃতি ছিল; রাজা কবিকে সঙ্গে নিয়ে সেই চিত্রশালাটি ঘুরে ঘুরে দেখালেন। এখানে কবিকে বলিদ্বীপের বিখ্যাত নৃত্য-নাট্য দেখানোর আয়োজন করা হয়েছিল। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করেই ওখানে নৃত্য-নাট্যের পরিকল্পনা করা হয়। এই নাটিকাটিরও আখ্যান-বস্তু ছিল মহাভারতের শল্য ও সত্যবতীর উপাখ্যান।

গিয়াঞ-এর রাজা কবিকে নিয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদে, সম্বর্ধনা জানিয়ে বললেন—বলিদ্বীপের লোকেরা আর ভারতের লোকেরা এক বংশের। ভারতের সঙ্গে এই সংযোগ তাদের কাছে গৌরবের বস্তু। কবির আগমনে এই গৌরববোধ বলিদ্বীপের লোকদের মনে যেন প্রসার লাভ করে।

এখানে কবি মুখোস-নৃত্য দেখলেন।

বাতুঙে এক সাহেব, আমেরিকান রুজভেল্ট কবির সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন—বলদ্বীপ একটা স্বর্গ।

কবি বললেন—স্বর্গ তো বটেই। কিন্তু বাইরের হাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আর ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে নানা অভাব আর অসন্তোষও তো আসছে,—এইবার এই স্বর্গের উদ্যানে নানা দুঃখ আর অশান্তির বিষ নিয়ে শয়তান-রূপী সর্প আস্তে আস্তে ঢুকবে।

যবদ্বীপে শুরকর্তা সহরে কবি একটি সাঁকো ও রাস্তার উদ্বোধন করলেন, বললেন—কাজটা আমার লাগলো ভালো, মনে হলো পথের বাধা দূর করাই আমার ব্রত।

কবির নামেই এই রাস্তাটির নামকরণ হয়।

প্রাম্বানমে একটি পুরাণো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ কবি দেখেন।—'এ জায়গাটা ভুবনেশ্বরের মত মন্দিরের ভগ্নস্তূপ পরিকীর্ণ। শিবমন্দিরই এখানে প্রধান। শিবের নানাবিধ নাট্যমুদ্রা এখানকার মূর্তিতে পাওয়া যায়···এখানে রামায়ণ

মহাভারতের নানাবিধ গল্প আছে যা অন্ততঃ সংস্কৃত মহাকাব্যে ও বাংলাদেশে অপ্রচলিত।'

যোগ্যকর্তার রাজা পাকু-আলম কবিকে নিয়ে গেলেন নিজের প্রাসাদে। রাজকন্যা কুসুমবর্ধিনী কবিকে সভার মাঝে বরণ করলেন, রাজা জানালেন সম্বর্ধনা।

বরবুদুরের বৌদ্ধস্তূপটি দেখে কবি মুগ্ধ হলেন। ভাবাবেশে কবি লিখলেন—

"সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া
তাই আসিয়াছে দিন—
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন—
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে সে বাণী রয়েছে চিরস্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অজেয় প্রেমের মন্ত্র—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।"

"ভারতের প্রাচীন প্রতিভার লীলাক্ষেত্রে এসেছেন ভারতের আধুনিক যুগের এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ···বরবুদুর-রবীন্দ্রনাথ;—ভারতের শাশ্বতচিন্তা আর পরিকল্পনা-শক্তির দুইটি বিরাট প্রকাশ—একদিকে ভাস্কর্যমণ্ডিত সৌধে, অন্যদিকে অলৌকিক কবি প্রতিভায়।" [—দ্বীপময় ভারত

বাতাভিয়ার সম্বর্ধনা সভায় কবি বাংলা ভাষায় কবিতা পাঠ করেন।

সুরাবায়ার সম্বর্ধনা সভায় কবিকে উপহার দিলেন শ্রীঝাম্ব এক-হাজার-এক টাকার একটি তোড়া বিশ্বভারতীর জন্য; শ্রীলকুমল নামে এক সিন্ধি ব্যবসায়ী দিলেন সওয়া শ' গিল্‌ডার ও যবদ্বীপের সূচীশিল্পের নিদর্শন একখানি 'বাতিক' বস্ত্র।

কবি এলেন শ্যামরাজ্যে।

ব্যাংকক্ যাবার পথে অলোরস্টার স্টেশনে মাদ্রাজী ব্যবসায়ী চেট্টিরা এসে দেখা করলেন কবির সঙ্গে। কবিকে তাঁরা প্রণামী দিলেন তিনশো ডলার বিশ্বভারতীর জন্য।

রাজা প্রজাধিপক রাজপ্রাসাদে কবিকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা জানালেন। সেদিন বিজয়া দশমী। প্রাসাদের 'ভুষিত হলে' সামরিক কুচকাওয়াজ দেখিয়ে কবিকে অভিনন্দিত করা হলো। সন্ধ্যাবেলা রাজসভায় রাজা কবির রাজোচিত সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। কবি বাঙালীর জাতীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে রাজসভায় এলেন। গরদের ধুতি পাঞ্জাবী পরণে, গৌরবর্ণ, শুভ্র শ্মশ্রু কবি চন্দ্রালোকে মহীয়ান হয়ে ওঠেন। সে মূর্তির সামনে সবাই শ্রদ্ধায় আনত হয়ে পড়ে। নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে রাজ-পরিবারের মেয়েরা কবিকে বরণ করেন। কবি সেইদিনই একটি কবিতা রচনা করেছিলেন, সেইটি রাজাকে উপহার দিলেন—

"আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মূক শিলারূপে—
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃতি কুয়াশা
ভক্তির বিষয়স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।......"

রাজমাতা কয়েকদিন আগে মারা গিয়েছিলেন, কবি তাঁর শবাধারে মাল্যদান করলেন।

শ্যামের এক রাজকুমার ইউরোপে লেখা-পড়া শেখেন, তারপরে সর্বত্যাগী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হন, দেবশ্রী-ইন্দ্র বৌদ্ধ বিহারে তাঁর সঙ্গে কবির আলাপ হলো।

এখনকার উল্লেখযোগ্য সম্বর্ধনা—দরোয়ানদের সম্বর্ধনা। অযোধ্যা নগরীতে প্রবাসী হিন্দুদের একটি বিষ্ণুমন্দির আছে। সেখানকার ভোজপুরী দরোয়ানরা কবিকে সম্বর্ধনা করেন। দরোয়ানরা নিজেদের মধ্যে একশো টিকাল চাঁদা তুলে কবির হাতে দেয় বিশ্বভারতীর জন্য। এইসব দরোয়ানদের শ্রদ্ধা ও সরলতায় কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

শ্যামদেশ থেকে বিদায় নেবার সময় ট্রেনে বসে কবি লেখেন—

"কোন সে সুদূর মৈত্রী আপন প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞানে
আমার গোপন ধ্যান
চিহ্নিত করেছে তব নামে
হে সিয়াম
বহু পূর্বে যুগান্তরে মিলনের দিনে।

মুহূর্তে লয়েছি তাই চিনে
তোমারে আপন বলি,
তাই আজ ভারিয়াছি ক্ষণিকের পথিক অঞ্জলি
পুরাতন প্রণয়ের স্মরণের দানে,
সপ্তাহ হয়েছে পূর্ণ শতাব্দীর শব্দহীন গানে।......"

রেংগুন হয়ে কবি কলিকাতায় ফিরলেন।

কলিকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে।

এবার শান্তিনিকেতনে বহু সুধীজনের সমাগম হয়। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা আসেন, প্রসিদ্ধ গায়িকা ক্লারা-বাট আসেন, আসেন প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লেস্‌লি।

ক্লারা বাট বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা, তিনি এসেছিলেন কবিকে গান শোনাতে। নিজের গান শুনিয়ে বললেন—যে আমার বড় ইচ্ছা আপনার গান আপনার মুখ থেকে শুনি।

কবি বললেন—সে গান তো গাইয়ের গান হবে না।

—তা হোক্ তবু আপনার গান আপনার মুখ থেকে শোনা এক সৌভাগ্য।

—তোমার গান আমায় আনন্দ দিয়েছে, আমি গাইব।

কবি দু-তিনখানি গান গাইলেন।

বাট অভিভূত হয়ে পড়লেন, বললেন—অপূর্ব মিষ্ট আপনার কণ্ঠ।

অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিমন্ত্রণ এলো—কবিকে হিবার্ট বক্তৃতা দিতে হবে। কবি বিলাত যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু মাদ্রাজে গিয়েই কবি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিলাত যাওয়া আর হলো না।

পণ্ডিচেরীতে গিয়ে কবি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ দিন ও বিশেষ সময় ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা করতেন না, কিন্তু তাঁর প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে অসময়েই কবির সঙ্গে দেখা করলেন।

শ্রীঅরবিন্দকে দেখে কবির ভাল লাগলো, তিনি বললেন—"স্থির করেছি এবার ফিরে গিয়ে অরবিন্দ ঘোষের মতো সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্নতা অবলম্বন করব—কেবল প্রতি বুধবারে সাধারণকে দর্শন দেব,—বাকি ছয়দিন চুপচাপ নিজের নিঃশব্দ নির্জন শান্তি অবলম্বন করে গভীরের মধ্যে তলিয়ে থাকব। অরবিন্দকে দেখে আমার ভারী ভাল লাগল—বেশ বুঝতে পারলুম নিজেকে ঠিকমত পাবার এই ঠিক উপায়।" [—চিঠিপত্র ৪র্থ খণ্ড

তারপর কয়েকদিন তিনি অতিথি হলেন আনি বেশান্তের গৃহে—আদিয়ারের শান্তিকুঞ্জে।

দিন দশেকের মধ্যে কবি গেলেন সিংহলে। সেখানে গিয়ে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কবিকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সিংহল থেকে ফেরার পথে কবি গেলেন বাঙালুরে।

এই ক'দিন কবি বিশ্রাম করার যে সুযোগ পেয়েছিলেন তারই মধ্যে রচনা করলেন 'শেষের কবিতা'।

কবি বার বার অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন, তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না, ডাক্তার নীলরতন সরকার কবির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন। দেখে-শুনে ডাক্তারবাবু বললেন—কবির বয়স সাতষট্টি বছর হয়েছে বটে, কিন্তু দেহে তার কোন প্রভাব পড়েনি। অসুস্থতার কারণ হলো অতিশ্রম। কিছুদিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কবি রহস্য করে বললেন—নীলরতনবাবু আমার সকল রকম পরীক্ষা নিঃশেষ করেছেন। রক্ত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে অন্ততঃ দুই আউন্স রক্ত দিয়েছি। এটা যদি দেশকে দিতে পারতুম তাহলে বীরপুরুষ বলে খ্যাতি থাকত। যাই হোক পরীক্ষার ফল ভালো—একেবারে ফুল মার্ক—নীলরতনবাবু বললেন রক্ত ও শরীরযন্ত্র প্রভৃতিতে ৬৭ বৎসরের কোনো দাগ পড়েনি। দেহটা ভিতরে ভিতরে এখনো তরুণ আছে। ক্লান্তির কারণ হচ্ছে পূর্বকৃত অতিশ্রম—কিন্তু এর উল্টাটাও ভালো নয়, যাকে বলা হয় অশ্রম—অতএব মধ্যপথ হচ্ছে আশ্রম—কাল সকালে ন'টার গাড়ীতে সেই পথেই যাচ্ছি। বাজে কাজেই মানুষের ক্ষতি করে—আসল কাজে কোনো অনিষ্ট হয় না। চিরদিন কাজ করে এসেচি—হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে মনে হয় মরেই গেছি—তার চেয়ে সত্যিকার মরাটা ভালো—কেননা সেটা সত্যি! [—চিঠিপত্র ৫ম

কবি চলে এলেন শান্তিনিকেতনে।

কয়েকদিন পরে বড়লাট লর্ড আরুইন শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করতে এলেন।

১৯২৯ সালে কলিকাতায় আন্তর্জাতিক ধর্ম-মহাসম্মেলনের অধিবেশন বসলো। কবি হলেন তার সভাপতি।

ক্যানাডায় আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলন বসবে, তাতে যোগ দেবার জন্য ক্যানাডাবাসী কবিকে নিমন্ত্রণ করলো। কবি বেরিয়ে পড়লেন, সঙ্গে চললেন অপূর্বকুমার চন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিশ্বভারতীর মার্কিন অধ্যাপক মিষ্টার বয়েড টাকার।

কলম্বো, পেনাং, সিঙাপুর হয়ে কবি এলেন হংকংএ। এখানে সিন্ধি-ব্যবসায়ী-দের হিন্দু-সমিতি এক সম্বর্ধনা সভা করে। সেই সভায় শ্রীমিলওয়ানী কবিকে একটি মুদ্রাপূর্ণ রৌপ্যাধার উপহার দেন শান্তিনিকেতনের শ্রীভবনের উন্নতির জন্য। সাংহাই-এ এক সম্বর্ধনা সভা হলো। সেই সভায় কবি বললেন—মার্কিন লেখিকা মিস্ মেয়ো 'মাদার ইণ্ডিয়া' নামে যে বইখানি লিখেছে, তা মিথ্যা তথ্যে পূর্ণ।

তখন এই বইখানি ভারতে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। এদেশ সম্পর্কে এমন জঘন্য প্রচার-পুস্তিকা ইতিপূর্বে আর কোন বিদেশী লেখে নি।

সাংহাই-এ অনেক শিখ পুলিশের চাকরী করে। তারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে একটি টাকার থলি কবিকে উপহার দেয়। কবি তাদের বলেন—শিখেরা পুলিশ হয়ে চীনাদের উপর নানারকম অত্যাচার করে বলে তিনি শুনেছেন, শিখদের পক্ষে এরূপ করা উচিত নয়।

কবি জাপানে এলেন—এবার চতুর্থবার।

আসহা প্রেক্ষাগৃহে এক সভায় কবি কাব্যের ধর্ম সম্বন্ধে বললেন—কবিতা একটি বিশ্বজনীন প্রেমের ভাব প্রকাশ করে—ভাষার দ্বারা যে প্রাচীর সৃষ্টি হয় কবিতা তা ভেঙে দেয়।

টোকিওতে কবি দু'দিন মাত্র ছিলেন, তার মধ্যেই তিনটি সভায় বক্তৃতা করতে হলো।

কবি যখন ক্যানাডায় এসে পৌছলেন, তখন সেখানকার বিভিন্ন পত্রিকা কবিকে স্বাগতম্ জানালো। ভিক্টোরিয়ার 'ডেলি টাইম্স্' লিখলো—'উজ্জ্বল বিশুদ্ধ স্বাধীন চেতনার প্রতীক প্রাচী হইতে এই ভূখণ্ডে আগমন করিয়াছে।' দি 'কলোনিষ্ট' লিখলো—'ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, বিশ্বের গীতিকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে উচ্চাসনের অধিকারী, একজন দক্ষ সমাজ-সংস্কারক, ধর্মসাধক, দার্শনিক, যাঁহার লেখা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশকে নব নব প্রেরণা জোগাইতেছে, তিনি বাংলা দেশ থেকে কয়েক দিনের জন্য এ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে পদার্পণ করিয়াছেন।'

শিক্ষা সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন কবি। তিনি 'ফিলজফি অব

লিজার'—অবসরের দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা করলেন। এইটিই ক্যানাডায় তাঁর প্রথম বক্তৃতা।

দ্বিতীয় বক্তৃতা দিলেন ভাংকুভার সহরে—সাহিত্যের ধর্ম—'দি প্রিনসিপ্‌ল্ অফ্ লিটারেচার।' দু-তিনশো মাইল দূর থেকেও অনেক লোক এসেছিল এই সভায় বক্তৃতা শোনার জন্য। অনেকেই হলের মধ্যে স্থান না পেয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। বক্তৃতাটি প্রচারিত হয়েছিল ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সকল বেতার-কেন্দ্র থেকে।

ক্যানাডায় কবি দশদিন রইলেন, ইতিমধ্যে কবির নিমন্ত্রণ এলো যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে—হারভাড, কলম্বিয়া, ওয়াশিংটন, ক্যালিফোর্ণিয়া ও ডেট্রয়েট। কবিও প্রস্তুত হলেন যাবার জন্য। কিন্তু পথে ভাংকুভারের পাসপোর্ট আপিসে কবি অপমানিত হন। সহসা কবির পাসপোর্ট হারিয়ে গেল। এণ্ডরুজ সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গেলেন পাসপোর্ট আপিসে, নূতন পাসপোর্টের জন্য। আপিসের কর্তারা কবিকে আধঘণ্টার উপর বসিয়ে রাখেন। আগে সব 'সাদা-চামড়াওয়ালাদের' কাজ মিটিয়ে তারপর তাঁরা কবিকে নিয়ে পড়লেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন—কবির যাতায়াতের রাহা খরচা আছে কি না, কবির জীবনধারণের নিজস্ব আয় আছে কি, ইত্যাদি। সব শেষে কর্তারা এ-কথাও শুনিয়ে দিলেন, যে-ক'দিন থাকার মেয়াদ তার বেশী যদি কবি সেখানে থাকেন, তাহলে কবিকে দণ্ড দেওয়া হবে।

এর আগে কবি এমন ব্যবহার আর কোথাও পাননি। এশিয়াবাসীদের উপর আমেরিকানদের এই লাঞ্ছনা দেখে কবি ব্যথিত হলেন।—"এই অপমানের বোঝা শিরে লইয়া এদেশে আর এক মুহূর্ত থাকিতে মন চাহিল না। ইহা কোন কর্মচারীর হাতে কোন একটি ব্যক্তির নিপীড়নের ঘটনা নহে, সমগ্র এশিয়া-বাসীর প্রতি এই অপমান করা হইতেছে—আমি ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। এবং যেখানে আমাদের দেশের লোকদের এমনভাবে ব্যবহার করা হয় সে-দেশে আমার আর এক মুহূর্ত থাকিতে ইচ্ছা হইল না।

"আমি আনন্দিত যে আমার খ্যাতির জন্য কর্মচারীটি আমার সঙ্গে ভিন্ন ব্যবহার করেন নি, প্রাচ্যদেশীয় কালা-আদমির সঙ্গে যে ব্যবহার তাঁরা করেন তাই করেছেন। আমি এশিয়ার প্রতিনিধি, যারা এশিয়াবাসীদের চায় না, সে দেশে আমি থাকতে পারিনা।…" [—বিশ্বভ্রমণে……

কবি এই দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে সমস্ত নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে জাহাজে উঠে বসলেন।

হনলুলু, জাপান, সাইগন, সিঙাপুর, পেনাং হয়ে কবি দেশে ফিরলেন।

টোকিওর 'জোজোদী মন্দিরে' 'দি ফ্রেণ্ডস্ অফ টোগোর সোসাইটি' কবিকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করে।

সাইগান-এ কবি যেদিন পৌছলেন সেদিন তাঁর সম্মানে সমস্ত সরকারী আফিস ও ইস্কুল-কলেজে ছুটি দেওয়া হয়। জাহাজে কবির ৬৮ তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। জাহাজের ক্যাপ্‌টেন ও যাত্রীরা একটি মনোরম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

কবি এতদিন সাহিত্য রচনাই করেছিলেন, নৃত্য-পরিকল্পনা ও সংগীত-চর্চাতেও তাঁর বিশেষ দখল ছিল, এবার তিনি আরেকটি সুকুমার শিল্পের চর্চায় রত হলেন। সেটি ছবি আঁকা। কবি এবার ছবি আঁকতে সুরু করলেন, দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় তিনি বসে বসে ছবি আঁকতে লাগলেন। এই ছবিগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কবি নিজেই একবার বলেন—"আচ্ছা ধর পাঁচশ' ছ'শ বছর পরে আমার ছবি আমার কবিতা নিয়ে কেমন আলোচনা হবে আন্দাজ কর তো। হয়তো একদল লোক কেবল এই নিয়েই রিসার্চ করবে। কেউ হয়তো বলবে সেই সময় এক দেবতার পূজা হোত, সূর্যও বলতে পারো, রবীন্দ্র—রবি-ইন্দ্র। বলবে হয়তো সে-সময়ে সবাই সূর্য উপাসক ছিল। গান কবিতা লিখে তাঁর পূজো হোত। আমার ছবিগুলোকে বলবে এগুলো এক একটা 'সেরি-মোনিয়্যাল' ব্যাপার। ছবি এঁকে এঁকে রবীন্দ্রকে উৎসর্গ করা হোত, ইত্যাদি ইত্যাদি।" [—আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ

কবি শান্তিনিকেতনে যুযুৎসু শেখার ব্যবস্থা করলেন। বাঙালী ছেলেদের শক্তি কম, আত্মরক্ষা করতে তারা পারে না। যুযুৎসুর কৌশল জানা থাকলে দুর্বল লোকেরাও শক্তিমানের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এই কৌশলটি জাপানীদের বিশেষত্ব। কবি জাপান থেকে নিপ্পন বিশ্ববিদ্যালয়ের যুযুৎসু-শিক্ষক নকুজো তাকাগাকিকে আনালেন, তাকাগাকি শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের যুযুৎসু শেখাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে সুরুলে সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামোন্নয়নের প্রচেষ্টা কিছু কিছু সফল হয়েছে। সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার জন্য কবি সমবায়-কর্মীদের এক

সম্মেলন আহ্বান করলেন। এই সম্মেলন বসে স্থরুলে। বাংলার লাট সাহেব স্যার ষ্টানলি জ্যাকসন্ এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সব দেখে-শুনে লাট সাহেব স্থরুলে আর্থিক সাহায্য দেবার কথা বলেন। তিনি বললেন—প্রথমে পাঁচ হাজার টাকা তারপর বার্ষিক এক হাজার টাকা করে বাংলা গবর্মেণ্ট শ্রীনিকেতনে দেবেন। যে টাকা প্রয়োজন, সে অনুপাতে এ অর্থ অতি নগণ্য, সেইজন্য এই দানের বিরুদ্ধে সারা দেশে বিক্ষোভ দেখা দেয়।

গাইকোয়াড় নিমন্ত্রণ করে কবিকে নিয়ে গেলেন বরোদায়, সেখানে কবি বক্তৃতা করলেন—'শিল্পীমানুষ'। পথে দিন পনেরো থেকে গেলেন আমেদাবাদে আম্বালাল সরাভাইয়ের বাড়ীতে।

তারপর আবার কবির আমন্ত্রণ এলো বিলাত থেকে। হিবার্ট বক্তৃতা দিতে হবে। দু'বছর আগে অসুস্থতার জন্য যাওয়া হয়নি। এবার কবি বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে চললেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নন্দিনী, আরিয়াম, অমিয় চক্রবর্তী ও হৈমন্তী দেবী।

কলম্বো হয়ে কবি এলেন মার্সেলিসে। এখানে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি ম্যাসারিক এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

প্যারিসে গ্যালারী পিগালে কবির আঁকা ১২৫ খানি ছবির একটি প্রদর্শনী হলো। ছবিগুলি দেখে ফরাসী সমালোচক হেন্‌রী বিদু বললেন—পরিকল্পনার বাস্তবতা, অভিব্যক্তির সৌন্দর্য, প্রতি রেখাটানের জীবন্তভাব, সাজসজ্জার পারিপাট্য এই চিত্রগুলিতে অপূর্ব। কবি কিছুদিন রয়ে গেলেন প্যারিসে। লেখা ছেড়ে তখন ছবি আঁকছেন।

কবি বিলাতে পৌছেই খবর পেলেন—লবণ আইন অমান্য করে গান্ধিজী গ্রেপ্তার হয়েছেন, বাংলা দেশে উৎপীড়ন স্থরু হয়েছে, শোলাপুরে জঙ্গী আইন জারী হয়েছে। তিনজন যুবককে সামরিক আদালত ফাঁসী দিয়েছে। কবি ক্ষুব্ধ হলেন, তীব্র মন্তব্য করলেন, সে অভিমত ছাপা হলো 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান'-এ।—"সব খবরই চেপে যাওয়া হচ্ছে, তবু ভারতীয় পর্যটকদের মুখ থেকে যেটুকু খবর আমি পাচ্ছি, তাতে জানছি যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ব্যক্তিদেরকে নিষ্টুরভাবে খুসিমত শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আইন ও শৃংখলা রক্ষার যত বড় বড় নামই একে দেওয়া হোক না কেন, একে মানবতার নীতির বিরোধী এবং মানবতা-বোধকে আমি সকল সাধনের চেয়ে মহত্তর বলে মনে করি।"

কবি ভারত-সচিব ওয়েজউড্‌বেনের সঙ্গে দেখা করলেন, ভারতের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একখানি চিঠি লিখলেন 'স্পেক্‌টেটর' কাগজে।

কবি ভারতে বৃটিশ শাসন-নীতির যে নিন্দা করেন তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল কয়েকদিন পরে। 'কোয়েকার' সম্প্রদায় কবিকে নিমন্ত্রণ করলো বার্ষিক সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার জন্য। সম্প্রদায়ের ইতিহাসে ২৫২ বছরের মধ্যে কোয়েকার ছাড়া আর কাউকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয়নি এদের কোন সভায়। রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানোই এই নীতির একমাত্র ব্যতিক্রম। কবি বক্তৃতার শেষে ভারতে বৃটিশ শাসন-নীতির নিন্দা করলেন। প্রতিবাদে সভার মাঝে হট্টগোল সুরু হলো। কবি তখন দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—আমাদের স্থলে আপনাদের নিজেদেরকে কল্পনা করুন এবং স্মরণ করুন সেই দিনের কথা, যেদিন আমেরিকায় আপনাদেরই স্বজাতিবর্গ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বুকের রক্ত ঢালিয়া দিতেও দ্বিধা করেন নাই।

উপযুক্ত জবাব পেয়ে কোয়েকার শ্রোতাদের মুখ বন্ধ হলো, হট্টগোল থামলো।

অক্‌স্‌ফোর্ডে ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে কবি হিবার্ট বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—মানুষের ধর্ম। এই বক্তৃতা শোনার জন্য এত ভীড় হয় যা হিবার্ট বক্তৃতার ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে কবি গেলেন এল্‌ম্‌হার্ষ্টের শিক্ষাকেন্দ্র দেখতে। সেখানে কবি দিন দশেক রইলেন।

এই সময়ে লণ্ডনে কবির আঁকা ছবির প্রদর্শনী হলো। উদ্বোধন করলেন স্যার ফ্রানসিস্‌ ইয়ং হাজব্যাণ্ড।

কবি গেলেন জার্মানীতে। জার্মানীর যেখানেই কবি যান, সেখানেই তিনি রাজার মত সম্মান পান।

বার্লিনের 'গ্যালারী মুলার'-এ কবির আঁকা ছবিগুলির একটি প্রদর্শনী হয়।

ব্যাভেরিয়ায় কবি যান 'প্যাশান প্লে' দেখতে। মিউনিক থেকে ৪৪ মাইল দূরে 'ওবেরামেরগাঁ'। পাহাড়ের কোলে নদীর তীরে সুন্দর একখানি গ্রাম। এই গ্রামে প্রতি দশবছর অন্তর একবার যীশুর পুণ্যময় জীবনকথা অভিনীত হয়। ১৬৩৪ সাল থেকে এই অভিনয় হয়ে আসছে। যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁদের প্রত্যেককেই পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করতে হয়। বিশেষতঃ যীশুর

ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেন তিনি হন আদর্শ খৃষ্টান সাধক। অভিনয় হয় খোলা মাঠে—মাথার উপর থাকে অসীম নীল আকাশ, চারিপাশে শ্যামল তরুশ্রেণী, পিছনে ব্যাভেরিয়ার গিরিশ্রেণী—বিস্তীর্ণ পৃথিবীর উন্মুক্ত পটভূমিকায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যীশুর জীবনকথা অভিনীত হয়। কবি বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হন অভিনয় দেখতে। অপূর্ব অভিনয়, দেখতে দেখতে কবি তন্ময় হয়ে যান।

দুপুরে এক ঘণ্টার জন্য অভিনয়ের বিরতি হলো, তখন সহসা জার্মান পল্লীবাসীর দৃষ্টি পড়লো কবির দিকে। তারা চমকে উঠলো,—ইনি কে? এই চোখ, এই মুখ, এই সৌম্যমূর্তি! দর্শকদের মাঝে সাড়া পড়ে গেল—খৃষ্ট, খৃষ্ট, খৃষ্ট এসেচেন!

কবিকে ভাল করে দেখবার জন্য চারিপাশে জনতার ভীড় জমে গেল।

না না, ইনি খৃষ্ট নন, ইনি ভারতের কবি টেগোর!

মুনি-ঋষির দেশ ভারতবর্ষ, সেখানকার এক সাধক কবি ইনি। সবাই শ্রদ্ধাভরে ভাল করে তাকায় কবির মুখের পানে।

কবি গেলেন হোহেনস্টাইন উপনিবেশ দেখতে। এই উপনিবেশের যুবকেরা কবির বাসের জন্য নিজেরা একটি কুটির তৈরী করে দেয়।

জার্মানী থেকে বিদায়ের দিনে, জার্মানীর জাতীয় চিত্রশালার কর্তৃপক্ষ কবির কয়েকখানি ছবি চেয়ে নেন, চিত্রশালায় জাতীয় সম্পদ হিসাবে স্থায়ী-ভাবে রাখার জন্য।

কবি গেলেন ডেনমার্কে। কোপেনহেগেন-এ কবির চিত্রগুলির একটি প্রদর্শনী হলো।

ডেনমার্কের বিখ্যাত শিক্ষা-সংস্কারক 'পিটার মানিকে'র একটি শিক্ষাকেন্দ্র আছে এলশিনোর সহরের সমুদ্রতীরে। সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য কবি দিনকয়েক সেখানে থেকে গেলেন।

কবির আমন্ত্রণ এলো রুশিয়া যাবার জন্য। কবির সঙ্গে গেলেন অমিয় চক্রবর্তী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আরিয়াম ও মিস্ মার্গারেট আইনস্টাইন। কবির শরীর ভাল যাচ্ছিল না, তাই কবি একজন ডাক্তারকেও সঙ্গে নিলেন—ডাক্তার হ্যারি টিম্বাস্।

মস্কোর লোক-সংঘ কবিকে অভ্যর্থনা করেন, কবি-সম্বর্ধনায় সংঘের

সভাপতি বললেন—রবীন্দ্রনাথ শুধু শ্রেষ্ঠ কবি ও দ্রষ্টা নন, জনসাধারণকে মানুষ হবার শিক্ষাদানেও তিনি একজন অগ্রণী দক্ষ শিক্ষক। শান্তিনিকেতন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।...তিনি যে তাঁর সরল উন্মুক্ত প্রাণ নিয়ে আমাদের অন্তরের শক্তি জানবার জন্য এত কষ্ট করে এসেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোভিয়েট সরকার তখন বিশেষভাবে দেশকে গড়ে তুলছেন, যেখানে তার যেটুকু বিশেষত্ব তা সবই কবিকে দেখানো হয়।

কবি রুশিয়ায় ছিলেন পনেরো দিন। মসকৌ-এ কবির আঁকা ছবিগুলির একটি প্রদর্শনী হয়। ওদেশে যা কিছু দেখেন তা-ই কবিকে মুগ্ধ করে। একটি কৃষি-ভবন দেখে কবি লেখেন—"এটা ওদের ক্লাবের মতো। রাশিয়ার সমস্ত ছোট বড় শহরে এবং গ্রামে এ রকম আবাস ছড়ানো আছে।...এই রকম প্রত্যেক বাড়িতে প্রাকৃতিক সামাজিক সকল প্রকার শিক্ষণীয় বিষয়ের ম্যুজিয়ম। তাছাড়া চাষীদের সকল প্রকার প্রয়োজনের উপযোগী পরামর্শ দেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। চাষীরা কোনো উপলক্ষ্যে গ্রাম থেকে যখন শহরে আসে তখন খুব কম খরচে অন্ততঃ তিন সপ্তাহ এই রকম বাড়িতে থাকতে পারে।... বাড়িতে ঢুকে দেখি, খাবার ঘরে কেউ বসে খাচ্ছে, পড়বার ঘরে একদল খবরের কাগজ পড়তে প্রবৃত্ত। উপরে একটা বড়ো ঘরে এসে আমি বসলুম—সেখানে সবাই এসে জমা হোল। তারা নানাস্থানের লোক, কেউ-বা অনেক দূর প্রদেশ থেকে এসেছে। বেশ সহজ ওদের ভাবগতিক; কোন রকম সংকোচ নেই।... প্রথমেই ওদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হয় কেন! উত্তর দিলুম...যে পরিমাণ শিক্ষার দ্বারা এই রকম দুর্বুদ্ধি দূর হয় আমাদের দেশে বিস্তৃত ভাবে তার প্রচলন করা আজ পর্যন্ত হয়নি। যা তোমাদের দেশে দেখলুম তাতে আমরা বিস্মিত হয়েছি।"

[—রাশিয়ার চিঠি

কবি গেলেন ছোটদের প্রতিষ্ঠান 'পায়োনিয়র্স কম্যুন' দেখতে।—"পায়োনিয়রস্ কম্যুন বলে এদেশে যেসব আশ্রম স্থাপিত হয়েছে তারই একটি দেখতে সেদিন গিয়েছিলুম।...বাড়িতে প্রবেশ করেই দেখি আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সিঁড়ির দু'ধারে বালক-বালিকার দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আসতেই ওরা আমার চারদিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল, যেন আমি ওদের আপন দলের। একটা কথা মনে রেখো এরা সকলেই পিতৃমাতৃহীন। এরা যে শ্রেণী থেকে এসেছে সে শ্রেণীর মানুষ কারো কাছে কোনো যত্নের দাবী

করতে পারত না, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে নিতান্ত নীচ বৃত্তির দ্বারা দিনপাত করত। এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, অনাদরের অসম্মানের কুয়াশা ঢাকা চেহারা একেবারেই নয়। সংকোচ নেই, জড়তা নেই।……

"ওদের কর্তব্য কী প্রশ্ন করতে বললে, 'অন্য দেশের লোকেরা নিজের কাজের জন্য অর্থ চায়, আমরা তার কিছুই চাইনে, আমরা সাধারণের হিত চাই। আমরা গাঁয়ের লোকদের শিক্ষা দেবার জন্যে পাড়াগাঁয়ে যাই; কী করে পরিষ্কার হয়ে থাকতে হয়, সকল কাজ কি করে বুদ্ধিপূর্বক করতে হয়, এই সব তাদের বুঝিয়ে দিই। অনেকসময় আমরা তাদের মধ্যে গিয়েই বাস করি। নাটক অভিনয় করি, দেশের অবস্থার কথা বলি।'……

"ওদের দৈনিক কার্যপদ্ধতি হচ্ছে এই রকম। সকালে সাতটার সময় ওরা বিছানা থেকে ওঠে। তারপর পনেরো মিনিট ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ। আটটার সময় ক্লাশ বসে। একটার সময় কিছুক্ষণের জন্য আহার ও বিশ্রাম। বেলা তিনটে পর্যন্ত ক্লাশ চলে। শেখবার বিষয় হচ্ছে—ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন, প্রাথমিক জীববিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ, ছুতোরের কাজ, বই বাঁধাই, হাল আমলের চাষের যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার ইত্যাদি। রবিবার নেই। প্রত্যেক পঞ্চম দিনে ছুটি। তিনটের পরে বিশেষ দিনের কার্যতালিকা অনুসারে পায়োনিয়ররা (পুরোযায়ীর দল) কারখানা, হাসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যায়।…ভরতি হবার বয়েস সাত-আট, বিদ্যালয় ত্যাগ করবার বয়েস ষোলো। এদের অধ্যয়নকালে আমাদের দেশের মতো লম্বা লম্বা ছুটি দিয়ে ফাঁক করে দেওয়া নয়, সুতরাং অল্পদিনে অনেক বেশি পড়তে পারে।" [—রাশিয়ার চিঠি

কবি এক স্বাস্থ্য-নিবাস দেখতে গেলেন—"মস্কৌ শহর থেকে কিছু দূরে সাবেক কালের একটি প্রাসাদ আছে। রাশিয়ার প্রাচীন অভিজাত বংশীয় কাউণ্ট আপ্রাকৃসিনদের সেই ছিল বাসভবন। পাহাড়ের উপর থেকে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখতে—শস্যক্ষেত্র, নদী এবং পার্বত্য অরণ্য। দুটি আছে সরোবর আর অনেকগুলি উৎস। থামওয়ালা বড়ো বড়ো প্রকোষ্ঠ, উঁচু বারান্দা, প্রাচীন কালের আসবাব, ছবি ও পাথরের মূর্তি দিয়ে সাজানো বসবার গৃহ; এ ছাড়া আছে সংগীতশালা, খেলার ঘর, লাইব্রেরী, নাট্যশালা, এছাড়া অনেকগুলি সুন্দর বহির্ভবন বাড়ীটিকে অর্ধ চন্দ্রাকারে ঘিরে আছে।

এই বৃহৎ প্রাসাদে আল্‌গভো নাম দিয়ে একটি কো-অপারেটিভ স্বাস্থ্যাগার স্থাপন করা হয়েছে, এমন সমস্ত লোকদের জন্য যারা একদা এই প্রাসাদে দাস শ্রেণীতে গণ্য হত। সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, শ্রমিকদের জন্য বাসা নির্মাণ যার প্রধান কর্তব্য। এই সোসাইটির নাম বিশ্রান্তি নিকেতন—The house of rest এই আল্‌গভো তারই তত্বাধীনে।

"এমন তরো আরও চারটে স্যানাটোরিয়াম এর হাতে আছে। খাটুনির ঋতু-কাল শেষ হয়ে গেলে অন্তত: ত্রিশ হাজার শ্রমক্লান্ত এই পাঁচটি আরোগ্যশালায় এসে বিশ্রাম করতে পারবে। প্রত্যেক লোক এক পক্ষকাল এখানে থাকতে পারে। আহারের ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত। আরামের ব্যবস্থা যথেষ্ট, ডাক্তারের ব্যবস্থাও আছে।" [—ঐ

রুশিয়ার নতুন সমাজ সংগঠন দেখে কবি মুগ্ধ হলেন, লিখলেন—"আপাতত: রাশিয়ায় এসেছি, না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।... এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত: এই একটি দেশের লোক স্বজাতির স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।" [—ঐ

এই সম্পর্কে নিজের দেশের কথা স্বতঃই কবির মনে উঠলো—"অন্ন নেই, বিদ্যা নেই, বৈদ্য নেই, পানের জল পাওয়া যায় পাঁক ছেঁকে, কিন্তু চৌকিদারের অভাব নেই—আর আছে মোটা মাইনের কর্মচারী, তাদের মাইনে গল্‌ফ্‌ ষ্ট্রিমের মতো সম্পূর্ণ চলে যায়, বৃটিশ দ্বীপের শৈত্য নিবারণের জন্যে—তাদের পেনসন জোগাই আমাদের অন্ত্যেষ্টি সৎকারের খরচের অংশ থেকে। এর একমাত্র কারণ লোভ অন্ধ, লোভ নিষ্ঠুর—ভারতবর্ষ ভারতেশ্বরের লোভের সামগ্রী।" [—ঐ

রুশিয়া থেকে ফিরে এসে দেশের ছেলেদের উদ্দেশ্যে কবি বললেন—"সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছি—দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা, পুলিশের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের বোলো, এখনও অনেক বাকী আছে—তার কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বলতে সুরু না করে যে বড়ো লাগছে—সেকথা বললেই লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়। দেশ-বিদেশে ভারতবর্ষ আজ গৌরব লাভ করেছে কেবলমাত্র মারকে স্বীকার না করে—দুঃখকে উপেক্ষা করার সাধনা আমরা যেন কিছুতে না ছাড়ি। পশুবল কেবলই

চেষ্টা করছে আমাদের পশুকে জাগিয়ে তুলতে; যদি সফল হতে পারে তবেই আমরা হারব। দুঃখ পাচ্ছি সেজন্য আমরা দুঃখ করব না। এই আমাদের প্রমাণ করবার অবকাশ এসেছে যে, আমরা মানুষ—পশুর নকল করতে গেলেই এই শুভযোগ নষ্ট হবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের বলতে হবে ভয় করি নে।… আমার সব চেয়ে দুঃখ এই, যৌবনের সম্বল নেই। আমি পড়ে আছি গতিহীন হয়ে পান্থশালায়,—যারা পথে চলেছে তাদের সঙ্গে চলবার সময় চলে গেছে।"

"বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই
কাজের পথে আমি তো আর নাই
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে
জয়মাল্য লও না তুলি গলে
আমি এখন বনচ্ছায়া তলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই
তোমরা মোরে ডাক দিও না ভাই।"

রাশিয়া থেকে কবি ফিরে গেলেন জার্মানীতে। সেখান থেকে গেলেন আমেরিকা। এবার নিয়ে ষষ্ঠবার কবির আমেরিকা যাওয়া হলো।

এখানকার বড় বড় শহরে কবির আঁকা ছবিগুলির প্রদর্শনী হলো। বোস্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া। বিশ্ববিশ্রুত মূকবধির হেলেন কেলার ও উপন্যাসিক সিনক্লেয়ার লিউইস কবির সঙ্গে আলাপ করলেন। আইনস্টাইনের সঙ্গে আবার এখানে কবির সাক্ষাত হয়। আমেরিকা থেকে বিদায়-কালে মার্কিন গুণীরা দুটি বিরাট ভোজসভায় কবিকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানালেন।

এই সময় অধ্যাপক উইলিয়ম কিলপ্যাট্রিক নিউইয়র্ক ইণ্টারন্যাশান্যাল হাউসে কবি সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন—"তিনি শুধু কবি নন, তিনি একজন শিক্ষাদাতা—সর্বকালে সর্বযুগে মানুষকে শিক্ষা দেবার অদ্‌ভূত শক্তি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান—আমি জানি। তাঁর জীবনের এদিকটা নিয়ে আমি অধ্যাপনা করেছি, আলোচনা করেছি। তাই একথা আজ নিঃসংকোচে আপনাদের কাছে বলতে পারি।…বনে সত্যিকারের গাছতলায় তাঁর বিদ্যালয়, বিদ্যা বিতরণের ক্ষেত্র। যতদূর দৃষ্টি যায় চারিদিকে বৃক্ষরাজি সুশোভিত উন্মুক্ত প্রান্তর—নানারূপ ফল ও ফুলের বাগান। বড় বড় ইট পাথরের তৈরী প্রাসাদ সেখানে মূর্তিমান উৎপাতের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নেই। বৃক্ষরাজির মধ্যে

মাথা নীচু করে বাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে আছে—কোথাও এতটুকু বেমানান হয় না। সে আশ্রমের বড় কথা, বড় বড় অট্টালিকা নয়—বৃক্ষ। ভারতবর্ষ এই বৃক্ষের মধ্যেই ধরা দিয়েছে। আপনারা জানেন বোধ হয় ভারতবর্ষে উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রকৃতিদেবী হিন্দুদের প্রাণে যেমনতরো সাড়া দিয়েছেন এমনতরো বোধ হয় আর কোনও দেশে দেন নি। গাছে গাছে প্রাণের হিল্লোল হিন্দুদের প্রাণে গিয়েই পৌছেছে। এভাব অবশ্য কতকটা আমরা জাপানে দেখতে পাই তার কারণ জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এবং সে ধর্মের জন্ম হিন্দুস্থানেই। কবির কল্পনাপ্রসূত এই বিদ্যালয় কবিরই সৃষ্টি। এখানে জাতিবিচার নাই। স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গে মিলেমিশে এখানে বিদ্যাশিক্ষা করে। মিথ্যা সংস্কারের বেড়া দিয়ে স্ত্রীপুরুষকে আলাদা করে রেখে দেওয়া হয় না—এই বিদ্যালয়ে।

"চারুকলা, চিত্রকলা, সংগীত, ধর্ম—এই সব ভারতবর্ষের নিজের রূপেই সার্থক হয়ে ওঠে—এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। আমার মনে পড়ে আমি যখন এই বিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলাম, ঘরে ঢুকবার সময় আমার জুতো-জোড়া আমাকে বাইরে রেখে যেতে হয়েছিল। ভারতবাসীর দিক দিয়ে এর অর্থ যে কত গভীর, কত পবিত্র তা তিনিই বুঝতে পারবেন যাঁর কোনদিন ক্ষণেকের তরেও ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার সঙ্গে এতটুকু পরিচয় ঘটেছে।

"একটা জিনিষ দেখে বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলাম। নয় দশ কি এগারো বছরের ছেলেরা মিলে নিজেদের হাতে একটি বাড়ী তৈরী করেছে—কেবলমাত্র ছাদ তৈরী করতে পারেনি। বাড়ীতে তিনখানি কামরা; একখানিতে পুস্তকালয়, একখানি দোকান এবং একখানি তাদের বসবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাদের কি অহংকার বাড়ীখানি তৈরী করেছে বলে। এই তো চাই। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় এই রকম শিক্ষারই তো প্রয়োজন। শতাব্দীর বিদেশী শাসনে ভারতবর্ষের আর যাই হোক না কেন, কর্মশক্তির অনুপ্রেরণা ভারতবর্ষ হারিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তা জানেন। তাই তাঁর বিদ্যালয়ে এই সব প্রচেষ্টা। তাই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যে কেবল ভারতবর্ষের সভ্যতাই প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তা নয়, পশ্চিমের যা কিছু ভালো তা তিনি গ্রহণ করেছেন এবং বিদ্যালয়ের বিদ্যাদানের মধ্যে তিনি পশ্চিমকে অবহেলা করেন নি।

"কৃষির উন্নতি, গ্রাম্য সংস্কার—এই সমস্তই তাঁর বিদ্যালয়ের অন্তর্গত। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিব্বত থেকে আনীত পুরাতন জীর্ণ পুঁথির মধ্যে প্রাণ ঢেলে দিয়ে পণ্ডিতদের গবেষণা করতে দেখেছি—বৌদ্ধধর্মের নূতন রূপ যদি আবিষ্কৃত

হয়। একটি লোককে আবার দেখলাম বাংলা অভিধান তৈরী করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে।

"কবির বিদ্যাশ্রমে একটি মন্দির আছে—ধর্ম মন্দির। কোনও সম্প্রদায় বিশেষের মন্দির নয়। মানবের ধর্মের, বিশ্বমানবের ধর্মের যা কিছু গভীর, যা কিছু সত্য, যা কিছু মহান—প্রাণে তারই স্পর্শ পাওয়া যায় এই মন্দিরের মধ্যে।

"মহাত্মা গান্ধীর মুখে শুনেছি ভারতবর্ষে যেদিন ত্রিশ কোটি লোক অন্ততঃ একবেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করিতে পারে,—সেদিন ভারতবর্ষের একটি শুভদিন। যে দেশে দারিদ্র্য এত প্রখর, এত ভীষণ, সে দেশে এরূপ একটি বিদ্যালয় সৃষ্টি অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়।"

[—বিচিত্রা-রবীন্দ্র-জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৩৮

একজন মননশীল বিদেশীর চোখে কবির শিক্ষাকেন্দ্র কি রূপে ধরা দিয়াছিল —এ তারই বিবরণ।

এখানে কবির শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। মার্কিন প্রচার বিভাগ পৃথিবীময় খবর ছড়িয়ে দিল—কবি অসুস্থ! সর্বত্রই উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী রাম্‌সে ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ড্‌ টেলিগ্রাম করলেন—কবি কেমন আছেন?

হাংগেরীর লোকেরা জানালো—বালাতন ফুরেড-এ চার বছর আগে কবি যে গাছটি রোপণ করে গেছেন, সে গাছ এখনও সতেজ, ওই গাছ দেখে তাঁরা বুঝেছেন কবির এই অসুস্থতা সাময়িক, তিনি শীঘ্রই নিরাময় হয়ে উঠবেন।

নানা দেশ থেকে টেলিগ্রাম আসতে লাগলো।

এর ফলে সভা-সমিতিতে কবির বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ হলো। চুপ করে বসে থাকতে হলো কিছুদিন। দেড় মাসের মধ্যে মাত্র দুটি বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা থেকে কবি বিদায় নিলেন।

কবি এলেন ইংলণ্ডে। লণ্ডনে তখন ভারতীয় নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক বসেছে। গান্ধিজীর সঙ্গে মোহাম্মদ আলি জিন্না সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দর কষাকষি করছেন। মতের মিল হচ্ছে না। কবি আসতেই কথা উঠলো—আপনি মধ্যস্থ হয়ে একটা মীমাংসা করে দিন্‌। কবি ছিলেন সত্য ও সুন্দরের পূজারী। সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী। তিনি সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে মধ্যস্থ হতে রাজী হলেন না।

কবি দিন পনেরো লণ্ডনে রইলেন। বার্নার্ড শ'য়ের সঙ্গে দেখা করলেন। দীর্ঘকাল দু'জনের মধ্যে নানা বিষয়ের আলোচনা হলো।

কবি এবার বরাবর দেশে ফিরলেন।

কবি নতুন নাটক লিখেছিলেন—'নবীন'। শান্তিনিকেতনে ও এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে এই নৃত্য-নাট্যটি অভিনীত হলো। সত্তর বছরের বৃদ্ধ কবি রঙ্গমঞ্চে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলেন—উদাত্ত কণ্ঠে।

কিছু দিনের মধ্যে উত্তর বঙ্গে এক ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল। বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য কবি উন্মুখ হয়ে উঠলেন। 'শিশুতীর্থ' নামে একখানি গীতিনাট্য তিনি মঞ্চস্থ করলেন। পর পর চারদিন নাটকখানি মঞ্চস্থ হলো। তার বিক্রয়-লব্ধ টাকা গেল বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য।

এই সময় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হলো, সেই অনুষ্ঠানে কবিকে 'কবি সার্বভৌম' উপাধি দেওয়া হলো।

ইতিমধ্যে দেশে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বেধে গেল। কবি স্পষ্ট বললেন—'এই দাঙ্গার ফলে যে তৃতীয় পক্ষ এদেশে পরাধীনতা কায়েম করতে চায় তাদেরই সুবিধা হবে।"

কয়েক বছর আগে এই ধরনের দাঙ্গা সম্পর্কে কবি বলেছিলেন—"হিন্দু মুসলমান সমস্যার কূল পাওয়া যায় না। লাঠালাঠির দ্বারা কোনো জিনিষের সমাধান হয় না। যে রীতিমত জনশিক্ষা দ্বারা ধর্মান্ধতার আরোগ্য ঘটে তা ছাড়া উপায় নেই। য়ুরোপেও এককালে এই বিপদ ছিল, তারা কেবল শিক্ষা দ্বারা মনের বিকার ঘুচিয়ে তবে উদ্ধার পেয়েছে। আমাদের তত কোটিকে তেমন শিক্ষা কবে দেবে, কে দেবে ?" [—চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড

রাজনৈতিক বন্দীদের বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য হিজলী বন্দীশালায় আটকে রাখা হয়েছিল। বন্দীদের সঙ্গে প্রহরীদের বিরোধ হলো। রক্ষীরা বন্দীদের উপর গুলি চালালো; কয়েক জনকে নির্দয়ভাবে প্রহার করলো। এর ফলে দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখা দিল। প্রতিবাদ সভার আয়োজন হলো কলিকাতার টাউন হলে। সেই সভায় এমন জনসমাগম হলো যে টাউন হল ছেড়ে সভা করতে হলো গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নীচে। কবি সেই সভায় সভাপতি হলেন। তীব্র নিন্দা করে কবি বললেন—"প্রজাকে

পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে; কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাহাকে নিরস্ত করতে পারে কোন শক্তি।·· ···ঘটনাটি স্বতঃই আপন কলঙ্ক-লাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যত উচ্চে ধরে আছে তত উর্ধ্বে আমাদের ধিক্কার বাক্য পূর্ণবেগে পৌছতে পারবে না।···"

স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা এই সব অত্যাচারী সিপাহীদের ক্ষমা করার জন্য লেখে। কবি তার উত্তরে বললেন—"···বে-আইনী অপরাধকে অপরাধ বলেই মানতে হবে এবং তার ন্যায়সঙ্গত পরিণাম যেন অনিবার্য হয় এইটেই বাঞ্ছনীয়। অথচ একথাও ইতিহাস-বিখ্যাত যে যাদের হাতে সৈন্যবল ও রাজপ্রতাপ অথবা যারা এই শক্তির প্রশ্রয়ে পালিত তারা বিচার এড়িয়ে এবং বলপূর্বক সাধারণের কণ্ঠরোধ করে ব্যাপকভাবে এবং গোপন প্রণালীতে দুর্বৃত্ততার চূড়ান্ত সীমায় যেতে কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু মানুষের সৌভাগ্যক্রমে এরূপ নীতি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে না।"

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা
স্বর্গ কি হবে না কেনা
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন
নিদারুণ দুঃখ রাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা।"

কবি সত্তর বছরে পড়লেন। বড় দিনের সময় মহাসমারোহে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান হলো। টাউন হলে একটি প্রদর্শনী ও একটি মেলা বসে। প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ কর। এই প্রদর্শনীতে কবির আঁকা একশো খানি ছবি, তাঁর বাংলা ও ইংরাজি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও বিভিন্ন সংস্করণ, বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত গ্রন্থাবলী, কবির বিভিন্ন বয়সের প্রতিকৃতি, নানা দেশ থেকে প্রাপ্ত উপহার, বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের

তৈরী শিল্প-দ্রব্য, বাংলাদেশের প্রাচীন ও আধুনিক ললিতকলা ও শিল্পের নিদর্শন, বেংগল-স্কুল-অফ-পেন্‌টিং-এর আঁকা ছবি এবং ভারতীয় চিত্রকলার প্রাচীন ও আধুনিক নিদর্শনসমূহ প্রদর্শিত হয়।

মেলার আয়োজন করেছিলেন জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। মেলায় কুটীর-শিল্প-জাত নানা জিনিষের সমাবেশ করা হয়েছিল। আর তারই সঙ্গে ছিল যাত্রা, কথকতা, কীর্তন, বাউল, গ্রাম্য সংগীত ও নৃত্য-ক্রীড়ার আয়োজন।

তিনদিন সাহিত্য সম্মেলন ও কবি-সম্বর্ধনা হয়। প্রথম দিনের সভায় সভাপতি হন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কবির প্রতিভার বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেন মনীষীরা। ইন্দিরা দেবী ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আয়োজনে বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকারা পঁয়ত্রিশখানি রবীন্দ্র-সংগীত গান করেন।

দ্বিতীয় দিন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে য়ুরোপীয় ও সর্বভারতীয় সাহিত্যিক, শিল্পী ও শিক্ষাব্রতীদের এক সম্মেলন হয়; সন্ধ্যায় আবার গানের আসর বসে।

তৃতীয় দিনে টাউন হলের বাইরে এক বিরাট জনসভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কবিকে অভিনন্দিত করা হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে মেয়র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রতিভা দেবী এবং জনসাধারণের পক্ষ থেকে কামিনী রায় কবিকে এক একখানি মানপত্র দেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ—'গোল্ডেন বুক অফ টেগোর', এবং ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনের পক্ষ থেকে 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থ কবিকে উপহার দেন।

তারপর তিন দিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'নটির পূজা' অভিনয় হয়। সত্তর বছরের বৃদ্ধ কবি স্বয়ং বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভূমিকা অভিনয় করেন।

কলিকাতার ছাত্র-ছাত্রীরা সিনেট হলের এক মহতী সভায় কবিকে অভিনন্দিত করে।

কবি বললেন—"আমার কর্মপথের যাত্রা সত্তর বছরের গোধূলি বেলায় একটা উপসংহারে এসে পৌছল। আলো ম্লান হবার শেষ মুহূর্তে এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশ আমার দীর্ঘজীবনের মূল্য স্বীকার করবেন।

"ফসল যতদিন মাঠে ততদিন সংশয় থেকে যায়। বুদ্ধিমান মহাজন

খেতের দিকে তাকিয়েই আগাম দাদন দিতে দ্বিধা করে, অনেকটা হাতে রেখে দেয়। ফসল যখন গোলায় উঠল তখনই ওজন বুঝে দামের কথা পাকা হতে পারে। আজ আমার বুঝি সেই ফলন-শেষে হিসাব চুকিয়ে দেবার দিন।······ ফুল ফুটেছে এইটেই ফুলের চরম কথা। যার ভালো লাগল সেই জিতল, ফুলের জিত তার আপন আবির্ভাবেই। সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরের সঙ্গে তার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর গভীর উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ।

"কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা।······

"বীণাপানির বীণায় তার অনেক। কোনোটা সোনার, কোনোটা তামার, কোনোটা ইস্পাতের। সংসারের কণ্ঠে হাল্‌কা ও ভারী, আনন্দের ও প্রমোদের যত রকমের সুর আছে—সবই তাঁর বীণায় বাজে। কবির কাব্যেও সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। সবই যে উদাত্ত ধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলিনে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে।······

"সাহিত্যে মানুষের অনুরাগ-সম্পদ সৃষ্টি করাই যদি কবির যথার্থ কাজ হয়, তবে এই দান গ্রহণ করতে গেলে প্রীতিরই প্রয়োজন। কেননা প্রীতিই সমগ্র করে দেখে। আজ পর্যন্ত সাহিত্যে যাঁরা সম্মান পেয়েছেন, তাঁদের রচনাকে আমরা সমগ্রভাবে দেখেই শ্রদ্ধা অনুভব করি। তাকে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছিদ্র সন্ধান বা ছিদ্র খনন করতে স্বভাবত প্রবৃত্তি হয় না।·····

"মর্ত্যলোকে শ্রেষ্ঠ দান এই প্রীতি আমি পেয়েছি এ-কথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেয়েছি পৃথিবীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে—তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার হৃদয় নিবেদন করে দিয়ে গেলাম। তাঁদের দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেছে আমার ললাটে—আমার যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা তাঁদের গ্রহণের যোগ্য হোক।······

"জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা,

অঙ্গুলি তুলি' তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে'
এ-কূল হইতে নব-জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।...

যা কিছু পেয়েছি, যাহা-কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে,
যে-মণি দুলিল, যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের' পরে।" [—আত্মপরিচয়

গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে এসেই মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হলেন, সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল প্রভৃতি নেতারা এবং রবীন্দ্র-জয়ন্তী মেলার সম্পাদক জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। জয়ন্তী অনুষ্ঠান হয়তো আরো কয়েকদিন চলতো, এই কারণে সহসা বন্ধ হয়ে গেল। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ডের কাছে কবি টেলিগ্রাম করলেন—'নির্বিচারে নিপীড়ন করার যে নীতি ভারত গবর্ণমেণ্ট মহাত্মাজীর গ্রেপ্তার থেকে সূচনা করলেন, তা অতীব শোচনীয়, তার ফলে জনসাধারণের শুভবুদ্ধিকে স্থায়ীভাবে দূরে ঠেলে দেওয়া হলো, রাজনীতিক মীমাংসার ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা করাও আমাদের পক্ষে অতীব কঠিন হয়ে পড়লো।'. [—রবীন্দ্রনাথ-সু. দা.

২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে কবি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এক বিবৃতি দিলেন সংবাদপত্রে। কিন্তু গবর্মেণ্ট তার সবটুকু ছাপতে দিল না। সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী এবার বেদনার্ত মানবতার চিরন্তন প্রশ্ন তুললেন বিশ্বসমাজের কাছে—

"আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,—

আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।"
[—পরিশেষ

বিলাত থেকে কয়েকজন 'কোয়েকার'-সাহেব এলেন এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা দেখবার ও বুঝবার জন্য। শান্তিনিকেতনে কবি তাঁদের বললেন—'আমরা অপেক্ষা করছি—অবস্থার একটা মূলগত পরিবর্তনের জন্য, যা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে একটা ঐক্য ও বুঝাপড়ায় পৌঁছে দেবে।'

শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে কবি বললেন—'দেশ মানুষের, দেশের কল্যাণ করতে হলে সেই মানুষকে দৈন্য থেকে মুক্তি দিতে হবে। তার প্রকৃষ্ট সাধনা হলো স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করা।'

৲

পারস্যের রাজা রেজা-শা-পহ্লভি কবিকে আমন্ত্রণ জানালেন। কবি পারস্য যাত্রা করলেন বিমানে। সঙ্গে চললেন প্রতিমা ঠাকুর ও ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী; কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় আগেই চলে গিয়েছিলেন।

কবি তেহেরাণে পৌছতেই রেজা-শা-পহ্লভি কবির সঙ্গে দেখা করলেন। কবি একটি কবিতা লিখে রাজাকে উপহার দিলেন। রাজার নির্দেশে ৭ই মে সারা পারস্যে কবির জন্মোৎসব প্রতিপালিত হলো। সরকারের পক্ষে থেকে কবিকে একখানি পদক ও একখানি ফর্মাণ দেওয়া হয়। কবি তাঁর ভাষণে বললেন—'আমি প্রথম জন্মেছি নিজের দেশে, যেদিন কেবল আত্মীয়েরা আমাকে স্বীকার করে নিয়েছিল তারপর তোমরা যেদিন আমাকে স্বীকার করে নিলে আমার সেদিনকার জন্ম সর্বদেশের—আমি দ্বিজ।'

কবি গেলেন সিরাজে। সেখানে সাদীর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন।

এখানে দর্শনার্থীর ভীড় এতো বেশী হয়েছিল যে পুলিশের পক্ষে সেই ভীড়কে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। শেষে সৈন্য ডাকতে হয়। সৈন্য এসে ভীড়কে আয়ত্তে আনে। সাদীর রচিত একখানি প্রাচীন হাতে-লেখা পুঁথি এখানে কবিকে উপহার দেওয়া হয়।

তারপর গেলেন হাফেজের সমাধিতে।

সাদীর সমাধি অত্যন্ত সাদাসিদে। ফুল ও দীপের সমারোহে এই সমাধিটি স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল, কবির ভাল লেগেছিল। কিন্তু হাফেজের সমাধি তেমনভাবে মুগ্ধ করেনি। পুরানো সাদাসিদে কবরের উপর নতুন আমলের এক মণ্ডপ তুলে দেওয়া হয়েছে। কবির চোখে কারুকার্য-করা এই মণ্ডপ হাফেজের কাব্যের সঙ্গে একেবারে বেমানান বলে মনে হলো।

হাফেজের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে কবি মণ্ডপে কিছুক্ষণ বসলেন।

সমাধিরক্ষক একখানি বড় বই এনে কবির সামনে ধরলো। সেখানি হাফেজের কাব্যগ্রন্থ। রক্ষক বললো—লোকের বিশ্বাস কোন একটি বিশেষ ইচ্ছা মনে নিয়ে চোখ বুঁজে এই বই খুললে যে কবিতাটি বেরুবে সেইটি পড়লেই সে ইচ্ছা সফল হবে কি বিফল হবে তা বুঝতে পারা যায়।

কবি বইখানি হাতে নিলেন। একটু আগেই ওখানকার গবর্ণরের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে, সেই কথাটাই মনে এলো। চোখ বুঁজে বই খুললেন।

যে পাতা বেরুলো তার কবিতাটি দু'ভাগে ভাগ করা, রক্ষক পড়ে তার ব্যাখ্যা করে দিলেন—

"প্রথম অংশ।—মুকুটধারী রাজারা তোমার মনোমোহন চক্ষুর দাস, তোমার কণ্ঠ থেকে যে সুধা নিঃসৃত হয় জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানেরা তার দ্বারা অভিভূত।

"দ্বিতীয় অংশ।—স্বর্গদ্বার যাবে খুলে, আর সেই সঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি, এও কি হবে সম্ভব? অহঙ্কৃত ধার্মিক-নামধারীদের জন্যে যদি তা বন্ধই থাকে তবে ভরসা রাখো মনে, ঈশ্বরের নিমিত্ত তা যাবে খুলে।" [—পারস্যে

মানে যে প্রশ্ন জেগেছিল তার সঙ্গে উত্তরের সংগতি দেখে কবি বিস্মিত হলেন।

ইস্পাহানের এক পার্বত্য পল্লীতে কবিকে একদিন সম্বর্ধনা জানানো হলো। সেই সভায় এক গ্রাম্য কবি একটি কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানান—

"ভারত থেকে সার্থবাহরা উটের পিঠে চিনি নিয়ে আসে, কিন্তু এবার এসেছে সংগীতের সৌরভ, ওগো পণ্যবাহীর দল, বারেক থাম, সৌরভ-আকুল প্রজাপতির মত উৎসুক অন্তর তোমাদের অনুসরণ করছে, যেমন দীপশিখার চারিপাশে পতঙ্গের দল ঘুরে বেড়ায় ও আত্মাহুতি দেয়, সেইভাবে।

'ওগো দেবদূত, সাদীর সমাধির উপর তোমার শৃঙ্গার মৃদু মধুর সুর ধ্বনিত হোক্। আনন্দের স্পর্শে সাদী পুনরুজ্জীবিত হবেন তাঁর সমাধির মধ্যে।

'কবি, তুমি অতুলনীয়, তুমি অতীত ও ভবিষ্যদ্‌বেত্তা দার্শনিক।

'মহান্ সাইরাসের দেশে, যেখানে তাঁরই এক যোগ্য বংশধর সিংহাসনে আসীন, সে দেশে তোমার আগমন শুভসূচক হোক্, সৌভাগ্যদ্যোতক হোক্!"

রাজা ফইজল কবিকে আমন্ত্রণ জানালেন।

কবি গেলেন ইরাকে।

বোগদাদে সাহিত্যিকদের তরফ থেকে কবিকে অভিনন্দন জানানো হলো। কবি তার উত্তরে বললেন—"আজ আমি একটি দরবার নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। একদা আরবের পরম গৌরবের দিনে পূর্বে পশ্চিমে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূভাগ আরব্যের প্রভাব-অধীনে এসেছিল। ভারতবর্ষে সেই প্রভাব যদিও আজ রাষ্ট্রশাসনের আকারে নেই, তবুও সেখানকার বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়কে অধিকার করে বিদ্যার আকারে ধর্মের আকারে আছে। সেই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে আমি আপনাদের বলছি আরব সাগর পার করে আরব্যের নববাণী আর একবার ভারতবর্ষে পাঠান—যাঁরা আপনাদের স্বধর্মী তাঁদের কাছে —আপনাদের মহৎ ধর্মগুরুর পূজ্য নামে, আপনাদের পবিত্র ধর্মের সুনাম রক্ষার জন্য। দুঃসহ আমাদের দুঃখ, আমাদের মুক্তির অধ্যবসায় পদে পদে ব্যর্থ; আপনাদের নবজাগ্রত প্রাণের উদার আহ্বান সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা থেকে, অমানুষিক অসহিষ্ণুতা থেকে, উদার ধর্মের অবমাননা থেকে, মানুষে মানুষে মিলনের পথে মুক্তির পথে নিয়ে যাক্ হতভাগ্য ভারতবর্ষকে। এক দেশের কোলে যাদের জন্ম অন্তরে-বাহিরে তারা এক হোক্।" [—পারস্যে

রাজা ফইজল কবিকে বিশেষ সমাদর করেন। রাজ উদ্যান-সৌধে নিভৃত আলাপে রাজার সঙ্গে সারাদিন কবির কেটে যায়।

এক বেদুইন সর্দার কবিকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর তাঁবুতে। মস্ত বড়-

তাঁবু, মেঝেতে কার্পেট পাতা।—"একটা বড়ো কাঁচের গুড়গুড়িতে একজন তামাক টানছে ; ছোটো আয়তনের পেয়ালা আমাদের হাতে দিয়ে তাতে অল্প একটু করে কফি ঢাললে, ঘন কফি, কালো তিতো। দলপতি জিজ্ঞাসা করলেন আহার ইচ্ছা করি কি না, 'না' বললে আনবার রীতি নয়। ইচ্ছা করলেম, অভ্যন্তরে তাগিদও ছিল। আহার আসবার পূর্বে সুরু হলো একটু সঙ্গীতের ভূমিকা! গোটাকতক কাঠির উপরে কোনোমতে চামড়া জড়ানো একটা ত্যাড়া-বাঁকা একতারা যন্ত্র বাজিয়ে একজন গান ধরলে।...অত্যন্ত মিহি-চড়া গলায় নিতান্ত কান্নার সুরে গান।...অবশেষে সামনে চিলিমৃচি ও জলপাত্র এল। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে বসলুম। মেঝের উপর জাজিম পেতে দিলে। পূর্ণ-চন্দ্রের ডবল আকারের মোটা মোটা রুটি, হাতাওয়ালা অতি প্রকাণ্ড পিতলের থালায় ভাতের পর্বত আর তার উপর মস্ত এবং আস্ত একটা সিদ্ধ ভেড়া। দু-তিনজন জোয়ান বহন করে মেঝের উপর রাখলে। আহার্য্যার্থীরা সব বসলো থালা ঘিরে। সেই এক থালা থেকে সবাই হাতে করে মুঠো মুঠো ভাত প্লেটে তুলে নিয়ে আর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। ঘোল দিয়ে গেল পানীয় রূপে।...এইবার হোলো নাচের ফরমাস। একজন একঘেয়ে সুরে বাঁশী বাজিয়ে চলল, আর এরা তার তাল রাখলে লাফিয়ে লাফিয়ে। একে নাচ বললে বেশি বলা হয়।...তারপরে বাইরে এসে যুদ্ধের নাচ দেখলুম। লাঠি ছুরি বন্দুক তলোয়ার নিয়ে আস্ফালন করতে করতে চীৎকার করতে করতে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে তাদের মাতুনি, ওদিকে অন্তঃপুরের দ্বার থেকে মেয়েরা দিচ্ছে তাদের উৎসাহ।" [—পারস্যে

বেদুইনের সেই তাঁবুতে সারাটা দিন কেটে গেল।

প্রায় দু'মাস ইরান ও ইরাকে কাটিয়ে কবি ফিরে এলেন বিমানপথে।

ভারতে সাম্প্রদায়িকতা স্থায়ী ভাবে বজায় রাখার জন্য বিদেশী শাসক 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' ঘোষণা করলেন। গান্ধিজী এই নীতির প্রতিবাদে অনশন করার সংকল্প করলেন। অনশন করার আগে মহাত্মাজী কবির কাছে টেলিগ্রাম করলেন—'গুরুদেব, এখন প্রত্যূষ তিনটে, মঙ্গলবার, আজ দুপুর থেকে আমার অগ্নিপরীক্ষা সুরু হবে। আপনার আশীষ চাই। আপনি আমার সত্যিকারের সুহৃদ, কারণ আপনি আমার আন্তরিক শুভকামী। আপনার অন্তর যদি আমার কাজ সমর্থন করে, আপনি আমায় আশীর্বাদ করবেন। তা-ই হবে

আমার অবলম্বন। আশা করি আপনি আমাকে বুঝতে পেরেছেন। প্রীতি জানবেন।—' ম, ক, গান্ধী।'

কবি তার উত্তরে জানালেন—'ভারতের ঐক্য ও সামাজিক সংহতি রক্ষার জন্য মূল্যবান জীবন আহুতি দেবার প্রয়োজন আছে।...যদিও আমরা জানিনা আমাদের শাসকবর্গের উপর এর কি প্রভাব হবে, জনসাধারণের কাছে এর যে বিশেষ গুরুত্ব আছে তা হয়তো তারা বুঝতে পারবেন না। তবে আমরা নিশ্চিত জানি যে এই ধরনের আত্মাহুতির চরম আবেদন আমাদের দেশবাসীর বিবেকের কাছে ব্যর্থ হবে না, এবং জাতির বিয়োগান্ত পরিস্থিতিকে চরম পরিণতিতে পৌছে দিতে তাঁরা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীকৃতি দেবেন না। আমার দুঃখিত অন্তর শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে আপনার মহান্ প্রায়শ্চিত্তের গতি লক্ষ্য করবে।'

মহাত্মাজী অনশন স্বরু করলেন।

ক'দিন পরেই খবর এলো, মহাত্মাজীর অবস্থা খারাপের দিকে চলেছে। কবি চলে গেলেন পুণায়—য়েরোড়া জেলে গান্ধিজীর শয্যাপার্শ্বে। মহাত্মাজীর পাশে বসে, শীর্ণ শান্ত সন্ন্যাসীর মুখের পানে তাকিয়ে কবির চোখে জল এলো। কিছুক্ষণ দু'জনের কেউ কোন কথা বলতে পারলেন না। তারপর চোখের জল মুছে রুদ্ধকণ্ঠে কবি জানালেন—মহাত্মাজীর মনোবেদনা লাঘব করার উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যদের জন্য যা কিছু করা দরকার সব কিছু করার জন্যই তিনি প্রস্তুত আছেন।

কবির কথায় মহাত্মাজীর অনশন-ক্লান্ত মুখখানি স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মহাত্মাজী শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন দেখে কবি বিদায় নিলেন।

সেইদিন বিকাল সওয়া-চারটের সময় খবর এলো—বিলাতের কর্তারা গান্ধিজীর কথা মেনে নিয়েছেন। গান্ধিজী অনশন ভঙ্গ করলেন। প্রার্থনা-সভা হলো। সেই সভায় কবি প্রার্থনা করলেন—

"জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীত-সুধা-রসে এসো॥
কর্ম যখন প্রবল আকার, গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার
হৃদয় প্রান্তে হে জীবন-নাথ, শান্ত চরণে এসো।
... ...
বাসনা যখন বিপুল ধূলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো॥" [—গীতবিতান ১ম

এই সময় ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিদেশে নানা মিথ্যা প্রচার করতে থাকে। বিঠলভাই প্যাটেল তখন ছিলেন য়ুরোপে, তিনি সেইসব মিথ্যার প্রতিবাদ করতে সুরু করলেন। কবি এখান থেকে তাঁকে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দিলেন। এই সম্পর্কে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে কবি বললেন—'মাঝে মাঝে এদেশের দু-একজন জ্ঞানী-গুণী বিদেশে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যাবে না। পশ্চিম-দেশগুলিতে পুরোদস্তুর সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।'

এদেশের নেতারা অনেকেই তখন বিনাবিচারে বন্দী ছিলেন। তাঁদের মুক্তি কামনা করে দেশের লোকেরা বিলাতের পার্লামেণ্টের সদস্যদের কাছে এক আবেদন জানালেন। সেই আবেদন-পত্রে প্রথম স্বাক্ষর করলেন রবীন্দ্রনাথ।

কবি ছিলেন দার্জিলিঙে, খবর পেলেন মহাত্মাজী আবার অনশন করতে চান। গতবারের অনশনের সময় মহাত্মাজীর অবস্থা কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাড়াতাড়ি তিনি গান্ধিজীর কাছে টেলিগ্রাম করলেন,—মহাত্মাজী যেন আবার অনশন না করেন। কিন্তু সে টেলিগ্রাম মহাত্মাজীর কাছে গিয়ে পৌঁছালো না। গবর্মেণ্ট মাঝপথে তা আটক করলো।

আরেক অনশনের সংবাদ এলো আন্দামান থেকে। সেখানকার কারাগারে অনেক রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন, কর্মচারীদের অনাচার ও উৎপীড়নের প্রতিবাদে তাঁরা অনশন সুরু করলেন। কবি তখনই তাঁদের টেলিগ্রাম করলেন—'এভাবে আত্মাহুতি দেওয়া ঠিক হবে না।' বন্দীরা কবির অনুরোধের সম্মান রাখলেন।

হঠাৎ কবির বিরুদ্ধে এক আন্দোলন সুরু হয়ে গেল পাঞ্জাবে। লয়ালপুরের শিখেরা বললো—কবি কথাকাহিনীতে গুরুগোবিন্দের নামে যে গল্পটি লিখেছেন তাতে গুরুর অপমান করেছেন। এক প্রতিবাদ সভাও হলো। কবি তো অবাক, শুনলেন এক উর্দু কাগজে তাঁর কবিতার এক নিকৃষ্ট অনুবাদ বেরিয়েছে তাতেই এই ব্যাপার। তিনি একখানি চিঠি লিখলেন অধ্যাপক তেজা সিংহের কাছে—'কাহিনীটি ম্যাকগ্রিগর ও কানিংহামের ইতিহাস থেকে সংগৃহীত, এতে কোন অশ্রদ্ধার ভাব নেই।'

তবু কাগজে বিতর্ক চললো কিছুদিন, তারপরে কবি যখন পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে গেলেন লাহোরে তখন সেই বিতর্কের শেষ হলো। শিখেরা তাঁকে দেখে, তাঁর কথাবার্তা শুনে এক গুরুদ্বারে কবিকে বিশেষভাবে সম্বর্ধনা জানালো।

কলিকাতায় এই সময় দুটি সভা হয়ে গেল, কবি হলেন তার সভাপতি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী ও রামমোহন শতবার্ষিকী উৎসব।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিমন্ত্রণ এলো। কবি সেখানে গিয়ে তিন দিন তিনটি বক্তৃতা করলেন।

সেখান থেকে কবি গেলেন হায়দ্রাবাদে। রাজ-অতিথি হয়ে রইলেন দিন-পনেরো। বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করলেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম ইতিপূর্বে বিশ্বভারতীতে ইসলাম সংস্কৃতি শিক্ষাদানের জন্য এক লাখ টাকা দিয়েছিলেন, এবার আরও পাঁচিশ হাজার টাকা কবির হাতে দিলেন।

বিহারে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেল, গান্ধিজী বললেন—অস্পৃশ্যতার পাপেই এই ভূমিকম্প হয়েছে।

সারা ভারতেই অস্পৃশ্যতা রয়েছে তাহলে একা বিহারই বা তার ফল ভুগবে কেন? কবি মহাত্মাজীর এই উক্তির প্রতিবাদ করলেন। গান্ধিজী বললেন—'এই আমার বিশ্বাস!' এর পর আর যুক্তি চলে না। পৃথিবীর সকল দেশে কবি আবেদন জানালেন বিহারের দুর্গতদের সাহায্যের জন্য।

কবি আবার বেরুলেন ভ্রমণে—বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের আশায়; সঙ্গে চললো শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা।

কবি পৌছলেন সিংহলে। কলম্বোতে পাঁচদিন 'শাপমোচন' অভিনয় হলো। কবির ছবিরও একটা প্রদর্শনী হলো। পাণ্ডুরায় শ্রীনিকেতনের আদর্শে একটি গ্রামোন্নয়ন গঠিত হয়েছিল, কবি তার নামকরণ করলেন—শ্রীপল্লী।

সিংহলে কবি রইলেন প্রায় একমাস সাতদিন। এখানকার কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কবির লিখন ছিল অব্যাহত। এইখানে বসেই তিনি 'চার অধ্যায়' উপন্যাসখানি শেষ করলেন।

ইতিমধ্যে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যু ঘটলো। কবি স্পষ্টই বললেন—'দীর্ঘকাল রাজনৈতিক বন্দীরূপে আবদ্ধ থাকার জন্য যে তাঁহার মৃত্যু এত ত্বরান্বিত এবং এত অসময়ে সংঘটিত হইল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'

কবি এই সময় অল্পদিনের ব্যবধানে দুটি আঘাত পেলেন, দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যু ও ভ্রাতুষ্পুত্র দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যু।

মীরার জ্যেষ্ঠপুত্র নীতিন্দ্রনাথ য়ুরোপে গিয়েছিলেন পড়াশুনা করতে। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহসা একদিন খবর এলো তিনি

মারা গেছেন। কবি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, এই আঘাত খুব বড় হয়ে বাজলো।—

"কিছুকাল থেকে আমি আছি মৃত্যুর ছায়ায় ডুবে। নীতুর বই তার কাপড় তার জিনিষপত্র এসে পৌঁছেছে। যে নিজে যায় চলে সে যা কিছু ফেলে রেখে যায় তাতে তার বিচ্ছেদকে আরো দুঃসহ করে তোলে—সংসারের সমস্ত আয়োজনকে কী ফাঁকি বলেই মনে হয়।...অনুভব করচি যে প্রাণ গেছে—ছোটোবড়ো তার কতগুলো শিকড় সংসারের অন্তরে অন্তরে আঁকড়ে রয়েছে, তারা ছিল বিচিত্র আনন্দের সম্বন্ধসূত্র আজ তারাই অসহ্য বেদনার জাল বিস্তার করেছে চারিদিকে—সান্ত্বনা দেবার কোনো কথাই নেই, স্তম্ভিত হয়ে নির্বাক হয়ে থাকতে হয়। মৃত্যু আপন বেদনা মারবার জন্যে বৈরাগ্য আনে—একমাত্র সেই বৈরাগ্যই—যে গেছে এবং যে সংসারটা পড়ে আছে তাদের মধ্যে নীরব গম্ভীর বাণী বহন করতে থাকে।"... [—চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড

"নীতুকে খুব ভালবাসতুম।...কিন্তু সর্বলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি কাউকে বলিনে আমাকে রাস্তা ছেড়ে দাও, সকলে যেমন চলছে চলুক। সবার সঙ্গে আমিও চলব। অনেকে বললে এবার বর্ষামঙ্গল বন্ধ হয়ে যাক্—আমার শোকের খাতিরে—আমি বললুম সে হতেই পারে না। আমার শোকের দায় আমিই নেব—কোনরকম আনুষ্ঠানিক শোক একটুও দরকার নেই।...ভয় হয়েছিল পাছে সবাই আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসে, তাই কিছুদিনের জন্য বারণ করেছিলুম সবাইকে আমার কাছে আসতে। কিন্তু আমার সকল কাজকর্মই আমি সহজভাবে করে গেছি।...যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাতে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক্, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেক দিন ধরে বার বার করে বলেচি, আর তো আমার কোন কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি, এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক্। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌঁছয়—নইলে ভালোবাসা এখনো টিঁকে থাকে কেন? শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই।

মন বললে, কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে। আমিও তারি মধ্যে সমস্তের জন্যে আমার কাজও বাকি রইল, যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়—যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।"… [—চিঠিপত্র ৪র্থ খণ্ড

নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরেই দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে।—

"মৃত্যুকে আমরা সকলের চেয়ে ভুলে থাকি, অথচ মৃত্যু যখন ঘরের মধ্যে দেখা দেয় তখন বুঝতে পারি আমরা কী অসহায়—একেবারে চরম আঘাত, কোথাও কোনো আপিল নেই।" [—চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড

বিশ্বভারতীকে সমৃদ্ধ করার জন্য সমস্তশক্তি কবি সেই দিকেই নিয়োগ করেন। আর্থিক দিক থেকে বিশ্বভারতীর অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না, কিন্তু কবি সর্বস্ব পণ করেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। কবিকে এজন্য বহুবার বহুভাবে টাকা ধার করতে হয়। ১৯১৭ সালে কবি একখানি চিঠিতে লেখেন—'শতকরা দশটাকা সুদে হ্যাণ্ডনোট অনেক দিন লিখিনি—ন'টাকা পর্যন্ত অভ্যাস আছে। শুনলাম মাসে দেড় হাজার টাকা কেবল সুদই দিচ্ছি।' [—চিঠিপত্র ৫ম

আরেকখানি চিঠিতে লেখেন—'এই দেনার বিপাকে পড়ে বিদ্যালয়ের অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হয়েছে যে আমি আর উদাসীন থাকতে পারিনে। একে যুদ্ধের জন্য দাম চড়ে গেছে, তাতে আমাদের এস্টেট থেকে সুদ বন্ধ, শান্তিনিকেতন থেকে যে ২৫০৲ টাকা পাওয়া যেত তাও বন্ধ, ছেলেদের অনেকেই দুর্দশায় পড়ে বহুকাল বেতন মুলতুবি রেখেচে ইত্যাদি সমস্ত উৎপাত একসঙ্গে জড়ো হয়েছে। ভাগ্যে হঠাৎ ম্যাক্‌মিলান হাজার টাকা পাঠিয়েছিল তাই উপস্থিত মত কাজ চলচে। আমাদের নিজের ক্ষুধিত সংসারের গ্রাস থেকে এই হাজার টাকা ছিনিয়ে আনা আমার পক্ষে কম দুঃখকর নয়, কিন্তু সেকথা ভাব্‌বার সময় নেই।"… [—চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড

১৯২১ সালের আরেকখানি চিঠি—'দুই-একশো টাকা যা পাওয়া যায় তাই সই—কেননা সেখানে অন্ত ভক্ষ্যো ধনুর্গুণ…গত বছরে আশ্রমে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে—এবারে হয়ত তার বেশিই হবে—এখনই দু-একটা

ঢেউ লাগলেই নৌকা কাৎ হবে—সেই সঙ্গে আমিও, তাই অর্থচিন্তায় আছি। অর্থচিন্তায় শরীর মনকে শোষণ করে—করেও অর্থের সুযোগ ঘটায় না। আমার অবস্থা এই।' [—চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড

কিছুদিন পরের আরেক খানি চিঠি—'বিশ্বভারতীকে মরীচিকা বলে মনে হয়…এ কি টিকবে?……যাই হোক্ আমাদের শাস্ত্র বলেচেন বপন করতে, ফলের হিসাব করতে নিষেধ করেচেন। অতএব এমনি করেই দিন কাটবে, তার-পরে দিন শেষ হয়ে গেলে আমার দায় যাবে চুকে।' [—চিঠিপত্র ৫মখণ্ড

কিন্তু এ দায় কবি যত সহজ চুকাতে চেয়েছিলেন ততো সহজে চুকলো না। কবিকে নানাভাবে অর্থের সংস্থান করতে হলো। কবি অনেক বিচার করে দেখলেন নৃত্য-গীত-অভিনয়ের অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েই এদেশে টাকা তোলা সহজ। এদেশে ধনীদের টাকা আছে কিন্তু সৎকাজে সহজভাবে সে টাকা দেবার মত হৃদয় আছে সামান্য সংখ্যকের। কবি তাই নৃত্যগীতেরই আয়োজন করলেন। নিজের গীতিনাট্যগুলি শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে অভিনয় করাতে সুরু করলেন। শুধু কলিকাতায় নয়, ভারতের নানাস্থানে কবি শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ঘুরলেন। পাটনা ও এলাহাবাদ হয়ে যখন তিনি দিল্লীতে এলেন তখন এই বয়সে তাঁর মত বিশ্ববরেণ্য মনীষীকে অর্থের জন্য এতো পরিশ্রম করতে দেখে মহাত্মাজী চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কবির কাছে এলেন, বললেন—এ কী?

কবি বললেন—টাকা চাই নাহলে বিশ্বভারতী বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না। অনেক টাকা ঋণ হয়েছে, শোধ করতে হবে।

টাকার একটা মোটামুটি হিসাব কবি বললেন।

গান্ধিজী সচেষ্ট হয়ে ষাট হাজার টাকা সংগ্রহ করে দিলেন কবিকে। বললেন—এই টাকায় আপনার সব ঋণ শোধ হবে। এই বয়সে আপনি অর্থের জন্য এভাবে ঘুরে বেড়াবেন এ আমি দেখতে পারি না।

কবির অর্থাভাব মিটে গেল।

বিশ্বভারতী শুধু কবির কল্পনা বিলাসই ছিল না, গান্ধিজীও শান্তিনিকেতনকে কি চোখে দেখতেন তা একটি ছোট ঘটনা থেকে জানা যায়।—

জাপানের এক খ্যাতনামা জনকল্যাণ-কর্মী কাগাওয়া এসেছিলেন ভারতবর্ষে।

গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করে কথায় কথায় তিনি বললেন—বাংলা দেশে গোসাবা দেখতে যাব।

গান্ধিজী বললেন—শান্তিনিকেতন যাবেন না?

কাগাওয়া বললেন—না।

গান্ধিজী বললেন—ভালকথা। গোসাবা গোসাবা, কিন্তু শান্তিনিকেতন ভারতবর্ষ। [—রবীন্দ্রজীবনী

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে টাউন হলে এক সভা হলো। কবি হলেন সভাপতি। সভাপতির ভাষণে কবি বললেন—"আমার পক্ষে ইহার (বাঁটোয়ারা) অপমান এমন দুর্বিসহ যে, বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যহীনতার অজুহাত দেখাইতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম এবং আমার চিরপ্রিয় নির্জনতা পরিত্যাগ করিয়া সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতে আসিলাম।...

"সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দেশের রাজনৈতিক জীবনকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য একটা অভিশাপ। যে সকল দল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা চাহে নাই, তাহাদেরও উপর এই অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে। ভারতবাসীকে রাজনীতি হিসাবে আঠারোটা পৃথক ভাগে বিভক্ত করিবার আয়োজন হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ইহাকে ভারতবর্ষের জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্যবচ্ছেদের ফলে ভারতবর্ষ প্রাণহীন শবমাত্রে পরিণত হইবে।..."

ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি কবি বললেন—"আসুন আমরা দূরদর্শিতা অবলম্বন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি যে, সাবধানীর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সুবিধা লাভ হয়, তাহা ভাগ্যবান অনুগৃহীত এবং দুর্ভাগ্য বিমুখ—উভয়ের পক্ষেই সমান ক্ষতিকর। তাহার ফলে যে সকল জটিলতার সৃষ্টি হইবে, তাহা পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্‌কাইয়া দিবে, এবং যাহারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সস্তায় কিস্তীমাত করে, পরিণামে তাহাদেরও কোন মঙ্গল হইবে না। আমরা, যাহারা এই জন্মভূমির সন্তান, সভ্য জাতিস্বরূপ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য, এমন কি, আত্মরক্ষার জন্য তাহাদের উচিত পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা, উভয় সম্প্রদায়েরই ক্ষোভের কারণ ও প্রলোভন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া দেশ ও বিদেশের তাহাদিগকেই উপেক্ষা করা উচিত, যাহারা তাহাদের বন্ধুত্বের পথে কণ্টক স্থাপন করে।

"এই অন্যায় অনুগ্রহের যে একটা নিশ্চিত প্রতিক্রিয়া আছে তাহাই

চিন্তার বিষয়। কারণ একদিন আসিবে যেদিন আর এইরূপ অনুগ্রহ করা সম্ভব হইবে না; যেদিন একতরফা আব্দার পালনে স্বেচ্ছাচারীরও চক্ষুলজ্জা হইবে; অথচ সেইদিনও অন্যায় অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে না।…”

কবি বৃটিশের উদ্দেশে বললেন—“যাঁহারা ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কোন দেশের অধিবাসীদিগকে সাময়িক কালের জন্য নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়া অপমানের বোঝা শিরে বহিতে বাধ্য করা যায় বটে কিন্তু তাহাদিগকে চিরতরে তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য করা যায় না। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, ঐ অপমান প্রতিনিক্ষিপ্ত হয় এবং উহার বিষ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়।” [—জাতীয় আন্দোলনে…

এই সভায় ভীড় হয়েছিল অত্যধিক। গরমের চাপে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে অক্‌সিজেন দিতে হয়। ডাক্তার নীলরতন সরকার সারাক্ষণ তাঁর পাশে পাশে ছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চিরাচরিত রীতির এক ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বসলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৭ সালের সমাবর্তন উৎসবে কবি মূল ভাষণ দিলেন। ইতিপূর্বে কোনও বেসরকারী লোক এই সম্মান পাননি। কবির এই অভিভাষণের বিশেষত্ব ছিল যে ভাষণটি বাংলাভাষায় রচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ ঘটনা অবিস্মরণীয়।

ভাষণ শেষে কবি প্রার্থনা করলেন—

“হে বিধাতা, দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।
টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে
সবলে ধিক্‌কৃত করে দীনতার ধূলায় লুণ্ঠন।
দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর কর মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্যাদা বিসর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি নিষ্ঠুর আঘাতে।…”

এই সময় ভারতীয় কয়েকটি বিশ্ববিত্তালয় কবিকে উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

কাশী বিশ্ববিত্তালয় কবিকে সাহিত্যাচার্য উপাধি দেন ১৯৩৫ সালে।

ঢাকা বিশ্ববিত্তালয় কবিকে সাহিত্যাচার্য উপাধি দিলেন ১৯৩৬ সালে।

অন্ধ্রের ভারততীর্থ কবিকে 'কবি সম্রাট' উপাধি দিলেন ১৯৩৭ সালে।

ওসমানিয়া বিশ্ববিত্তালয় কবিকে সাহিত্যাচার্য উপাধি দিলেন ১৯৩৮ সালে।

বৃদ্ধ কবি চারিদিক থেকে অভিনন্দনের চাপে বিব্রত হয়ে উঠলেন। ইন্দিরা দেবীকে একখানি চিঠিতে লিখলেন—"অভিনন্দনের ভীড়কে কোন রকমে পাশ কাটাতে পারলেই আমি বাঁচি—কিন্তু খোঁড়ার পা খানায় পড়ে—ঐ ভীড় ঠেলেই চলতে হয়েছে সমুদ্রের এক তীর থেকে অন্য তীর পর্যন্ত। যদিও এসে পড়লুম শেষ ঘাটে তবু ঢাকীর দলের ঢাক পিটুনি আরো যেন মেতে উঠচে।...আমি নিশ্চয় জানতুম আমার আসন মাটিতে—আদরের এই উপবাস এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে আজ তার প্রাচুর্য আমার পাওনার বেশী মনে না করলেও তাতে অস্বস্তি বোধ করি। জন্মদিনের ডাকের চিঠিগুলো দেখলে বিষম কুণ্ঠা বোধ হয়, ভালো করে পড়িই নে—এই আমার অবস্থা অথচ—যাকগে!"

[—চিঠিপত্র ৫ম

এই সময় দেশের সর্বত্রই রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান হতে থাকে। জয়ন্তীর এই আধিক্য দেখে কবি একদিন কথায় কথায় রাণী চন্দকে বললেন—"আমাকে এই স্তুতিবাদ, চাটুক্তি করার মানে হয় না। এতে অত্যুক্তি থাকে অনেক। আর—কী লাভ এই প্রশংসায়। আমি বড়লোক, বড় লেখক, বিশ্ববিখ্যাত; এই সব স্তুতিবাদে আমি লজ্জায় হেঁট হয়ে যাই।...আমি যে মস্ত বড়লোক এ সম্বন্ধে আমি ছাড়া আর কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি ভাবি, কেন, কেন এইসব প্রশংসা—এর মূল্য কী। এর স্থায়িত্বই বা কতটুকু। চারদিক থেকে এই সব স্তুতিবাদ ভীষ্মের শরের মতো আমার দিকে নিক্ষেপ হচ্ছে; নিজে লজ্জায় জর্জরিত হয়ে যাচ্ছি। খ্যাতি স্থায়ী নয়।...জীবনে কত বড়লোক দেখেছি, তাঁদের কত খ্যাতি ছিল এককালে, আজ সেই খ্যাতি কোথায় মিলিয়ে গেছে। সাহিত্য জীবনে খ্যাতি বড়ো ক্ষণস্থায়ী, পরবর্তী generation-এই মিলিয়ে যায়।...সংসারে বড়ো জিনিষ হচ্ছে প্রীতি, খ্যাতি নয়। নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যখন তোমাদের কাছ থেকে প্রীতি ভালবাসা পাই।...ভালবাসাই স্থায়ী।" [—আলাপচারী...

কবি শান্তিনিকেতনে নিরিবিলিতে থাকতে ভালবাসেন। কিন্তু তাবলে সভা-সমিতির চাপ তাঁকে কম সইতে হয় না।—

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসবে ধর্ম-মহাসম্মেলনের অধিবেশন হলো, কবি হলেন সভাপতি।

এই সময় সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের বিরোধ হয়। কবি বলেন—"আজ আমি জানি, বাংলা দেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের।…আজকের এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধরে আছে বাংলাকে। যে বাংলাকে আমরা বড়ো করব সেই বাংলাকেই বড়ো করে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ়সংকল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে বাংলাদেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।"

সুভাষচন্দ্র যখন রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, তখন কবি বললেন—"তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি…বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন। কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তা থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে; কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানোনি। তোমার এই চরিত্রশক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।…বাঙালীর স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার কল্পনা বৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজশক্তি; এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর করে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত করে নব বসন্তের তার নূতন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টি কর্তৃত্ব গ্রহণ করো তুমি।…আমি আজ তোমাকে

বাংলা দেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি সমস্ত দেশকে।...”

কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্রকে বের করে দেওয়া হলো, কবি গান্ধিজীর কাছে টেলিগ্রাম করলেন—‘কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরোধ করি অবিলম্বে সুভাষের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে জাতীয় ঐক্যের জন্ম তার আন্তরিক সহযোগিতা আমন্ত্রণ করা হোক!’

গান্ধিজী উত্তর দিলেন—আপনার বার্তা ওয়ার্কিং কমিটি বিবেচনা করেছেন। তাঁরা যেসব তথ্য জানেন তাতে তাঁরা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে অক্ষম। আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, যদি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করাতে হয় তাহলে আপনি সুভাষবাবুকে উপদেশ দিন এই (কংগ্রেসের) শাসন মেনে নিতে।

পরে এণ্ডরুজ সাহেবকে গান্ধিজী বলেন—‘গুরুদেবকে বলবেন তাঁর তারবার্তা নিয়ে আমি ভেবেছি।...সুভাষবাবুর রাজনীতি ভিন্ন ধরণের। দু’মতে মেলা অসম্ভব বলে মনে হয়। গুরুদেবের পক্ষে ব্যাপারটা খুবই জটিল। তবে তিনি বিশ্বাস করুন যে কমিটির মধ্যে সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কারও নেই। ‘আমি তাকে নিজের ছেলের মত দেখি।’ [—রবীন্দ্রজীবনী

কবির রাজনৈতিক সংহতি কামনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

কলিকাতায় মহাজাতি-সদনের গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা হলো, কবি তার ভিত্তি স্থাপনা করলেন। ভিত্তি স্থাপনা করে কবি প্রার্থনা করলেন—

“বাঙ্গালীর পণ বাঙ্গালীর আশা
বাঙ্গালীর কাজ বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

“সেই সঙ্গে এ-কথা যোগ করা হোক্ বাঙ্গালীর বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক্, বাঙ্গালীর বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তি সাধনায় বাঙ্গালী স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে।”

কলিকাতার পৌর-প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকর খাদ্যের এক প্রদর্শনী করলেন, তার উদ্বোধন করলেন কবি।

খাদ্যবস্তু নিয়ে পরীক্ষা করতে কবি ভালবাসতেন। সে সম্পর্কে তাঁর নানা অভিজ্ঞতা ছিল।

একবার ঠিক করলেন সব জিনিষ সিদ্ধ খাবেন। পেঁপে সিদ্ধ, কচু সিদ্ধ, মূলা গাজর কপি সিদ্ধ, ইত্যাদি সিদ্ধ খাওয়াই চললো কিছুদিন।

একবার ঠিক করলেন কাঁচা আনাজ খাওয়া ধরবেন। টম্যাটো, মূলা, শালগম প্রভৃতি কাঁচা খাওয়া সুরু হলো। কয়েকদিন তাই চললো। তারপর হয়তো ভালো লাগলো না, কি শরীরে সইল না, দু'চার দিন পরেই ছেড়ে দিলেন।

আহার সম্পর্কেও কবির বিশেষত্ব ছিল। প্রচলিত নিয়মকানুনের ধার তিনি ধরতেন না। নানা জিনিষ সাজিয়ে দেওয়া হতো তাঁর টেবিলে, যেটা যখন ইচ্ছা তিনি চামচ দিয়ে তুলে নিতেন। হয়তো সুরু করলেন খানিকটা পায়স খেয়ে, তারপর খেলেন দু-চারখানা আলুভাজা, তারপর হয়তো দু-চামচ মোচার ঘণ্ট, তারপর দইভাত, শেষে দু'খানা লুচি ও একটু ঝোল।

এসব ছাড়া প্রাত্যহিক আহারের সঙ্গে নিমপাতা বাটা, পঞ্চতিক্ত, মেথি-ভিজে জল বা এমনি ধারা কোন জিনিষ খেতেন। রীতিমত তারিফ করেই খেতেন।

একবার এক ভদ্রলোক কবির সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনে রয়েছেন। দু'জনকেই খাদ্যবস্তু পরিবেশন করা হয়েছে সমভাবে। বরং অভ্যাগতকে কোন কোন জিনিষ কিছু বেশী করেই দেওয়া হয়েছে। শেষে কবিকে একটা তরকারীর মত জিনিষ আলাদা করে দেওয়া হলো। অভ্যাগতকে সেটি দেওয়া হলো না। ভদ্রলোক বার বার দেখতে লাগলেন সেইদিকে। কবি তাঁর মুখের পানে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন তাঁর মনের কথা, বললেন—এই ত। এ সব পক্ষপাতিত্ব আমি একদম পছন্দ করি না—আমি রবীন্দ্রনাথ। অমি টপ করে কি না একটা গ্রন্থ আমায় বেশী দিয়ে দিলে!···ওরে দে দে বাবুকে ঐটে একটু!

সেই জিনিষটা তখনই অভ্যাগতকেও দেওয়া হলো। তিনি সন্তুষ্ট মনে সেটি মুখে তুললেন। কিন্তু মুখে দিয়েই তিনি চমকে উঠলেন—এ কী! এ যে খাঁটি নিমপাতা বাটা!

কবি তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে হেসে উঠলেন।

কবির আহার ছিল পরিমিত। সকালে লেখার টেবিলে, কাগজপত্র পড়তে পড়তে, কি চিঠি লিখতে লিখতে জলযোগ শেষ করতেন। এই সময় খেতেন সাধারণতঃ কিছু ভাজাভুজি, যেমন চিঁড়ে ভাজা তার সঙ্গে নারিকেল নাড়ু, বা একটা কিছু মিষ্টান্ন ও পেঁপে আম বা কোন একটা ফল। আর চা, নয়তো কফি বা কোকো। চা তিনি বেশী খেতেন না, যা খেতেন তাতে দুধের ভাগটা থাকতো বেশী। কফি খাওয়াটাই বেশী পছন্দ করতেন।

প্রাতরাশের একটু পরেই খেতেন এক গ্লাস সরবৎ। আম, কলা, লেবু বা কোন ফলের নির্যাস থেকে এই সরবৎ বানানো হতো। কমলা লেবুটাই তিনি পছন্দ করতেন বেশী।

তারপর মধ্যাহ্ন আহার।

বৈকালিক আহার করতেন সাধারণতঃ চারটেয়। তখন ফলই ছিল প্রধান। ফলের মধ্যে আমই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। তারপরেই কমলা লেবু। কিছু উষ্ণ পানীয়ও থাকতো সেই সঙ্গে।

রাত্রে তিনি খুব কম খেতেন। দু-একখানা লুচি, বা দুটি যবের ছাতু। অল্প ফলমূল, সামান্য ছানা, নয়তো দুধ আর সেই সঙ্গে সামান্য কিছু সন্দেশ।

মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিভবন নির্মিত হয়েছিল, তার দ্বারোদ্ঘাটন করলেন কবি।

বিদ্যাসাগর স্মৃতিভবনের দ্বারোদ্ঘটন সম্পর্কে কবি বললেন—"বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্য্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন, আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না, আড়ম্বর করি কাজ করি না। যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না, যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না। ভূরিপ্রমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না, আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি যোগ্যতালাভের চেষ্টা করিনা,

আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স্ এবং নিজের বাক্ চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তি বিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগর এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে ইহাদের বিপরীত ছিলেন।" [—চরিত্র পূজা

নিন্দা ও প্রশংসার উর্ধ্বে উঠে স্বজাতি চরিত্রের বিশ্লেষণে এই নির্মম সত্য উচ্চারণ করার মত ব্যক্তিত্ব একমাত্র কবিরই ছিল।

সিউড়িতে শিল্প প্রদর্শনী হলো, তার উদ্বোধন করলেন কবি।

বাঁকুড়ায় একটি মাতৃনিবাস ও শিশুকল্যাণ আশ্রমের পরিকল্পনা হলো, তার ভিত্তি স্থাপনা করলেন কবি।

এখানকার ছাত্রদের কবি বললেন—"...যারা অকুণ্ঠিত মনে নিয়ম ভাঙতে চায় তারা নিয়ম গড়তে কোনোদিন পারে না। এই ভাঙন-ধরানো মন সাংঘাতিকভাবে বিস্তার লাভ করছে, এদের হাতে কীর্তি গঠিত হচ্ছে না, কীর্তি ভাঙছে। দলাদলিতে ক্রমাগত ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছে দেশের আশ্রয়-সৌধকে। ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা এই সৃষ্টিশক্তির সৃষ্টিপ্রীতির মূলে আঘাত করেছেন তাঁরা এটা করেছেন স্বাজাত্যকর্তব্যের দোহাই দিয়ে। সভা ভাঙা, দল ভাঙা, ইস্কুল ভাঙা সমস্ত এর অন্তর্ভুক্ত করে মরণ তাণ্ডবের পিছনে দাঁড়িয়ে বাহবা দিয়েছেন। ...আগুন লাগানোর মাতামাতিতে দল বাঁধতে প্রশ্রয় দেওয়ার মতো দেশের অনিষ্ট সাধন আমি তো কিছু মনে করতে পারি নে।" [—রবীন্দ্র-জীবনী

ছোট বড় সকল প্রতিষ্ঠানই তখন কবিকে চায়, নিরিবিলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম ভোগ করা কবির আর হয়ে ওঠে না।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মারা গেলেন, কবি লিখলেন—

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে,
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি,
দেশের হৃদয়ে তারে রাখিয়াছে ধরি।"

বিশ্বভারতীকে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যাপকতর করার

দিকে তিনি বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৩৭ সালের ১৪ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষের দিনে বিশ্বভারতী চীনা-ভবন প্রতিষ্ঠিত হলো। এখানে ছাত্রেরা চীনা-ভাষা ও সংস্কৃতি আলোচনা করবেন। ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করলেন চীনা-কনসাল।

১৯৩৯ সালের হিন্দী শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য হিন্দী-ভবন প্রতিষ্ঠিত হলো। এর উদ্যোক্তা ছিলেন পণ্ডিত বারাণসীদাস চতুর্বেদী ও সীতারাম সক্‌সেরিয়া এবং অর্থ দেন ভাগীরথ কানোড়িয়া ও রামদাস চোখানী। ৩১শে জানুয়ারী এই ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

১৯৪০ সালে মহাত্মাজী এলেন শান্তিনিকেতনে। তিন দিন রইলেন। শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা গান্ধিজীকে 'চণ্ডালিকা' অভিনয় করে দেখালো। মহাত্মাজী ভারী খুশি হলেন। বিদায় কালে গান্ধিজীর হাতে কবি একখানি চিঠি দেন, তাতে অনুরোধ করেন—মহাত্মাজী যেন বিশ্বভারতীর প্রতি দৃষ্টি রাখেন, কবির অবর্তমানে বিশ্বভারতী যেন উঠে না যায়।

অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবার কবিকে সাহিত্যাচার্য (ডি-লিট) উপাধি দেবার ব্যবস্থা হলো। কবির স্বাস্থ্য ভাল নয়, অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস্ গায়ার, স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হেণ্ডারসন এলেন শান্তি-নিকেতনে। সেখানে এক আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্যে তাঁরা কবিকে উপাধি দিলেন। অক্‌স্‌ফোর্ডের রীতি অনুযায়ী তাঁরা মানপত্র দিলেন ল্যাটিন ভাষায়। কবিও সেই বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিলেন সংস্কৃত ভাষায়। কবি সর্ব-ভারতীয় ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষাকেই স্থান দিতে চেয়েছিলেন বোধ হয়।

ইতিপূর্বে কবি একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, সন্ধ্যার পর সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে সহসা তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। ডাক্তার নীলরতন সরকার গেলেন শান্তিনিকেতনে। কবিকে সুস্থ করে তবে তিনি ফিরলেন। কিন্তু বৃদ্ধ কবি আগের মত দৈহিক শক্তি আর ফিরে পেলেন না। পুরোপুরি সোজা হয়ে তিনি আর হাঁটতে পারতেন না। বয়সের ভারে কোমর কতকটা বেঁকে গিয়েছিল। আগের মত স্বচ্ছন্দগতিতে ইতস্ততঃ চলাফেরা করতে পারতেন না। তবুও তিনি পারতপক্ষে কাউকে খাটাতেন না। ছোট-

খাটো কাজ যতটা পারতেন নিজেই সেরে নিতেন। কেউ এ-সম্পর্কে অনুরোধ করলে বলতেন—শরীর তো একটা যন্ত্র, চালিয়ে না রাখলে মরচে ধরবে যে!

একদিন কি একটা জিনিষ খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গেলেন। সবাই ছুটে এলো, অনুযোগ তুললো—কাউকে ডাকেন নি কেন?

আশী বছরের বৃদ্ধ হেসে বললেন—প্রতি কথায় হাঁক-ডাক করে একে-তাকে উদ্ব্যস্ত করে তোলার মধ্যে কি একটা কাপুরুষতা নেই? সেই পরশ্রমজীবিতা আমার কোনদিন সহ্য হয় না।

কোন রকম আলস্য কবির কাছে কখনও প্রশ্রয় পায় নি।

"বীরভূমের প্রচণ্ড শীতেও দেখেছি, সূর্যোদয়ের পূর্বেই বিছানা ছেড়ে উঠতেন তিনি, এবং শ্যামলীর বারাণ্ডায় টেবিল বিছিয়ে বসে যেতেন। বেলা দশটা পর্যন্ত একটানা লেখাপড়া, চিঠিপত্র দেখা, তার জবাব দেওয়া, অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে দেখা করা—তারপর স্নান ও আহার—তারপর? দিবানিদ্রা নয়, এমন কি একটু গড়াগড়ি দিয়ে নেওয়া পর্যন্ত নয়, খাড়া একটা কেঠো চেয়ারে বসে হয় লেখা, নয় ছবি আঁকা। তারপর বিকালে—বৈকালিক জলযোগ—আবার অতিথি অভ্যাগত, সেই সঙ্গেই অল্পস্বল্প লেখাপড়া। এর পর সন্ধ্যা, উত্তরায়ণে গান-বাজনার মহড়া থাকলে তাতে যোগ দেওয়া, নয়ত আপন ঘরে বসে পড়াশুনা। ন'টা সাড়ে ন'টায় নৈশ ভোজন এবং সেখানেই সেই-দিনের মত যবনিকা পতন। ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতো সুনিয়ন্ত্রিত জীবন এবং সে জীবন কঠোর শ্রমে অনলস আত্মনিময়তায় অতুলনীয়।" [—কাছের মানুষ…

এই বয়সে এইভাবে একটানা পরিশ্রম করার কথা তুললে কবি একদিন হেসে বলেছিলেন—তোমরা অনেক দিন বাঁচবে, ধীরেসুস্থে কাজ করতে পারো। আমার ত আর সময় নেই, তাই তাড়াতাড়ি সেরে নিচ্ছি সব।

এবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসলো কলিকাতায়। কবিও তখন কলিকাতায়। নেতারা কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। গান্ধিজী আসার সময় মোটরে উঠতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, কবি নিজেই গেলেন গান্ধিজীকে দেখতে।

এবারকার কমিটিতে বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল 'বন্দেমাতরম্'। কিছুদিন ধরে মুসলমানরা প্রচার করছিল—এই গানটি পৌত্তলিক, কাজেই জাতীয় সংগীত হতে পারে না। জওহরলাল কবির অভিমত চাইলেন, কবি

বললেন—"এই গানটির প্রথম চরণ সুর দিয়ে আমি প্রথম গাই কলিকাতা কংগ্রেসের এক অধিবেশনে। লেখক তখন জীবিত ছিলেন···বংগবিভাগের কঠিন সংগ্রামের সময় এই গানটিই উপযুক্ত জাতীয় সংগীত হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। পরবর্তী যুগে 'বন্দেমাতরম্' হয়েছে জাতীয় ধ্বনি, এবং এর জন্য বহু যুবক যে ত্যাগ স্বীকার করেছে আজ আমাদের সাফল্য লাভে সুনিশ্চিত আস্থা প্রকাশের দিনে তাকে উপেক্ষা করা যায় না।···এই সংগীতের প্রথম দুটি চরণ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। এবং ইহার মধ্যে যে উদ্দীপনা আছে, কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ের তাতে ক্ষুন্ন হবার কোন কারণ দেখি না।"

কংগ্রেস কমিটি 'বন্দেমাতরমের' প্রথম অংশ জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করলেন।

কবির মন ছিল ভ্রাম্যমান। এক জায়গায় বেশীদিন তিনি থাকতে পারতেন না। কারণে-অকারণে তিনি বাসা বদল করতেন।

শ্যামলীতে আছেন দিব্যি লেখাপড়ায় দিন কেটে যাচ্ছে, কোন চাঞ্চল্য নেই, হঠাৎ কি মনে হলো, বললেন—সব নিয়ে চল পুনশ্চতে।

জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়া হলো, কবি চলে এলেন পুনশ্চতে। বললেন—এখানে একটু হাতপা গুটিয়ে বসতে পারবো দিন কতক—বেশ গোছানো জায়গাটা।

কিন্তু সাতদিনও সেখানে মন বসলো না।

আবার জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়া হলো শ্যামলীতে, নয়ত উদয়নের সংলগ্ন বাগানে ছোট ঘরটিতে।

এইভাবেই ক্রমাগত তিনি বাসা বদল করতেন।

"কবির এই বাসা বদলের অভ্যাস এত প্রবল ছিল যে এর সঙ্গে তাল রাখার প্রয়োজনেই উত্তরায়ণ কাম্পাউণ্ডের ভিতর অনেকগুলি বাড়ী তৈরী করতে হয়েছে, আর প্রত্যেকটিতেই কবি কিছুদিন করে করে বাস করেছেন। প্রথমে থাকতেন উদয়নে, খেয়াল হল একটা নিরিবিলি মাটির ঘরে থাকবেন—সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হল শ্যামলী, মাটির কংক্রিটে বানানো চমৎকার ঘর। কবি বললেন—'হাঁ, এই ঠিক ঘর আমার। মাটির সঙ্গে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারি না আমি—আমি যে মাটির খুব কাছাকাছি। এখানে বাকী কটা দিন আরামে কাটবে।' কবিতার বই লিখলেন, তার নাম দিলেন 'শ্যামলী'।

তারপরেই শ্যামলী আর ভালো লাগলো না—প্রথমত ছাদের দু-এক জায়গায় ফাটল ধরলো, তা দিয়ে জল চুইয়ে পড়তে লাগলো, দ্বিতীয়ত এমনিতেই কবির সোহাগ কমে গেল তা থেকে—তৈরী হল 'পুনশ্চ'। কিছুদিন কাটলো এখানে। কবিতার বইয়ের নামকরণ করে একেও তিনি সম্মানিত করলেন। কিন্তু না, গ্রীষ্মে ঘরটা বড্ড তেতে ওঠে—একেবারে জলন্ত কটাহের মত ঠেকতে থাকে। রাতারাতি চলে গেলেন উদয়নের বাগান-ঘরে। পুনশ্চের লম্বালম্বি আর একটা বাড়ীও বানানো হয়েছিল···সেখানেও কিছু দিন ছিলেন। শেষ রোগ শয্যায় যখন, তখন গিয়ে দেখলাম, রয়েছেন উদয়নের একতলার হল ঘরটিতে—তাতে air-condition করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনে এই তাঁর সর্বশেষ বাসগৃহ।"

[—কাছের মানুষ···

•

ইতিমধ্যে চীনদেশে জাপানী অভিযান সুরু হয়েছে। সেখানে জাপানীদের অনাচার কাহিনী কবিকে ব্যথিত করলো, কবি একখানি চিঠি লিখলেন চীনের রাষ্ট্রনায়ক চিয়াং কাই শেকের কাছে।—"জাপান তার সাংস্কৃতিক সম্পদের জন্য চীনের কাছে ঋণী, চীনদেশে সখ্যতাই তার কাছে কাম্য হওয়া উচিত ছিল কিন্তু পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদ তার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। জাপান এক অপবিত্র অভিযানে মেতে উঠেছে, তাতে আপাতঃ দৃষ্টিতে সাফল্য দেখা দিলেও মারাত্মক ব্যর্থতায় একদিন তা নিশ্চিত ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।"

সেই চিঠি যখন সংবাদপত্রে বেরুলো তখন জাপানী কবি, নেগুচি এক খোলা চিঠি লিখলেন কবিকে।—"আপনি ভুল বুঝেছেন, এশিয়ায় নতুন জগৎ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই যুদ্ধ ছাড়া আর কোন পথ নেই। এই যুদ্ধ 'এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য'—এই নীতির যুদ্ধ।"

কবি বললেন—"এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য, এ-কথা একটা রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী, যে এশিয়া গড়ে তোলার স্বপ্ন আপনারা দেখছেন তা মৃতের কংকালের উপর গড়ে উঠবে। আপনার দেশবাসীর জন্য আমার দুঃখ হয়। তাদের দুঃস্বপ্ন একদিন ভাঙবে।···চীনকে তারা জয় করতে পারবে না। অদূর ভবিষ্যতে চীন ও জাপানকে হাত মিলিয়ে অগ্রসর হতে হবে, অতীতের তিক্ততাকে ভোলার জন্য। সেদিন এশিয়ায় সত্যকারের মানবতার জন্ম হবে।'

নেগুচি এ যুক্তি মানলেন না। শেষে কবি লিখলেন—"তোমার জাতিকে আমি ভালবাসি সেইজন্যই আমি কামনা করি সাফল্য নয়, অনুতাপ।"

কবিকে কেউ চিঠি লিখলে কবি অবশ্যই তার উত্তর দিতেন। অনেক সময় সেই সব চিঠির বক্তব্যের কোন যুক্তি থাকতে না। পত্র লেখার আসল উদ্দেশ্য থাকতো কবির একটি হস্তলিপি সংগ্রহ করা। সে উদ্দেশ্য তার সফল হতো। চিঠি যাই হোক, কবি উত্তর দিতেন।

একবার একটি ছোট ছেলে লিখলো—ডিম জিনিষটাকে আমিষ বলা হয় কেন? নিরামিষ বললে ক্ষতি কি হয়?

কবি তার উত্তরে লিখলেন—বটেই ত! ওর গায়ে আঁশ দেখেছি বলে ত মনে হয় না। দিব্যি গোলগাল—খাসা আলুর মতই ত!

একটি ছেলে লিখলো—স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে চাই কিন্তু বাপ-মা আপত্তি করছেন, সেইজন্য আপনার উপদেশ চাই।

কবি উত্তর দিলেন—বাবা-মার কথা শুনো, সেটাও কোন বিদেশী আন্দোলনের পর্যায়ে পড়ে না।

একটি ছোট মেয়ে লিখলো—আমি কবি হতে চাই, কিন্তু কবিতা মেলাতে পারি না, আপনি আমার এই ছত্রটি মিলিয়ে দিন। মিল আমার কিছুতেই আসছে না।—'সারাদিন বসে আছি জানালার ধারে।'

কবি তখনই কয়েক চরণ লিখে দিলেন মিলিয়ে।

এক ভদ্রমহিলা চিঠি লিখলেন—আমার একটি ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে তার নাম করে দিন্।

কবি লিখে দিলেন—শুভ্রা।

একটি ছেলে জানালো—দশজনে মিলে এক সংঘ করেছি, কি তার নাম দোব?

কবি লিখে দিলেন—নাম দাও 'দশমিকা'।

এই ধরণের নানা রকম চিঠি এতো আসতো, যে মাঝে মাঝে কবি উত্তর দিতে দিতে শ্রান্ত হয়ে পড়তেন, বলতেন—না, আর চিঠিপত্র দিতে পারবো না কারুকে—শরীরে পোষাচ্ছে না আমার।

মুখে একথা বলতেন বটে কিন্তু পরদিন আবার ঠিক যথারীতি চিঠির উত্তর লিখতে বসতেন।

মানুষকে তিনি দরদ দিয়ে বিচার করতেন। এজন্য অনেকের অনেক উৎপাত তিনি সইতেন নির্বিকারভাবে। কখনও কারুর উপর বিরক্ত হতেন না।

একদিন জ্বর হয়েছে, সকালবেলা বসে আছেন, এমন সময় কয়েকজন বিহারী সাহিত্যিক এলেন দেখা করতে। কবি বললেন—ডাকো ওদেরকে, এতটা এসেছেন, ফিরিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে?

চার-পাঁচ জন ভিতরে এলেন। সঙ্গে অনেকগুলি বই। বইগুলি কবির হাতে দিয়ে তাঁরা কবির অভিমত প্রার্থনা করলেন। দলের হয়ে একজন সুরু করলেন কথা বলতে। অনর্গল কথা বলার কোন ছেদ নেই। আশে-পাশে যাঁরা ছিলেন সবাই বিরক্ত হয়ে উঠলেন, শেষে একজন বললেন—কবির জ্বর হয়েছে।

—আর একটা কথা—বলে ভদ্রলোক আবার সুরু করলেন তাঁর বক্তব্য। শেষে যখন তিনি থামলেন, এবং তাঁরা চলে গেলেন, কবির মুখে তখন বিরক্তির কোন ভাব নেই, হেসে বললেন—প্রায় জখম করার দাখিল। বাক্যের আঘাতে দেহ ক্লিষ্ট হয় দেখেছ তোমরা?

আর এক দিনের কথা।

কবি একখানি নাটক রচনায় ব্যস্ত আছেন। সংলাপ লিখছেন, গান বাঁধছেন, সুর দিচ্ছেন, সঙ্গীত ভবনের কর্মীরা সেই সুর তুলে নিচ্ছেন। এমন সময় একজন আশ্রমিক এসে দাঁড়ালেন। কবি বললেন—কি হে, কিছু বলতে চাও বোধ করি?

আশ্রমিক বললেন—আজ্ঞে শরীরটা···

কবি বললেন—বল, বল কি ব্যাপার? আমি তো শুধু কবি নয়, কবিরাজও। একটা ওষুধ বাতলে দেব এখনি তোমাকে।

আশ্রমিক অসুস্থতার কথা বললো। সব শুনে কবি তখনই একটা বায়োকেমিক ওষুধ বলে দিলেন। নাটক রচনার মাঝে যে ছেদ পড়লো সেজন্য তিনি মোটেই বিরক্ত হলেন না।

নিজের এই সহনশীলতা সম্পর্কে কবি একদিন একটি গল্প বলেন। কলিকাতার বাড়ীতে কবিকে একবার একতলার একটি ঘরে রাত্রে থাকতে হয়েছিল। সে ঘরটিতে সাধারণতঃ কেউ থাকতো না। মেঝের উপর বিছানা পেতে কবি শুয়েছেন, হঠাৎ কোন এক সময় পায়ের আঙুলে কাঁকড়া বিছা কামড়ে দিল। অসহ্য যাতনা। কিন্তু অতো রাত্রে কোথায় ওষুধ, কে তার

ব্যবস্থা করে। তবু ব্যবস্থা হয়তো একটা কিছু হতো, কিন্তু কবি অত রাত্রে কাউকে কষ্ট দিতে চাইলেন না, কাউকে জাগালেন না। চুপ করে পড়ে রইলেন। যাতনা যখন অসহ্য মনে হতে লাগলো তখন ভাবতে লাগলেন—কাকে বিছে কামড়ালো, কার ওই পা, কার ওই আঙুল,—সে কি আমি? আমি আর আমার যন্ত্রণাকাতর দেহ এক তো নয়।

নিজেকে নিজের দেহ থেকে পৃথক করে দেখার তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন, একাগ্রভাবে ভাবতে লাগলেন—যে দেহধারী কষ্ট পাচ্ছে, সে দেহ আমি নয়।

ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে বেদনা বোধ চলে গেল, মনে হলো যেন আর কোন যন্ত্রণা নাই। রাত কেটে গেল।

সকালে সেই আঙুলের ক্ষত চিহ্নটুকু ছাড়া আর কোন বোধই রইল না।

কবি বেড়াতে গেলেন কালিম্‌পং-এ।

মংপু জায়গাটি কবির খুব ভাল লেগেছিল।

মংপুর পাহাড়িয়ারা কবির জন্মদিনে এক উৎসব করে। পঁচিশে বৈশাখের দু-তিনদিন আগে একটা রবিবার এখানে উৎসবের বন্দোবস্ত হয়। "সকালবেলা দশটার সময় স্নান করে কালো জামা কালো রংয়ের জুতো পরে বাইরে এসে বসলেন। কাঠের বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে একজন বৌদ্ধ বুদ্ধস্তোত্র পাঠ করল। কবি ঈশোপনিষদ থেকে অনেকটা পড়লেন। সেইদিন দুপুরবেলা জন্মদিন বলে তিনটি কবিতা লিখেছিলেন,······বিকেলবেলা দলে দলে সবাই আসতে লাগলো। গেরুয়া রংএর জামার উপর মালাচন্দনভূষিত আশ্চর্য স্বর্গীয় সেই সৌন্দর্য সবাই স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল। ঠেলা চেয়ারে করে বাড়ির পথ দিয়ে ধীরে ধীরে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, দলে দলে পাহাড়ীয়া প্রণত হয়ে ফুল দিচ্ছিল। প্রত্যেকটি লোক, শিশু বৃদ্ধ সবাই কিছু না কিছু ফুল এনেছে। ওরা যে এমন করে ফুল দিতে জানে তা আগে কখনো মনে করেনি। তিব্বতীরা পরালো 'খদা' গাছের সুতোয় বোনা স্কার্ফ, যা ওরা লামাদের পরায়। ফুলে প্রায় আবৃত হয়ে গিয়েছিলেন। শঙ্খধ্বনির মধ্যে শিলাতলে এসে বসলেন, তিব্বতী আর ভুটানীরা শুরু করলে তাদের জংলী তাণ্ডব নাচ।

"তারপর চালাটার নীচে সব সারি সারি বসে গেল পাতার ঠোঙা নিয়ে। কবি বললেন—তোমরা পরিবেশন কর। সমস্তক্ষণ বসে দেখতে লাগলেন,

আমাদের ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, কে পায়নি, কাকে আর একবার দেওয়া দরকার।" [—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

মংপুতে কবি সহসা অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কলিকাতায় ফিরতে হলো।

"সাত মাইল দূরে মংপু পাহাড়ের পদপ্রান্তে বিয়াং ষ্টেশন।···

···ট্রেন আসতে তখনও কিছুক্ষণ দেরী ছিল, কোনো রকম একটা ভদ্র-গোছের হাতাওয়ালা চৌকি জোগাড় করে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের উপর ওঁকে বসানো হোলো। সামনে প্রকাণ্ড উদ্ধত পাহাড় গভীর অরণ্য বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে, নীচে স্রোতস্বিনী কলভাষিণী নদী, মাঝখানে বসে আছেন জগতের মহাকবি, মহিমান্বিত স্তব্ধ সমাহিত মূর্তি। ধূসর রংয়ের জোব্বা পরা, মাথায় কালো টুপি, পথে সংগৃহীত এক গুচ্ছ সিনকোনা ফুল হাতে। দূরের দিকে তাকিয়ে স্থির বসেছিলেন।······হিমালয়ের এক প্রান্তে এই নগণ্য জন-বিরল গ্রামের অতি ক্ষুদ্র ষ্টেশনের ধূলিমলিন প্ল্যাটফর্মের উপর জরাজীর্ণ চৌকিতে বিশ্বআদৃত মনীষী বসে আছেন; এ একটা দেখবার মত ঘটনা। ক্রমে ক্রমে যে কয়েকজন সম্ভব দর্শক জুটে গেল, ষ্টেশনমাষ্টার ও কেরানী প্রভৃতি যে দু-তিনঘর বাঙালী আছেন তাদের অন্তঃপুরচারিণীরা সুদীর্ঘ অব-গুণ্ঠনাবৃত হয়ে এসে প্রণাম করলেন একে একে।······

"শিলিগুড়ি পৌছতে না পৌছতে খবর রাষ্ট্র হয়ে গেল এবং আধঘণ্টার মধ্যে প্ল্যাটফর্মে আর জায়গা রইল না। সারি সারি ছেলের দল খাতা পেনসিল নিয়ে তার মধ্যেই অটোগ্রাফের জন্য তৈরী হয়ে গেছে—ইস্কুলের মেয়ের দল, নানা শ্রেণীর শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, এমনকি অবগুণ্ঠনবতীরাও ঠেলাঠেলি ভিড় করে দাঁড়িয়েছেন। কোন মতে গাড়ীতে তোলা গেল। ছোট একটা ফার্ষ্টক্লাশ 'কুপে', আমাদের কামরা তার পাশেই।······আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করতে হোলো। ওঁকে খেতে দিতে হবে তো! কিন্তু তাঁর এটা ভালো লাগছিল না, অত্যন্ত সংক্ষেপে খাওয়া সেরে বললেন—'দরজা খুলে আলো জেলে দাও!'

"দলে দলে লোক ঘরে ঢুকে প্রণাম করে যেতে লাগল। দু-একটা ছেলে সই করিয়ে নিলে তাদের খাতায়। নানা শ্রেণীর ছেলেমেয়ে বয়স্ক শিশু সবাই এলো। উনি স্থির স্তব্ধ হয়ে নীচের দিকে চেয়ে বসে আছেন। হাত জোড় করে সকলকে প্রতিনমস্কার করছেন। আমরা এক কোণে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে লাগলুম। দেখেশুনে মন ভরে ওঠে। সব লোক চলে যাবার পরেও তেমনি স্থির বসে রইলেন।······"

"পরদিন দুপুরে কলিকাতার বাড়ীতে কথায় কথায় তিনি বললেন—"কাল সন্ধ্যা থেকে ভাবছি যখন ভীড় করে এসে দাঁড়ালো সব গাড়ির সামনে, আমার কী আশ্চর্য বোধ হল বলতে পারিনে। কেন সবাই এমন করে আমাকে দেখতে চায়! এই দেখতে চাওয়ার মধ্যে একটা অকথিত উপদেশ আছে, সে বলে আমরা তোমাকে যে সম্মান দিচ্ছি, তোমার জন্য ভক্তির উপহার এনেছি, তুমি তার যোগ্য হয়। মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। জীবনে কতবার এমন ঘটেছে মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন অজস্র ধারায় পেয়েছি, ভাবছিলুম বসে বসে সত্যি আমার পাওনা কতটুকু তার মধ্যে। যখন দলে দলে এসে প্রণাম করতে লাগল। বলব কি, মুখে কথা সরে না। এতো প্রণাম নয়, আশীর্বাদ। এ বলে, তুমি এই প্রণামের যোগ্য হও, যোগ্য হও। তাই তো বল্লুম তোমাদের দরজা খুলে দাও, যদি আমার ভিতরে এমনি কিছু থাকে যা তারা দেখতে চায় তবে দরজা বন্ধ করবার অধিকার তো নেই আমার।"

[—মংপুতে···

কবির অসুখের সংবাদ পেয়ে গান্ধিজী পাঠালেন মহাদেব দেশাইকে। গান্ধিজীর সহানুভূতি ও প্রীতি তিনি জানালেন। কবি ভাল করে শুনতে পাচ্ছিলেন না, তাঁর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। যে মানুষকে অতি বড় শোকও কোনদিন বিচলিত করতে পারে নি, আজ প্রীতি তাঁকে উদ্বেল করে তুললো।

সেবার কবি দেড়মাস শয্যাগত হয়েছিলেন। তারপর সুস্থ হয়ে চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে।

মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। সেই মহাযুদ্ধে আহুতি দেবার মহা সমারোহ চলছে জগৎ জুড়ে। এই নির্মম নৃশংসতা কবিকে ব্যথিত করে তোলে। ১৯৪১ সালের ১৪ই এপ্রিল কবির জন্মোৎসব হয়, কবি সেদিন 'সভ্যতার সঙ্কট' সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলেন—"বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানতঃ দুটি জাতির হাতে আছে—এক ইংরেজ আর এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মত নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি—এই জাতিকে সকল দিকে

শক্তিমান করে তোলবার জন্ম তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্ম সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এই রকম গবর্ণমেণ্টের প্রভাব কোন অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না।…

"এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কি অপহরণ করেছে আমি জানি। সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order—বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাহিরের জিনিষ, যা দরোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা অভিযানের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তি-রূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সব চেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।…

"ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্য শাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে।…ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন —একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে, আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা, মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।…

"আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কি দেখে এলুম, কি রেখে এলুম, ইতিহাসের কি অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে

পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

"এই কথা আজ আমি বলে যাব প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়, তার প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে—নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥"

ক'দিন পরে ত্রিপুরার রাজ-প্রতিনিধিরা এলেন। জানালেন ত্রিপুরা দরবার কবিকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধি দিয়েছেন। কবির কাব্য জীবনের আরম্ভে ত্রিপুরার মহারাজা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, জীবন শেষে সেইখান থেকেই এলো শেষ অর্ঘ্য।

মহাযুদ্ধ উত্তরোত্তর নির্মম ও নৃশংস হয়ে উঠছে। যেদিন প্যারিসের পতন হলো, সেদিন কবি ছিলেন কালিম্পংএ।

কবি বসেছিলেন, শ্রীমতী বস্‌নিক নামে এক ফরাসী মহিলা ছিলেন কবির সঙ্গে। শ্রীমতী এসে বললেন—গুরুদেব, আজ ওরা এখন ডাকঘর অভিনয় করছে।

কবি উঠে বসলেন, মৃদুস্বরে বললেন—আজ? আজ ওরা ডাকঘর অভিনয় করছে।

তারপর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

অতীত দিনের কোন পুরানো স্মৃতির কথা মনে পড়লো বুঝি। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললেন—সেবার রাশিয়াতেও ওদের দারুণ দুঃখের দিনে ওরা বার বার অভিনয় করেছে কিং অফ দি ডার্ক চেম্বার (King of the Dark Chamber), একেই বলে পুরস্কার।

এই সময় মিস্ রাথবোন নামে পার্লামেণ্টের এম-এ পাসকরা এক সদস্যা পণ্ডিত জওহরলালকে উদ্দেশ করে একখানি খোলা-চিঠি ছাপালেন কাগজে। চিঠিখানিতে ভারতীয় নেতাদের সমালোচনা করে তিনি লিখলেন—ইংরাজদের দ্বারা শিক্ষিত হয়ে ভারত আজ সর্বাংগীন উন্নতি করেছে। এই যুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করাই ভারতের উচিত ছিল, কিন্তু ভারতবাসী অকৃতজ্ঞ।

সে চিঠির জবাব দেবার মত কোন নেতাই তখন কারাগারের বাইরে ছিলেন না। অথচ সে চিঠির একটি জবাব দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। একাশী বছরের বৃদ্ধ কবি কলম ধরলেন। মিস্ রাথবোনের জবাব তিনি দিলেন—

"…আমাদের যে সকল তথাকথিত ইংরেজবন্ধু মনে করেন যে, তাঁহারা যদি আমাদের শিক্ষাদান না করিতেন তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারের যুগেই থাকিয়া যাইতাম, তাঁহাদের এই মনোভাব দাম্ভিক আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতে ব্রিটেনের সরকারী শিক্ষার প্রণালী বাহিয়া যাহা আমাদের সন্তানগণের নিকটে পৌছিয়াছে, তাহা ব্রিটিশ ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নহে, উহার উচ্ছিষ্ট অসার অংশ। ফলে ভারতীয়েরা তাহাদের নিজেদের দেশের স্বাস্থ্যকর সংস্কৃতি সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।……দুই শতাব্দী ব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৩১ সালে আমরা দেখিতে পাই ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একজন ইংরেজি ভাষায় লিখন-পঠনক্ষম (literate) হইয়াছে। অন্যদিকে রাশিয়ায় মাত্র পনেরো বৎসরের সোভিয়েট শাসনের ফলে ১৯৩৯ সালে সোভিএট য়ুনিয়নে শতকরা ৯৮টি বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে। (এই সংখ্যাগুলি ইংরেজ প্রকাশিত স্টেট্সম্যান্স ইয়ার বুক হইতে উদ্ধৃত। ঐ বই রাশিয়ার অনুকূলে পক্ষপাত ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই)।……

"আমাদের দেশের টাকার থলি দুই শতাব্দী কাল দৃঢ়মুষ্টিতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া যে ব্রিটিশ জাতি আমাদের ধনদৌলত শোষণ করিয়াছে তাহারা আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কী করিয়াছে? চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, অনশনশীর্ণ লোকেরা অন্নের জন্য ক্রন্দন করিতেছে।……আমি জানি যে ইংলণ্ডের লোক আজ দুর্ভিক্ষের দ্বারে উপস্থিত। আমি তাহাদের জন্য ব্যথিত। কিন্তু যখন দেখি যে খাদ্যসম্ভারপূর্ণ জাহাজগুলি পাহারা দিয়া ইংলণ্ডের উপকূলে পৌছিয়া দিবার জন্য ব্রিটিশ নৌবহরের সমগ্রশক্তি নিয়োগ করা হইতেছে এবং যখন এমন অবস্থাও মনে পড়ে যে এদেশের একটী জেলার লোক অনাহারে মরিতেছে অথচ পাশের জেলা হইতে এক গাড়ী খাদ্যও তাহাদের দ্বারে পৌছিতে দেখি না তখন আমি বিলাতের ইংরেজ ও ভারতের ইংরেজের মধ্যে একটি পার্থক্য না দেখিয়া থাকিতে পারি না।

"ব্রিটিশ রাজ আমাদিগকে খাওয়াইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আমাদের দেশে 'আইন ও শৃঙ্খলা' রক্ষা করিয়াছেন, এই জন্যই কি আমরা ইংরেজের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।…

"কোনো একটি গবর্মেণ্ট ভালো কি মন্দ বিচার করিতে হইলে তাহার মুখপাত্রদের কথা শুনিয়া বিচার করা চলে না। সেই গবর্মেণ্টে প্রজার কি বাস্তব হিত করিয়াছে তাহার দ্বারাই বিচার করিতে হয়।...তাহারা, আমাদের কল্যাণের অছি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু অছির কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিলাতের অল্পসংখ্যক বণিকের পকেট স্ফীত করিবার জন্ম ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়াছে।..."

কিছুদিন পরে কবি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দুপুরে রোজই একটু করে জ্বর হত। তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। উঠে বসতে পারতেন না, কানে কম শুনতেন, অনেক সময় মানুষ চিনতেও কষ্ট হতো। অনেক সময় মনে হত কথা বলতেও তাঁর কষ্ট হচ্ছে।

দীর্ঘ রোগ ভোগের পর কবির চেহারারও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। মাথার সামনের দিকে দেখা দিয়েছিল অল্প টাক, দাড়ী হাল্‌কা হয়ে গিয়েছিল, দেহ হয়েছিল কৃশ।

"কবি তখন রয়েছেন উদয়নের একতলায়। শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন।... সারা গায়ে একখানি পুরু চাদর ঢাকা ছিল, শুধু বাইরে বেরিয়েছিল তাঁর পাণ্ডুর মুখমণ্ডল।...আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলোতে লাগলাম—দেখলাম, পা দুটো বেশ ফুলেছে। কবি বুঝলেন। হেসে বললেন 'মরণ চরণে শরণ নিয়েছে। আর তাকে বিমুখ করবো না হে।' কান্না পেতে লাগলো, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। বুঝলাম আর দেরী নেই।...বললেন—'অনেকদিন বেঁচেছি বিধাতার বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই—তিনি দিয়েছেন অনেক। আজ যবনিকা পড়ার আগে এই কথাটাই স্মরণ করে যাবো কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।'...

"পরের দিন প্রাতঃকালে দেখলাম কবিকে, অনেকটা ঝরঝরে। উদয়নের বাগান বাড়ীর দিককার ঘরে একটী আরাম কেদারায় তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রতিমা দেবী ও নন্দিতা দেবী বসে আছেন দুটো ছোট চৌকিতে। ঢুকতেই পুরাতন কণ্ঠে সম্ভাষণ জানালেন কবি। ছোট একটি মোড়া টেনে নিয়ে বসলাম।......রাজনীতির কথাই উঠলো সবার আগে। বললেন—'মানুষের লালসা, তার হিংস্র স্বাজাত্যবোধ আবার যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে তুললো—দেখো, এই আগুন আস্তে আস্তে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াবে। এই সার্বভৌম কুরুক্ষেত্রের শেষ আমি দেখে যাবো না, কিন্তু এই আশা নিয়েই যেতে চাই

যে ভারতবর্ষ এই অগ্নিস্নান করে মুক্ত হবে. আর সেই মুক্ত ভারত দেবে জগৎকে নূতন শান্তি।...'

"দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুলে বললেন,—'আমার আর সময় নেই, কিন্তু তোমরা, তোমরা আর ভুল করো না। আর ক্ষুদ্র স্বার্থের কাড়াকাড়ি নিয়ে তোমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকো না, তোমরা এক হও। এই এক হতে না পারার বিপাকেই নিষ্ফল হয়ে গেছে আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত আয়োজন। একদিন আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলাম আমিও, কিন্তু কি হল? সবার অলক্ষ্যেই ভেতরকার অশিব বুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, দেখা দিলে অন্যায়, অনৈক্য, সরে আসতে হল।...'

"বিকালের দিকে কবির অবস্থা হঠাৎ অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়লো। দুপুরে রোজই তাঁর একটু করে জ্বর হত, সেদিনও হয়েছিল। তবু ওরি ভেতর কেন জানি না, তিনি খানিকক্ষণ বসিয়ে দেবার জন্যে জিদ ধরলেন। বসিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু এই উঠিয়ে বসানোর শ্রম তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যে সহ্য হল না। চীৎকার করে বললেন তিনি—'শুইয়ে দাও, শুইয়ে দাও আমাকে'।...

"বিছানায় শুইয়ে দেবার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত কবি খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ঘন ঘন হাই উঠছে, চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে, শরীর একটু একটু কাঁপছে। তারপর আস্তে আস্তে কতকটা সুস্থ হলেন।...

"রাত্রে কবির সুনিদ্রা হল না। থেকে থেকে খালি ঘুম ভেঙে যায়, অস্বঘটিত উপসর্গ তাঁকে অধীর করে তোলে। ওখানকার ডাক্তারবাবু প্রাণপণ চেষ্টায় মধ্য রাত্রের পর থেকে কবির অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারলেন। তাঁর ঘুম এলো। পরের দিন সকালে আবার উদয়নের সেই বারান্দায় দেখলাম কবিকে অনেকটা সুস্থ, অনেকটা সজীব।...

"বেলা আন্দাজ দশটার সময় গেলাম কবির কাছে।...দেখলাম কবি খানকয়েক সাময়িক পত্র নাড়াচড়া করছেন—চোখে সেলুলয়েডের চশমা, তার প্রান্ত-সংলগ্ন কালো ফিতে গলায় পরানো রয়েছে।...

"প্রণামান্তে বিদায় নিচ্ছি যখন, কবি বললেন—সম্ভব হলে এসো আবার। পোঁটলাপুঁটলি নিয়েই বসে আছি, কখন নৌকা আসবে ঠিক নেই ত তার!

"সময়োচিত সৌজন্য দেখিয়ে বললাম—আপনি শীঘ্রই নিরাময় হয়ে উঠুন এই কামনা করি। আসবো আবার বর্ষামঙ্গলের সময়।'

"হাসলেন। বললেন—তোমাদের বোধহয় বিশ্বাস, চিত্রগুপ্তের আফিস থেকে আমার হিসাবের খাতা হারিয়ে গেছে।

"ঘরে অনেকেই ছিলেন, দেখলাম এ কথার পর সকলেরই চোখ ছল ছল করছে। বেরিয়ে এলাম।" [—কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ

এই রোগশয্যাতেও কিন্তু কবির সাহিত্য সেবার বিরাম ছিল না। অসুস্থতা তাঁর মননশীলতাকে খর্ব করতে পারে নি। শুয়ে শুয়ে তিনি গল্প কবিতা প্রবন্ধ রচনা করে চলেছিলেন। মুখে মুখে বলে যেতেন, একজন পাশে বসে শ্রুতি-লিখন নিতেন। 'গল্পসল্প,' 'জন্মদিনে', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' প্রভৃতি বই তাঁর এই সময়কার লেখা। এ ছাড়াও ছিল দুটি গল্প এবং অজস্র ছড়া। সবই মুখে মুখে বলা।

কলিকাতা থেকে ডাক্তাররা এসে দেখলেন, ডাক্তার ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডাক্তার ইন্দুভূষণ বসু, ডাক্তার জ্যোতি-প্রকাশ সরকার, ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী, ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ দত্ত ও ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ রায়।

ডাক্তাররা বললেন—কবিকে সুস্থ করতে হলে অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন।

কবিকে নিয়ে আসা হলো কলিকাতায়।

অস্ত্রোপচার করা হলো। অপারেশন করলেন ললিতবাবু, সঙ্গে ছিলেন সত্যসখা মৈত্র, অমিয় সেন ও আরো কয়েকজন।

সেইদিন অপারেশনের কিছুক্ষণ আগে মুখে মুখে কবি একটি কবিতা বলে যান সেইটাই তার শেষ কবিতা।—

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।

তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ
সহজ বিশ্বাস সে যে
করে তারে সমুজ্জ্বল।
... ...
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।" [—রবীন্দ্র-জীবনী

কবির মন এই সময় মৃত্যুকে প্রশান্তভাবে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। মনে মনে এই প্রস্তুতি চলেছিল অনেক দিন ধরে। কিছুদিন আগে কথায় কথায় তিনি একবার বলেছিলেন—'এখন আমার মন হয়েছে—যেমন অস্ত যাবার মন। এখন অস্ত যেতেই ইচ্ছে করছে। আস্তে আস্তে সব আত্মীয়তা নিজের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। এখন চাই যেন একবার ঘুমিয়ে পড়ি আর না উঠি। সেই হলেই বেশ হয়। নির্বিঘ্নে আপদ কেটে যায়। তারপর তাই নিয়ে যেন একটা হৈ হৈ ধূমধাম ব্যাপার না করে। আমার ইচ্ছে ছাতিমতলায় আমার বড়দার যেমন হয়েছিল, তেমনি। চুপেচাপে শান্তভাবে সব কাজ যেন সারা হয়। বড়ো জোর হাজার খানেক টাকা কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে স্কলারশিপ দেয় আমার নামে। ব্যাস—এই আমি জানিয়ে যেতে চাই সবাইকে। বলে গেলুম তোমায়, সময় মতো সবাইকে জানিয়ে দিয়ো।" [—আলাপচারী...

আরেক দিন বললেন—"পা অচল, কানে দোষ, চোখ ক্ষয়ে আসছে, আর বেঁচে থেকে লাভ কী বল। শরীর অক্ষম হবার আগেই যাওয়া ভালো। এমনি করে এই অক্ষম দেহে টেনে বেড়ানোয় কী লাভ। ছুটি, ছুটি চাই, কবে যে ছুটি পাব জানিনে। কাজ করেছি তো ঢের; এবার চাই পূর্ণ বিশ্রাম।" [—ঐ

কিন্তু দীর্ঘ একাশী বছরের একান্ত পরিচিত এই ধরিত্রীর কাছ চিরদিনের মত ছুটি নেওয়াও তো কবির পক্ষে সহজ ছিল না। কবি সে কথাও বলেছিলেন —"মরতে আমার দুঃখ নেই। নিজের জীবনের জন্ত একটুও ভাবিনে। কারো

জন্যও এতটুকু দুঃখ হবে না। কেবল ভাবি—এই যে পৃথিবীকে আমি এত ভালো বেসেছি, এই তার গাছপালা আলোছায়া—"

"বলতে বলতে গলার স্বর ভারী হয়ে এলো, কথা শেষ করতে পারলেন না।" [—ঐ

অস্ত্রোপচারের পর দুটি দিন একটু ভালো ছিলেন। তারপর দেখা দিল আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। ভারত মনীষার উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক নিভে আসছে ধীরে ধীরে।

"পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই—
সবারে আমি প্রণাম করে যাই ॥
ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি, রাখি না আর ঘরের দাবি—
সবার আজি প্রসাদবাণী চাই।
অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।
প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি নিবিয়া গেল কোণের বাতি—
পড়েছে ডাক, চলেছি আমি তাই ॥"

সারাবাড়ী থম থম করছে। কবির শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন রামানন্দ-বাবু—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। খাটের পাশে বসে শেষ উপাসনা করলেন। বাড়ীর মধ্যে মেয়েরা ধীরে ধীরে গেয়ে উঠলো সংগীত। মৃত্যুর শান্ত স্তব্ধ ছায়া নেমে আসছে সবার মনে, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বিদায় নিচ্ছেন ধরিত্রীর বুক থেকে, সীমা মিশে যাচ্ছে অসীমের নিঃসীমতার মাঝে।

"......আমি চলিলাম—
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সংগমে।" [—জন্মদিনে

নিঃশ্বাসের মৃদু রেশটুকু ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে গেল। কবি চলে গেলেন।

বৃহস্পতিবার বারোটা দশমিনিট, সাতই আগষ্ট।

তারপর—

"অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে
ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভ শঙ্খধ্বনি।" [—জন্মদিনে

মানব সমুদ্রের ঢেউ এসে লাগলো গৃহদ্বারে। সমগ্র জাতি কবিকে শেষ সম্মান জানাতে এসেছে। কত জন এলো, চরণতলে সমর্পণ করলো শ্রদ্ধার পুষ্পার্ঘ্য। তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ, শুভ্র ধুতি উত্তরীয়ে সমুজ্জ্বল, কপালে শ্বেত-চন্দনের তিলক, গলায় রজনীগন্ধার মালা,—'সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান।'

"হে মহা সুন্দর শেষ, হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ,
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির, মুছায়ে নয়ন নীর
করো আশীর্বাদ
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির, পদতলে নমি শির
তব যাত্রাপথে,
নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি নিঃশব্দে আরতি করি
নিস্তব্ধ জগতে।" [—কল্পনা

পরিচয়ঃ

দ্বারকানাথ ঠাকুর

(দিগম্বরী দেবী)—দেবেন্দ্রনাথ
—নরেন্দ্রনাথ
—গিরীন্দ্রনাথ
—ভূপেন্দ্রনাথ
—নগেন্দ্রনাথ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(সারদা দেবী) —এক কন্যা
—দ্বিজেন্দ্রনাথ
—সত্যেন্দ্রনাথ
—হেমেন্দ্রনাথ
—বীরেন্দ্রনাথ
—সৌদামিনী
—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

—পুণ্যেন্দ্রনাথ
—শরৎকুমারী
—স্বর্ণকুমারী
—বর্ণকুমারী
—সোমেন্দ্রনাথ
—রবীন্দ্রনাথ
—বুধেন্দ্রনাথ

গিরীন্দ্রনাথ

(যোগমায়া দেবী)—গণেন্দ্রনাথ
—কাদম্বিনী
(যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়)—জ্যোঃতিপ্রকাশ—যামিনী-
প্রকা
—কুমুদিনী
—গুণেন্দ্রনাথ
সৌদামিনী দেবী)—গগনেন্দ্রনাথ
—সমরেন্দ্রনাথ
—অবনীন্দ্রনাথ
—বিনয়িনী
—সুনয়নী

দ্বিজেন্দ্রনাথ

(সর্বসুন্দরী দেবী)—দ্বিপেন্দ্রনাথ—দিনেন্দ্রনাথ

—সুধীন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথ

(জ্ঞানদানন্দিনী দেবী)—সুরেন্দ্রনাথ

—ইন্দিরা দেবী

—কবীন্দ্রনাথ

হেমেন্দ্রনাথ

(নীপময়ী দেবী)—প্রতিভা দেবী

বীরেন্দ্রনাথ

(প্রফুল্লময়ী দেবী)—বলেন্দ্রনাথ

সৌদামিনী

(সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়)—সত্যপ্রসাদ

—ইরাবতী

শরৎকুমারী

(যদুনাথ মুখোপাধ্যায়)—সুশীলা

স্বর্ণকুমারী

(জানকীনাথ ঘোষাল)—হিরন্ময়ী

—জ্যোৎস্নানাথ

—সরলা

—উর্মিলা

রবীন্দ্রনাথ

(মৃণালিনী দেবী)—মাধুরীলতা

(শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী)

—রথীন্দ্রনাথ

(প্রতিমা দেবী)—গৃহীতা কন্যা নন্দিনী

—রেণুকা

(সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)

—মীরা

(নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়)—নীতীন্দ্রনাথ

—নন্দিতা

—শমীন্দ্রনাথ

জীবনপঞ্জী

১৮৬১—

মে ৭ [১২৬৮—২৫শে বৈশাখ]—রাত্রি ২।৩০-৩টার মধ্যে জন্ম—কলিকাতা, জোড়াসাঁকো।

১৮৬৮—

প্রথম কবিতা রচনার চেষ্টা।

প্রথম কলিকাতার বাহিরে গমন—ছাতুবাবুর বাগানবাড়ী, পাণিহাটি।

বিদ্যালয়ে শিক্ষারম্ভ—গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী…পরে নর্মাল ইস্কুল…পরে বেঙ্গল আকাডেমি।

গৃহশিক্ষক : নীলকমল ঘোষাল, অঘোরবাবু ও সীতানাথ ঘোষ ; কুস্তি : হীরা সিং পালোয়ান ; গান : বিষ্ণু চক্রবর্তী।

১৮৭৩—

ফেব্রুয়ারী ৬ উপনয়ন।

পিতার সঙ্গে ভ্রমণ—বোলপুর, সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, অমৃতসর, ডালহৌসি।

পিতার কাছে সংস্কৃত পড়া ও নক্ষত্র চেনা।

গৃহশিক্ষক : রামসর্বস্ব পণ্ডিত, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কিছুদিন রাজনারায়ণ বসু।

'ম্যাকবেথের' কাব্যানুবাদ।

১৮৭৫—

সেণ্ট জেভিয়ার্স ইস্কুলে প্রবেশ।

ফেব্রুয়ারী ১১ হিন্দুমেলায় কবিতা পাঠ—'হিন্দুমেলার উপহার'।

ঐ ২৫ সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশ—'হিন্দুমেলার উপহার'।

মার্চ১০ মাতার মৃত্যু।

অসীমের লীলা আকাশে আলোক-লেখায়,
ছন্দের লীলার অচল মূর্তিতে;
অরূপের লীলা রূপের রেখায় রেখায়,
অচলের লীলা চপল স্রোতে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫ অক্টোবর
১৯৩২

১৮৭৬—

'জ্ঞানাঙ্কুর' মাসিক পত্রিকায় রচনা প্রকাশ—'বনফুল' কাব্য, 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছ, ও গ্রন্থ সমালোচনা।

নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে পরিচয়।

অভিনয়: জ্যোতিরিন্দ্র নাথের 'এমন কর্ম আর করব না' নাটকে অলীকবাবুর ভূমিকা।

১৮৭৭—

বিহারীলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয়।

'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত রচনা প্রকাশ—মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা, 'ভিখারিণী' গল্প, 'করুণা' উপন্যাস: 'ভানুসিংহের পদাবলী' কবিতা ও 'কবি-কাহিনী' কাব্য রচনা।

হিন্দুমেলায় কবিতা পাঠ।

১৮৭৮—

প্রথম পুস্তক প্রকাশ: 'কবিকাহিনী'।

আমেদাবাদে কয়েকমাস—সত্যেন্দ্রনাথের কাছে।

বোম্বাইয়ে কিছুদিন—পাণ্ডুরঙের গৃহে।

সেপ্টেম্বর ২০ বিলাত যাত্রা—সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে।

ব্রাইটনে—মেজো বৌঠাকুরাণীর কাছে—পাব্‌লিক ইস্কুলে প্রবেশ—বিলিতী নাচ ও ইংরাজি গান শেখা।

লণ্ডনে—য়ুনিভার্সিটি কলেজে প্রবেশ—লোকেন পালিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব—স্কটের গৃহে বাস।

ডিভনশায়রে—টার্কি সহরে কয়েকদিন।

পার্লামেন্টে নেতাদের বক্তৃতা শ্রবণ।

রচনা 'ভগ্নতরী', 'ভগ্নহৃদয়', য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র।

১৮৮০—

ফেব্রুয়ারী··· দেশে প্রত্যাবর্তন।

অভিনয়: জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' গীতিনাট্যে মদনের ভূমিকা।

১৮৮১—

ফেব্রুয়ারী ২৬ অভিনয়: 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় বাল্মীকির ভূমিকা; দর্শক: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

এপ্রিল ১৯ বক্তৃতা: বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে মেডিকেল কলেজের সভায়—'সংগীত ও ভাব'।

১৮৮২-

বিলাত যাত্রা কিন্তু মাদ্রাজ থেকে প্রত্যাবর্তন।

মুসৌরীতে পিতার কাছে গমন।

চন্দন নগরে—মোরাণ সাহেবের বাগানবাড়ীতে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে।

রচনা: 'সন্ধ্যাসংগীত'।

ভারতীতে 'বিবিধপ্রসঙ্গ' প্রকাশ।

১৮৮৩—

জানুয়ারী… 'বউঠাকুরাণীর হাট' প্রকাশ।

যুগ্মসম্পাদক—কলিকাতা সারস্বত সম্মেলন।

১০ নং সদর স্ট্রীটে বাসা—'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনা।

মে ১১ 'প্রভাত সংগীত' প্রকাশ।

রচনা: 'কালমৃগয়া'।

অভিনয়: কালমৃগয়ায় 'অন্ধমুনি'র ভূমিকা—জোড়াসাঁকোয়।

শরৎকাল দার্জিলিঙ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে।

১৪ নং সার্কুলার রোডে বাসা—সমালোচনী সভা।

ডিসেম্বর ৯ বিবাহ: কনে যশোহরের বেণী রায়চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণী দেবী (মৃণালিনী দেবী)।

ঐ জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতি সারদাপ্রসাদের মৃত্যু।

১৮৮৪-

কর্ণাটের কারোয়া শহরে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে

রচনা: 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'।

	সার্কুলার রোডের বাগান-বাড়ীতে বাস।
	রচনা : 'ছবি ও গান'।
	গ্রন্থ প্রকাশ : 'আলোচনা'।
এপ্রিল ১৯	কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা।
মে···	মেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যু।
	রচনা : 'পুষ্পাঞ্জলি'।
	বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ—হিন্দুধর্মের আদর্শ সম্পর্কে।
আগষ্ট···	প্রবন্ধ পাঠ : 'অকালকুষ্মাণ্ড' ও 'হাতে কলমে'—সাবিত্রী লাইব্রেরীতে।
	সম্পাদক—আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮৮৫—

	দেওঘর—রাজনারায়ণ বাবুর কাছে।
	রচনা : 'রাজর্ষি' ও 'মুকুট'।
	মধুপুর, গিরিডি ও হাজারিবাগে কয়েকদিন।
শরৎকাল	সোলাপুর—সত্যেন্দ্রনাথের কাছে।
	বোম্বাইয়ের বন্দোরা সহরে কিছুদিন—পিতার সঙ্গে।
	চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ—হিন্দুধর্ম সম্পর্কে।
	প্রকাশ : 'শৈশব সংগীত'।

১৮৮৬—

	নাসিকে কিছুদিন—সত্যেন্দ্রনাথের কাছে।
আগষ্ট···	হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবীর বিবাহ—পাত্র আশুতোষ চৌধুরী।
	প্রকাশ : 'কড়ি ও কোমল'।
অক্টোবর ২৫	জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা দেবীর (মাধুরীলতা) জন্ম।
ডিসেম্বর···	কংগ্রেসের অধিবেশনে উদ্‌বোধন সংগীত—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'।
	ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়ের কলেজের ছাত্রসম্মেলনে যোগদান।
	যোগেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ—ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ সম্পর্কে।

১৮৮৭—

অক্টোবর··· দার্জিলিং-এ ক্যাসল্‌টন হাউসে—সপরিবারে।
পার্ক স্ট্রীটের বাসা।
রচনা : 'মানসী'।

১৮৮৮—

গাজিপুরে তিনমাস—কবিতার ইংরাজি অনুবাদ সিবিল সার্জেনকে শোনাবার জন্য।
উড স্ট্রীটের বাসা—সাহিত্যিকদের মজলিস।
রচনা : 'মায়ার খেলা'—'সখীসমিতির' 'মহিলা শিল্পমেলায়' অভিনয়ের জন্য।

নভেম্বর ২৭ জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম।

১৮৮৯—

সোলাপুর—পুণার খিড়কি—রমাবাইয়ের বক্তৃতা শ্রবণ।
রচনা : 'রাজা ও রাণী'।
শিলাইদহ—সাহাজাদপুর।
রচনা : 'বিসর্জন'—সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে।

১৮৯০—

জানুয়ারী ৩১ দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকার জন্ম।
এপ্রিল+মে বোলপুর।
মে ১৫ প্রবন্ধপাঠ : 'মন্ত্রী অভিষেক'—এমারেলড থিয়েটারে।
জুন··· শিলাইদহ।
জুলাই··· সোলাপুর।
আগষ্ট ২২ বিলাত যাত্রা—শ্যাম জাহাজে সী-সিক্‌নেস্।
··· প্যারিস—ঈফেল টাওয়ারে।
সেপ্টেম্বর ১০ লণ্ডন।
অক্টোবর ৯ টেম্‌স্ জাহাজে প্রত্যাবর্তন—পথে মাল্‌টা দ্বীপের catacomb দর্শন।

নভেম্বর ৫ কলিকাতা।
'মানসী' প্রকাশ—প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে হৃদ্যতা।
শিলাইদহ—জমিদারী দেখাশোনা।

১৮৯১—

সাহিত্য-সম্পাদক—'হিতবাদী'; হিতবাদী যৌথ প্রতিষ্ঠানে যোগদান।
রচনা: দেনা-পাওনা, গিন্নী, পোষ্টমাষ্টার, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, ব্যবধান, রামকানাইয়ের নিবুর্দ্ধিতা, ইত্যাদি।
'হিতবাদী' ত্যাগ।

জুন···	সাহাজাদপুর—জমিদারী দেখাশুনা।
সেপ্টেম্বর···	কটক—পাণ্ডুয়া—জমিদারী দেখাশুনা।
অক্টোবর···	শিলাইদহ।
নভেম্বর···	'সাধনা' মাসিকপত্রে 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী' প্রকাশ।
ডিসেম্বর ২২	শান্তিনিকেতনে মন্দির ও মঠ প্রতিষ্ঠা।

১৮৯২—

শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতন।
রচনা: কবিতা—হিংটিংছট্, পরশপাথর প্রভৃতি; ছোটগল্প—খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি সমর্পণ, দালিয়া, কংকাল, মুক্তির উপায়, ত্যাগ, একরাত্রি, আষাঢ়ে গল্প, প্রভৃতি।
প্রকাশ: 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'গোড়ায় গলদ'।

ডিসেম্বর ১৭ অভিনয়: 'চিত্রাঙ্গদা'—এমারেল্ড থিয়েটারে।
রাজসাহী—জেলাজজ্ লোকেন পালিতের অতিথি।
প্রবন্ধপাঠ—'শিক্ষার হেরফের'—রাজসাহী এসোসিয়েশনে।
নাটোর—দাঁতের ব্যথায় কষ্টভোগ।
শিলাইদহ।

১৮৯৩—

জানুয়ারী ১২	কনিষ্ঠা কন্যা মীরার জন্ম।
ফেব্রুয়ারী···	কটক, পুরী, ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরি—জেলাজজ্ বিহারীলাল গুপ্তের অতিথি—সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ।

মার্চ··· শিলাইদহ। রাজসাহী।
প্রবন্ধপাঠ: 'ইংরাজ ও ভারতবাসী'—চৈতন্য লাইব্রেরীর সভায়।
কার্মাটার।
রচনা: উর্বশী, বিদায় অভিশাপ, বসুন্ধরা, প্রভৃতি কবিতা।

১৮৯৪—

জানুয়ারী··· সিমলা শৈলে—সত্যেন্দ্রনাথের কাছে।
মার্চ··· পাতিসর।
এপ্রিল··· প্রবন্ধপাঠ: 'বঙ্কিমচন্দ্র'—চৈতন্য লাইব্রেরীর শোকসভায়।
মে··· রচনা: 'বিহারীলাল'।
কার্সিয়ঙ—ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমন্ত্রণে।
জুলাই ·· শিলাইদহ।
শোভাবাজার রাজবাড়ীতে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' প্রতিষ্ঠা।
আগষ্ট··· কুষ্টিয়া—সাহাজাদপুর।
ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহ।
অক্টোবর··· বোলপুর।
সম্পাদক: সাধনা।
নভেম্বর··· কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের জন্ম।
রচনা: জীবনদেবতা, নদী, পুরাতন ভৃত্য, প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, নিশীথে, প্রভৃতি।

১৮৯৫—

জুন··· সাহাজাদপুর।
জুলাই··· বক্তৃতাপাঠ: 'ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত'—এমারেল্ড থিয়েটারে বিদ্যাসাগর স্মৃতিদিবসে।
বক্তৃতাপাঠ: 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য'—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক উৎসব সভায়।
রচনা: ক্ষুধিত পাষাণ, ইচ্ছাপূরণ, চিত্রা, প্রভৃতি।
'সাধনা' প্রকাশ বন্ধ।
কুষ্টিয়ায় পাটের ব্যবসায়—বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে।

১৮৯৬—

সাহাজাদপুর···উড়িষ্যা।

কংগ্রেস অধিবেশনের উদ্‌বোধন সংগীত 'বন্দেমাতরম্‌' গান।

রচনা: 'মালিনী', 'বৈকুণ্ঠের খাতা'।

১৮৯৭—

শান্তিনিকেতন·· শিলাইদহ।

জুন ১১ নাটোরে—বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান।

অর্থসংগ্রহ—লোকমান্য তিলকের মামলার সাহায্যের জন্য।

নিউরাইটিস রোগে আক্রান্ত।

কার্মাটার।

সিমলা শৈলে।

সম্পাদক: ভারতী।

রচনা: গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, প্রভৃতি।

১৮৯৮—

'ভারতী'র সম্পাদনা ত্যাগ।

শিলাইদহ—সপরিবারে—চাষ-আবাদের পরীক্ষা, মার্কিন ভুট্টা, মাদ্রাজী ধান ও রেশম—লরেন্স সাহেব ও জগদানন্দ রায়।

কলিকাতায় প্লেগ—সেবাকার্য—ভগিনী নিবেদিতার সহযোগিতা।

প্রবন্ধপাঠ: 'কণ্ঠরোধ'—টাউন হলের সভায়।

ঢাকা—বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রতিবাদ—আসাম ও উড়িষ্যা থেকে বাংলাভাষা উচ্ছেদের চেষ্টা সম্পর্কে।

রচনা: কোর্ট বনাম চাপকান, মুখার্জী বনাম ব্যানার্জী, প্রভৃতি।

অর্থসংগ্রহ—কবি হেমচন্দ্রের সাহায্যের জন্য।

১৮৯৯—

বলেন্দ্রনাথের অসুস্থতা—'ঠাকুর কোম্পানী'র কারবার বন্ধ।

রচনা: কথা ও কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা ও চিরকুমার সভা।

১৯০০—

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু।

অভিনয়: 'বিসর্জন'—রঘুপতির ভূমিকা—পার্ক স্ট্রীটের বাড়ীতে ত্রিপুরার মহারাজার অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে।

মাঘোৎসব—শান্তিনিকেতনে।

শিলাইদহ।

অর্থ সংগ্রহ—আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাহায্যার্থে ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে।

রচনা: নৈবেদ্য, চোখের বালি, প্রভৃতি।

১৯০১—

এপ্রিল···	সম্পাদক: 'বঙ্গদর্শন'-নবপর্যায় প্রকাশ।
মে···	দার্জিলিঙ—ত্রিপুরার মহারাজার অতিথি।
জুন···	মাধুরীলতার বিবাহ—জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী।
	শিলাইদহ···মজঃফরপুর—কবি সম্বর্ধনা—মুখার্জী সেমিনারীতে বাঙালীদের সভায়।
সেপ্টেম্বর···	রেণুকার বিবাহ—জামাতা ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
	শান্তিনিকেতনে বোর্ডিং স্কুল পরিচালনা।
ডিসেম্বর ২২	'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রেবাচাঁদ, জগদানন্দ রায়, শিবধন বিদ্যার্ণব ও লরেন্স সাহেবের সহযোগিতা।
	উপাধ্যায় কর্তৃক প্রথম 'গুরুদেব' আখ্যা দান

১৯০২—

	এলাহাবাদ—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়।
	বোলপুর···শিলাইদহ···পুরী।
	মৃণালিনী দেবীর অসুস্থতা।
নভেম্বর ২৩	মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু।

১৯০৩—

মার্চ···	হাজারিবাগ—সঙ্গে অসুস্থ কন্যা রেণুকা, মীরা ও শমীন্দ্র।
	কলিকাতা···শান্তিনিকেতন।

আলমোড়া—সঙ্গে রেণুকা—মোহিতচন্দ্র সেনকে আমন্ত্রণ ও বিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা।
কলিকাতা—বোলপুর—শিলাইদহ।
সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ।
আলমোড়া—রেণুকার রোগবৃদ্ধি।
রেণুকার মৃত্যু।
রচনা: 'শিশু', 'নৌকাডুবি'।
রথীন্দ্রনাথের এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস।

১৯০৪—

ফেব্রুয়ারী ১ আশ্রমে বসন্তরোগ—সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু—শিলাইদহে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত।
বিদ্যালয়ে ত্রিপুরার মহারাজার বার্ষিক হাজার টাকা দান।
শিলাইদহে ছাত্রদের মধ্যে বসন্তরোগ—বিদ্যালয় বন্ধ।
দেবেন্দ্রনাথের অসুস্থতা—কলিকাতা···মজঃফরপুর···কাশী।
রামকৃষ্ণ মিশনের সদানন্দ স্বামীর সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্র-নাথের কেদার-বদরী ভ্রমণ।

জুলাই ২২ প্রবন্ধ পাঠ: 'স্বদেশী সমাজ' মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরীর সভায়।

আগষ্ট··· গিরিডি—সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, মীরা ও শমীন্দ্র।
শান্তিনিকেতন···বুদ্ধগয়া—সঙ্গে জগদীশচন্দ্র, অবলা দেবী, ভগিনী নিবেদিতা, ত্রিপুরার রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর মাণিক্য, রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র।

১৯০৫—

জানুয়ারী ১৯ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরলোক গমন।
দ্বিজেন্দ্রনাথের বোলপুরের নিকট রায়পুরে বাস।
শান্তিনিকেতনে কবির নতুন বাড়ী 'দেহলি' নির্মাণ।
সম্পাদক: 'ভাণ্ডার' মাসিক পত্রিকা।

জুলাই··· আগরতলায় ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব—প্রবন্ধ পাঠ: 'দেশীয় রাজ্য'।

গিরিডি—অসুস্থতা।

প্রবন্ধ পাঠ : 'অবস্থা ও ব্যবস্থা'—কলিকাতা টাউন হলে।

প্রকাশ : স্বদেশী গানের বই—'বাউল'।

অক্টোবর ১৬ রাখী-বন্ধন উৎসব—সকালে শোভাযাত্রা পরিচালনা, বিকালে 'ফেডারেশন হলের' ভিত্তি স্থাপনায় আনন্দমোহন বসুর অভিভাষণের বাংলা তর্জমা পাঠ।

ঐ ২৭ পটলডাঙ্গা মল্লিকবাড়ীতে ছাত্র-সভায় সভাপতিত্ব।

নভেম্বর ৭ বক্তৃতা—বিজয়া দশমী মিলন সভা—বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ী।

কুষ্টিয়াতে বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—গগনেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তা।

ডিসেম্বর··· যুবরাজ পঞ্চম জর্জের ভারত দর্শন—'রাজভক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৯০৬—

এপ্রিল ৩ রথীন্দ্রনাথের আমেরিকা যাত্রা।

কুমিল্লা···আগরতলা।

বরিশাল—প্রাদেশিক সম্মেলনীতে সাহিত্য-সম্মেলনীর সভাপতিত্ব—সভা নিষিদ্ধ।

প্রবন্ধপাঠ : 'দেশনায়ক'—বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ী।

বক্তৃতাপাঠ : 'স্বদেশী আন্দোলন'—ডন সোসাইটির ছাত্রসভায়।

জুন··· প্রবন্ধ পাঠ : 'শিক্ষা সমস্যা'—ওভারটুন হলের সভায়।

আগষ্ট ১৫ প্রবন্ধ পাঠ : 'জাতীয় বিদ্যালয়'—টাউন হলে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন সভা—জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বাংলা ভাষার পরিচালক ও পরীক্ষার প্রশ্ন-কর্তার পদগ্রহণ।

ডিসেম্বর··· বক্তৃতা—ভবানীপুর সাহিত্য সম্মেলন।

গ্রন্থপ্রকাশ : 'খেয়া'।

১৯০৭—

ফেব্রুয়ারী ১৭ শান্তিনিকেতনে শ্রীপঞ্চমীর দিনে 'ঋতু উৎসব'—উদ্যোক্তা শমীন্দ্রনাথ।

জুন… মীরার বিবাহ—জামাতা ডাঃ নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি।
নগেন্দ্রনাথের আমেরিকা যাত্রা।
রচনা: 'গোরা'।
আগষ্ট… শ্রীঅরবিন্দের মামলা—'নমস্কার' রচনা।
শিলাইদহ—কলিকাতা—মীরার অসুখ।
নভেম্বর· বহরমপুর—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব।
অসুস্থতা—অর্শ রোগাক্রান্ত।
মুংগেরে শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু।

১৯০৮—

শিলাইদহ—পল্লীসমাজ গঠন।
সুরাট কংগ্রেসে নরম ও চরমপন্থীদের বিবাদ—'যজ্ঞভঙ্গ' রচনা।
পাবনা—বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব—বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ।
বিরাহিমপুর পরগণায় পল্লী সমাজ গঠন।
মে ২৫ প্রবন্ধ পাঠ: 'পথ ও পাথেয়'—চৈতন্য লাইব্রেরীর সভায়।
প্রবন্ধ পাঠ: 'পূর্ব ও পশ্চিম'—ব্রাহ্ম সমাজের ছাত্রসভায়।
অভিনয়: 'শারদোৎসব'—ক্ষিতিমোহন সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির অভিনয়,—কবি প্রম্প্‌টর।
শান্তিনিকেতনে—মেয়েদের বোর্ডিংয়ের পত্তন।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ-উন্মোচন উৎসব—দুটি সভা, উপর তলে ও নীচের তলে—উপর তলের সভায় সভাপতিত্ব—কবি রজনীকান্ত সেনের সঙ্গে পরিচয়।
রচনা: 'শান্তিনিকেতন' উপদেশ মালা।
মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু।

১৯০৯—

কাল্‌কা (সিমলা)—সঙ্গে মীরা দেবী।
গ্রন্থপ্রকাশ: 'প্রায়শ্চিত্ত'।
শান্তিনিকেতন…শিলাইদহ—অজিতকুমার চক্রবর্তী ও জগদীশ-চন্দ্র বসুর সাহচর্য।

কলিকাতা…বক্তৃতা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রসভায়।
রথীন্দ্রনাথের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের B. S. (Bachelor of Science) ডিগ্রি লাভ ও আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন।
শিলাইদহ—সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ।
প্রবন্ধ পাঠ: 'তপোবন'—কলিকাতা ওভারটুন হলে।
শান্তিনিকেতনে—'পৌষ উৎসব'।
বক্তৃতা পাঠ: 'বিশ্ববোধ'—কলিকাতায় মাঘোৎসবে।

১৯১০—

জানুয়ারী· রথীন্দ্রনাথের বিবাহ—বধূ প্রতিমা দেবী—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নী বিনয়নী দেবীর কন্যা।
ভাগলপুরে—বক্তৃতা—সাহিত্য সম্মেলনে।
শান্তিনিকেতনে—গোশালা স্থাপন—সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের অধীনে।

মে· শান্তিনিকেতনে—কবির জন্মোৎসব।
গ্রীষ্ম অবকাশের পূর্বে ছাত্র ও অধ্যাপকদের 'প্রায়শ্চিত্ত' অভিনয়।
কলিকাতা—অজিতকুমার চক্রবর্তীর বিবাহ।
তিনধরিয়া—সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, মীরা, নগেন্দ্রনাথ ও ও হেমলতা দেবী।
কলিকাতা…শান্তিনিকেতন…শিলাইদহ—জানিপুর—কয়া… কলিকাতা। পাতিসর।
শান্তিনিকেতনে—ছাত্রীদের অভিনয়—'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'।
অভিনয়: 'প্রায়শ্চিত্ত'—ধনঞ্জয় বৈরাগীর।
শান্তিনিকেতনে বালিকা বিভাগ ব

সেপ্টেম্বর··· গ্রন্থপ্রকাশ: 'গীতাঞ্জলি'।
শিলাইদহে—গবেষণাগার, লাইব্রেরী প্রভৃতি নির্মাণ।
রচনা: 'রাজা'।
শান্তিনিকেতনে সর্বাধ্যক্ষ পদে জগদানন্দ রায়।

ডিসেম্বর··· কলিকাতায় উইলিয়ম রদেনস্টাইনের সঙ্গে পরিচয়—অবনীন্দ্রনাথের বাড়ীতে…কাউন্ট কাইসারলিঙের সঙ্গে পরিচয়।
খ্রীস্টোৎসব।

১৯১১—

ফেব্রুয়ারী···	আনন্দকুমার স্বামীর শান্তিনিকেতনে আগমন।
	শিলাইদহ—রচনা : 'অচলায়তন'।
এপ্রিল···	সম্পাদক—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'।
	বক্তৃতা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে, রিপণ কলেজ হলে, একেশ্বরবাদী সম্মিলনীতে, আদি ব্রাহ্মসমাজে ও ওভারটুন হলে।
	বিদ্যালয়ের জন্য ঋণগ্রহণ—বিদ্যালয়ের কর্ণধার দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রচনা : 'জীবনস্মৃতি'।
	অভিনয়—'শারদোৎসব'—সন্ন্যাসীর ভূমিকায় কবি—শান্তিনিকেতনে।
	রচনা : 'ডাকঘর'—কলিকাতায় 'ডাকঘর' পাঠ, শ্রোতা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গাঙ্গুলি, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বাগচি, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচি, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মার্চ···	অভিনয় : 'রাজা' নাটকে ঠাকুরদা'র ভূমিকায়।
মে···	শান্তিনিকেতনে—জন্মোৎসব।
ডিসেম্বর···	কলিকাতা কংগ্রেসে 'জন-গন-মন অধিনায়ক' গান।

১৯১২—

জানুয়ারী ২৮	সম্বর্ধনা—টাউন হল—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অভিনন্দন পাঠ।
	শান্তিনিকেতনে—সরকারী গোপন সার্কুলার। মার্কিন আইনজীবী মেরিয়ান ফেল্‌প্‌সের আগমন।
মার্চ ১৯	য়ুরোপ যাত্রার উদ্যোগ ও অসুস্থতার বাধা।
	শিলাইদহ—গান ও কবিতার ইংরাজী অনুবাদ করা।
এপ্রিল···	শান্তিনিকেতনে—'রাজা' অভিনয়।
	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে দীর্ঘকালের সাহিত্য-বিরোধের সমাপ্তি
মে ২৪	বিলাত যাত্রা—সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী।
	বোম্বাই···মার্সাই···প্যারিস।

জুন ১৬ ডোভার—লণ্ডন—হামপস্টেড হীথ-এ বাসা।
রদেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা। কেমব্রিজ। কবিসম্মেলন—

ঐ ৩০ রদেনস্টাইনের গৃহে—ইয়েট্‌স্ কর্তৃক কবিতাপাঠ—এণ্ডরুজের সঙ্গে পরিচয়।

জুলাই ১০ সম্বর্ধনা—ট্রকেডারো হোটেল—ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে—ইয়েট্‌স্ কর্তৃক কবিতা পাঠ—কবির বক্তৃতা।

ঐ ৩০ 'দালিয়ার' অভিনয়—রয়েল এলবার্ট হল থিয়েটারে—নাট্যরূপ জর্জ কলডেরণ—কবির ইংরাজী গান রচনা।
হালডেন গীতি-উৎসবে যোগদান।

আগষ্ট··· বাটার্টন গ্রামে—এক পাদ্রীর গৃহে কয়েকদিন।
চ্যালফোর্ড গ্রামে—রদেনস্টাইনের গৃহে কয়েকাদন।

অক্টোবর ·· সুরুলের কুঠিবাড়ী ক্রয়।

ঐ ২৮ নিউইয়র্ক—সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী।
ইলিনয়—আর্বানা শহরে।

নভেম্বর ·· বক্তৃতা—ইউনিটি ক্লাবে উপনিষদ সম্পর্কে পর পর চারটি বক্তৃতা
পুস্তক প্রকাশ : 'গীতাঞ্জলির' ইংরাজি অনুবাদ Song Offering.
—লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক।
'পাঠসঞ্চয়'—সংকলন গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্যরূপে অমনোনীত।

১৯১৩—

জানুয়ারী ১৩ বক্তৃতা : 'ভারতের প্রাচীন সভ্যতার আদর্শ'—শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে···মিসেস মুডির অতিথি।
বক্তৃতাপাঠ : The Problems of Evil—ইউনিটেরিয়ানদের হলে।

ঐ ২৯ রচেস্টার।

ঐ ৩০ বক্তৃতা : Race Conflict—উদার মতাবলম্বীদের সম্মেলনে। বোস্টন।

ফেব্রুয়ারী ১৪ বক্তৃতা—কেমব্রিজ হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।
নিউইয়র্ক।

মার্চ ১০	আর্বানা।
	ইংলণ্ড—সঙ্গে পুত্র ও পুত্রবধূ—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লণ্ডনে গমন।
মে ১৯	বক্তৃতাপাঠ—ক্যাকস্টন হলে—ছ' সপ্তাহে ছ'টি।
জুন...	ডাচেস নার্সিং হোমে একমাস—অস্ত্রোপচার।
	চেইনিওয়াকে বাসা।
সেপ্টেম্বর ৪	লণ্ডন ত্যাগ—সিটি অব লাহোর জাহাজে।
অক্টোবর ৪	বোম্বাই।
ঐ ৬	কলিকাতা।
নভেম্বর ১৫	শান্তিনিকেতনে 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্তির সংবাদ—চৌপাহাড়ির পথে।
ঐ ২৩	শান্তিনিকেতনে জনসমাগম—কলিকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেণে ৫০০ আগন্তুকদের মধ্যে বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পুরণচাঁদ নাহার, মৌলভী আবদুল কাসেম, রেভারেণ্ড মিলবার্ণ প্রভৃতি—কবিসম্বর্ধনা।
ঐ ৩০	শান্তিনিকেতন থেকে দীনবন্ধু এণ্ডরুজ ও পিয়ার্সনের দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা।
	শান্তিনিকেতনে—পার্লামেণ্ট সদস্য রামসে ম্যাকডোনাল্ড।
ডিসেম্বর ২৬	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন—সাহিত্যাচার্য (D. Litt.) উপাধি লাভ।
	পুস্তক প্রকাশ : বিলাতে—The Gardener, The Crescent Moon, Chitra, Post Office, The King of the Dark Chamber.

১৯১৪—

জানুয়ারী ২৯	কলিকাতা রাজভবনে সভা—লাট সাহেব লর্ড কারমাইকেল কর্তৃক নোবেল পুরস্কারের পদক ও মানপত্র প্রদান।
ফেব্রুয়ারী ২৪	পাবনা—বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বিশেষ অতিথি।
	শান্তিনিকেতনে পিয়ার্সন ও এণ্ডরুজের আগমন।
এপ্রিল ১৪	সুরুলের কুঠিবাড়ীতে গৃহপ্রবেশ।

মে ৭ জন্মদিনে 'অচলায়তন' অভিনয়—গুরুর ভূমিকায় কবি—পিয়ার্সনেরও অভিনয়।

আলমোড়া—রামগড় পাহাড়ে—সঙ্গে প্রতিমা দেবী ও মীরা দেবী—অতুলপ্রসাদ সেনের আগমন।

অভিনন্দন পাঠ—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্মোৎসব—কলিকাতা—টাউন হলে।

আগষ্ট ৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ—প্রবন্ধ রচনা: 'মা মা হিংসী'।

বুদ্ধগয়া—মোহান্তের অতিথি—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাহচর্য।

এলাহাবাদ—তিন সপ্তাহ—রচনা: 'শাজাহান'।

দার্জিলিং—সঙ্গে পুত্র ও পুত্রবধূ—উডল্যাণ্ড হোটেলে বাসা··· লর্ড কারমাইকেল কর্তৃক আমন্ত্রণ ও তিব্বতী নাচ দেখা··· লেডি কারমাইকেল কর্তৃক ভোজের নিমন্ত্রণ।

কলিকাতা···এলাহাবাদ···দিল্লী···আগ্রা·· এলাহাবাদ···

১৯১৫-

শিলাইদহ—সঙ্গে নন্দলাল বসু, মুকুলচন্দ্র দে ও সুরেন্দ্রনাথ কর।

ফেব্রুয়ারী ১৩ বক্তৃতা—উদ্বোধন সভা—'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী।'

মার্চ ৬ গান্ধিজীর শান্তিনিকেতনে আগমন—দুই মহামানবের প্রথম সাক্ষাৎ।

ঐ ৮ পাঠ: 'বসন্তোৎসব'—কলিকাতার বন্ধুমহলে।

ঐ ২০ শান্তিনিকেতনে—লর্ড কারমাইকেলের আগমন।

ইষ্টার অভিনয়: 'ফাল্‌গুনী'তে অন্ধ বাউলের ভূমিকায়।

এণ্ডরুজ সাহেবের কলেরা—তাঁর সেবা।

কলিকাতা—'বিচিত্রা'—অভিজাত সাহিত্যিকদের মিলনকেন্দ্র।

পিয়ার্সনের নতুন বাড়ী—'দ্বারিক'—শান্তিনিকেতনে।

কলিকাতায় রথীন্দ্রনাথের মোটর গাড়ীর কারবার সুরু।

অজিতকুমার চক্রবর্তীর আশ্রম ত্যাগ।

জুন ৩ সম্রাট পঞ্চম জর্জের জন্মদিনে—'স্যার' উপাধি প্রাপ্তি।

শান্তিনিকেতন···শিলাইদহ—কালিগ্রাম—বিরাহিমপুর।

সেপ্টেম্বর ২৭ বক্তৃতা—রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী।

অক্টোবর··· কাশ্মীর—সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী, কমলা দেবী, হেমচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,—পরে সত্যরঞ্জন দাশ ও জ্যোতি-রঞ্জন দাশ—শিক্ষামন্ত্রীর আমন্ত্রণ—বিতস্তা নদীতে টিকারীর মহারাজার 'পরীস্থান' নামক নৌকায় বাসা—মার্তণ্ডমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দর্শন—গন্ধর্বলের দ্রাক্ষা-ক্ষেতে ভ্রমণ।

রচনা: 'ঝড়ের খেয়া'।

ডিসেম্বর ১০ প্রবন্ধ পাঠ: 'শিক্ষার বাহন'—রামমোহন লাইব্রেরী।

১৯১৬—

জানুয়ারী··· অভিনয়: 'ফালগুনী'—অন্ধ বাউলের ভূমিকায়—বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে শান্তি-নিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনয়।

রচনা: 'ছাত্রশাসন'—প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেনকে প্রহার ও ছাত্র বিতাড়ন সম্পর্কে—মডার্ণ রিভিউ-এ ইংরাজী অনুবাদ ও রাজ্যপালের কাছে প্রেরণ।

রচনা: 'ঘরে বাইরে'।

মে ৩ আমেরিকা যাত্রা—জাপানী জাহাজ তোষামারু—সঙ্গে এণ্ডরুজ, পিয়ার্সন ও মুকুল দে।

বঙ্গোপসাগরে কাল বৈশাখী।

ঐ ৬ রেংগুন—পি, পি, সেনের বাড়ী—শোয়েডাগং মন্দির দর্শন।

ঐ ১৫ সিঙাপুর—জাপানী মহিলার সঙ্গে রবার ক্ষেত ও গ্রামাঞ্চল দর্শন।

চীন সাগরে তাইফুন।

ঐ ২২ হংকং।

ঐ ২৯ কোবে—ওসাকা—প্রেস এসোসিয়েশন কর্তৃক সম্বর্ধনা ও বক্তৃতা।

জুন··· টোকিও—শিল্পী টাইকানের বাড়ীতে অতিথি।

ঐ ১২ বক্তৃতা—টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়।

ঐ ১৩ সম্বর্ধনা—উয়েনো পার্ক—বাংলা ভাষায় বক্তৃতা।

হাকান—ধনী হারাসানের পল্লীবাসে অতিথি।

	কারুইজাওয়ার নারী বিদ্যালয় দর্শন।
	ওকাকুরার পুত্রের অতিথি।
	ফরাসী ভাবুক পল রিচার্ডের সঙ্গে পরিচয়।
	ক্যানেডার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।
সেপ্টেম্বর ৭	আমেরিকা যাত্রা—জাপানী জাহাজ ক্যানাডা-মারু।
ঐ ১৮	ওয়াশিংটন—নিউ ওয়াশিংটন হোটেলে বাসা—সিয়াটেল।
	পণ্ড লিসিয়াম কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি—৪০টি বক্তৃতা—প্রতি বক্তৃতার জন্য ৫০০ ডালার।
ঐ ১৯	সম্বর্ধনা—মহিলা মজলিস—সানসেট ক্লাব।
ঐ ২৫	বক্তৃতা: The Cult of Nationalism—সানসেট হল—অত্যধিক ভীড়ের জন্য দু'বার বক্তৃতা পাঠ।
ঐ ২৬	পোর্টল্যাণ্ড—অরিগন স্টেট।
ঐ ২৭	বক্তৃতা—ড্রামা লীগ।
ঐ ৩০	বক্তৃতা—কলোনিয়েল বল রুম—সানফ্রান্‌সিস্‌কো।
অক্টোবর ৩	প্রবাসী জাপানীদের সভা।
	সম্বর্ধনা—বোহেমিয়ান ক্লাব।
	গল্প ও রাজার অনুবাদ পাঠ—কলম্বিয়া থিয়েটার হল।
	পোলিস পিয়ানো বাদক পদেরিউস্কির বাজনা শ্রবণ।
	গদর পার্টি কর্তৃক কবিকে হত্যা করার গুজব।
ঐ ৬	বক্তৃতা: 'ন্যাশন্যালিজম'—সেণ্ট বারবারা।
	বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তি—ট্রিনিটি অডিটোরিয়াম, লস্ এঞ্জেলিস।
	সান ডাইগো শহরে পাখীর প্রদর্শনী দর্শন।
ঐ ১৪	বক্তৃতা: 'ন্যাশন্যালিজম'—সল্ট লেক সিটি।
ঐ ২৪	বক্তৃতা—শিকাগো অরকেষ্ট্রা হলে।
	শ্রীমতি মুডির অতিথি।
	আইওয়া—ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে পরিচয়।
	মিলবোকি—বিসকনাসিন স্টেট।
নভেম্বর ৪	বক্তৃতা—পারেট থিয়েটারে।
	বক্তৃতা—লুইসিভিল-এ।

	বক্তৃতা—ডেণ্ডম থিয়েটার—ন্যাসভিলে।
	বক্তৃতা—ডেট্রয়েট-এ।
	বক্তৃতা—টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাব—ক্লিভ্ল্যাণ্ড-এ।
নভেম্বর ১৮	নিউইয়র্ক।
ঐ ২১	বক্তৃতা—কার্ণেগী হলে।
ঐ ২২	রচনা পাঠ—ওগোনটি বালিকা বিদ্যালয়—ফিলাডেলফিয়াতে।
ঐ ২৩	প্রবন্ধ পাঠ: The World of Personality—লীগ অফ পলিটিক্যাল এডুকেশন—নিউইয়র্ক-এ।
	বক্তৃতা—মহিলাদের ওয়েলেসলি কলেজ—বোস্টন।
ডিসেম্বর ৪	বক্তৃতা—মাউণ্ট হলিওক্ কলেজে।
ঐ ৫	বক্তৃতা: 'ন্যাশন্যালিজম'—ট্রিমেণ্ট টেমপ্ল্।
	সম্বর্ধনা—ইলেল বিশ্ববিদ্যালয়—আবৃত্তি: 'শিশুর' কবিতা।
	সম্বর্ধনা—এলিজাবেথিয়ান ক্লাবের ডিনারপার্টি—অধ্যাপক হপকিন্সের সংস্কৃত ভাষায় অভিনন্দন।
	বক্তৃতা: 'শান্তিনিকেতন'—স্মিথ কলেজ—নর্দামটন-এ।
ঐ ১২	বক্তৃতা: The World of Personality—আমষ্টারডেম থিয়েটার—বাফেলো।
	বক্তৃতা: 'ন্যাশন্যালিজম'—পিটস্বার্গ-এ।
	বৃক্ষরোপন—সেক্স্পীয়র উদ্যান—ক্লিভ্ল্যাণ্ড-এ।
	কবিতা আবৃত্তি—শিকাগোর সভায়।
	কালেরেডো—উষ্ণ প্রস্রবণ দর্শন।
	রচনা—পল রিচার্ডের বই To the Nation-এর ভূমিকা।
	সানফ্রানসিস্কো।

১৯১৭—

জানুয়ারী···	বক্তৃতা—হনলুলু—হাওয়াই দ্বীপে।
মার্চ ১৭	কলিকাতা।
	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের বিতর্ক।
	সম্বর্ধনা—রামমোহন লাইব্রেরী হল—কলিকাতা।
আগষ্ট ৪	প্রবন্ধ-পাঠ: 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'—রামমোহন লাইব্রেরী হলে।

প্রবন্ধপাঠ : 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'—আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে।

সেপ্টেম্বর ৭ — বিনাবিচারে গ্রেপ্তার ও আটক রাখার প্রতিবাদ।

ঐ ১১ — কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদ গ্রহণ।
আনি বেশান্তের কলিকাতা আগমন ও জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে সাক্ষাৎ।

ঐ ৩০ — অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদত্যাগ।
অভিনয় : 'ডাকঘর'—ঠাকুরদার ভূমিকায়—বিচিত্রা ক্লাবে—দর্শকদের মধ্যে—লোকমান্য তিলক, আনি বেশান্ত, মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মালব্য।

অক্টোবর ১৫ — বক্তৃতা—রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিসভা।

ঐ ২৭ — সভাপতি—রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী সভা।
সভাপতি—শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণী সভা।

নভেম্বর· — প্রবন্ধপাঠ : 'ছোটো বড়ো'।
বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠান।
শান্তিনিকেতনে—স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কার কমিশনের কয়েকজন সদস্যের আগমন।

ডিসেম্বর ২১ — ভারত সচিব মণ্টেগুর আপ্যায়ন—বিচিত্রা ভবনে।
পাঠ : Indian Prayer—কংগ্রেস সভায়।
রচনা : 'তোতা কাহিনী'।
রচনা : 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী'—মালব্যজীর অনুরোধে।

১৯১৮—

মার্চ-এপ্রিল· — রচনা : 'পলাতকা'।
দিল্লীতে War Conference-এ যাবার আগে নেতাদের আগমন।

মে ৯ — প্রতিবাদ—লাটসাহেবের সেক্রেটারি গৌরলের অভিযোগ—'গদরপার্টির' সঙ্গে কবির যোগাযোগ ও জার্মান অর্থে বিদেশ ভ্রমণ।

ঐ ১১ — মার্কিন কনসালের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও প্রেসিডেন্ট উইলসনের কাছে পত্র।

মে ১৬	জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার মৃত্যু।
	ইংরাজি অনুবাদ—'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ও 'মুকুট'।
	শান্তিনিকেতনে গুজরাটি ছাত্রদের আগমন।
অক্টোবর ১২	মাদ্রাজ যাত্রা।
	ট্রেনে গোলযোগ—পিঠাপুরম—রাজ অতিথি—বীরকর সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীর বীণাবাদন শ্রবণ।
ঐ ২০	শান্তিনিকেতন।
ডিসেম্বর ২৩	বিশ্বভারতীর পত্তন—গুজরাটিদের কয়েক হাজার টাকা দান।
	শান্তিনিকেতনে ইনফ্লুয়েঞ্জা—দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূর মৃত্যু।
ঐ ৩০	কলিকাতায় অজিতকুমার চক্রবর্তীর মৃত্যু।

১৯১৯—

জানুয়ারী···	মহীশূর যাত্রা, সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ কর।
ঐ ১০	বাংগালুর।
ঐ ১২	উদ্বোধন—চারুশিল্পের উৎসব—কানাড়ী শিল্পীসংঘের মানপত্র দান। প্রবন্ধপাঠ: The Message of the Forest.
ঐ ১৩	সম্বর্ধনা—কানাড়ী ছাত্রসমাজ।
	বক্তৃতা: 'প্রাচ্য বিদ্যালয়ের আদর্শ।'
	মহীশূর—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ৫০০৲ টাকা প্রদান শান্তিনিকেতনের জন্য।
	পাঠ: 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'—ইংরাজি তর্জমা।
ঐ ২১	উটি।
ফেব্রুয়ারী ৬	কয়ম্বটোর—এণ্ডরুজ ও নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির গমন।
	পালঘাট—অভিনন্দন ও বক্তৃতা—ছাত্রদের সভা।
ঐ ৯	মানপত্র ও প্রবন্ধপাঠ: 'ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র'—ছাত্রসভা—সালেম।
	পাঠ: 'কর্ণকুন্তী সংবাদের' অনুবাদ—সাহিত্যসভা—সালেম।
ঐ ১০	ত্রিচিনপল্লী—সম্বর্ধনা ও বক্তৃতা।
	শ্রীরঙ্গপত্তম—নৌকা উৎসব দর্শন।

ফেব্রুয়ারী ১১ কুম্ভকোণম—বক্তৃতা : The Spirituality in the Popular Religions of India—কলেজে।
তাঞ্জোরের পথে—এক স্টেশনে সাধারণ লোকদের মানপত্র ও পূর্ণকুম্ভ দান।
তাঞ্জোর—প্রবন্ধপাঠ : The Message of the Forest—সরকারী ট্রেনিং কলেজে।
ছাত্রদের অভিনয়—'চিত্রা'র কয়েকটি দৃশ্য ও 'শকুন্তলা'।

ঐ ১৩ ত্রিচিনপল্লী—বক্তৃতা।

ঐ ১৪ মাদুরা—প্রবন্ধপাঠ : The Message of the Forest—আমেরিকান কলেজ হলে।
জ্বরে আক্রান্ত : দেওয়ান গণপতের অতিথি।

ঐ ২১ বক্তৃতা : The Spirit of the Popular Religions of India.

ঐ ২২ বক্তৃতা : Education in India—টিকিট বিক্রী ১৫৭৫৲ টাকা।
মদনাপল্লী—থিওজফিষ্টদের অলকট বাংলোয় অতিথি।
বাংগালুর।

মার্চ ৮ মহীশূর—প্রবন্ধপাঠ : Folk Religion of India—মিথিক সোসাইটি।
মহীশূর সরকার কর্তৃক গ্রন্থাদি উপহার দান।
মাদ্রাজ—রঙ্গস্বামী আয়ারের অতিথি।

ঐ ১০ বক্তৃতা : Education—আনিবেশান্তের ন্যাশন্যাল য়ুনিভার্সিটি।

ঐ ১১ বক্তৃতা : The Message of the Forest.

ঐ ১২ বক্তৃতা : The Spirit of the' Popular Religions in India.

ঐ ১৩ অভিনন্দন ও কাব্যের তর্জমা পাঠ—আর্য গণসভায়।

ঐ ১৪ অসুস্থতা ও কলিকাতা যাত্রা।

ঐ ২১ বক্তৃতা : Centre of Indian Culture—কলিকাতা এম্পায়ার থিয়েটারে—টিকিট বিক্রয়।
প্রবন্ধপাঠ : The Message of the Forest—বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে।

এপ্রিল ১৬	গান্ধিজীর কাছে খোলা চিঠি।
	'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা প্রকাশ।
মে…	শান্তিনিকেতনে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়।
ঐ ৩০	বড়লাটের কাছে চরমপত্র—জালিয়ানওয়ালা-বাগের অত্যাচারের প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধি ফিরিয়ে দেওয়া।
জুন ২	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শয্যাপার্শ্বে।
জুলাই ৩	বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভ।
সেপ্টেম্বর ২৫	অভিনয়: 'শারদোৎসব'—সন্ন্যাসীর ভূমিকায় কবি।
অক্টোবর ১১	শিলং—সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ ও কমলা-দেবী—ব্রুকসাইড নামক বাড়ীতে বাসা।
ঐ ৩১	গৌহাটি—জ্ঞানাভিরাম বড়ুয়ার অতিথি।
	সম্বর্ধনা—জুবিলী পার্কে।
নভেম্বর ২	সম্বর্ধনা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটি শাখা কর্তৃক।
	বক্তৃতা—মহিলা সভা—আইন কলেজ হলে—মহিলাদের হাতে-বোনা এণ্ডি ও মুগা চাদর উপহার দান।
	সভাপতি—শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিসভা—ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে।
ঐ ৫	শ্রীহট্ট।
ঐ ৬	সম্বর্ধনা—বক্তৃতা: 'বাঙালীর সাধনা'—শ্রীহট্ট টাউনহলে।
ঐ ৭	গোবিন্দ নারায়ণ সিংহের বাড়ীতে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগদান।
	সম্বর্ধনা ও বক্তৃতা: 'আকাঙ্ক্ষা'—মুরারীচাঁদ কলেজ ছাত্রাবাসে।
	নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী গৃহে প্রীতি-সম্মেলন।
	মণিপুর সমাজ কর্তৃক নৃত্য প্রদর্শন।
ঐ ৯	কলিকাতা।
	শান্তিনিকেতনে নতুন বাড়ী 'উত্তরায়ণের' পর্ণকুটীর নির্মাণ।

১৯২০—

মার্চ ২৯	বোম্বাই যাত্রা—সঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন, দীনবন্ধু এণ্ডরুজ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও প্রমথনাথ বিশি—স্টেশনে বিপুল সম্বর্ধনা।

এপ্রিল ১	আমেদাবাদ—আম্বালাল সরাভাইয়ের অতিথি।
ঐ ২	গুজরাটি সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব। সবরমতী আশ্রমে। বক্তৃতা—গুজরাটি মেয়েদের বণিতা আশ্রমে। ভবনগর—সম্বর্ধনা—ভজনগান শ্রবণ। লিমডি—এখানকার রাজার দশ হাজার টাকা দান। বক্তৃতা—নাদিয়াদ।
ঐ ১৩	লিখিত ভাষণ প্রেরণ—বোম্বাইয়ে জালিয়ানওয়ালা-বাগের বার্ষিক সভায়। বরোদা—রাজ অতিথি।
ঐ ১৯	সম্বর্ধনা—মহিলাদের 'সহচরী সম্মেলন'-এ…দুপুরে আব্বাস তয়েবজীর বাড়ীর মেয়েদের অভ্যর্থনা; বিকালে সম্বর্ধনা—হাইকোর্টে মহিলা সমাজ; রাত্রে 'চিত্রা' অভিনয় দর্শন—দেওয়ান স্যার মানুভাই-এর বাড়ীতে। অন্ত্যজ সমাজের সভায় যোগদান।
ঐ ২১	সুরাট—নাগিনদাসের অতিথি…পথে সমস্ত স্টেশনে দর্শনেচ্ছু জনতা।
মে…	কলিকাতা—৫৯তম জন্মোৎসব।
ঐ ১৪	বোম্বাই হয়ে বিলাতযাত্রা—সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও মঞ্জুশ্রী দেবী, জাহাজে ছিলেন—আগা খাঁ, স্যার করিম ভাই, স্যার জামসেদজি জিজিভাই, আলোয়ারের মহারাজা, নবনগরের জামসাহেব রণজিৎ সিং…মহামান্ত আগা খাঁর মুখে হাফিজের কবিতা আবৃত্তি শ্রবণ।
জুন ৫	প্লিমাউথ—পিয়ার্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ তিনবছর পরে। লণ্ডন—স্টেশনে রদেনস্টাইন—কেনসিংটন প্যালেস ম্যানসন হোটেলে বাসা। রোদেনস্টাইনের গৃহে গুণী সমাগম—উইলিয়ম হাডসন, ফক্স স্ট্রাংওয়েজ, কানিং গ্রেহাম, বার্ণার্ড শ', গিলবার্ট মারে, নিকোলাস রোয়েরিখ্ প্রভৃতি।

জুন ১৯	বক্তৃতা—অক্স্‌ফোর্ডে : The Message of the Forest—কর্ণেল লরেন্সের সঙ্গে পরিচয়। সম্বর্ধনা—ইস্ট এণ্ড ওয়েস্ট সোসাইটি—সভায় ছিলেন—কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত, ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, আলোয়ারের মহারাজা, ঝালোয়ারের মহারাজা,—লরেন্স বিনিয়নের কবিতা আবৃত্তি করেন সিবিল থর্ণডাইক।
ঐ ২৫	বক্তৃতা—Y. M. C. A-এর সেক্‌স্‌পীয়র হাট-এ : The Centre of Indian Culture. পিটার্স ফীল্‌ড্‌।
জুলাই ৯	লণ্ডন—রোদেনস্টাইনের পার্টি—দিলীপ রায় ও ইয়েট্সের সঙ্গে দেখা।
ঐ ১০	ব্রিস্টল—ক্লিফ্‌টন বোর্ডিং স্কুলের মেয়েদের 'রাজা' অভিনয়—অধ্যাপক লিওনার্ডের অতিথি; বিকালে রামমোহন রায়ের সমাধি দর্শন। আলোচনা—মণ্টেগু ও লর্ড সিংহের সঙ্গে জালিয়ানওয়ালা-বাগ সম্পর্কে। আয়ারল্যাণ্ডের কর্মবীর স্যার হোরেস্‌ প্লাংকেটের সঙ্গে পরিচয়।
আগষ্ট ৬	প্যারিস—এম-এ কাঁনের অতিথি। Gardener-এর ফরাসী অনুবাদক অধ্যাপক লে-ব্রণের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
ঐ ১৮	উত্তর ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন। দক্ষিণ ফ্রান্সে কাঁনের বাগানবাড়ীতে গমন—ট্রেনে তোরঙ্গ হারানো। সিলভিয়ান লেভি ও হেনরি বার্গসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ—বিদুষী মহিলা কম্‌টেস্‌ ডি নেয়ালিস। অভ্যর্থনা—মুসে গীমে।
সেপ্টেম্বর ১৯	রটারডাম—অভ্যর্থনা—ভ্যান ইডেন কর্তৃক। আমস্টারডাম—হেগ—লাইডেন। বক্তৃতা—ইউট্রেক্ট : The Message of the East—এক অজ্ঞাত মহিলার উপহার হীরের আংটি ও সোনার লকেট।

অক্টোবর ২	এন্টওয়ার্প।
	ব্রুসেল্‌স—রাজার অভ্যর্থনা।
ঐ ৪	বক্তৃতা: 'প্রাচ্য ও প্রাতীচ্যের মিলন'—ফ্রান্সের প্রধান বিচারালয় প্যালেস অফ্ জাস্টিস-এ।
	প্যারিসের প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা সমিতি কর্তৃক ৩৫০ খানি গ্রন্থ উপহার।
	প্রকাশ: 'ঘরে-বাইরে'র ফরাসী অনুবাদ।
ঐ ১৮	লণ্ডন।
ঐ ২৮	রটারডাম জাহাজে নিউইয়র্ক যাত্রা, সঙ্গে পিয়ার্সন ও কেদার দাসগুপ্ত।
নভেম্বর ১০	ব্রুকলীন—বক্তৃতা: 'পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন'—আকাডেমি অফ-মিউজিক ভবনে।
ঐ ১২	বক্তৃতা: 'বাংলার মরমী কবি'—মেয়েদের কলেজে—ফিলাডেলফিয়া—ব্রেনর নগরে।
ঐ ১৬, ২১	বক্তৃতা: 'কবির জন্ম'—নিউইয়র্ক লীগ অফ পলিটিক্যাল এডুকেশনের সভায়—অভূতপূর্ব জনসমাগম।
	জন্মান্ধ-বধির হেলেন কেলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কবিতা আবৃত্তি।
	এল্‌ম্‌হার্ষ্টের সঙ্গে পরিচয়।
	অভিনন্দন—পোয়েট্রি সোসাইটি কর্তৃক।

১৯২১—

ফেব্রুয়ারী ১	শিকাগো—শ্রীমতি মুডির অতিথি।
	সমাজ সেবিকা জেন আডাম্‌স্‌-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ।
	বক্তৃতা—টেকসাস্ অঞ্চলে পনেরো দিন ধরে ঘুরে বেড়ানো—পণ্ডের ব্যবস্থায়।
মার্চ ১৯	রিনডাম জাহাজে য়ুরোপ যাত্রা—পথে তুফান।
ঐ ২৪	ইংলণ্ড।
এপ্রিল ৮	বক্তৃতা: 'পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন'—ভারতীয় ছাত্রদের হোস্টেলে।
ঐ ১৬	বিমানে প্যারিস—প্রথম বিমান বিহার—কাঁনের অতিথি।

এপ্রিল ১৭ রোমাঁ-রোলাঁর সঙ্গে পরিচয়।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যার পেট্রিক গেডিসের সঙ্গে পরিচয়।

বক্তৃতা: Indian Folk Religion—প্রাচ্য বন্ধু সমিতিতে।

বক্তৃতা: Public Spirit of India—সমাজ ও রাজনীতি শিক্ষা সমিতিতে (Comte Nationel d'etudes)।

শ্রীধর রাণার সঙ্গে পরিচয়—মৃতপুত্র রণজিত রাণার নামে বিশ্বভারতীতে গ্রন্থাগার দান।

কালিদাস নাগ কর্তৃক অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহ।

রিচার্ড ওয়াগ্‌নারের বিখ্যাত নাটক Valkyre দর্শন।

ঐ ২৭ স্ট্রাসবুর্গ—বক্তৃতা: The Message of the Forest—বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলভিয়ান লেভির সঙ্গে সাক্ষাৎ।

ঐ ৩০ জেনিভা—বক্তৃতা—শিক্ষা সম্বন্ধে—রুশো ইনস্টিটিউট-এ।

লুসার্ণ।

ব্যাসল—বক্তৃতা।

মে ১১ জুরিখ বক্তৃতা: Poet's Religion—বিশ্ববিদ্যালয়ে।

পাঠ ও আবৃত্তি—রচনাবলী—হোস্টেলে।

ডার্মস্টাটে—কাউণ্ট কাইসারলিঙের অতিথি।

ঐ ১৩ হামবুর্গ।

ঐ ২০ বক্তৃতা—বিশ্ববিদ্যালয়ে, অভ্যর্থনা—প্রিন্স অটো বিসমার্ক কর্তৃক।

ঐ ২১ কোপেনহেগেন।

ঐ ২৩ বক্তৃতা—বিশ্ববিদ্যালয়ে—ছাত্রদের মশাল মিছিল—হোটেলের সামনে মধ্যরাত্রি অবধি জনতার উৎসব।

ঐ ২৪ স্টকহল্‌ম।

লোক উৎসবে—লোক শিল্প উৎসবে লোকনৃত্য দর্শন।

বক্তৃতা—সুইডিস আকাডেমি।

বক্তৃতা—উপশালা সহরের ক্যাথিড্রালে—বিরাট শোভাযাত্রা।

Volksbinger নাট্যশালায় 'ডাকঘরের' অভিনয় দর্শন।

রাজার সঙ্গে পরিচয়।

জাতিসংঘের সভাপতি মিঃ ব্র্যানটিং-এর সঙ্গে পরিচয়।

এপ্রিল ২৯ বার্লিন—হুগো স্টিনেসের অতিথি।

জুন ২ বক্তৃতা—বিশ্ববিদ্যালয়ে—অভূতপূর্ব জনসমাগম; সন্ধ্যায় অভ্যর্থনা—শিক্ষামন্ত্রী ডকটর বাক-এর ভোজসভা।

ঐ ৩ বক্তৃতা—বিশ্ববিদ্যালয়ে; বিকালে সম্বর্ধনা—ভারতীয় ছাত্রদের পার্টিতে; রাত্রে অভ্যর্থনা—ওয়াল্‌টার রাথেনিউ-এর ভোজসভা। ফনোগ্রাফ যন্ত্রে রেকর্ডিং—The Message of the Forest ও 'মোর বীণা উঠে কোন্ সুরে বাজি'—প্রুসিয়ান আকাডেমি ও গ্রন্থাগারের জন্য।

ঐ ৫ মিউনিক। কার্ট উল্‌ফ, টমাসম্যান প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয়।

ঐ ৭ বক্তৃতা—বিশ্ববিদ্যালয়ে—টিকিট বিক্রীর দশহাজার টাকা জার্মান শিশুদের জন্য দান।

ঐ ৯ ডার্মস্টাট্—হেসের গ্রাণ্ড ডিউকের অতিথি।
ঠাকুর সপ্তাহ—সকাল-বিকালে সভা—সম্বর্ধনা—শ্রমিক সংঘের সভা।

ঐ ১৪ ভিয়েনা—বক্তৃতা।

ঐ ১৭ প্রাগ।
বক্তৃতা—কনসার্ট হলে—উইণ্টারনিজ, অধ্যাপক লেসলি, ডক্টর স্টেলা ক্রামরিসের সঙ্গে আলাপ।
কবিতা পাঠ—চেক ছাত্রদের ন্যাশন্যাল ক্লাবে।

ঐ ২১ স্টুটগার্ট।

জুলাই ১ প্যারিস।

জুলাই ১৬ বোম্বাই।

আগষ্ট ১৫ বক্তৃতা: 'শিক্ষার মিলন'—জাতীয় শিক্ষাপরিষদ কর্তৃক আহূত কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সভা।

ঐ ১৮ বক্তৃতা: 'শিক্ষার মিলন'—আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে—সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
সম্বর্ধনা—সেবাসমিতি ও সংগীতসংঘ কর্তৃক।

ঐ ২৯ বক্তৃতা: 'সত্যের আহ্বান'—য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট।

সেপ্টেম্বর ২, ৩ কবিতা আবৃত্তি—জোড়াসাঁকোয় বর্ষামঙ্গল উৎসব।

সেপ্টেম্বর ৪	সম্বর্ধনা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক—সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
ঐ ৬	গান্ধিজীর সঙ্গে আলোচনা—চার ঘণ্টা বিচিত্রা ভবনের রুদ্ধদ্বার কক্ষে, উপস্থিত শুধু এণ্ডরুজ।
ঐ ৮	শান্তিনিকেতন।
	রচনা : 'শিশু ভোলানাথ'।
অক্টোবর···	অভিনয়—'ঋণশোধ'।
	খড়ের ঘর 'কোণার্কে' বাসা।
	শান্তিনিকেতনে—অধ্যাপক এডোয়ার্ড টমসন্, কাজিন্স্ দম্পতি, সুকুমার রায়, অধ্যাপক শহীদুল্লা ও নজরুল ইসলাম প্রভৃতির আগমন।
	শ্রীমতী ষ্ট্রেট কর্তৃক ৫০হাজার টাকা দান—সুরুলে গ্রামোন্নয়নের জন্য।
নভেম্বর ১০	শান্তিনিকেতনে আগমন—সিলভিয়ান লেভি সস্ত্রীক—বিশ্ব-ভারতীর প্রথম ভিজিটিং প্রফেসার।
	বিশ্বভারতীতে বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা—চীনা, তিব্বতী ও ফরাসী—ম্যাডাম লেভি ফরাসী শিক্ষিকা।
ডিসেম্বর ২২	বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা উৎসব—সভাপতি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল —জমি, বাড়ী, গ্রন্থাগার ও পুস্তক-স্বত্ব বিশ্বভারতীকে দান।
	শিলাইদহ। রচনা : 'মুক্তধারা'।

১৯২২—

জানুয়ারী···	পাঠ : 'মুক্তধারা'—কলিকাতা বন্ধুমহলে।
ফেব্রুয়ারী ৬	সুরুলে শ্রীনিকেতন গ্রাম পুনর্গঠন কেন্দ্র স্থাপন—এলমহার্স্ট কর্তৃক।
মার্চ ১০	গান্ধিজী ও নেতাদের গ্রেপ্তার—'মুক্তধারা' অভিনয় বন্ধ।
এপ্রিল···	শান্তিনিকেতনে আগমন—সুইস ফরাসী অধ্যাপক ফার্ডিনাণ্ড বেনোয়েট সপরিবারে।
জুলাই ৮	সভাপতি—কলিকাতার শেলী শতবার্ষিকী উৎসব।
	সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শোকসভা।

	উদ্বোধন—কলিকাতায় বিশ্বভারতীর শাখা।
	সভাপতি—বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভা।
	অধ্যাপক সিলভিয়ান লেভির বিদায়সভা।
ঐ ৯	'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠান—রামমোহন লাইব্রেরী (পরে ম্যাডান থিয়েটার ও এলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে)।
	বক্তৃতা—প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসভা।
সেপ্টেম্বর ১৩	অভিনয়: 'শারদোৎসব'—সন্ন্যাসীর ভূমিকায় কবি—এলফ্রেড থিয়েটারে।
ঐ ১৭	'শারদোৎসব'—ম্যাডান থিয়েটারে।
	দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের মৃত্যু।
ঐ ২০	বোম্বাই যাত্রা—সঙ্গে এলমহার্ষ্ট ও গৌরগোপাল ঘোষ।
ঐ ২৩	পুণা—সঙ্গে লেভি ও এণ্ডরুজ—লেডি থ্যাকর্সের অতিথি।
	বক্তৃতা: Indian Renaissance কিরলোসকর থিয়েটার হলে।
	বক্তৃতা—লোকমান্য তিলকের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন—সার্বজনীন সভা।
ঐ ২৭	মহীশূর—বাংগালুর—ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অতিথি।
	বক্তৃতা—বিশ্ববিদ্যালয়ে।
	মাদ্রাজ—রামস্বামী আয়ারের অতিথি।
ঐ ২৯	বক্তৃতা পাঠ: Vision of History—গোখ্‌লে হলে।
ঐ ৩০	বক্তৃতা: The Spirit of Modern Times.
অক্টোবর	কয়ম্বটোর—বক্তৃতা: Vision of India's History—ভ্যারাইটি হলে।
ঐ ২	বক্তৃতা: An Eastern University—ভ্যারাইটি হলে।
	স্থানীয় বণিক সংঘের আড়াই হাজার টাকা দান।
ঐ ৩	বহিহামালাপালায়াম গ্রামে—স্থানীয় লোকদের ১৮৩ টাকার তোড়া দান।
	বাংগালুর।
ঐ ১১	সিংহল—ডাক্তার ডি-সিল্‌ভার অতিথি
ঐ ১৩	বক্তৃতা: Forest University of India—Y. M. C. A হলে।

অক্টোবর ১৫	প্রবন্ধ পাঠ: The Growth of My Life's Work—স্যার অরুণাচলম সভাপতি।
ঐ ১৬	বক্তৃতা: 'শিক্ষার আদর্শ' ও কবিতা আবৃত্তি—কলম্বোর ভারতীয় ক্লাব-এ।
ঐ ১৭	গ্যালে—বক্তৃতা—অলকট হলে—অভূতপূর্ব জনতা।
ঐ ১৮	মহিন্দ কলেজ পরিদর্শন।
নভেম্বর ৯	অভ্যর্থনা—ত্রিবাংকুর তিরুবন্দরমের জনতা কর্তৃক।
	বরকল—অস্পৃশ্য থিয়া জাতির গুরু শ্রীনারায়ণ গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ।
ঐ ১৭	অভ্যর্থনা—এরানকুল্লম বন্দর।
	বক্তৃতা—স্থানীয় কলেজে—আলেপ্পি নারায়ণগুরুর অদ্বৈত আশ্রম দর্শন; ইউনিয়ন কলেজ হোস্টেলের দ্বারোন্মোচন।
ঐ ১৮	তাতাপুরম—সম্বর্ধনা ও অর্থদান—গুজরাটি বণিকসঙ্ঘ কর্তৃক।
ঐ ২০	মাদ্রাজ।
	বক্তৃতা—ইউনাইটেড উইমেন্‌স্‌ কলেজে।
ঐ ২৩	বোম্বাই।
ডিসেম্বর·	আমেদাবাদ—আম্বালাল সরাভাইয়ের অতিথি।
ঐ ৪	বক্তৃতা—সবরমতী আশ্রমে (গান্ধিজী তখন কারাগারে)

১৯২৩—

জানুয়ারী···	শান্তিনিকেতনে—অবনীন্দ্রনাথ সম্বর্ধনা।
	শান্তিনিকেতনে—লাটসাহেব লর্ড লিটনের আগমন।
ফেব্রুয়ারী ২২	ম্যাডান থিয়েটারে 'বসন্তোৎসব' অভিনয়।
ঐ ২৮	কাশী—অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ অধিকারীর অতিথি।
	সভাপতি—প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন।
মার্চ ৫	লখনৌ—অতুলপ্রসাদ সেনের অতিথি।
ঐ ১০	বোম্বাই—জাহাংগীর পেটিট-এর অতিথি।
ঐ ১৪	আমেদাবাদ—আম্বালাল সরাভাইয়ের অতিথি।
ঐ ১৯	করাচি—জামসেদ মেটার অতিথি।
	সম্বর্ধনা—বার্নস উদ্যানে।

সম্বর্ধনা—মিউনিসিপ্যালিটিতে।

সম্বর্ধনা—সিন্ধি নারী মজলিসে।

বক্তৃতা: 'বিশ্বভারতী'—থিওজফিক্যাল সোসাইটি হলে

মার্চ ২৫ হায়দরাবাদ।

ঐ ৩০ কাথিয়াবাড়।

পোর বন্দরে রাজা ও জনগণের সমাদর।

এপ্রিল ১০ শান্তিনিকেতন।

স্থার রতন টাটার ২৫০০০৲ টাকা দান—নববর্ষে 'রতন কুঠির ভিত্তি স্থাপনা—অধ্যাপক তারাপুরবালা কর্তৃক।

নারীবিভাগ—মিস মূলের আগমন—'গার্লস গাইড' সংগঠন—'গৃহদীপ' পরে 'সহায়িকা'।

শিলং—জিতভূম বাড়ীতে বাসা—অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের সাহচর্য।

রচনা: 'রক্তকরবী'।

জুন ২৮ বক্তৃতা: 'বঙ্কিমচন্দ্র' ভবানীপুর সাহিত্য সম্মেলনী।

আগষ্ট ২৫, ২৭, ২৮ অভিনয়: 'বিসর্জন'—জয়সিংহের ভূমিকায়—এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে।

কবি সুকুমার রায়ের শয্যাপার্শে—শেষ সাক্ষাৎ।

সেপ্টেম্বর··· কবি সুকুমার রায়ের মৃত্যু।

ঐ ১৪ পিয়ার্সনের মৃত্যু,—ইটালীতে ট্রেন হইতে পতনের ফলে।

নভেম্বর··· কাথিয়াবাড়—সঙ্গে এণ্ডরুজ, ক্ষিতিমোহন সেন ও গৌরগোপাল ঘোষ—রাজাদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ।

১৯২৪—

সভাপতি—ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির বার্ষিক সভা—এলফ্রেড থিয়েটারে।

ফেব্রুয়ারী··· বক্তৃতা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পর পর তিনটি—স্যার আশুতোষের অনুরোধে।

নাটকাভিনয়—'বসন্ত উৎসব'—ম্যাডান থিয়েটারে।

মার্চ ২৩ ইথিওপিয়া জাহাজে চীনযাত্রা—সঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন,

নন্দলাল বসু ও কালিদাস নাগ…ভ্রমণ ব্যয়ের জন্য শেঠ যুগলকিশোর বিড়লার ১১০০০৲ টাকা প্রদান।

মার্চ ২৪ রেংগুন—সম্বর্ধনা—জুবিলি হলে; লাটসাহেব স্যার হারকোর্ট বাটলারের মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন।

ঐ ২৫ সম্বর্ধনা—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন—সুনাইরাম হলে—সভাপতি অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐ ২৬ সম্বর্ধনা—কেম্বেনডাইন চীনা ইস্কুলে।

ঐ ৩০ পেনাং—বন্দরে বিরাট জনতা—পি, কে নাম্বায়ারের অতিথি।

ঐ ৩১ কুয়ালালামপুর—স্টেটেন হাম—ডাঃ পরেশনাথ সেনের অতিথি।

এপ্রিল ৭ সিঙাপুর।

ঐ ১০ হংকং—নেমাজির অতিথি।

ঐ ১২ সাংহাই—বার্লিংটন হোটেলে বাসা।

ঐ ১৩ সম্বর্ধনা—শিখ গুরুদ্বারে—বাংলায় বক্তৃতা; মধ্যাহ্নে—ইহুদী-বণিক মিঃ হার্ডুনের গৃহে নিমন্ত্রণ; বিকালে—অভিনন্দন—কার্সন চ্যাঙের বাগান বাড়ীতে।

ঐ ১৪ হ্যাংচৌ।

বক্তৃতা—শিক্ষা সমিতির সভা।

ঐ ১৭ সাংহাই; সম্বর্ধনা—জাপানী সভায়; সম্বর্ধনা—কবি কাচুরির গৃহে।

ঐ ১৮ সম্বর্ধনা—পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে সম্মিলিতভাবে।

বক্তৃতা—'শিক্ষার আদর্শ'—চাইনীজ উইমেন্‌স্ কলেজে।

নদীপথে নানকিং।

বক্তৃতা—বিশ্ববিদ্যালয়ে—অত্যধিক জনতা।

ঐ ২২ শানটুং; সম্বর্ধনা—ৎসি নান ফু-এ; বক্তৃতা—খ্রীষ্টান মহা-বিদ্যালয়ে।

ঐ ২৩ স্পেশ্যাল ট্রেনে পিকিন—স্টেশনে পুষ্পবৃষ্টি ও বাজী পোড়ানো।

ঐ ২৪ সম্বর্ধনা—রাজকীয় উদ্যানে।

ঐ ২৫ সম্বর্ধনা—ওয়াগনলিটস হোটেলে—এ্যাংলো আমেরিকান এসো-সিয়েশন কর্তৃক

ঐ ২৬ সম্বর্ধনা—ন্যাশন্যাল য়ুনিভার্সিটি হলে—ডাঃ হুসীর সঙ্গে পরিচয়।

এপ্রিল ২৭	মাঞ্চু সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ—সাম্রাজ্ঞীকে ঢাকাই শাঁখা উপহার দান—সম্রাট কর্তৃক বুদ্ধমূর্তি উপহার। সম্বর্ধনা—সুধীমণ্ডলী কর্তৃক।
ঐ ২৮	বক্তৃতা ভূমিদেবীর মন্দিরে—'প্রাচ্যের আদর্শ'।
	বক্তৃতা—Civilisation and Progress—Tsin Hua কলেজে।
	সম্বর্ধনা ও বক্তৃতা—বৌদ্ধ যুব সমিতি—বৌদ্ধ মন্দিরে।
মে ৮	জন্মোৎসব—ডাঃ হুসী কর্তৃক উপাধি দান—'চু চেন তান'—ভারতের বজ্রঘোষিত প্রাতঃকাল।
ঐ ৯	বক্তৃতা—চারদিন—চেন কোঙান থিয়েটারে।
	ওয়েষ্টার্ণ হিল-এ কয়েক দিন।
ঐ ১৯	বক্তৃতা—'কবির ধর্ম'—ইণ্টারন্যাশান্যাল ইনস্টিটিউটে।
	তাইয়ুন ফু (শানসি); বক্তৃতা—জনসভায়—ইয়েন-শি-সানের সঙ্গে পরিচয়; হংকৌ; বক্তৃতা—জনসভায়।
ঐ ২৮	সাংহাই—মিঃ বেনার অতিথি, বক্তৃতা।
ঐ ৩১	জাপান—রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ; বক্তৃতা।
জুলাই ২১	সম্বর্ধনা—কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে।
ঐ ২২	শান্তিনিকেতনে।
	চীনা দোভাষী সু-সী-মো'র নামে চা-চক্রের উদ্বোধন।
আগষ্ট···	লাট সাহেব লিটনের অশোভন উক্তির প্রতিবাদ।
ঐ ২২	লাট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা।
সেপ্টেম্বর···	রক্তকরবীর ইংরাজি তর্জমা প্রকাশ—বিশ্বভারতী কোয়ার্টালিতে।
ঐ ১৪	আবৃত্তি—'অরূপরতন'—মূক অভিনয় এলফ্রেড থিয়েটারে।
	ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত।
ঐ ১৯	আমেরিকা যাত্রা—সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নন্দিনী, সুরেন্দ্রনাথ কর ও এলমহার্ষ্ট।
ঐ ২৮	কলম্বো।
অক্টোবর···	রচনা—'লিপি', 'ক্ষণিকা', 'খেয়ার' কবিতা—জাহাজে।
ঐ ১১	মার্সেই।
	প্যারিস—কাঁনের অতিথি—এক সপ্তাহ।
	জাহাজে অসুস্থতা—'পূরবী' রচনা।

নভেম্বর ১০	বুয়োনেস এয়ারিস্।
	সানইসিড্রোর বাগান বাড়ীতে দু'মাস—ম্যাডাম ভিকটোরিয়া ওকুম্পার সেবা।
ডিসেম্বর ২০	বাংলাদেশে অর্ডিন্যান্সের অনাচার শুনে পত্র-কবিতা প্রেরণ।
ঐ ৩০	আর্জেণ্টাইন রিপাবলিকের সভাপতি ডক্টর আলভিয়ার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯২৫—

জানুয়ারী ৪	য়ুরোপ যাত্রা—ইতালীয় জাহাজ জুলিও সেজার-এ।
ঐ ২১	জেনোয়া—ইতালীয় অধ্যাপক ফার্মিকির সাহচার্য।
ঐ ২২	মিলান—সম্বর্ধনা ও বক্তৃতা।
ঐ ২৩	অভিনন্দন—বালক-বালিকা কর্তৃক পিপলস থিয়েটারে।
	শিল্পী রিয়েত্তি কর্তৃক আলেখ্য অঙ্কন।
	অসুস্থতা।
ঐ ২৯	ভিনিস—প্রতি স্টেশনে জনতার ভীড়—গ্রাণ্ড হোটেলে বাসা।
	সম্বর্ধনা—আর্মেনিয়ান পাদরীদের দ্বারা।
ফেব্রুয়ারী ৪	ব্রিন্দিসি—শহর ও গ্রাম দেখা।
	পোর্ট সৈয়দ—অভিনন্দন—প্রবাসী ইতালিয়ানদের দ্বারা।
ঐ ১৭	স্বদেশে।
	শান্তিনিকেতনে অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টেন কনৌ।
	রচনা: 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'।
	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু—রাঁচিতে।
মে ২৯	শান্তিনিকেতনে গান্ধিজীর আগমন—সঙ্গে মহাদেব দেশাই ও সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত।
	আগমন—মার্কিন পাদরী বিশপ লুই ফিশার।
জুন ১৬	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু।
জুলাই…	'চিরকুমার সভার' অভিনয় দর্শন—স্টার থিয়েটারে।
আগস্ট…	অভিনয়: 'শেষবর্ষণ'—নটরাজের ভূমিকায় কবি—বিচিত্রা ভবনে।
	চরকার বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন; খিলাফৎ আন্দোলনে অনাস্থা প্রকাশ।

নভেম্বর ২১ শান্তিনিকেতনে—অধ্যাপক কার্লে ফার্মিকি ও রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের জোসেপ তুচ্চি।

ঐ ২৪ লাটসাহেব লিটনের শান্তিনিকেতন পরিদর্শন।

ডিসেম্বর ১৯ সভাপতি—ভারতীয় দর্শন সম্মেলন।

১৯২৬—

জানুয়ারী ১২ শান্তিনিকেতনে জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধি লেখক এফ, এম, মার্ভিন-এর আগমন।
লখনৌ—অযোধ্যার নবাব-বাড়ী ছাত্রমঞ্জিলে অতিথি।

ঐ ১৮ দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু—শান্তিনিকেতনে।
সভাপতি—সংগীত সম্মেলনী।

ফেব্রুয়ারী ৭ ঢাকা—সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, কালিমোহন ঘোষ, হিরজি ভাই মরিস, কার্লে ফার্মিকি ও জোসেপ তুচ্চি—গঙ্গাবক্ষে নবাবের হাউস-বোট তুরাগ-এ বাস; সম্বর্ধনা—করোনেশন পার্কে।

ঐ ৮ সম্বর্ধনা—মহিলা সমিতি দীপালী সঙ্ঘে।

ঐ ৯ বক্তৃতা—ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ প্রাঙ্গণে।

ঐ ১০ বক্তৃতা—ব্রাহ্মসমাজে।
সম্বর্ধনা—বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসঙ্ঘ—মোসলেম হলে।
বক্তৃতা : The Philosophy of Art—কার্জন হলে।

ঐ ১৩ আপ্যায়ন—ভাইস্‌ চ্যানসেলর পার্টি ; বক্তৃতা : The Rule of the Giant—বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ঐ ১৪ ময়মনসিংহ—মহারাজা শশিকান্তের অতিথি।

ঐ ১৫ সম্বর্ধনা—টাউন হলে।

ঐ ১৬ অভিনন্দন—ব্রাহ্মমন্দিরে ; অভিনন্দন—ত্রয়োদশী সম্মেলনী কর্তৃক। জমিদারগণের দেড় হাজার টাকা উপহার প্রদান।

ঐ ১৭ সম্বর্ধনা—নাগরিক ও সাহিত্যসভা কর্তৃক।
সম্বর্ধনা—আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক।
বক্তৃতা—মহিলা সমিতি।

ঐ ১৯ কুমিল্লা—অভয় আশ্রমে।

ঐ ২০ সভাপতি—আশ্রমের বার্ষিক উৎসব সভায়।

ফেব্রুয়ারী ২১	অভিনন্দন—মহিলা সমিতি; জনসভা; সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'গৌরাঙ্গ' নাটকের অভিনয় দর্শন।
ঐ ২২	রামমালা ছাত্রাবাসে···ভিকটোরিয়া কলেজে···নমঃশূদ্র সম্মেলনে।
ঐ ২৪	আগরতলা—তরুণ মহারাজের অভ্যর্থনা। সম্বর্ধনা—কিশোর সাহিত্য সমাজ কর্তৃক। মণিপুরী নৃত্য দর্শন। চাঁদপুর···সম্বর্ধনা—নীরদ পার্কে।
ঐ ২৮	নারায়ণগঞ্জ···সম্বর্ধনা—ছাত্রসঙ্ঘ কর্তৃক।
এপ্রিল···	রচনা: 'নটীর পূজা'।
মে···	জন্মোৎসব—'নটীর পূজা' অভিনয়--পোর বন্দরের মহারাজার কয়েক হাজার টাকা দান।
ঐ ১২	য়ুরোপ যাত্রা—সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী, প্রশান্ত মহলানবিশ ও রাণী দেবী, প্রেমচাঁদ লাল, গৌরগোপাল ঘোষ, ত্রিপুরার রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মন ও লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।
ঐ ৩০	নেপল্‌স্—স্পেশাল ট্রেনে রোম।
ঐ ৩১	মুসোলিনী কর্তৃক আপ্যায়ন।
জুন ৭	সম্বর্ধনা—ক্যাপিটলে।
ঐ ৮	বক্তৃতা: Meaning of Art—কুইরিন্যাল থিয়েটারে—সভায় মুসোলিনীর উপস্থিতি; বৃক্ষ রোপণ—ছোট ছেলেমেয়েদের ইস্কুল Orti da Pace-এর উদ্যোগে।
ঐ ১০	সম্বর্ধনা—কলোসিয়ামে; সম্বর্ধনা—রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে।
ঐ ১১	রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
ঐ ১৩	মুসোলিনীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ। দার্শনিক ক্রোচের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
ঐ ১৬	ফ্লোরেন্স।
ঐ ১৭	বক্তৃতা: My School—ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে।
ঐ ২১	টুরিণ—বক্তৃতা: City and Village—লিসিও মিউজিক্যাল হলে, মাডা লিপোভেট্স্কার বাংলা গান।

মে ২২	বক্তৃতা—টুরিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে।
	সুইট্জারল্যাণ্ড—ভিলেন্যুভ গ্রামে রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ।
জুলাই…	জুরিখ ; বক্তৃতা—সাধারণ সভা ; অধ্যাপক সলভাদোরির স্ত্রীর সঙ্গে দেখা ও ফ্যাসিজ্মের নিন্দা।
	বক্তৃতা—লুসার্ণ।
ঐ ১০	বিয়েন—ইতালী থেকে পলায়িত সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
ঐ ২০	ফ্যাসিবাদের নিন্দাসূচক পত্র প্রকাশ—ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান-এ।
	প্যারিস—কাঁনের অতিথি, অধ্যাপক লেভি, জুল ব্লক প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ।
আগষ্ট…	লণ্ডন—রদেনস্টাইন, আর্ণেষ্ট রীজ প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ।
	ডিভনশায়র—টিটনিশ—এলমহার্ষ্টের বিদ্যায়তনে।
	কর্বিশ বে'—রার্ট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
	অক্স্ফোর্ড—রবার্ট বিজেসের আমন্ত্রণ।
	শিল্পী এপস্টাইন কর্তৃক মূর্তি নির্মাণ।
ঐ ২১	নরোয়ে যাত্রা।
	অসলো।
ঐ ২৩	রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ।
ঐ ২৫	বক্তৃতা—ওরিয়েণ্টাল আকাডেমি—রাজার উপস্থিতি।
	বক্তৃতা—বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে।
	লেখক জোহান বোয়ারের সঙ্গে একদিন।
	সুইডেন…সম্বর্ধনা—স্বেন হেডিন কর্তৃক।
	আপ্যায়ন—সুইডিশ রাজকুমারের পার্টি।
সেপ্টেম্বর ৬	ডেনমার্ক—কোপেনহেগেন।
	সম্বর্ধনা—রয়েল নটিক্যাল ক্লাবে ডিনার পার্টি…জর্জ ব্রাণ্ডেসের শয্যাপার্শ্বে।
ঐ ৯	হ্যামবুর্গ (জার্মানী)।
	বক্তৃতা : Culture and Progress.
ঐ ১১	বার্লিন—ডার কাইজার হফ হোটেলে বাস।
ঐ ১৩	বক্তৃতা : ভারতীয় দর্শন—ফিলোহারমোনিক হলে।
ঐ ১৪	ভন হিণ্ডেনবার্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

মিউনিক···হুরেন বার্গ···স্টুটগার্ট···ডুসেল ডর্ফ।
বার্লিন হাসপাতালে রথীন্দ্রনাথের অস্ত্রোপচার।

অক্টোবর ৯ প্রাগ (চেকোশ্লোভাকিয়া)।
বক্তৃতা ও সম্বর্ধনা—পি-ই-এন ক্লাবে···'ডাকঘরের' অভিনয় দর্শন—চেক ও জার্মান ভাষায়।

ঐ ১৬ ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া)।
বক্তৃতা···সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

ঐ ২৬ বুডাপেস্ট (হাংগেরি)।
বক্তৃতা···বালাতন হ্রদের তীরে কয়েকদিন।
প্রকাশ—হাতের লেখা থেকে : 'লেখন'।
বৃক্ষরোপণ—কবি কারোলি কিস ফালুডির মূর্তির নিকট··· ঔপন্যাসিক মরাস জোকাই-য়ের স্মৃতিস্তম্ভে মাল্যদান।

ঐ ২৭ বক্তৃতা ও কবিতা পাঠ।

ঐ ২৮ প্রীতিভোজ।

ঐ ৩০ বেলগ্রেড (যুগোশ্লাভিয়া)।
বক্তৃতা—বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিন—অত্যন্ত ভীড়।

নভেম্বর··· সোফিয়া (বুলগেরিয়া)।
বক্তৃতা···রাজা বোরিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

ঐ ১৯ বুখারেস্ট (রুমানিয়া)।

ঐ ২১ রাজা ফার্ডিনাণ্ডের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন।
বক্তৃতা—জনসভায়।

ঐ ২৫ এথেন্স (গ্রীস)।
রাজা কর্তৃক উপাধিদান—Commander of the Order of the Redeemer.···সম্বর্ধনা—সাহিত্যিকদের···আক্রোপলিস দর্শন।

ঐ ২৭ আলেকজেন্দ্রিয়া (মিশর)—ইতালীয়ন সোয়ারেসের অতিথি।

ঐ ২৮ বক্তৃতা।

ঐ ২৯ কায়রো।
শ্রেষ্ঠ কবির গৃহে চায়ের নিমন্ত্রণ।

ডিসেম্বর ১	রাজা ফুয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ—রাজা কর্তৃক বহু আরবী গ্রন্থ উপহার দান···জগলুল পাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ।
ঐ ২	স্বদেশ যাত্রা।
ঐ ১৯	হাওড়া স্টেশনে—মেয়র দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সম্বর্ধনা। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যু-সংবাদে দুঃখ প্রকাশ।
১৯২৭—	
জানুয়ারী ২৪	অভিনয়ঃ 'নটীর পূজা'—উপালির ভূমিকায় কবি—জোড়া-সাঁকোয়।
ফেব্রুয়ারী ৩	রাজবন্দীদের বিনাবিচারে আটক রাখার প্রতিবাদ-পত্র।
মার্চ···	আগ্রা। ভরতপুর—রাজপ্রাসাদে অতিথি। সভাপতি—হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন···গৌরীশংকর ওঝার সঙ্গে পরিচয়।
এপ্রিল···	আগ্রা—আওয়াগড়ের মহারাজার অতিথি; অধ্যক্ষ ক্যানন ডেভিস ও অধ্যক্ষ নারায়ণ দাসের সঙ্গে পরিচয়; সম্বর্ধনা।
ঐ ৩	তাজমহল দেখতে গিয়ে অসুস্থতার জন্য ফিরে আসা। রাজপুত ইস্কুলের পারিতোষিক বিতরণ সভা। জয়পুর—সুবোধ মজুমদারের অতিথি। আমেদাবাদ—আম্বালাল সরাভাইয়ের অতিথি। সম্বর্ধনা—গুজরাটি সাহিত্য সভা কর্তৃক।
ঐ ১১	শান্তিনিকেতন। চন্দননগর—প্রবর্তক সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন; সম্বর্ধনা—নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে—মেয়র কর্তৃক এক হাজার মুদ্রা দান; কৃষ্ণভামিনী বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন; আপ্যায়ন—এডমিনিস্ট্রেটরের টি-পার্টি; প্রবর্তক সঙ্ঘমন্দিরের ভিত্তি স্থাপনা। শিলং—সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথ, জাহাংগীর ভকিল ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—আম্বালাল সরাভাই ও রাণী সুচারু দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। রচনাঃ 'তিনপুরুষ' (পরে 'যোগাযোগ')।

জুলাই…	শেঠ যুগলকিশোর বিড়লার ১০০০০৲ টাকা ও নারায়ণ দাস বাজোরিয়ার ১০০০৲ সাহায্য দান।
ঐ ১২	দ্বীপময় ভারত যাত্রা—সঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র নাথ কর, ধীরেন্দ্রনাথ দেববর্মন ও আর্যনায়কম্।
ঐ ২০	সিঙাপুর—লাট সাহেব স্যার হিউ ক্লিফোর্ডের অতিথি।
ঐ ২১	সম্বর্ধনা—গার্ডেন ক্লাবে।
	সম্বর্ধনা—ভিকটোরিয়া থিয়েটারে।
	বক্তৃতা—চীনাদের সভা—প্যালেস্ থিয়েটারে।
	বক্তৃতা—নামাজির গৃহে।
	বক্তৃতা—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন গৃহে।
	বিদায়-সম্বর্ধনায় অত্যধিক জনতা।
ঐ ২৭	মালাক্কা—মুয়ার শহরে।
	সম্বর্ধনা—ভারতীয় ও চীনাদের সভায়।
	সম্বর্ধনা—রোমান ক্যাথলিক স্কুলের সভায়।
ঐ ৩০	কুয়ালা-লামপুর—চীনা বণিকদের ক্লাব-বাড়ী চ্যান-চুক্-কী-লো-তে অতিথি।
	সেরেম্বান শহরে।
	ক্লাঙ শহরে।
আগষ্ট ৭	ইপো শহরে।
	তেলোক-আনসন শহরে।
	তাই-পিং শহরে।
	পেনাং।
ঐ ১৬	মালয় ত্যাগ।
ঐ ১৭	মেদান (সুমাত্রা)।
ঐ ২১	যবদ্বীপ—হোটেল দ্য ইণ্ডিজ-এ বাসা।
	সম্বর্ধনা ; আপ্যায়ন—কনসাল ক্রসবি সাহেবের বাড়ীতে ভোজ।
ঐ ২৫	সুরবায়া।
	বলিদ্বীপ—বাঙলি রাজবাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজ ও নৃত্যদর্শন।
	কারেন-আসেমের রাজবাড়ীতে।

	গিয়াঞ্জা রাজবাড়ীতে—মুখোস নৃত্য দর্শন।
	বাতুং।
সেপ্টেম্বর ৫	মুণ্ডুক—ডাক বাংলোয় বাসা।
	ক্যাথারিন মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়ার' প্রতিবাদ পত্র
ঐ ৯	সুরবায়া—(যবদ্বীপ)।
	সম্বর্ধনা—নাগরিকদের ১২৫ গিলভারের তোড়া প্রদান।
	বক্তৃতা : 'আর্ট কী'—কলাসভায়।
	শূরকর্তা—রাজ অতিথি; সম্বর্ধনা—নৃত্যদর্শন—ছায়া-নাটক দর্শন।
	উদ্বোধন—পথ ও সাঁকো।
	প্রাম্বানন—প্রাচীন মন্দির দর্শন।
	যোগ্যকর্তা—রাজ অতিথি।
	'বরবুদুর' স্তূপ দর্শন।
ঐ ৩০	যবদ্বীপ ত্যাগ।
অক্টোবর ৮	ব্যাংকক (শ্যাম রাজ্য)—ফিয়াথাই হোটেলে বাসা।
	রাজমূর্তিতে মাল্যদান, রাজ-জননীর শবাধারে মাল্যদান, প্রিন্স রাজানুভবের আর্টসংগ্রহ দর্শন।
	প্রিন্স শান্তাবান কর্তৃক গ্রন্থ উপহার প্রদান।
	সম্বর্ধনা—বজ্রায়ুধ বিদ্যালয়ে।
	বক্তৃতা—চূড়ালংকরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে।
ঐ ১৩	রাজা ও রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ—রাজাকে 'সিয়াম' কবিতাটি উপহার দেওয়া।
ঐ ১৪	বক্তৃতা—মিউজিয়ামে—অত্যধিক জনতা।
ঐ ২২	রেংগুন।
ঐ ২৭	কলিকাতা।
ডিসেম্বর ৮	কলিকাতায় 'ঋতুরঙ্গ' অভিনয়।

১৯২৮—

জানুয়ারী ৫	সভাপতি—সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির বার্ষিক উৎসব।
	সম্বর্ধনা—প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র পরিষদে।

জানুয়ারী ৬	শান্তিনিকেতনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সদস্যগণ।
	গায়িকা ম্যাডাম ক্লারা বাটের আগমন।
মে ৭	জন্মোৎসব—সমান ওজনের গ্রন্থ পাবলিক্ লাইব্রেরীতে বিতরণ।
ঐ ১২	বিলাত যাত্রা—সঙ্গে প্রশান্ত মহলানবিশ ও রাণী দেবী।
	মাদ্রাজে অসুস্থতা—আনি বেশান্তের অতিথি।
	কুন্নুর।
	পিঠাপুরম—মহারাজার অতিথি।
ঐ ২৯	শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
ঐ ৩১	কলম্বো—ডাঃ ডি. সিলভার অতিথি।
	অসুস্থতা ও প্রত্যাবর্তন।
জুন ১০	বাংগালুর—আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অতিথি।
	রচনা: 'শেষের কবিতা'।
জুলাই ২৫	শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব।
আগষ্ট…	কলিকাতায় ডায়াথার্মিক চিকিৎসা।
	সিলভিয়ান লেভি ও ম্যাডাম লেভির সঙ্গে সাক্ষাৎ।
	বক্তৃতা—ব্রাহ্মসমাজ শতবার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবস।
সেপ্টেম্বর…	আন্তর্জাতিক শান্তি সঙ্ঘে বাণী প্রেরণ।
	ডাক্তার নীলরতন সরকার কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা।
নভেম্বর…	রচনা: 'মহুয়া' ও ছবি আঁকা।
	শান্তিনিকেতনে ডক্টর সু-সি-মো'র আগমন।
	রচনা—আচার্য জগদীশচন্দ্রের ৭০তম জন্মোৎসবের জন্য কবিতা।
ডিসেম্বর ১৭	শান্তিনিকেতনে বড়লাট লর্ড আরুইনের আগমন।
	রচনা—নিখিল ভারত গ্রন্থাগারের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে ভাষণ।

১৯২৯—

জানুয়ারী ২৭	সভাপতি—কলিকাতায় আন্তর্জাতিক ধর্মমহাসম্মেলনে।
ফেব্রুয়ারী ৯	উদ্বোধন—শ্রীনিকেতনে বাৎসরিক উৎসব।

ফেব্রুয়ারী ২৬	ক্যানেডা যাত্রা—সঙ্গে অধ্যাপক টাকার, অপূর্বকুমার চন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বোম্বাই—তাজমহল হোটেলে বাসা।
মার্চ ১	নলদেরা জাহাজে।
ঐ ৮	পেনাং।
ঐ ৯	সিঙাপুর—নেমাজীর অতিথি—লাটসাহেব সোসল ক্লেমেণ্টের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ। সম্বর্ধনা ও অর্থদান—সিন্ধু বণিক সমিতি।
ঐ ১৫	হংকং।
ঐ ১৯	সাংহাই—সু-সী-মো'র অতিথি—জেনারেল চিয়াং-ফাও-চেন-এর সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ; রাত্রে প্রবাসী ভারতীয়দের নিমন্ত্রণ।
ঐ ২০	সম্বর্ধনা ও অর্ঘ উপহার—প্রবাসী শিখদের দ্বারা।
ঐ ২৫	কোবে—টোকিও।
ঐ ২৬	ইয়োকোহামা। অভ্যর্থনা—প্রবাসী সিন্ধীদের দ্বারা।
ঐ ২৮	জাপান ত্যাগ—এমপ্রেস অফ এশিয়া জাহাজে।
এপ্রিল ৬	ভিকটোরিয়া। সম্বর্ধনা—শিখ গুরুদ্বারে। বক্তৃতা: The Philosophy of Leisure—শিক্ষা সম্মেলনে।
ঐ ৭	ভাংকুভার।
ঐ ৮	দ্বিতীয় বক্তৃতা: The Principle of Literature শিক্ষা সম্মেলনে—অত্যধিক জনতা। শিখ মন্দির দর্শন ও গবর্ণর উইলিংডনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
ঐ ১৮	লস এঞ্জেলিস।
ঐ ১৯	বক্তৃতা—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায়। পাসপোর্ট আপিসে হয়রানি।
ঐ ২০	আমেরিকা ত্যাগ।
মে ৭	জাহাজে জন্মোৎসব।
ঐ ১০	ইয়োকোহামা—টোকিও ইম্পিরিয়াল হোটেলে বাসা।

এপ্রিল ১১	সম্বর্ধনা ও বক্তৃতা: The Philosophy of Leisure—জোজোজির মন্দিরে 'টোগোর-সোসাইটি'র উদ্যোগে।
ঐ ১৬	বক্তৃতা—মিস ৎসুদার বিদ্যালয়ে।
ঐ ১৭	বক্তৃতা—মিটোতে।
ঐ ১৮	সম্বর্ধনা—মারকুইস ওকুমার সভায়।
ঐ ২১	বক্তৃতা—The Philosophy of Leisure—কনকডিয়াতে।
	বক্তৃতা—On Oriental Culture and Japanese Mission—ইণ্ডো-জাপানী সমাজের সভায়।
জুন ৮	জাপান ত্যাগ।
ঐ ২১	সাইগন।
	সম্বর্ধনা—মেয়র কর্তৃক ও বক্তৃতা।
	ফরাসী গবর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
	সম্বর্ধনা—ভারতীয় বণিক-সঙ্ঘ।
	চীনাদের আর্ট মিউজিয়াম ও প্যাগোডা দর্শন…আনামীদের প্যাগোডা দর্শন…ভারতীয় চেট্টিয়ারদের হিন্দু মন্দির দর্শন…।
ঐ ২৬	সিঙাপুর।
জুলাই ৩	মাদ্রাজ।
ঐ ৫	কলিকাতা।
সেপ্টেম্বর…	বক্তৃতা: 'সাহিত্যের স্বরূপ ও সাহিত্যের বিচার'—প্রেসিডেন্সি কলেজে।
ঐ ২৬, ২৮, ২৯	অভিনয়: 'তপতী'—বিক্রমের ভূমিকায় কবি—জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে।
অক্টোবর…	প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্থ-সংগ্রহ বিশ্বভারতীকে দান।
নভেম্বর…	জুজুৎসু শিক্ষক তাকাগাকির শান্তিনিকেতনে আগমন।

১৯৩০—

জানুয়ারী ১০	বরোদা যাত্রা—সঙ্গে ধীরেন্দ্রমোহন সেন ও অমিয় চক্রবর্তী।
	আমেদাবাদ—আম্বালাল সরাভাইয়ের অতিথি।
ঐ ২৬	বরোদা—রাজ-অতিথি।
ঐ ২৭	বক্তৃতা: Man the Artist.
ঐ ৩০	আলোচনা—শিক্ষা সম্পর্কে—ট্রেনিং কলেজে।

ফেব্রুয়ারী ১০ শ্রীনিকেতনে সমবায় কর্মী সম্মেলন, সভাপতি—স্যার্ ষ্টানলি জ্যাকসন।

মার্চ ২ বিলাত যাত্রা—সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নন্দিনী, আর্যনায়কম ও ডাঃ সুহৃৎ নাথ চৌধুরী।

ঐ ২৬ মার্সেই—কাঁনের অতিথি।

মে ২ প্যারিস—চিত্র প্রদর্শনী।

ঐ ৭ জন্মোৎসব।

ঐ ১১ ইংলণ্ড।

ঐ ১৩ বাকিংহাম।

বক্তৃতা: Civilization and Progress—সেলি ওক কলেজে—উডব্রুক।

ভারতে বৃটিশ স্বৈরাচারের প্রতিবাদ।

ঐ ১৭ অক্সফোর্ড—ডাঃ হেনরি ড্রমণ্ডের অতিথি।

ঐ ১৯, ২১, ২৬ হিবার্ট বক্তৃতা: The Religion of Man—ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে—অত্যধিক জনতা।

ঐ ২৪ বক্তৃতা: কোয়েকারদের বার্ষিক সভা—লণ্ডন।

বক্তৃতা: পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার আদর্শ—বাকিংহাম।

লণ্ডনে বিড়লাদের অতিথিশালা আর্যভবনে বাসা।

ওয়েজউড বেনের সঙ্গে ভারত সম্পর্কে আলোচনা—অতুলপ্রসাদ চ্যাটার্জীর গৃহে।

জুন ৩ সম্বর্ধনা—P. E. N. ক্লাবের ভোজসভা।

ঐ ৪ চিত্র প্রদর্শনী।

ডারলিংটন হলে এলমহার্স্টের অতিথি।

জুলাই ১১ বার্লিন।

ঐ ১২ রাইখ্স্টাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও গ্যালারি মোলার চিত্রশালা দর্শন।

বক্তৃতা—বার্লিন রেডিওতে।

ঐ ১৪ অধ্যাপক আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

ঐ ১৬ গ্যালারি মোলারে রবীন্দ্রচিত্র প্রদর্শনী—ন্যাশন্যাল গ্যালারি কর্তৃক পাঁচাখনি চিত্র গ্রহণ।

জুলাই ১৭	মিউনিক। যাদুঘর ও প্লানেটোরিয়াম দর্শন। সম্বর্ধনা—টাউন হলে।
ঐ ২৩	চিত্র প্রদর্শনী—গ্যালারি ক্যাসপারি। ওবেরামেরগাঁ—Passion Play দর্শন। ফ্রাংকফুর্ট—মারবুর্গ—কোব্‌লেনজ—বক্তৃতা—অত্যধিক জনতা।
আগষ্ট···	হেলসিঙোর—সম্বর্ধনা—ছাত্রসম্মেলনে।
ঐ ৯	কোপেনহেগেন—চিত্রপ্রদর্শনী। জেনিভা—মিস স্টোরির অতিথি।
ঐ ৩০	ঢাকার দাঙ্গা সম্পর্কে পত্র প্রকাশ—সাপ্তাহিক স্পেকটেটর-এ।
সেপ্টেম্বর ১১	মসকৌ—গ্রাণ্ড হোটেলে বাসা—সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী, আর্য-নায়কম্‌, ডাঃ হ্যারি টিম্বার্স, মিস আইনস্টাইন ও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ঐ ১২	সম্বর্ধনা—সংস্কৃতি মিলন সমিতি (Voks)-তে। সম্বর্ধনা—সোভিয়েট লেখক সংঘে।
ঐ ১৪	'পায়োনিয়র্স কমিউন' পরিদর্শন।
ঐ ১৬	'কৃষিভবন' পরিদর্শন।
ঐ ১৭	চিত্র প্রদর্শনী—দি স্টেট মিউজিয়াম অফ নিউ ওয়েষ্টার্ণ আর্ট ভবনে। অভিনয় দর্শন—পিটার দি গ্রেট ও রেসারেকসন—মস্কো আর্ট থিয়েটারে। নৃত্যাভিনয় দর্শন—বিয়াডার্কা—ফার্ষ্ট স্টেট অপেরা হাউসে। 'শিশুসদন' দর্শন। বিদায় সম্বর্ধনা।
ঐ ২৫	বার্লিন—মেণ্ডেল দম্পতির অতিথি।
অক্টোবর···	নিউ ইয়র্ক; চিত্র প্রদর্শনী; সম্বর্ধনা—বালটিমোর হোটেলে; প্রেসিডেণ্ট হুভারের সঙ্গে সাক্ষাৎ—সঙ্গে বৃটিশ রাজদূত স্যার রেনল্‌ড্‌ লিণ্ডসে।

ডিসেম্বর ১ বক্তৃতা—কার্নেগী হলে।

বক্তৃতা : The First and the Last Prophet of Persia —বাহাই সম্প্রদায়ের সভা।

নৃত্যশিল্পী রুথকেণ্ট ডেনিস কর্তৃক বিশ্বভারতীর জন্ম অর্থসংগ্রহ —সে টাকা নিউইয়র্কের বেকারদের জন্ম দান।

ফিলাডেলফিয়া…চিত্র প্রদর্শনী—সিনক্লেয়ার লিউইস, হেলেন কেলার, উইল ডুরাণ্ট প্রভৃতির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ।

ঐ ২৩ ইংলণ্ড।

সম্বর্ধনা—হাইডপার্ক হোটেলে।

বার্নার্ডশ', ইয়েট্‌স ব্রাউন প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা।

গোলটেবিল বৈঠকের আমন্ত্রণ অস্বীকার।

১৯৩১—

জানুয়ারী ৩১ দেশে প্রত্যাবর্তন।

মার্চ ১৭,১৮,১৯, ২২ অভিনয় : 'নবীন'—কবির আবৃত্তি—এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে।

মে ৭ জন্মোৎসব।

প্রকাশ : 'রাশিয়ার চিঠি'।

ঐ ১৬ অভিনন্দন—য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, সভাপতি—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

জুন… দার্জিলিং।

রচনা : 'বক্‌সা দুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি সম্ভাষণ।'

জুলাই ১৭ ভূপাল—সঙ্গে ডাক্তার মহম্মদ আলি—নবাবের অতিথি।

সেপ্টেম্বর ২৪, ২৫, ২৭, ২৮ অভিনয় : গীতোৎসব ও 'শিশুতীর্থ'—উত্তর বঙ্গের বন্যায় সাহায্যের জন্ম।

ঐ ২০ 'কবি সার্বভৌম' উপাধি দান—সংস্কৃত কলেজ কর্তৃক।

ঐ ২৬ সভাপতি—হিজলি বন্দীশালায় গুলিচালনার প্রতিবাদসভা—মনুমেণ্টের পাদদেশে।

অক্টোবর ২ শান্তিনিকেতনে গান্ধিজীর জন্মদিন পালন।

প্রকাশ : 'গীতবিতান'।

দার্জিলিং।

ডিসেম্বর ২৫ রবীন্দ্র জয়ন্তী—সপ্তাহব্যাপী উৎসব।
সম্বর্ধনা—টাউন হলে।
চিত্রপ্রদর্শনী—টাউন হলে।
গীত উৎসব—য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে।
সম্বর্ধনা—সিনেট হলে ছাত্র সমাজ কর্তৃক।
অভিনয়ঃ 'শাপমোচন' জোড়াসাঁকোয় মূকাভিনয়।
অভিনয়ঃ 'নটির পূজা'—বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভূমিকায় কবি।

১৯৩২—

জানুয়ারী ৪ গান্ধিজী ও নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ—উৎসব বন্ধ—
র‍্যামসে ম্যাকডোন্যাল্ডের কাছে টেলিগ্রাম।
রচনাঃ 'প্রশ্ন'।
খড়দহে বাসাঃ স্বাধীনতা দিবসে বিবৃতি দান।

ফেব্রুয়ারী ৬ ভাষণ—শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবে।
চিত্র প্রদর্শনী—গভর্মেণ্ট আর্ট ইস্কুলে।
ডাচ কনসাল জেনারেলের সঙ্গে আধঘণ্টার অন্য প্লেনে উড়া।

এপ্রিল ১১ বিমানে পারস্য যাত্রা—সঙ্গে প্রতিমা দেবী, অমিয় চক্রবর্তী, ও কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঐ ১৩ বুশোয়ার—সম্বর্ধনা।

ঐ ১৬ সিরাজ—সম্বর্ধনা—নাগরিকদের।

ঐ ১৭ সাদীর সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

ঐ ১৯ হাফেজের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

ঐ ২৩ ইস্পাহান—পথে পার্সিপোলিশ দর্শন।

ঐ ২৭ সম্বর্ধনা—নাগরিকদের।

ঐ ২৯ তেহেরাণ।

মে ২ পারস্য-রাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ—পারস্যরাজকে কবিতা উপহার দান।

ঐ ৫ নাগরিক সম্বর্ধনা।

ঐ ৬ সারাদিন ধরে উৎসব—রাজার আদেশে।
বোগদাদ—রাজা ফৈজলের অভ্যর্থনা; নাগরিক সম্বর্ধনা।
বেদুইন শিবিরে আপ্যায়ন।

জুন ৩	বিমানে প্রত্যাবর্তন।
	নীতিন্দ্রনাথের অসুস্থতার সংবাদ—মীরা দেবীর জার্মান যাত্রা।
আগষ্ট ৬	সম্বর্ধনা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
ঐ ৭	নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যু।
	রচনা: 'পরিশেষ', 'বীথিকা', 'পুনশ্চ'।
সেপ্টেম্বর ২০	গান্ধিজীর অনশন—শান্তিনিকেতনে উপাসনায় ভাষণ।
ঐ ২২	দেশবাসীর কাছে অস্পৃশ্যতা বর্জনের আবেদন।
ঐ ২৪	বোম্বাই যাত্রা।
ঐ ২৬	পুণা। ম্যাকডোন্যাল্ডের কাছে জরুরী টেলিগ্রাম।
অক্টোবর ১	গান্ধিজীর অনশন ভঙ্গ—শয্যাপার্শ্বে কবির গান: 'জীবন যখন শুকায়ে যায়……'।
ঐ ২	মালব্যজী কর্তৃক কবির লিখিত ভাষণ পাঠ—গান্ধিজীর জন্মদিন সভা—শিবাজী মন্দিরে।
	খড়দহ।
ডিসেম্বর ২	শান্তিনিকেতনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের আগমন।
ঐ ১১	সভাপতি—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সম্বর্ধনা সভা—টাউনহলে।
ঐ ১২	জাপান কনসালের বাড়ী নিমন্ত্রণ—সারনাথের শিল্পী কেমেৎসু-নসুর সঙ্গে পরিচয়।
ঐ ১৮	দ্বারোদ্‌ঘাটন—বেংগল ষ্টোর্স, চৌরঙ্গী।
	সভাপতি—কুচবিহারের রাজমাতার শ্রাদ্ধবাসর।
ঐ ২৯	সুন্দরবন অঞ্চলে স্যার ডানিয়েল হামিলটনের গোসাবা পল্লীকেন্দ্র দর্শন।

১৯৩৩—

জানুয়ারী…	কেশোরাম কটন মিল পরিদর্শন।
ঐ ৯	শান্তিনিকেতনে পারস্যের রেজা শাহ পহ্লভী প্রেরিত অধ্যাপক আগাপুরে দাউদ।
ঐ ১০	বার্নার্ডশ'য়ের বোম্বাই আগমন ও কবির আমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ।
ঐ ১৬, ১৮, ২০	বক্তৃতা: 'মানুষের ধর্ম'—কমলা লেকচার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

জানুয়ারী ১৮ সভাপতি—রামমোহন শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্‌বোধন সভা—সিনেট হলে।

বক্তৃতা: 'শিক্ষার বিকিরণ'—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে।

মার্চ ২৯, ৩০ শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের 'শাপমোচন' অভিনয়—এম্পায়ার থিয়েটারে।

এপ্রিল ৮ মদনমোহন মালব্যের কলিকাতা আগমন ও সাক্ষাৎ।

ঐ ১৩ বিবৃতি দান—বিদেশে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারের প্রতিবাদ।

ঐ ২৩ নাটক পাঠ: 'বাঁশরী'।

ঐ ২৭ দার্জিলিং গমন।

গান্ধিজীর অনশন সংবাদে যারবেদা জেলে টেলিগ্রাম।

আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন সম্পর্কে টেলিগ্রাম।

জুন ৬ লয়ালপুরে শিখদের বিক্ষোভ—কথাকাহিনীর গুরু গোবিন্দ সম্পর্কিত কবিতার জন্য।

ঐ ১১ কবিতা আবৃত্তি—জিমখানা ক্লাবে।

ঐ ২৫ জগদানন্দ রায়ের মৃত্যু।

জুলাই ৮ শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব।

ঐ ১২ উদয়শঙ্করের শান্তিনিকেতনে আগমন ও নৃত্য প্রদর্শন।

ঐ ২৪ বিবৃতি দান—পুণা চুক্তি সম্পর্কে।

আগষ্ট ১৭ রচনা পাঠ: 'চণ্ডালিকা'।

সেপ্টেম্বর ১২ 'চণ্ডালিকা' ও 'তাসের দেশ' অভিনয়—পর পর তিন দিন—ম্যাডান থিয়েটারে।

ঐ ১৬ বক্তৃতা—ছন্দ সম্বন্ধে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ঐ ২৭ ইংরাজি কবিতা রচনা: Forward—রামমোহনের মৃত্যুতিথি উপলক্ষে।

নভেম্বর ২৩ বোম্বাই—ভিকটোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে জনসমুদ্র—স্যার দোরব টাটার অতিথি; চিত্রশিল্প-প্রদর্শনী—উন্মোচন করেন বিচারপতি স্যার মির্জা আকবর; আপ্যায়ন—ভাইস চ্যান-সেলরের ভোজসভায়।

ঐ ২৪ গবর্মেণ্ট আর্ট ইস্কুলে চিত্রপ্রদর্শনী দর্শন।

নভেম্বর ২৫ অভিনয় 'শাপমোচন'—একসেলসিয়র থিয়েটারে।

ঐ ২৬ বক্তৃতা: The Challenge of Judgement—রিগ্যাল থিয়েটারে।

ঐ ২৭ অভিনয় 'তাসের দেশ'।

ঐ ২৯ সম্বর্ধনা—পারসিক যুবসমিতি কর্তৃক—মালাবার হিলে হাতিয়া বাগানবাড়ীতে।

ডিসেম্বর বক্তৃতা: The Price of Freedom—কাওয়াসজী জাহাংগীর-হলে—(অভিনয়, বক্তৃতা ও দানে ৬৫ হাজার টাকা প্রাপ্তি)।

ঐ ৫ ওয়ালটেয়ার—বাব্‌লীর রাজপ্রাসাদে অতিথি।

ঐ ৮ আপ্যায়ন—অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রীতি সম্মেলন; বক্তৃতা: Supreme Man.

ঐ ৯ সম্বর্ধনা—ছাত্রগণ কর্তৃক সহরের বাইরে পাহাড়ের উপর।
সম্বর্ধনা—মিউনিসিপ্যালিটি ও কবি সমাজ কর্তৃক।

ঐ ১০ বক্তৃতা: I am He.

ঐ ১২ হায়দ্রাবাদ—রাজ অতিথি।
বক্তৃতা: Ideals of an Eastern University—ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ঐ ২৯ বক্তৃতা: 'ভারতপথিক রামমোহন'—রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ঐ ৩০ বক্তৃতা—নিখিল ভারত নারী সম্মেলনে।

১৯৩৪—

জানুয়ারী ৫ শান্তিনিকেতনে সরোজিনী নাইডুর আগমন।

ঐ ১০ শান্তিনিকেতনে পণ্ডিত জওহরলাল ও কমলা নেহেরুর আগমন। (ইন্দিরা নেহেরু তখন বিশ্বভারতীর ছাত্রী)

ঐ ২৩ বিহার ভূমিকম্পের সাহায্যের জন্য আবেদন।

ফেব্রুয়ারী ৫ ভূমিকম্প সম্পর্কে গান্ধিজীর অভিমতের প্রতিবাদ।

ঐ ৬ ভাষণ: 'উপেক্ষিতা পল্লী'—শ্রীনিকেতন উৎসবে (নলিনীরঞ্জন সরকারের উপস্থিতি)।।

ঐ ৮ বক্তৃতা: 'সাহিত্যতত্ত্ব'—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

	বক্তৃতা—রবীন্দ্র পরিষদে।
	ভারতী ফাউণ্টেনপেন কারখানা পরিদর্শন।
	সভাপতি—হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কমিটির জয়ন্তী উৎসব।
এপ্রিল ৭	বক্তৃতা—International Relation Club-এর উদ্যোগে সিনেট হলে।
মে ৫	সিংহল যাত্রা—সঙ্গে অভিনয়ের দল।
ঐ ৯	কলম্বো—জাহাজঘাটে লোকারণ্য।
ঐ ১০	বক্তৃতা : 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ'—রোটারি ক্লাবে।
ঐ ১১-১৮	চিত্রপ্রদর্শনী ও বক্তৃতা…অভিনয় 'শাপমোচন'।
ঐ ১৯	পানাদুরা।
ঐ ২০	উদ্‌বোধন—শ্রীপল্লী ও কাণ্ডি-নৃত্য দর্শন।
ঐ ২২	গ্যালে…'শাপমোচন' অভিনয়।
	মাতারু…মুখোস-নাচ দর্শন।
ঐ ২৬	কলম্বো…'শাপমোচন' অভিনয়—পর পর তিনদিন।
জুন ৩	ক্যাণ্ডি…নৃত্য দর্শন।
	রচনা : 'চার অধ্যায়'।
	অনুরাধাপুর।
	জাফ্‌না…'শাপমোচন' অভিনয়—পর পর তিনদিন…বক্তৃতা।
ঐ ১৫	ধনুষ্কোটি।
ঐ ২৮	শান্তিনিকেতন।
জুলাই ১৫	'চার অধ্যায়' পাঠ—কলিকাতায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়ীতে।
ঐ ১৬	বক্তৃতা—'সাহিত্যের তাৎপর্য'—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
	গান্ধিজীর কলিকাতা আগমন ও সাক্ষাৎ।
	'বর্ষামঙ্গল' উৎসব—হলকর্ষণ—বৃক্ষ রোপণ—অভিনয়—নটরাজের ভূমিকায় কবি।
আগষ্ট ৩১	শান্তিনিকেতনে সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খাঁয়ের আগমন ও সম্বর্ধনা (গোফুর খাঁয়ের পুত্র তখন কলাভবনের ছাত্র)।
	পত্র রচনা—অধ্যাপক গিলবার্ট মারের উদ্দেশে।

সেপ্টেম্বর…	উদ্বোধন—বাসন্তী কটন মিল্‌স্।
অক্টোবর ২১	মাদ্রাজ—থিওজফিক্যাল সোসাইটির অতিথি।
ঐ ২২	সম্বর্ধনা—মাদ্রাজ কর্পোরেশন কর্তৃক মানপত্র দান।
ঐ ২৩	বক্তৃতা—ছাত্র সমাজের সভা—মিড্‌ল্যাণ্ড থিয়েটার হলে—ছাত্রদের এক হাজার টাকা দান।
	সম্বর্ধনা—ভারতীয় নারী সমাজ ও কুইন মেরী কলেজের ছাত্রীগণ কর্তৃক।
ঐ ২৬	চিত্র ও শিল্প প্রদর্শনীর উন্মোচন।
ঐ ২৭-৩১	'শাপমোচন' অভিনয়।
	ওয়ালটেয়ার।
নভেম্বর ১১	শান্তিনিকেতন।
ঐ ২৯	কাশী।
ডিসেম্বর ২	মণ্টেসরি ইস্কুল উন্মোচন—রাজঘাট।
	শান্তিনিকেতনে পৌষ-উৎসব—রচনা : The Son of Man.
ঐ ২৭	উদ্বোধন—প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন।
	বক্তৃতা—'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ'—টাউন হলে।
	উদ্বোধন—নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন—সিনেট হলে।

১৯৩৫—

জানুয়ারী ৫	শান্তিনিকেতনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সদস্যগণ।
	শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিল্পী গোপীনাথ ও রাগিনী দেবী—নৃত্য প্রদর্শন।
ফেব্রুয়ারী ৬	শান্তিনিকেতনে লাট সাহেব স্যার জন এণ্ডারসন।
ঐ ৮	ভাষণ—কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে—'সাহিত্যাচার্য' উপাধি প্রাপ্তি।
ঐ ৯	এলাহাবাদ…সম্বর্ধনা—মহিলা সভা।
ঐ ১০	আপ্যায়ন—বাঙালীর উদ্যান সম্মেলনী।
ঐ ১১	সভাপতি—আনি বেশান্ত ইস্কুলে বার্ষিক সভা।
ঐ ১২	বক্তৃতা—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে—সিনেট হলে—ছাত্রদের টাকার তোড়া উপহার দান।

ফেব্রুয়ারী ১৪	লাহোর—ধনীরাম ভাল্লার অতিথি।
ঐ ১৫	উদ্বোধন—পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলন।
ঐ ১৬	জাতপাত-তোড়ক মণ্ডলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা।
ঐ ১৭	বক্তৃতা—পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনের সমাপ্তি।
	সম্বর্ধনা—শিখ গুরুদ্বারে…এংলো বেদিক কলেজ পরিদর্শন।
ঐ ১৯	সম্বর্ধনা—বাঙালী সমাজ কর্তৃক।
	বৃক্ষরোপণ—ভাল্লার গৃহ প্রাঙ্গণে।
	বক্তৃতা—সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে—সাংবাদিক সম্মেলনে।
ঐ ২৭	লখনৌ—নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের অতিথি।
	বক্তৃতা—দু'দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে।
	শ্রীকৃষ্ণ রতনজীর সংগীত শ্রবণ…অসুস্থতা।
মার্চ ৪	কলিকাতা।
ঐ ২৬	শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক কাজি আবদুল ওদুদ।
মে ৭	জন্মোৎসব—'শ্যামলীতে' গৃহপ্রবেশ।
	প্রকাশ : 'শেষ সপ্তক' ও কৃষ্ণ কৃপালনীর সম্পাদনায় 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'।
	সম্বর্ধনা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক।
	সভাপতি—বুদ্ধের জন্মোৎসব—ধর্মরাজিক চৈত্য বিহারে।
	গঙ্গাবক্ষে—পদ্মাবোটে—উত্তর পাড়া, শ্রীরামপুর, চন্দননগর।
জুলাই…	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু।
আগষ্ট…	শান্তিনিকেতনে—আলাউদ্দীন খাঁ ও আকবর আলি খাঁ।
ঐ ২৪	হৈ-হৈ সঙ্ঘ কর্তৃক শান্তিনিকেতনে 'ভরসা মঙ্গল' অনুষ্ঠান।
সেপ্টেম্বর ২৮	শান্তিনিকেতনে বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আগমন ও সঙ্গীত সম্পর্কে বক্তৃতা।
নভেম্বর ১৬	শান্তিনিকেতনে Y. W. C. A.-এর আমেরিকা শাখার সেক্রেটারী মিস ইথেল কাটলারের আগমন।
ঐ ২৯	নবান্ন উৎসব।
ঐ ৩০	শান্তিনিকেতনে কবি নোগুচির আগমন।
ডিসেম্বর ১	রচনা—আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সম্বর্ধনা কবিতা।
	অভিনয় : 'অরূপরতন'—ঠাকুরদার ভূমিকায় কবি।

	অসুস্থতা।
	শান্তিনিকেতনে মিস্ মার্গারেট স্যাংগার।
ডিসেম্বর ২৭	কংগ্রেস জয়ন্তী উৎসবে বাণী প্রেরণ।

১৯৩৬—

ফেব্রুয়ারী ৮	ভাষণ: 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সঙ্গীতের দান'—শিক্ষা সপ্তাহের অধিবেশনে।
	বক্তৃতা: 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ'—শিক্ষা সপ্তাহের সমাপ্তি।
	শান্তিনিকেতনে—আলিগড়ের অধ্যাপক মহম্মদ হবীবের বক্তৃতা।
মার্চ ৮	কমলা নেহেরুর মৃত্যুতে উপাসনা।
ঐ ১১, ১২, ১৩	'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় নিউ এম্পায়ারে।
ঐ ১৬, ১৭	পাটনা…'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়।
ঐ ১৭	সম্বর্ধনা—নাগরিকগণ কর্তৃক হুইলার হলে—টাকার তোড়া উপহার।
ঐ ১৯	এলাহাবাদ…'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়।
ঐ ২২-২৩	লাহোর…'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়।
ঐ ২৬-২৭	দিল্লী…'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়—রিগ্যাল থিয়েটারে।
	সম্বর্ধনা—কুইন্স্ গার্ডেনে।
	গান্ধিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ—গান্ধিজীর ষাট হাজার টাকার চেক প্রদান।
এপ্রিল…	শান্তিনিকেতন।
জুলাই ১৫	সভাপতি—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিরোধী সভা—টাউন হলে।
ঐ ১৯	'রবিবাসরের' সভায় উপস্থিতি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে।
ঐ ২৯	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'সাহিত্যাচার্য' উপাধি লাভ।
অক্টোবর ১০, ১১	'পরিশোধ' অভিনয়—আশুতোষ কলেজ হলে।
ঐ ১১	ভাষণ—শরৎচন্দ্রের জয়ন্তী সভায়

১৯৩৭—

ফেব্রুয়ারী ১৭	সমাবর্তন ভাষণ—বাংলা ভাষায়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে
ঐ ২১	উদ্বোধন—বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—চন্দননগরে।
মার্চ ৩	ভাষণ—রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী ধর্মমহাসম্মেলনে।

মার্চ ৮	শান্তিনিকেতনে স্যার জন রাসেল।
ঐ ১৪	শান্তিনিকেতনে রবিবাসরের অধিবেশন।
এপ্রিল ১৪	নববর্ষে চীনাভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন—তাওচি-তাও-এর উইলে দশ হাজার টাকা ও অধ্যাপক তানয়ুনশানের বিশহাজার টাকা সংগ্রহ।
ঐ ২৯	আলমোড়া যাত্রা—সঙ্গে পুত্র, পুত্রবধূ, নন্দিনী, নন্দিতা ও অনিলকুমার চন্দ—সেণ্ট মার্কাস গৃহে বাসা। রচনা: 'বিশ্বপরিচয়'।
জুন ২৭	সম্বর্ধনা—রাণীক্ষেতের ছাত্রগণ কর্তৃক।
ঐ ২৯	
জুলাই ২৬	পাতিসর যাত্রা—সঙ্গে সুধাকান্ত চৌধুরী।
আগষ্ট ২	সভাপতি—আন্দামানে বন্দীদের অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে সভা—টাউন হলে।
ঐ ১৪	শান্তিনিকেতনে আন্দামান দিবস পালন।
সেপ্টেম্বর ৪, ৫	'বর্ষামঙ্গল' উৎসব—কলিকাতা ছায়া সিনেমা হলে।
ঐ ১০	শান্তিনিকেতনে অসুস্থতা, দু'দিন হতচৈতন্য—ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসা। রচনা: 'প্রান্তিক'।
অক্টোবর ১২	কলিকাতা প্রশান্ত মহলানবিশের বেলঘরিয়ার বাড়ীতে বাসা—গান্ধিজী, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল, কৃপালনী, সরোজিনী নাইডু—প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সঙ্গীত করা সম্পর্কে অভিমত প্রদান।
নভেম্বর ৪	শান্তিনিকেতনে। আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু।
ডিসেম্বর…	ভাষণ প্রেরণ, New Education Fellowship সম্মেলনে। শান্তিনিকেতনে আগমন—ফিনল্যাণ্ডের অধ্যক্ষ রেকটর ল্যাভরিণ, জিলিয়াকাস্, ইংলণ্ডের সল্টার ডেভিস্, জেনেভার অধ্যাপক পিয়ার বোভেট প্রভৃতি শিক্ষাসম্মেলনের বিদেশী সদস্যগণ। শান্তিনিকেতনে লর্ড লোথিয়ান।

১৯৩৮—

জানুয়ারী ১৬ 'হিন্দিভবনের' ভিত্তিস্থাপন, ভাগীরথ কানোড়িয়ার ১৬০০০৲ টাকা দান।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

ফেব্রুয়ারী ১৬ শান্তিনিকেতনে লাটসাহেব লর্ড ব্রাবোর্ণ।

মার্চ ১৮, ১৯, ২০ 'চণ্ডালিকা' অভিনয়, কলিকাতার ছায়া সিনেমা হলে—সুভাষচন্দ্রের অভিনয় দর্শন।

ঐ ২২ গান্ধিজীর সঙ্গে কলিকাতায় সাক্ষাৎ।

এপ্রিল ২৫ কালিম্পং যাত্রা।

মে ৭ রেডিওতে ব্রডকাষ্টিং : 'জন্মদিন' কবিতা।
রচনা : 'বাংলাভাষা পরিচয়'।

ঐ ২১ মংপু—মৈত্রেয়ী দেবীর অতিথি।

জুন ৮ সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষের সাক্ষাৎ করা।

ঐ ২৫ কবিতা লিখে পাঠান—বঙ্কিম শতবার্ষিকী উৎসবে।

জুলাই ৫ কলিকাতা।

ঐ ৮ কবিতা রচনা—অধ্যাপক মৌলানা জিয়াউদ্দিনের মৃত্যুতে।

আগষ্ট ১৯ কবিতা রচনা—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে।

সেপ্টেম্বর ১ কবি নেগুচির পত্রের উত্তর দান।
কবিতা রচনা—বিদ্যাসাগর সম্পর্কে।

ঐ ২১ ভাষণ দান—গান্ধিজী সম্পর্কে—আশ্রমে।

অক্টোবর ১৫ পত্র লেখা—মিউনিক্ প্যাক্ট্ সম্পর্কে—অধ্যাপক লেসনিকে।

ঐ ৩০ প্রাদেশিক স্কাউটদের ক্রীড়া-নৈপুণ্য দর্শন।

নভেম্বর ১৭ রচনা—কেশবচন্দ্র সেনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে।

ঐ ১৮ ভাষণ দান—কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু উপলক্ষে।

ডিসেম্বর ৮ কলিকাতায় শ্রীনিকেতন শিল্পভবনের উদ্বোধন—কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর দ্বারোদ্‌ঘাটন, (অসুস্থতার জন্য কবির অনুপস্থিতি, ভাষণ পাঠ করেন রথীন্দ্রনাথ)।

ঐ ১১ শান্তিনিকেতনে হ্যাভেল স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৯—

জানুয়ারী ৯	শান্তিনিকেতনে ত্রিপুরার মহারাজা।
	'চণ্ডালিকা' অভিনয়…মহারাজার ২০,০০০৲ টাকা দান।
ঐ ২১	শান্তিনিকেতনে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র।
ঐ ২১	হিন্দিভবনের দ্বারোদ্ঘাটন—জওহরলাল কর্তৃক।
	শান্তিনিকেতনে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ।
ফেব্রুয়ারী ৬	শান্তিনিকেতনে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ—শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে।
	শান্তিনিকেতনে কলিকাতার লর্ড বিশপ।
ঐ ৮	কলিকাতা…অভিনয় দর্শন—'তাসের দেশ', শ্রী সিনেমা হলে।
ঐ ১৪	শান্তিনিকেতনে আওয়াগড়ের রাজা সূর্যপাল সিংহ।
মার্চ ১৩	শান্তিনিকেতনে মালয়ালমের কবি ভাল্লথাল।
ঐ ১৭	শান্তিনিকেতনে শিক্ষা কমিশনার জন সার্জেণ্ট।
	ত্রিপুরী কংগ্রেস সম্পর্কে পত্রালাপ।
এপ্রিল ১	রচনা—ক্যানেডায় Empire Day উপলক্ষে ব্রডকাষ্টিং করার জন্য।
ঐ ১৫	চা-চক্রের উদ্বোধন।
ঐ ১৭	পাইকপাড়ায় নববর্ষ উৎসবে উপস্থিতি।
ঐ ১৯	পুরী—সার্কেট হাউসে সরকারের অতিথি।
মে ৭	জন্মোৎসব—বিশ্বনাথ দাসের উদ্যোগে গবর্মেণ্ট পার্কে।
ঐ ১৭	মংপু—মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথি।
ঐ ২৯	অটোয়া রেডিও স্টেশন হতে কবির বাণী ব্রডকাষ্টিং।
	রচনা : 'দেশনায়ক'—সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ উপলক্ষে।
জুন ১৭	কলিকাতা।
জুলাই ১৪	বক্তৃতা—শ্রীনিকেতনে কর্মীসম্মেলন।
আগষ্ট…	শান্তিনিকেতনে আওয়াগড়ের মহারাজা সূর্যপাল সিংহ।
	রাজার ১, ২৭, ১০১ টাকা দান
	বৃক্ষরোপণ উৎসব—হাংগেরিয়ান শিল্পী মিসেস ব্রুণার কর্তৃক আনীত বোধিদ্রুমের চারা রোপণ।
ঐ ১৮	কলিকাতা…'মহাজাতি সদনের' ভিত্তিস্থাপনা।

আগষ্ট ১৯ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে জওহরলালের আগমন।
ঐ ২৯ হলকর্ষণ উৎসব—শ্রীনিকেতনে।
সেপ্টেম্বর ১২ মংপু—মৈত্রেয়ী দেবীর অতিথি।
অক্টোবর ২ রচনা—গান্ধিজীর জন্মজয়ন্তী গ্রন্থের জন্য।
নভেম্বর ১১ শান্তিনিকেতন।
ডিসেম্বর ১৫ কলিকাতা—প্রদর্শনী উন্মোচন—খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনী—কর্পোরেশন কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে।

হাওড়া স্টেশনে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ করা।
মেদিনীপুর—সঙ্গে যদুনাথ সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ রঘুবীর সিং, ক্ষিতিমোহন সেন, অমিয় চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস।
সম্বর্ধনা—মেদিনীপুর স্টেশনে।
ঐ ১৬ দ্বারোদ্‌ঘাটন—বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির।
ঐ ১৭ সম্বর্ধনা—পৌরসভা, জেলাবোর্ড ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা কর্তৃক।
ঐ ২০ সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেবার জন্য গান্ধিজীর কাছে টেলিগ্রাম।
ঐ ২১ কলাভবনে শিল্পী জু-পিওনের সম্বর্ধনা।
ঐ ২৫ কবিতা রচনা: 'বড়দিন' ও পৌষ উৎসবে ভাষণ দান।
ঐ ৩০ নন্দিনীর বিবাহ।

১৯৪০—

জানুয়ারী ১৭ শান্তিনিকেতনে চীনা পণ্ডিত তাই-সু।
ঐ ১৮ ভাষণ—মাঘোৎসবে।
ফেব্রুয়ারী ৪ পত্রলেখা—National Council for Civil Liberties-এর প্রেসিডেন্ট এইচ্-ডবলু-নেভিনসনের নিকট।
ঐ ৬ শ্রীনিকেতনে বার্ষিক উৎসব—প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক।
ঐ ১৭ শান্তিনিকেতনে গান্ধিজী।
ঐ ১৮ গান্ধিজীর 'চণ্ডালিকা' অভিনয় দর্শন।

ফেব্রুয়ারী ২১	প্রদর্শনীর উদ্বোধন—সিউড়ি শিল্প প্রদর্শনী—অত্যধিক জনতা।
মার্চ ২	দ্বারোদ্‌ঘাটন—বাঁকুড়া প্রদর্শনী।
	ভিত্তিস্থাপনা—প্রসূতিসদন।
	সম্বর্ধনা।
এপ্রিল ৫	কলিকাতায় নার্সিং হোমে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মৃত্যু।
ঐ ১৯	দ্বারোন্মোচন—কলিকাতা বিলডার্স ষ্টোরস লিমিটেডের ট্রাস্ট হাউস।
ঐ ২১	মংপু—মৈত্রেয়ী দেবীর অতিথি।
মে ৮	সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু।
	কালিম্পং।
ঐ ১২	কালীমোহন ঘোষের মৃত্যু সংবাদ।
জুন ১৫	প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কাছে টেলিগ্রাম—বিশ্বশান্তি কামনা।
ঐ ২৯	কলিকাতা···ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের সাক্ষাৎ করা।
জুলাই ৩	শান্তিনিকেতন।
ঐ ২৪	বোলপুর শহরে টেলিফোন উন্মোচন।
	প্রকাশ: 'সানাই'।
আগষ্ট ৭	শান্তিনিকেতনে স্যার মরিস গোয়ার, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও বিচারপতি হেণ্ডারসন, অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ডি-লিট উপাধি দান, কবির ভাষণ—সংস্কৃত ভাষায়।
	সন্ধ্যায় 'শাপমোচন' অভিনয়।
ঐ ১০	ভাষণ—তুলসীদাসের মৃত্যুতিথি বাসরে।
সেপ্টেম্বর ১৭	কলিকাতা।
ঐ ১৯	কালিম্পং।
ঐ ২৬	অসুস্থতা।
ঐ ২৯	কলিকাতা।
অক্টোবর ১	গান্ধিজীর শুভেচ্ছা নিয়ে মহাদেব দেশাইয়ের আগমন।
নভেম্বর ২	কবিতা রচনা—Blind Relief Camp-এর জন্য লর্ড বিশপের অনুরোধে।
ঐ ১৮	শান্তিনিকেতন।
	রচনা: 'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্য'।

ডিসেম্বর ৯ শান্তিনিকেতনে চীনা শুভেচ্ছা মিশন—তাও-চি-তাও প্রভৃতি।
ঐ ২৪ কবিতা রচনা : 'প্রচ্ছন্ন পত্র'।

১৯৪১—

ফেব্রুয়ারী-মার্চ···রচনা : 'গল্পসল্প'।
এপ্রিল··· প্রকাশ : 'জন্মদিন'।
মে ৭ জন্মোৎসব—ভাষণ : 'সভ্যতার সঙ্কট'।
অভিনয় দর্শন—'বশীকরণ'।
ঐ ১৩ ত্রিপুরা রাজদরবার কর্তৃক 'ভারতভাস্কর' উপাধি দান।
জুন ৪ মিস্ রাথবোনের খোলা চিঠির জবাবে বিবৃতি দান।
কবিরাজী চিকিৎসা—কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ।
জুলাই··· স্বাস্থ্যপরীক্ষা—ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী, ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ দত্ত ও ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায়।
ঐ ২৫ বিশেষ সেলুনে কলিকাতা আগমন।
ঐ ৩০ অস্ত্রোপচার—ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
আগষ্ট ৭ মহাপ্রয়াণ—রাখীপূর্ণিমা বেলা ১২।১০ মিনিট।

রচনা-পঞ্জী

১৮৭৮—কবি কাহিনী (কাব্য)
১৮৮০—বনফুল (কাব্যোপন্যাস)
১৮৮১—বাল্মীকি প্রতিভা (গীতিনাট্য)
ভগ্ন হৃদয় (গীতিকাব্য)
রুদ্রচণ্ড (নাটিকা)
য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (পত্র প্রবন্ধ)
১৮৮২—সন্ধ্যা সংগীত (কবিতা)
কাল মৃগয়া (গীতিনাট্য)
১৮৮৩—বৌঠাকুরাণীর হাট (উপন্যাস)
প্রভাত সংগীত (কবিতা)
বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)
১৮৮৪—ছবি ও গান (কবিতা)
প্রকৃতির প্রতিশোধ (নাট্যকাব্য)
নলিনী (নাটক)
শৈশব সংগীত (কবিতা)
ভানু সিংহের পদাবলী (কবিতা)
১৮৮৫—রামমোহন রায় (প্রবন্ধ)
আলোচনা (প্রবন্ধ)
রবিচ্ছায়া (গান)
১৮৮৬—কড়ি ও কোমল (কবিতা)
১৮৮৭—রাজর্ষি (উপন্যাস)
চিঠিপত্র (পত্র প্রবন্ধ)
১৮৮৮—সমালোচনা (প্রবন্ধ)
মায়ার খেলা (গীতিনাট্য)
১৮৮৯—রাজা ও রাণী (নাটক)
১৮৯০—বিসর্জন (নাটক)
মন্ত্রী অভিষেক (প্রবন্ধ)
মানসী (কবিতা)
১৮৯১—য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী ১ম খণ্ড (ভ্রমণ-প্রবন্ধ)
১৮৯২—চিত্রাঙ্গদা (নাট্য কাব্য)
গোড়ায় গলদ (প্রহসন)
১৮৯৩—গানের বই ও বাল্মীকি প্রতিভা
য়ুরোপ যাত্রীর পত্র ২য় খণ্ড
১৮৯৪—সোণার তরী (কবিতা)
ছোট গল্প
চিত্রাঙ্গদা ও বিদায় অভিশাপ (নাট্য কাব্য)
১৮৯৫—বিচিত্র গল্প ১ম ও ২য় খণ্ড
কথা চতুষ্টয় (গল্প)
গল্প সপ্তক
ছেলে-ভুলানো ছড়া
১৮৯৬—নদী (কবিতা)
চিত্রা (ঐ)
সংস্কৃত শিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ
কাব্য গ্রন্থাবলী (মালিনী নাটক ও চৈতালী কবিতাগুচ্ছ সহ)
১৮৯৭—বৈকুণ্ঠের খাতা (প্রহসন)
১৮৯৮—পঞ্চভূত (প্রবন্ধ)
১৮৯৯—কণিকা (কবিতা)
১৯০০—কথা (কবিতা)
কাহিনী (ঐ)
কল্পনা (ঐ)
ক্ষণিকা (ঐ)
ব্রহ্মোপনিষদ (ধর্মকথা)
গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড
১৯০১—ব্রহ্মমন্ত্র (ধর্মকথা)
গল্প (গল্পগুচ্ছের ২য় খণ্ড)
নৈবেদ্য (কবিতা)

উপনিষদ ব্রহ্ম (ধর্মকথা)
বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা
১৯০৩—চোখের বালি (উপন্যাস)
কাব্যগ্রন্থ ১-৯ খণ্ড (স্মরণ ও শিশু কবিতা সহ)
কর্মফল (গল্প)
১৯০৪—ইংরাজি সোপান, ১ম খণ্ড (পাঠ্যপুস্তক)
স্বদেশী সমাজ (প্রবন্ধ)
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (নষ্টনীড় ও চিরকুমার সভা সহ)
শিবাজী উৎসব
১৯০৫—আত্মশক্তি (প্রবন্ধ)
বাউল (গান)
স্বদেশ (কবিতা)
বিজয়া সম্মেলন (বক্তৃতা)
১৯০৬—ভারতবর্ষ (প্রবন্ধ)
রাজভক্তি (ঐ)
দেশনায়ক (ঐ)
ইংরাজি সোপান ২য় ভাগ (পাঠ্যপুস্তক)
খেয়া (কবিতা)
নৌকাডুবি (উপন্যাস)
১৯০৭—বিচিত্র প্রবন্ধ
চরিত্রপূজা (প্রবন্ধ)
প্রাচীন সাহিত্য (ঐ)
লোক সাহিত্য (ঐ)
সাহিত্য (ঐ)
আধুনিক সাহিত্য (ঐ)
হাস্য কৌতুক
ব্যঙ্গ কৌতুক
১৯০৮—প্রজাপতির নির্বন্ধ (নাটক)
সভাপতির অভিভাষণ (পাবনা সম্মেলনী)

প্রহসন (বৈকুণ্ঠের খাতা ও গোড়ায় গলদ একত্রে)
পথ ও পাথেয় (প্রবন্ধ)
রাজা প্রজা (ঐ)
সমূহ (ঐ)
স্বদেশ (ঐ)
সমাজ (ঐ)
কথা ও কাহিনী (কবিতা—পুনর্মুদ্রণ)
গান
শারদোৎসব (নাটক)
শিক্ষা (প্রবন্ধ)
মুকুট (নাটিকা)
১৯০৯—ব্রহ্মসংগীত (গান)
শান্তিনিকেতন (প্রবন্ধ) ১—৮ ভাগ
ধর্ম (প্রবন্ধ)
শব্দতত্ত্ব
চয়নিকা (কবিতাসংগ্রহ)
গান
ইংরাজি পাঠ (পাঠ্যপুস্তক)
ইংরাজি শ্রুতি শিক্ষা (ঐ)
ছুটির পড়া
প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)
বিদ্যাসাগর চরিত (প্রবন্ধ)
শিশু (পুনর্মুদ্রণ)
১৯১০—ব্রহ্মসংগীত
শান্তিনিকেতন (প্রবন্ধ) ৯—১১ ভাগ
রাজা (নাটক)
গোরা (উপন্যাস)
গীতাঞ্জলি (কবিতা ও গান)
১৯১১—শান্তিনিকেতন (প্রবন্ধ) ১২—১৩ ভাগ
আটটি গল্প

১৯১২—ডাকঘর (নাটক)
ধর্মশিক্ষা (প্রবন্ধ)
ধর্মের অধিকার (ঐ)
মালিনী (নাটক)
চৈতালি (কবিতা—পুনর্মুদ্রণ)
বিদায় অভিশাপ (নাট্য-কাব্য—পুনর্মুদ্রণ)
জীবনস্মৃতি (আত্মজীবনী)
ছিন্নপত্র (পত্রপ্রবন্ধ)
অচলায়তন (নাটক)
পাঠ-সঞ্চয় (পাঠ্যপুস্তক)
গল্প চারিটি
১৯১৪—স্মরণ (কবিতা—পুনর্মুদ্রণ)
উৎসর্গ (ঐ)
গীতিমাল্য (ঐ)
গীতালি (ঐ)
ধর্মসংগীত
১৯১৫—শান্তিনিকেতন, ১৪শ ভাগ
বিচিত্র পাঠ
কাব্য গ্রন্থ (কবিতা ও নাটক সংগ্রহ, দশ খণ্ড)
১৯১৬—শান্তিনিকেতন (প্রবন্ধ) ১৫—১৭শ ভাগ
ফাল্গুনী (নাটক)
ঘরে বাইরে (উপন্যাস)
সঞ্চয় (প্রবন্ধ)
পরিচয় (ঐ)
বলাকা (কবিতা)
চতুরঙ্গ (উপন্যাস)
গল্পসপ্তক
১৯১৭—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (প্রবন্ধ)
অনুবাদ চর্চা (পাঠ্য পুস্তক)
১৯১৮—গুরু (নাটক)
পলাতকা (কবিতা)
১৯১৯—জাপান যাত্রী (পত্র প্রবন্ধ)
১৯২০—অরূপরতন (নাটক)
পয়লা নম্বর (গল্প)
১৯২১—ঋণশোধ (নাটক)
বর্ষামঙ্গল (গীতি নাট্য)
শিক্ষার মিলন (প্রবন্ধ)
সত্যের আহ্বান (প্রবন্ধ)
১৯২২—শিশু ভোলানাথ (কবিতা)
মুক্তধারা (নাটক)
লিপিকা (কথিকা)
১৯২৩—বসন্ত (গীতি নাট্য)
১৯২৫—পূরবী (কবিতা)
শেষ বর্ষণ (গীতি নাট্য)
প্রবাহিনী (গান)
গীতি চর্চা (ঐ)
গৃহ প্রবেশ (নাটক)
সঙ্কলন (প্রবন্ধ সংগ্রহ)
১৯২৬—আচার্যের অভিভাষণ
চিরকুমার সভা (নাটক)
শোধবোধ (ঐ)
নটীর পূজা (ঐ)
রক্ত করবী (ঐ)
ঋতু উৎসব (নাট্য সংগ্রহ)
১৯২৭—লেখন (কবিতা)
ঋতুরঙ্গ (গীতি নাট্য)
১৯২৮—শেষরক্ষা (নাটক)
পালি প্রকৃতি (শ্রীনিকেতনে বার্ষিক উৎসবের অভিভাষণ)
১৯২৯—সমবায়নীতি (কো-অপারেটিভ কনফারেন্সের অভিভাষণ)
যাত্রী (পত্রাবলী)
পরিত্রাণ (নাটক)
তপতী (ঐ)
যোগাযোগ (উপন্যাস)
শেষের কবিতা (ঐ)
মহুয়া (কবিতা)

১৯৩০—ভানুসিংহের পদাবলী
ইংরেজি সহজ শিক্ষা, ১ ও ২
সহজ পাঠ ১ ও ২ ভাগ
পাঠ পরিচয় ২—৪ ভাগ
১৯৩১—নবীন (গীতি নাট্য)
রাশিয়ার চিঠি
শীতোৎসব (গান)
বনবাণী (কবিতা)
গীত বিজ্ঞান ১ ও ২ খণ্ড
(গান সংগ্রহ)
সঞ্চয়িতা (কবিতা সংগ্রহ)
শাপ-মোচন (কথিকা ও গান)
প্রতিভাষণ (জয়ন্তী উৎসবে
ছাত্রসভায় কবির অভিভাষণ)
১৯৩২—দেশের কাজ (প্রবন্ধ)
চৌঠা আশ্বিন (ঐ)
মহাত্মাজীর শেষব্রত (ঐ)
গীত-বিতান (গান সংগ্রহ)
কালের যাত্রা (নাটক)
পরিশেষ (কবিতা)
পুনশ্চ (গদ্য কবিতা)
Mahatmaji & The
Depressed Humanity
(ভাষণ)
১৯৩৩—দুই বোন (উপন্যাস)
চণ্ডালিকা (নাটিকা)
তাসের দেশ (ঐ)
বাঁশরী (ঐ)
বিচিত্রিতা (কবিতা)
বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ (কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা)
শিক্ষার বিকিরণ (ঐ)
মানুষের ধর্ম (ঐ কমলা
লেকচার্স)
ভারত পথিক রামমোহন রায়
(বক্তৃতা)

১৯৩৪—মালঞ্চ (উপন্যাস)
চার অধ্যায় (ঐ)
শ্রাবণ গাথা (গীতি নাট্য)
শ্রীভবন সম্বন্ধে অমর' আদর্শ
(প্রবন্ধ)
১৯৩৫—শেষ সপ্তক (গদ্য কবিতা)
বীথিকা (কবিতা)
সুর ও সঙ্গতি (পত্র প্রবন্ধ)
শান্তিনিকেতন ২ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ)
১৯৩৬—শিক্ষার সাঙ্গীকরণ (প্রবন্ধ)
ছন্দ (ঐ)
শিক্ষার ধারা (ঐ)
সাহিত্যের পথে (ঐ)
প্রাক্কনী (অভিভাষণ)
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা
পত্রপুট (কবিতা)
শ্যামলী (গদ্য কবিতা)
জাপানে পারস্যে (পত্রপ্রবন্ধ)
১৯৩৭—খাপছাড়া (ছড়া)
কালান্তর (প্রবন্ধ)
সে (গল্প)
ছড়ার ছবি (কবিতা)
বিশ্বপরিচয় (বিজ্ঞান
আলোচনা)
১৯৩৮—প্রান্তিক (কবিতা)
সেঁজুতি (ঐ)
চণ্ডালিকা (নৃত্যনাট্য)
পথ ও পথের প্রান্তে
(পত্রসাহিত্য)
পত্রধারা ১—৩ খণ্ড
অভিভাষণ (শ্রীনিকেতন ও
শিল্পভাণ্ডার উদ্বোধনী বক্তৃতা)
বাংলাভাষা-পরিচয়
(আলোচনা)
১৯৩৯—প্রহাসিনী (কবিতা)
আকাশ প্রদীপ (ঐ)

শ্যামা (নৃত্য নাট্য)
পথের সঞ্চয় (চিঠিপত্র)
মহাজাতিসদন (মহাজাতি-সদনের ভিত্তিস্থাপন কালে প্রদত্ত বক্তৃতা)
রবীন্দ্রনাথের বাণী (মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর বাণীমন্দিরে অভিভাষণ)
অন্তর্দেবতা (শান্তিনিকেতন বার্ষিক উৎসবে অভিভাষণ)
প্রসাদ

১৯৪০—নবজাতক (কবিতা)
সানাই (ঐ)
রোগশয্যায় (ঐ)
চিত্রলিপি (ছবি সংগ্রহ)
তিন সঙ্গী (গল্প)
ছেলেবেলা (আত্মজীবনী)
আরোগ্য (প্রবন্ধ)
আদর্শ প্রশ্ন

১৯৪১—আরোগ্য (কবিতা)
জন্মদিনে (ঐ)
গল্পসল্প (গল্প ও কবিতা)
সভ্যতার সঙ্কট (অভিভাষণ)
আশ্রমের রূপ ও বিকাশ (প্রবন্ধ)

কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত :

১৯৪১—ছড়া
শেষলেখা

১৯৪২—চিঠিপত্র ৩ খণ্ড

১৯৪৩—আত্মপরিচয় (প্রবন্ধ)
সাহিত্যের স্বরূপ (ঐ)

১৯৪৫—স্ফুলিঙ্গ (কবিতা)
রবীন্দ্র রচনাবলী—কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের সঙ্কলন—২৮ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত গ্রন্থ :

পদরত্নাবলী—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সহযোগে মহাজন পদাবলীর সংগ্রহ—বৈশাখ ১২৯২

সংস্কৃত প্রবেশ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত
১ম ভাগ ১৩ জুলাই ১৯০৪
২য় „ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
৩য় „ ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯০৬

শিক্ষক—১ম ভাগ ১৫ জুলাই ১৯০৪

সংক্ষিপ্তম্ বাল্মীকীয় রামায়ণম্—রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যকৃত ১৯:৫

কুরুপাণ্ডব—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

বাংলা কাব্য পরিচয়—১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র :

সাধনা—৪র্থ বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩০১—কার্তিক ১৩০২

ভারতী—২২শ বর্ষ, ১৩০৫

ভাণ্ডার—১ম বর্ষ, বৈশাখ, চৈত্র ১৩১২। ২য় বর্ষ, বৈশাখ, চৈত্র ১৩১৩
৩য় বর্ষ, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ+আষাঢ় (যুগ্ম সংখ্যা) ১৩১৪

বঙ্গদর্শন নবপর্যায়— ১ম—৫ম বর্ষ ১৩০৮-১৩১২ সাল

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৮ শ কল্প ১৮৩৩—১৮৩৬ শক (১৩১৮—২১ সাল)

রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি অনুবাদ ঃ

১৯১২—Gitanjali—

গীতাঞ্জলি	৫১টি কবিতা	চৈতালি	১ কবিতা
গীতিমাল্য	১৭ „	স্মরণ	১ „
নৈবেদ্য	১৬ „	কল্পনা	১ „
খেয়া	১১ „	উৎসর্গ	১ „
শিশু	৩ „	অচলায়তন	১ „

মোট ১০৩টি কবিতার অনুবাদ

১৯১৩—The Gardener—

ক্ষণিকা	২৫টি	মানসী	৩
কল্পনা	১৬	মায়ার খেলা	৩
সোনার তরী	৯	খেয়া	২
চৈতালি	১৬	কড়ি ও কোমল	৩
উৎসর্গ	৬	গীতালি	৩
চিত্রা	৫	শারদোৎসব	৩

মোট ৯৪টি কবিতার অনুবাদ

Chitra—চিত্রাঙ্গদার অনুবাদ

The Crescent Moon—শিশু, কড়ি ও কোমল, সোনার তরী ও গীতিমাল্য থেকে নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ।

Glimpses of Bengal life—রজনী রঞ্জন সেন কর্তৃক কয়েকটি পত্রের অনুবাদ।

১৯১৪—The King of the Dark Chamber—ক্ষিতীশ চন্দ্র সেন কর্তৃক 'রাজার' অনুবাদ।

The Post Office—দেবব্রত মুখার্জি কর্তৃক 'ডাকঘরের' অনুবাদ।

Sadhana—হার্ভার্ড য়ুনিভারসিটিতে প্রদত্ত বক্তৃতা।

One Hundred Poems of Kabir

১৯১৫—The Maharani of Arakan—জর্জ ক্যালডেরণ কর্তৃক একটি গল্পের নাট্যরূপ।

১৯১৬—Hungry Stones and Other Stories—ক্ষুধিত পাষাণ, জয়পরাজয়, অসম্ভব কথা, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, একটি আষাঢ়ে গল্প, বোষ্টমি, দৃষ্টিদান, ঠাকুর্দা, জীবিত ও মৃত, রাজটীকা, ত্যাগ ও কাবুলিওয়ালার অনুবাদ।

১৯১৬—Fruit Gathering—

গীতালি—১৬	ধর্মসংগীত—৩
বলাকা—১৪	কল্পনা—১
উৎসর্গ—৮	গীতাঞ্জলি—১
কথা—৬	রাজা—১
খেয়া—৫	মানসী—১
স্মরণ—৫	কড়ি ও কোমল—১
চিত্রা—২	অচলায়তন—১
নৈবেদ্য—২	

মোট ৬৭টি কবিতার অনুবাদ

Stray-birds—(Epigrams)

১৯১৭—The Cycle of Spring—'ফাল্গুনীর' অনুবাদ

My Reminiscences—'জীবনস্মৃতির' অনুবাদ

Sacrifice and Other Plays—প্রকৃতির প্রতিশোধ, মালিনী, বিসর্জন, রাজা ও রাণীর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

Personality—আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতার সমষ্টি

Nationalism—প্রবন্ধ সমষ্টি

Selected Passages for Bengali Translation.

১৯১৮—Gitanjali and Fruit-gathering (কবিতা সংগ্রহ)

Lover's Gift and Crossing—

বলাকা—১৪	খেয়া—১০	গীতাঞ্জলি—৮
গীতিমাল্য—৮	নৈবেদ্য—৭	উৎসর্গ—৭
চিত্রা—৫	স্মরণে—৪	গীতালি—৪
চৈতালি—৪	কল্পনা—৪	মানসী—২
প্রায়শ্চিত্ত—২	অচলায়তন—৩	কড়ি ও কোমল—১
কাহিনী—১	ধর্মসংগীত—২	

মোট ৯৩টি কবিতার অনুবাদ

Mashi and Other Stories—শেষের রাত্রি, কঙ্কাল, শুভদৃষ্টি, একরাত্রি, সদর ও অন্দর, সম্পত্তি সমর্পণ, সমস্যা পূরণ, দিদি, শুভা, পোষ্টমাষ্টার, ঘাটের কথা, আপদ উদ্ধার ও প্রতিবেশিনীর অনুবাদ

Stories from Tagore—কাবুলিওয়ালা, ছুটি, অসম্ভব কথা, মাষ্টার মশাই, শুভা, পোষ্টমাষ্টার, আপদ, রাসমণির ছেলে ও ঠাকুর্দার অনুবাদ

The Parrot's Training—তোতাকাহিনীর অনুবাদ

১৯১৯—The Centre of Indian Culture—প্রবন্ধ

The Home and the World—সুরেন্দ্রনা ঠাকুর কর্তৃক 'ঘরে বাইরের' অনুবাদ

The Trial of The Horse.

১৯২১—Greater India—প্রবন্ধ

The Wreck—'নৌকাডুবির' অনুবাদ

Poems from Tagore

Glimpses of Bengal—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'ছিন্নপত্রের' অনুবাদ

The Fugitive—

লিপিকা—২০	মানসী—৬	সোনার তরী—৭
চৈতালি—৭	চিত্রা—৫	ক্ষণিকা—৪
কাহিনী—৪	পলাতকা—৪	উৎসর্গ—৩
বলাকা—৩	কড়ি ও কোমল—২	স্মরণে—২
খেয়া—১	গীতিমাল্য—১	কথা—১
বিদায় অভিশাপ	সতী	গান্ধারীর আবেদন
নরক বাস	কর্ণ-কুন্তী সংবাদ	বৈষ্ণব সংগীত
বাউল সংগীত	জ্ঞানদাসের হিন্দি সংগীত	

১৯২২—Creative Unity—প্রবন্ধ

১৯২৪—Letters from Abroad.

Gora—ডব্লু, ডব্লু, পিয়ার্সন কর্তৃক 'গোরার' অনুবাদ

The Curse at Farewell—ই, টি, টম্পসন কর্তৃক 'বিদায় অভিশাপের' অনুবাদ

১৯২৫—Talks is China—প্রবন্ধ

Poems—ই, জে, টম্পসন কর্তৃক ২০টি কবিতার অনুবাদ

Red Oleanders—'রক্ত করবীর' অনুবাদ

Broken Ties and Other Stories—চতুরঙ্গ, নিশীথে, স্বর্ণমৃগ, মেঘ ও রৌদ্র, মণিহার ও পরিশোধের অনুবাদ

১৯২৬—The Meaning of Art

১৯২৮—Fire-flies

Letters to a friend

The Tagore Birthday Book—সি, এফ, এণ্ডরুজ সম্পাদিত কবির ইংরাজি রচনা সংগ্রহ

Lectures and Addresses

A Poet's School

১৯২৯—Thoughts from Tagore—এণ্ডরুজ সম্পাদিত

On Oriental Culture and Japan's Mission.

১৯৩০—The Religion of Man—হিবার্ট বক্তৃতা

১৯৩১—The Child—গদ্যকাব্য

১৯৩২—The Golden Boat—ভবানী ভট্টাচার্য কর্তৃক কবির কয়েকটি কবিতার অনুবাদ

Mahatmaji and the Depressed Humanity

Sheaves, Poems. and Songs—নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অনুবাদ

১৯৩৩—Presidential 'Address—Ram Mohan Roy Centenary, 18 Feb., 1933.

১৯৩৪—My 'ideals with regard to the Sree Bhaban.

১৯৩৫—East and West.

Twenty-six Songs of Tagore

১৯৩৬—Education Naturalized.

An Address—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ-সভায় বক্তৃতা 15 July, 1936.

Collected Poems and Plays of Rabindra Nath Tagore.

১৯৩৭—Man—বক্তৃতা

China and India—শান্তিনিকেতনে চীনাভবনের উদ্বোধন বক্তৃতা

Religion of the Spirit and Sectarianism.

১৯৩৮—My Boyhood Days—মারজোরি সাইক্স্ কর্তৃক 'ছেলেবেলার' অনুবাদ

১৯৪২—Poems.

১৯৪৩—Muktadhara.

বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বই :

Gitanjali—ফ্রেঞ্চ অনুবাদক Andre Gide

জার্মান ··· Marie Louise Gothein

ইতালিয়ান ··· Arundel del Re

রাশিয়ান ··· ১। U. Balrushaitz

২। N. A. Pusheshnikov

৩। Alexey Smirnov (গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার, দি ক্রিসেণ্ট মুন ও ফ্রুট গেদারিং একত্রে সংকলন)

সুইডিশ ··· Andrea Butenschon

ড্যানিশ ··· Louis V. Kohl

স্প্যানিশ ··· Zonobia Cambrubi de Jimenez

ডাচ ··· Frederic Van Ecden

চেক ··· F. Balej

যুগোশ্লাভ ·· Dved S. Reyade

লাটভিয়ান ··· Karla Egles

এস্তোনিয়া ··· Hugo Masing

হিব্রু ··· David Frishman

The Gardener—মালঞ্চ—ফ্রেঞ্চ—Henriette Miraband-Thorens

জার্মান—Hans Effenberger

রাশিয়ান—A. E. Grusinskaya

সুইডিশ—Kr. Anderberg

ড্যানিশ—Louis V. Kohl

স্প্যানিশ—Antonio Figueirinhas

ডাচ—Frederic Van Ecden

চেক—F. Balej

পর্তুগীজ—Francisca de Basto Cordeiro

যুগোশ্লাভ—David S. Riyade

লাটভিয়ান—Karla Egles

এস্তোনিয়া—Hugo Masing

ইডিশ—Oscar Dubin

হিব্রু—David Frishman

গ্রীক—Eyfes Lagopoiloi Apostiloi

The Crescent Moon—ফ্রেঞ্চ—Mme. Sturge Moore

জার্মান—Hans Effenberger

ইতালিয়ান—Clary Zannoni Chauvet
রাশিয়ান—M. Likiardopulov
সুইডিশ—Harold Heyman
ড্যানিশ—V. Pio's Boghandel (প্রকাশক)
স্প্যানিশ—Z. C. A.
চেক—নাম দেওয়া নেই
হাংগেরিয়ান—Zsoldas Beno
হিব্রু—David Frishman

Chitra—জার্মান—Elisabeth Wolff-Merck
ইতালিয়ান—Ferd Verdinois
রাশিয়ান—C. A. Adrianov
স্প্যানিশ—নাম দেওয়া নেই—ম্যাড্রিদ সংস্করণ
পর্তুগীজ—Jose F. Ferreira Martins
হাংগেরিয়ান—Laky Dezso
লাটভিয়ান—গ্রন্থাবলী ৫ খণ্ড সংকলন
হিব্রু—David Frishman

The King of the Dark Chamber—
জার্মান—Hedwig Lachmann & Gustar Landaner
ইতালিয়ান—Ferd. Verdinoes
রাশিয়ান—B. B. Gippius & D. H. Nosovitch
সুইডিশ—Kr. I, Anderberg
স্প্যানিশ—নাম দেওয়া নেই—ম্যাড্রিদ সংস্করণ
চেক—Dr. F. Balej & Dr. V. Lesny
লাটভিয়ান—গ্রন্থাবলী ৫ খণ্ড সংকলন

The Post Office—ফ্রেঞ্চ—Andre Gide
জার্মান—Hedwig Lachmann & Gustar Landaner
সুইডিশ—Hugo Hultenberg
স্প্যানিশ—নাম দেওয়া নেই—ম্যাড্রিদ সংস্করণ
ডাচ—Henry Borel
চেক—Jarmel Krecar
হাংগেরিয়ান—Bartos Zoltan
লাটভিয়ান—Karla Egles

Sadhana—ফ্রেঞ্চ—Jean Herbert
জার্মান—Helene Meyer Franck
ইতালিয়ান—Aug. Carelli
রাশিয়ান—V. Pegoskasky

সুইডিশ—August Carr
চেক—F. Balej
লাটভিয়ান—গ্রন্থাবলী ৯ম খণ্ড

One Hundred Poems of Kabir—
ফ্রেঞ্চ—Mme. Meraband Thorens
ইতালিয়ান—Clary Zaunoni Chauvet
স্প্যানিশ—en Castellano

Fruit Gathering—ফ্রেঞ্চ—Helene de Pasqurier
জার্মান—Annemarie V. Putikammer
ইতালিয়ান—E. Taglialatela
সুইডিশ—Hugo Hultenberg
ড্যানিশ—Ingeborg Seedorff
স্প্যানিশ—নাম দেওয়া নেই—ম্যাড্রিদ সংস্করণ
চেক—L: Vojtig
লাটভিয়ান—Karla Egles সম্পাদিত গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড
হিব্রু—David Frishman

Hungry Stones—জার্মান—Annemarie V. Putikammer
সুইডিশ—Harald Heyman
স্প্যানিশ—নাম দেওয়া নেই—ম্যাড্রিদ সংস্করণ

Broken Ties—ফ্রেঞ্চ—Madeleine Rolland
রাশিয়ান—E. S. Khakhlova
বুলগেরিয়ান——K. Konstantinov

Balaka—ফ্রেঞ্চ—Kalidas Nag & Peirre Jean Jouve

Stray-birds— জার্মান—গ্রন্থাবলী ৮ম খণ্ড
সুইডিশ—Hugo Hultenberg
ড্যানিশ—Kai Friis-Moller
স্প্যানিশ—নাম দেওয়া নেই—ম্যাড্রিদ সংস্করণ
হাংগেরিয়ান—Zsoldos Beno
লাটভিয়ান—গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড—Stray-bird ও The Golden Boat একত্রে

My Reminiscences—ফ্রেঞ্চ—E. Pieczynska
জার্মান—Helene Meyer-Franck
রাশিয়ান—M. I. Tubiansky
সুইডিশ—August Carr.
ড্যানিশ—E. Menon

Sacrifice & Other Plays—জার্মান—গ্রন্থাবলী ৩য় খণ্ড
রাশিয়ান—C. A. Andrianov
সুইডিশ—Hugo Hultenberg
স্প্যানিশ—নাম দেওয়া নেই—ম্যাড্রিদ সংস্করণ
লাটভিয়ান—গ্রন্থাবলী ৫ম খণ্ড

Cycle of Spring—ফ্রেঞ্চ—Henriette Miraband-Thorens
স্প্যানিশ—নাম দেওয়া নেই—ম্যাড্রিদ সংস্করণ

Personality—জার্মান—গ্রন্থাবলী ৭ম খণ্ড
রাশিয়ান—J. A. Kolubovsky
সুইডিশ—August Carr.

Nationalism—ফ্রেঞ্চ—Cecil George-Bazile
জার্মান—Helene Meyer Franck
রাশিয়ান—I. A. Kolubovsky & M. J. Toobiansky
চেক—K. Skrachovi

Lover's Gift & Crossing—জার্মান—গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড
সুইডিশ—Hugo Hultenberg
ড্যানিশ—Valdemar Rordam, V. Rio's Boghandel
স্প্যানিশ—নাম দেওয়া নেই—ম্যাড্রিদ সংস্করণ
হাংগেরিয়ান—নাম দেওয়া নেই—প্যানথিয়ান্ সংস্করণ
লাটভিয়ান—গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড

Mashi & Other Stories—ফ্রেঞ্চ—Helene die Pasqurier
জার্মান—গ্রন্থাবলী ৪র্থ খণ্ড
ইতালিয়ান—Vestri Georgi
রাশিয়ান—G. E. Gordon
স্প্যানিশ—নাম দেওয়া নেই—ম্যাড্রিদ সংস্করণ
ডাচ—Door B. Ehawab
হাংগেরিয়ান—Sarmay Marton
লাটভিয়ান—গ্রন্থাবলী ৭ম খণ্ড

The Parrot's Training—ডাচ—Noto Socroto
হাংগেরিয়ান—Bartoo Zotton

The Home and the World—ফ্রেঞ্চ—Frederick Roger Cornez
জার্মান—Helene Meyer Franck
ড্যানিশ—Rio's Boghandel (প্রকাশক)
চেক্—Ant. Klastersky
লাটভিয়ান—গ্রন্থাবলী ৫ম খণ্ড

সার্বিয়ান—Leter Beshevitch
হিব্রু—David Frishman

The Fugitive—ফ্রেঞ্চ—Renee de Brumont
স্প্যানিশ—নাম দেওয়া নেই—ম্যাদ্রিদ সংস্করণ
লাটভিয়ান—গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড

Glimpses of Bengal—রাশিয়ান—Joseph Tchervonsky.
চেক্—L. Vojtig

The Wreck—ফ্রেঞ্চ—Henriette Miraband-Thorens
জার্মান—গ্রন্থাবলী ৫ম খণ্ড
লাটভিয়ান—গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড
হিব্রু—Unreil Halperln

Creative Unity—ফ্রেঞ্চ—A. Tougard de Boismelon

Lipika—জার্মান—Reinhard Wagner

Muktadhara—ফ্রেঞ্চ—Benoit & Amiya Chandra Chakravarty

Gora—রাশিয়ান—E. K. Pemonov.
হাংগেরিয়ান—Kelene Ferenc
লাটভিয়ান—গ্রন্থাবলী ৩য় খণ্ড

Fire-flies—ফ্রেঞ্চ—Fenilles de L'Inde (প্রকাশক)
সুইডিশ—Prince Welhelm.

Letters to a Friend—ফ্রেঞ্চ—Jane Droz-Vignie
স্প্যানিশ—Dr. Nicolas Ma Martinez Amador

The Religion of Man—ফ্রেঞ্চ—Jane Droz Vignie
সুইডিশ—Hugo Hultenberg
স্প্যানিশ—R. Cansinos Arsens.

বিদেশী ভাষায় রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী :

জার্মান ভাষায়—Kurt Wolff Verlag সম্পাদিত
৮ খণ্ড : ১+২ কবিতা, ৩ নাটক, ৪ গল্প, ৫ The Wreck, ৬ The Home and the World, ৭ Sadhana & Nationalism, ৮ Personality, Stray-birds & Lectures.

লাটভিয়ান ভাষায়—Karla Eglus সম্পাদিত—
১০ খণ্ড : ১ Rabindra Nath's life and work, ২ নৌকাডুবি, ৩+৪ গোরা, ৫ ঘরে বাইরে, ৬ নাটক, ৭ কবিতা, ৮ দুষ্প্রাপ্য, ৯ গল্প, ১০ সাধনা

রবীন্দ্র-রচনাবলী

খণ্ড :	কবিতা :	নাটক :	গল্প-উপন্যাস :	প্রবন্ধ :	পৃষ্ঠা :
	কাহিনী	শারদোৎসব			
	কল্পনা				
	ক্ষণিকা				
৮ম	নৈবেদ্য	মুকুট	ঘরে-বাইরে	সাহিত্য	৫১৬+২৩
	স্মরণ				
৯ম	শিশু	প্রায়শ্চিত্ত	যোগাযোগ	আধুনিক সাহিত্য	৫৪১+২৩
১০ম	উৎসর্গ	রাজা	শেষের কবিতা	রাজা ও প্রজা	৬৪২+২৪
				সমূহ (+পরিশিষ্ট)	
	খেয়া				
১১শ	গীতাঞ্জলি	অচলায়তন	দুইবোন	স্বদেশ	৪৯৪+২১
	গীতিমাল্য	ডাকঘর			
	গীতালি				
১২শ	বলাকা	ফাল্গুনী	মালঞ্চ	সমাজ	৫৯০+৭০
				শিক্ষা	
				শব্দতত্ত্ব	
১৩শ	পলাতকা	গুরু	চার অধ্যায়	ধর্ম	৫৩৪+১২
	শিশু ভোলানাথ	অরূপরতন		শান্তিনিকেতন (১-৩)	
		ঋণশোধ			

খণ্ড :	কবিতা :	নাটক :	গল্প-উপন্যাস :	প্রবন্ধ :	পৃষ্ঠা :
১৪শ	পূরবী লেখন	মুক্তধারা	গল্পগুচ্ছ	শান্তিনিকেতন (৪-১০)	৫১৯+২১
১৫শ	মহুয়া বনবাণী পরিশেষ (+সংযোজন)	বসন্ত রক্তকরবী	গল্পগুচ্ছ	শান্তিনিকেতন (১১-১২)	৫১৫+৩৭
১৬শ	পুনশ্চ	চিরকুমার-সভা	গল্পগুচ্ছ	শান্তিনিকেতন (১৩-১৭)	৫০৮+৮
১৭শ	বিচিত্রিতা	শোধবোধ গৃহপ্রবেশ	গল্পগুচ্ছ	জীবনস্মৃতি	৪৩২+৬৬
১৮শ	শেষ সপ্তক (+সংযোজন)	শেষ বর্ষণ নটীর পূজা নটরাজ	গল্পগুচ্ছ	সঞ্চয় পরিচয় কর্তার ইচ্ছায় কর্ম	৫৬৫+২৭
১৯শ	বীথিকা	শেষরক্ষা	গল্পগুচ্ছ	জাপান যাত্রী যাত্রী : পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী যাভা যাত্রীর পত্র	৫২৬+৮
২০শ	পত্রপুট শ্যামলী	পরিত্রাণ	গল্পগুচ্ছ	রাশিয়ার চিঠি মানুষের ধর্ম	৪৩১+২৫
২১শ	খাপছাড়া ছড়ার বই	তপতী	গল্পগুচ্ছ	ছন্দ	৪৩২+১০

খণ্ড :	কবিতা :	নাটক :	গল্প-উপন্যাস :	প্রবন্ধ :	পৃষ্ঠা :
২২শ	প্রান্তিক	নবীন	গল্পগুচ্ছ	পারস্যে	৫০২+২৭
	সেঁজুতি	শাপমোচন			
		কালের যাত্রা			
২৩শ	প্রহাসিনী	চণ্ডালিকা	গল্পগুচ্ছ	সাহিত্যের পথে	৫২৮+৩০
	আকাশ প্রদীপ	তাসের দেশ			
২৪শ	নবজাতক	বাঁশরি	গল্পগুচ্ছ	কালান্তর	৪৬৪+৩৪
	সানাই				
২৫শ	রোগশয্যায়	শ্রাবনগাথা	তিনসঙ্গী	বিশ্বপরিচয়	৪১৫+২২
	আরোগ্য	চিত্রাঙ্গদা (নৃত্যনাট্য)			
	জন্মদিনে	চণ্ডালিকা			
		শ্যামা			
২৬	ছড়া	মুক্তির উপায়	লিপিকা	বাংলা ভাষা পরিচয়	৬৪৯+২২
	শেষ লেখা		সে	পথের সঞ্চয়	
			গল্পসল্প	ছেলেবেলা	
				সভ্যতার সংকট	
					১৩৯৯৮+৬১০

অচলিত সংগ্রহ :

১ম—কবিকাহিনী, বনফুল, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, কালমৃগয়া, বিবিধপ্রসঙ্গ, নলিনী, শৈশবসংগীত, বাল্মীকি প্রতিভা।

২য়—আলোচনা, সমালোচনা, মন্ত্রি অভিষেক, ব্রহ্মমন্ত্র, উপনিষদ ব্রহ্ম, সংস্কৃতশিক্ষা (২য়) ইংরাজী সোপান (উপক্রমণিকা ও ৩ ভাগ) ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা (২ ভাগ) ইংরেজি সহজ শিক্ষা (২ ভাগ) অনুবাদ চর্চা, সহজপাঠ (২ ভাগ) ইংরাজি পাঠ (১ম) আদর্শ প্রশ্ন।

রবীন্দ্র-সাহিত্য

প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—

"...বাঙলায় যদি রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত না হতেন ত আজকের দিনে বাঙলায় সাহিত্য বলে কোন জিনিষ থাকত না, যেমন ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে নেই অতএব আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রথম এবং প্রধান কথা হচ্ছে যে আমরা সকলেই রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়েছি।" [—বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৮

অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন—

"রবীন্দ্রনাথ কবি। তিনি নিজে বলেন তাই হচ্ছে তাঁর প্রথম ও শেষ পরিচয়; আর যা কিছু হয় অবান্তর নয় আনুষঙ্গিক। তাঁর কবি-প্রতিভা যে কাব্য-সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে তার লোকোত্তর মাধুর্য ও দীপ্তি, ও তার অতুল ঐশ্বর্য পাঠককে রসের অমৃতলোকে পৌঁছে দেয়; সমালোচককে স্তব্ধ ও নির্বাক করে। নরনারীর চিত্তের সমস্ত ভাবধারা তাঁর কাব্যের বীণায় ঝঙ্কার তুলেছে।...

ভাষা ও সাহিত্য-সমালোচনা, শিক্ষা ও ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি, ইতিহাস ও জীবনী, ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ—এ সবই তাঁর চিন্তার আলোতে উজ্জ্বল হয়েছে। প্রবন্ধলেখক হিসাবে তাঁর দান পৃথিবীর শক্তিশালী প্রবন্ধকারদের মধ্যে।...

আমরা আজ তাঁর ভাষা লিখি, তাঁর ভাবে ভাবুক হই, তাঁর চিন্তা চিন্তা করি, তাঁর কাব্যে রসের চরম অস্বাদ পাই, তাঁর সুরে তাঁর কথা ধ্যান করি। জীবন ও সভ্যতার তাঁরি-ই আদর্শ বাঙ্গালীর অন্তরতম অন্তর স্বীকার করেছে। বাঙ্গালীর ভাব ও চিন্তার পায়ে শিকল তিনি ভেঙেছেন। বাঙ্গালীর সাহিত্য ও জীবনকে প্রাদেশিকতার দেয়াল ভেঙে বিশ্বসাহিত্য ও সমগ্র মানব সভ্যতার মুখোমুখি এনেছেন।...

দেশ ও জাতির গণ্ডী সরিয়ে মানুষে মানুষে মৈত্রীর বাণী যাঁরা প্রচার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান। কাল্‌কের না হোক তার পরদিনের পৃথিবী এ বাণীকে স্বীকার করবে। সেদিনকার মানব-সমাজ কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঋষি রবীন্দ্রনাথকেও প্রীতির অঞ্জলি দেবে।"

[—বিচিত্রা, আশ্বিন' ৩৮

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"আমাদের সাহিত্যের যে আদর্শ ছিল অত্যন্ত খর্ব, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গত পঞ্চাশ বৎসরের সাধনায় তার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এত উঁচু করে দিয়েছেন,—সাধারণ গতিতে চলতে চলতে হয়তো দেড়শো বছরেও তা ঘটতো কিনা সন্দেহ।...

রবীন্দ্রনাথের দানের তুলনা নেই, জীবনের এমন কোনো দিকও নেই, যেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েনি, যার সম্বন্ধে তিনি কিছু না কিছু নতুন কথা না শুনিয়েছেন। তা শরৎকালীন দুপুর সম্বন্ধেই হোক, বা নাম উচ্চারণ করবার পদ্ধতি নিয়েই হোক্।...

একটী ক্ষুদ্র প্রাদেশিক সাহিত্য থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যকে আজ বিশ্বের দরবারে সকলের সামনে বসিয়েচেন, এই বিপুল দানের, মানবপ্রতিভার এই অনন্যসাধারণ বিকাশের তুলনা নাই বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে।..."

—বিচিত্রা, আশ্বিন'৩৮

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

"সমগ্রতার সাধনাই যদি রবীন্দ্রনাথের সাধনা হয়, তবে তাঁকে বোঝবার বা বোঝাবার, অর্থাৎ রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনা ঐ সমগ্র-সাধনার উপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। নচেৎ আমরা রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভায় দিশাহারা হয়ে যাব এবং তাঁর দৃষ্টির তাৎপর্য গল্প, নভেল, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, স্বদেশপ্রেম, সঙ্গীত, শিক্ষা ও অন্যান্য কর্মপ্রবৃত্তির তালিকায় পরিণত হবে—যা এতদিন ধরে হয়ে আসছে ও আজও হচ্ছে।...

রবীন্দ্রনাথের কবিতা-সমালোচনায় তাঁর সমাজবোধের উল্লেখ থাকবে না, তাঁর ছন্দ-বিশ্লেষণে তাঁর সঙ্গীত-বোধের, সুরজ্ঞানের কথা আনলেই সেটা অ-সাহিত্যিক বিচার হবে; তাঁর রাষ্ট্রকল্পনায়, নাটক, গল্প, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে, নভেলে, কথাবার্তায় তাঁর কবিত্ব, বাঙ্গালীত্ব, ভারতবাসীত্ব, নির্বাসিত করতেই হবে, নচেৎ 'বিশুদ্ধ' সমালোচনা হবে না; এমন কি তাঁর গোষ্ঠীর পারম্পর্য দেখানোও অ-বিচার, অসভ্যতা। ব্যক্তিগত জীবনের উল্লেখ তো দূরের কথা—এই ধরণের বারণ খণ্ডদৃষ্টির পরিচায়ক।...

...রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির ভেতর দিয়ে প্রত্যেকেই, দেশ ও কাল নির্বিশেষে নিজের বিকাশমর্ম উপলব্ধি করতে পারে। ...স্বভাব কথাটির দুটি অর্থ আছে,—একটি, মাত্র প্রকৃতির দান, যেটি স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি, অন্যটি সেই দানেরই সার্থক স্ফূর্তি, পরিপূর্ণতা, সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সুন্দর ইমারত। ঐ দুটি অর্থ

যেখানে এক হয়ে যায় সেইখানেই সার্বজনীন পরিমাণ সর্বাঙ্গীণ পরিণতি ও উন্নতি সূচিত হয়।…সেইভাবে যদি আমাদের দেশাত্মবোধ তাঁর বিশ্ববোধে পরিণত হয়, তাহলে তিনি কেবল আমাদের দেশের নন, সকল দেশের। যদি বর্তমান সভ্যতার গতি ও উন্নতি তাঁর চিন্তায় ও কর্মে নির্দিষ্ট হয়, তাহলে তিনি ভবিষ্যৎকালের, অর্থাৎ বর্তমানের সম্পর্কে সকল কালের। যদি তাঁর রচনার মধ্যে আমাদের দেশের ও অন্যদেশের রস-সৃষ্টির ধারার প্রধান প্রধান পর্যায়গুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সেই ধারার ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত করে, তাহলে তিনি কেবল আমাদের ও অন্যদের দেশের ঐতিহ্যে আবদ্ধ নন—তিনি হন সৎ-সাহিত্যিক, অর্থাৎ বিশ্বসাহিত্যিক। যদি তাঁর সঙ্গীত রচনায় আমার সঙ্গীতপ্রিয়তার, আমাদের ও অন্যদেশের সঙ্গীত-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করি, তাহলে তিনি শুধু আমাদেরও নন, তাঁদেরও নন, তিনি বিশ্বের। যদি তাঁর কাজের মধ্যে জীবনের সারধর্ম অনুসৃত হচ্ছে দেখতে পাই, তাহলে তিনি সর্বজীবনের। যদি তাঁর মধ্যে সাধারণ মানুষের আশা-ভরসা, চিন্তা কর্ম ও ধর্মের নিষ্কর্ম-সাধন হচ্ছে মনে হয়, তাহলে তিনি সর্ব-সাধারণের। এই রসসৃষ্টির ধারার, এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের, এই জীবনধর্মের পুনরাবৃত্তির দিক থেকে তাঁকে আমি বিশ্বকবি বলি। লোকেও তাই বলে। অতএব এই আখ্যা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্বজ্ঞান বাড়ানো, যে দায়িত্বজ্ঞান দেশকাল ও পাত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না হতে দেওয়া, এইটাই হল প্রকৃত অর্থজ্ঞান। নামকরণের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড দায়িত্ব লুকানো থাকে। সে সম্বন্ধে সচেতন হলে নামধারীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখানো হয়।…" [—বক্তব্য

অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন—

"একটি মুক্ত পুরুষের দৃষ্টান্ত লক্ষ লক্ষ মুক্ত পুরুষকে আহ্বান করে। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা; রবীন্দ্রনাথের উত্তর পুরুষেরা এই বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ রইবেন যে, মানুষকে মানুষের যা চরম উত্তরাধিকার তাই তিনি দিয়ে গেলেন। সেটি হচ্ছে, "কী করে বাঁচব", এই জিজ্ঞাসার নিঃশব্দ উত্তর।"

[—জীবন শিল্পী

নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—

"বিচিত্র বর্ণসম্ভারে রবীন্দ্র-সাহিত্য বর্ণময়, বিচিত্র ভাবপ্রসঙ্গে সমৃদ্ধ, বিচিত্র ও অভিনব রেখায় লীলায়িত। মানব-চৈতন্যের কত জটিল, গভীর ও ব্যাপক স্বপ্ন-কল্পনা, ভয়-ভাবনা জিজ্ঞাসা-আকূতি, আনন্দ-বেদনা, কত বিচিত্র

ইন্দ্রিয়ানুভূতি রং ও রেখার সীমাহীন অপরূপ কারুকুশলতায় সেই সাহিত্যে স্বপ্রকাশ! এই অপরূপ লীলা-বৈচিত্র্যই এক মুহূর্তে আমাদিগকে অভিভূত করিয়া দেয়; কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের গভীরে যে মর্মবাণীটি ধ্বনিত, তাহা একটু স্থিরচিত্তে কান পাতিয়া শুনিতে পারিলে তখন বুঝা যাইবে যত বিচিত্র বহু রূপময় হউক না কেন সেই সাহিত্য, তাহার সাধনমন্ত্র মূলত ও মুখ্যত একটি। যে-মন্ত্র অপরূপ অরূপকে ভাব, ভাষা ও ছন্দের রূপের মধ্যে বাঁধিবার এবং সেই রূপের মধ্যে অরূপের আরাধনা করিবার মন্ত্র।...দেশকাল ধৃত বস্তু ও জীবন-স্রোতের বিচিত্র রূপের মধ্যে তিনি আত্মগত অন্তর্মুখী অসংখ্য ও বিচিত্র ভাব-কল্পনার অরূপ অপরূপ অনুভূতিগুলিকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন ভাষা ও ছন্দের সাহায্যে, সেই অসংখ্য বিচিত্র রূপের চলচ্ছায়া তিনি নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছেন, প্রাণ ভরিয়া তাহার রসপান করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপের মধ্য দিয়াই তিনি আবার অরূপ অপরূপকেই নয়নপ্রাণের আরও নিকটতর করিয়া লাভ করিয়াছেন। রূপে অরূপে নিত্য এই লীলা প্রাণ ভরিয়া দেখা, দেখার আনন্দে দেহচিত্তমন রাঙাইয়া তোলা এবং ভাষা ও ছন্দে সেই আনন্দ গাঁথিয়া যাওয়া, ইহাই রবীন্দ্র-কবিকীর্তি, ইহাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবন সাধনা।...মানব-চেতনার বিচিত্র বর্ণের, বিচিত্র রেখার, বিচিত্র রসের, বিচিত্র বাসনার যেমন কোনও সীমা নাই, তেমনই বস্তুবিশ্ব ও জীবনদৃশ্যের প্রেক্ষাপটে তাহাদের বিচিত্র রূপেরও কোন সীমা নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য তাই এত বিচিত্র।" [—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা

"যতই দিন যাইতেছে, ততই আরো বেশী করিয়া বুঝিতেছি, আমি এবং আমার অনেকেই আমরা যে ভাষায় লিখি, যে ভাবে কথা বলি, যে ধারায় চিন্তা করি, সমস্ত কিছুর মূলে রহিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা বাঙালী শিক্ষিত ও সংস্কার-প্রাপ্ত ভদ্রসম্প্রদায় যে বাংলাদেশে বাস করি, সে বাংলা দেশ রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি!...আমার কেন জানি মনে হয়, বাংলাদেশের শিক্ষিত ও সংস্কারপ্রাপ্ত ভদ্রসম্প্রদায়কে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—এক, যাহারা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পড়িয়াছেন, আর যাঁহারা তাহা পড়েন নাই। যাঁহারা রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন যাত্রার মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য এমন অলক্ষ্যে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে সহজে তাহা চোখেই পড়িতে চায় না। তাঁহাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়, তাঁহাদের চলনে বলনে, অশনে বসনে, ভাবে ও চিন্তায় ঘরে ও বাহিরে সর্বদা ফুটিয়া

উঠিয়াছে একটি সুমধুর শ্রী, একটি ললিত সৌকুমার্য, একটি সংযত সুসমঞ্জস সুতীক্ষ্ণ সৌন্দর্য-প্রেরণা, এই পৃথিবীর দিকে তাকাইবার এক নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী। একথা আমি যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণ করিতে পারি না, কিন্তু ইহার অনুভূতি আমার কাছে সূর্যালোকের মত সুস্পষ্ট।" [—বিচিত্রা, আশ্বিন'৩৮

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—

"জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী সকল বাঁধন-ভাঙার বাণীই রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম বাণী।" [—রবীন্দ্র নাট্যপরিক্রমা

"বিশ্বমুখিতা ও সার্বজনীনতা তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। দেশ জাতি ও যুগের উর্ধ্বে যে সার্বজনীন ভাব, যে বিশ্বজনীন আদর্শ, যে চিরন্তন নীতি ও শাশ্বত সত্য, তাহারই উপর রবীন্দ্রনাথের কাব্যসরস্বতী প্রতিষ্ঠিত। দেশ-জাতি-কালের ঐতিহ্য ও সংস্কারকে তিনি ততখানি গ্রহণ করিয়াছেন যতখানি তাঁহার সার্বজনীন আদর্শ ও নীতির সহিত মিলিতে পারে। বাংলাদেশ ও বাঙালী-জাতির সংকীর্ণ ধর্মসংস্কার, যুক্তিহীন সমাজ-ব্যবস্থার উপর রবীন্দ্রনাথের অন্ধ-ভক্তি ছিল না।" [—রবীন্দ্র কাব্যপরিক্রমা

শিবনারায়ণ রায় বলেছেন—

"রবীন্দ্রনাথ দুটি সম্পন্ন ঐতিহ্যের ভিতরে মিলন ঘটিয়েছিলেন। তার প্রথমটি হোল ভারতবর্ষের ঔপনিষদিক ঐতিহ্য। ঋষিদের মত তিনিও অনুভব করেছিলেন যে এই বিশ্বজগৎ কোন কল্যাণময় উপস্থিতির বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যে সংসারের সমস্ত দুঃখ, সংঘাত ভাঙা-চোরার অন্তরালে এমন কোন চৈতন্যময় পুরুষ বর্তমান যিনি সবকিছুতেই নিয়ত সুষমা এবং সংগতি দান করছেন। সুতরাং যে ফুল না ফুটে ঝরে যায় সেও নাকি ব্যর্থ নয়; যে মানুষ অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করে অকালে মারা গেল, তার জীবনেও নাকি কোন মহৎ উদ্দেশ্য গোপনে স্বার্থকতা লাভ করেছে।...একথা স্বীকার্য যে এই বিশ্বাস অনেকের মনে প্রকৃতি-প্রেম, করুণা, ধৈর্য, প্রীতি, সৌন্দর্যচেতনা, নির্ভীকতা, ইত্যাদি নানা মানবীয় সদ্‌গুণের বিকাশে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথের গান এবং কবিতার একটা বড় অংশ সুস্পষ্টভাবে এই বিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং বহু প্রবন্ধের মধ্যেও এই ঔপনিষদিক ঐতিহ্যের ফলপ্রসূ প্রভাব লক্ষনীয়।

রবীন্দ্র-প্রতিভার ভিতর অপর যে মহৎ ঐতিহ্যের স্বীকরণ ঘটেছিল সেটি রেনেসাঁস-উত্তর পশ্চিমের মানবতন্ত্রী ঐতিহ্য।...মানবতন্ত্রীরা জড়জগতের

পিছনে কোন ঐশ্বরিক অস্তিত্বের কল্পনা ছাড়াই একদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীরভাবে কৌতূহলী, এবং অপরদিকে মনুষ্যত্বের বিচিত্র সম্ভাবনা আবিষ্কার করে উৎফুল্ল। এরা প্রতিটি মানুষের অনন্যতা এবং স্বতঃসিদ্ধ মূল্যে বিশ্বাসী। এদের উপলব্ধিতে মানুষমাত্রই সৃজনক্ষম এবং সেকারণে আপন ভাগ্য-বিধাতা; এবং মানুষের মধ্যে যে বিচারশক্তি বর্তমান তারই বিকাশের দ্বার, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দর, উচিত-অনুচিতের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভবপর। মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এঁদের কাম্য। এবং তার জন্য এঁরা যেমন একদিকে ব্যক্তির চরিত্রে নানা পরস্পর-বিরোধী বৃত্তির মধ্যে সৌষম্য অর্জনে উদ্যোগী, অপর দিকে তেমনি বিভিন্ন ব্যক্তির ভাবনা, কামনা এবং ব্যবহারের মধ্যে সহযোগিতা এবং সহনশীলতার ভিত্তিতে বাহুবাচনিক ঐক্য রচনায় সচেষ্ট। এই ব্যক্তি-জীবনের সুষমা এবং সর্বমানবীয় সঙ্গতি গড়ে তোলার জন্য এঁদের প্রধান নির্ভর হোল শিক্ষা।...

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এই দুই ধারা পরস্পরে যুক্ত হয়েছিল। তাঁর অধিকাংশ গানে এবং দার্শনিক রচনার মধ্যে ঔপনিষদিক ধারার প্রভাব বেশী স্পষ্ট। তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটক, সামাজিক প্রবন্ধাদিতে রেনেসাঁসী মানবতন্ত্রের বীজ আশ্চর্য ফসলে সার্থকতা লাভ করেছে।...” [—নায়কের মৃত্যু

প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন—

“তোমার পৃথিবী বন্ধু—রাত্রি তার ভয় নাহি জানে
রৌদ্রে নাহি তাপ।
ঝটিকায় পেলে শুধু শক্তির মহিমা, বজ্রে তব
নাই অভিশাপ!
সাঙ্গ করি ফিরে আসি দিবসের নির্লজ্জ সংগ্রাম,
পড়ি তব লেখা;
সুমধুর স্বপ্নগুলি শুভ্র পক্ষে নামে চারিধারে
মিছে অশ্রুরেখা।
তোমার কবিতা বন্ধু, জীবনের আতপ্ত ললাটে
বুলায় অঙ্গুলি।...”

[—বিচিত্রা, আশ্বিন’৩৮

উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বারোখানি : ১। বৌঠাকুরাণীর হাট, ২। রাজর্ষি, ৩। চোখের বালি, ৪। নৌকাডুবি, ৫। গোরা, ৬। ঘরে বাইরে, ৭। যোগাযোগ, ৮। শেষের কবিতা, ৯। দুই বোন, ১০। মালঞ্চ, ১১। চার অধ্যায় ও ১২। চতুরঙ্গ।

এই উপন্যাসগুলি সাধারণভাবে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' ঐতিহাসিক পরিবেশে রচিত রোম্যান্স। সামাজিক পরিবেশে রচিত উপাখ্যান 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'যোগাযোগ'। স্বাদেশিকতার পরিবেশে রচিত 'গোরা,' 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়'। জায়া ও প্রিয়া তত্ত্বের উপর রচিত 'শেষের কবিতা'। জননী ও প্রিয়া তত্ত্বের উপর রচিত 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ'। জীবন ও আদর্শবাদ নিয়ে লেখা 'চতুরঙ্গ'। সমালোচকরা মনে করেন 'গোরা' ও 'শেষের কবিতা' সবার সেরা। 'গোরা' ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে বহু সমস্যা আলোচনায় সমৃদ্ধ। এইখানিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় উপন্যাস। 'শেষের কবিতা' ভাষা, রচনা-নৈপুণ্য ও কাব্যসম্পদে অপূর্ব।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"...কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই আমাদের বাঙলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ প্রথম প্রবর্তন করেন, এবং এই কর্মে তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা সর্বজনবিদিত।"

[—রবিরশ্মি

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"...বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাঙ্গলা উপন্যাসের অগ্রগতি যখন রুদ্ধপ্রায় হইয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথই তাহার জন্য নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা যাহা স্পর্শ করিয়াছে তাহাই দ্যুতিমান হইয়া উঠিয়াছে।... আধুনিক বঙ্গ উপন্যাস তাঁহার প্রদর্শিত পথেই চলিয়াছে।... তাঁহার উপন্যাসাবলী জীবনের জনতাকীর্ণ, গ্রন্থিবহুল কেন্দ্রভাগের ভিতর দিয়া নিজেদের পথ করিয়া লয় নাই ;...আমাদের জনবহুল পল্লীগ্রাম, দ্বন্দ্ববহুল সংসার ও পরিবার, দারিদ্র্য ও ঈর্ষাবিদ্বেষের খরতাপ ক্লিষ্ট জীবনযাত্রা—ইহাদের অন্তর্নিহিত প্রখর বাস্তবতা হইতে তাঁহার সৌন্দর্য-প্রিয় কবিপ্রকৃতি সংকুচিত হইয়াছে।... তাঁহার সৃষ্ট

চরিত্রগুলিকে ঠিক আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের সাধারণ জীবনের সমসুখ-দুঃখভাগী বলিয়া মনে করা যায় না—'চোখের বালির' পর হইতেই তিনি এই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছেন—'চোখের বালিই' তাঁহার শেষ সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। গোরা, আনন্দময়ী, নিখিলেশ, সন্দীপ, অমিত, লাবণ্য, কুমুদিনী—ইহাদিগকে হঠাৎ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বহুপদ-চিহ্নাঙ্কিত রাস্তাঘাটে দেখিবার উপায় নাই।···

···এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই গভীরতর বাস্তবতাই বঙ্কিমের সহিত রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যের প্রধান হেতু ও উপন্যাস ক্ষেত্রে নবযুগ প্রবর্তনের সুস্পষ্ট সূচনা।" [—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

নীহাররঞ্জন রায় বলেন—

"···মানবচিত্তের দ্বন্দ্ব যেখানের যত নিবিড় ও প্রবল, সংগ্রাম যত সূক্ষ্ম ও বিচিত্র, অথচ কার্যের মধ্যে, বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে, দৃশ্য ঘটনার মধ্যে যাহার প্রকাশ খুব কম এবং সেই অনুপাতে হৃদয়ের মধ্যে যাহার অনুভূতি খুব তীব্র, মানব-চিত্তের সেই রহস্যের গভীরতা যেখানে যত বেশি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেইখানে তত বেশি ফুটিয়াছে। সেইজন্য দেখি যেখানে ঘাত-প্রতিঘাত খুব বেশি, জগৎ ও জীবনের উত্থান-পতনের তরঙ্গমালা যেখানে ঠেলাঠেলি করিয়া মরিতেছে, শতকণ্ঠের কোলাহল যেখানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেইখানে মূক হইয়া গিয়াছেন।···সেইজন্য নাটক বলিতে সাধারণত যে ঘটনা-বহুল বৈচিত্র্যবহুল সাহিত্যের রূপ আমরা বুঝিয়া থাকি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সে-নাটকের দৃষ্টি নাই। তাঁহার হাতে নাটক যে-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা মোটেই ঘটনাগত নহে, ভাবগত। এবং এইজন্য রবীন্দ্রনাট্যের একটী বিশেষ রূপ আছে।···কিন্তু ঘটনার লীলাবৈচিত্র্যই যাহার প্রাণ, যেমন সাধারণ নাট্য ও উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেইখানে সার্থক হইতে পারে নাই। সেইজন্যই উপন্যাস তাঁহার হাতে ততটা জমিয়া উঠে নাই, যতটা জমিয়াছে ছোট গল্প, যেখানে বস্তুর ঠেলাঠেলি নাই, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নাই, আছে শুধু বস্তুর পশ্চাতে ঘটনার পশ্চাতে বস্তুর ও ঘটনার ভাবরূপ। সেইজন্যই গীতিকাব্যে, ভাবনাট্যে, ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়।···

বঙ্কিমের রোম্যান্স ছিল বাহ্য-বৈচিত্র্য ও আকস্মিক অপ্রত্যাশিত সংঘটন নির্ভর;···রবীন্দ্রনাথও রোম্যান্টিক; কিন্তু তাঁহার রোম্যান্টিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী অন্তপ্রকৃতির। রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্স আশ্রয় করিয়াছে প্রকৃতির

সহিত মানব মনের গভীর আত্মীয়তাকে, জীবনের অতীন্দ্রিয় রহস্যলোককে, মানব মনের সূক্ষ্ম গভীর সমাহিত ভাবলোককে। এই রোম্যান্স একান্তই অন্তর্মুখী, এই প্রকৃতির রোম্যান্স বাহিরের ঘটনা বৈচিত্র্য অথবা আকস্মিক অসাধারণত্বের কোন অপেক্ষা রাখে না। এই রোম্যান্সই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পগুলিকে গীতধর্মী করিয়াছে, এবং এই রোম্যান্সই রবীন্দ্র-উপন্যাসে কাব্যের ঝংকার ও সুষমা দান করিয়াছে।...

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বঙ্কিম উপন্যাসাপেক্ষা অধিকতর বাস্তবনিষ্ঠ।...”

[—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা

শিবনারায়ণ রায় লিখেছেন—

“পরিণত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের জীবদর্শন বঙ্কিমী জীবনদর্শন থেকে অনেকটা পৃথক, শেষ পর্যন্ত প্রায় তার বিপরীত। সমাজানুগত্য এবং শাস্ত্রীয় নির্দেশের চাইতে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশকে কবি ক্রমশই বেশী মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু দর্শনের বৈপরীত্য সত্ত্বেও মনস্বীতা-প্রধান উপন্যাসের ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমেরই উত্তর-সাধক। ‘বৌঠাকুরাণীর হাট’ এবং ‘রাজর্ষি’ বাদ দিলে তাঁর প্রত্যেকটি দীর্ঘ কাহিনীর কেন্দ্রে কোন না-কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসা হয় প্রচ্ছন্ন, নয় প্রকটভাবে বর্তমান। এমন-কি এ-দুটি রচনার মধ্যেও তত্ত্বজিজ্ঞাসা একেবারে অনুপস্থিত নয়। ‘নষ্টনীড়’ থেকে সুরু করে ‘চার অধ্যায়’ পর্যন্ত প্রতিটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মানবীয় অস্তিত্বের একটি না একটি মূল সমস্যার সঙ্গে আমাদের মুখোমুখী করিয়েছেন। তাঁর স্বকীয় মননের দ্বারা মাজত হয়ে এই সব সমস্যা মানুষ সম্বন্ধে আমাদের অভ্যস্ত ধারণায় বিপ্লব ঘটিয়েছে। তাঁর লেখা থেকে আমরা শুধু গল্পের সুখ উপভোগ করিনি ; জীবনের নানা কঠিন প্রশ্ন নিয়ে নতুন করে ভাব্‌বার যে তীব্র, দুর্লভ বিদগ্ধ আনন্দ, তারও আস্বাদ লাভ করেছি।...

দার্শনিকতার দ্বারা পরিশীলিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে কোন ত্রুটি নেই, তা নয়। তাদের ত্রুটি মুখ্যতঃ দু-ধরণের : শিল্পগত ও দর্শনগত। কখনো কখনো তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা উপন্যাসের প্রবাহ থেকে বিযুক্ত হয়ে তত্ত্বপ্রচারের আকার নিয়েছে; যেমন ‘আনন্দমঠ’ এবং ‘দেবীচৌধুরাণীতে’, কিংবা ‘গোরার’ অনেক জায়গায়। ঔপন্যাসিক তাঁর তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে চরিত্র ও ঘটনার রসায়নে জারিত করে নিতে পারলে তত্ত্ব বোঝা হয়ে ওঠে না। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ যেখানে তা পারেননি সেখানে সেটা তাঁদের শিল্পকর্মের ত্রুটি। অপরপক্ষে আদর্শগত নানা পার্থক্য সত্ত্বেও

এঁদের উভয়ের দর্শনেই অস্তিত্বের একটি প্রধান দিক অনেকটা উপেক্ষিত হয়েছিল : সেটি হোল চৈতন্যের অন্তরালে গূঢ় প্রবৃত্তির ক্রিয়ার দিক। জৈব-প্রবৃত্তি হয়ত মানুষের সব অশান্তির মূল ; কিন্তু তাদের উচ্ছেদ ঘটিয়ে যে শান্তি সে ত মৃত্যুর শান্তি। প্রবৃত্তির প্রাণময় তাগিদেই না চেতনা নব নব রূপে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনাকে উন্মেষিত করে। গীতার দ্বারা প্রভাবান্বিত বঙ্কিম, এবং ব্রাহ্ম পিউরিট্যানিজম্-এর আবহাওয়ায় বর্ধিত রবীন্দ্রনাথ রুচি এবং নীতিবোধের কাছে প্যাশনকে অনেক সময় বলি দিয়েছেন। ফলে তাঁদের কল্পিত চরিত্রগুলি বহুক্ষেত্রে টাইপে পর্যবসিত হয়েছে।" [—নায়কের মৃত্যু

সুবোধ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন :

"…'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'কে প্রথম যুগের গল্পপ্রধান উপন্যাস বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

…'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'। ইহাদের মধ্যে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মানব মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার রহস্য নির্ধারণ কবির উপজীব্য হইয়াছে।…

…'ঘরে বাইরে'…'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা', 'দুই বোন' প্রভৃতি ; এইখানে ঘটনা অপেক্ষা ভাবের মূল্য বেশী।" [—রবীন্দ্রনাথ

বৌঠাকুরাণীর হাট

গল্পাংশ : যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য। তিনি মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করলেন না, স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন সুরু করলেন। কাকা বসন্ত রায় কিন্তু মোগলদের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করার পক্ষপাতী। এই মত-বিরোধের জন্য প্রতাপ খুড়ার উপর ক্রুদ্ধ হলেন। প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্য ও কন্যা বিভা বসন্ত রায়ের অনুগত, প্রতাপ সেটুকু ভাল চোখে দেখেন না।

বিভার বিবাহ হয় চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে। রামচন্দ্র তাঁর বিদূষক রমাই ভাঁড়কে স্ত্রীলোক সাজিয়ে শ্বশুরবাড়ীর অন্তঃপুরে নিয়ে যান। প্রতাপ এই ব্যাপারে অপমান বোধ করেন ও জামাইকে হত্যা করার আদেশ দেন। উদয়াদিত্যের কৌশলে রামচন্দ্র রাজবাড়ী থেকে পালিয়ে যান। এই অপরাধে প্রতাপ উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু বসন্ত রায়ের চেষ্টায় কারাগারে আগুন লাগে, এবং উদয় মুক্তি পেয়ে বসন্ত রায়ের কাছে চলে যায়। প্রতাপ তখন সৈন্য পাঠিয়ে উদয়কে বন্দী করেন। প্রতাপের ঘাতক গিয়ে বসন্ত রায়কে হত্যা করে।

রুক্মিনী নামে এক রমণী উদয়াদিত্যের প্রতি আসক্ত ছিল। সে রাজবাড়ীতে

পরিচারিকার কাজ করতো। উদয়াদিত্যের পত্নী সুরমা নিঃসন্তান। তার সন্তান হবে এই আশা দিয়ে রুক্মিনী সুরমাকে বিষ খাওয়ায়।

পিতার ঔদ্ধত্য, বসন্ত রায়ের হত্যা ও সুরমার মৃত্যু উদয়াদিত্যের মনে বৈরাগ্য জাগালো। পিতার নিকট শপথ করে সে রাজ্যত্যাগ করে কাশী যাত্রা করলো। যাবার সময় বিভাকে সে সঙ্গে নিয়ে গেল, পথে তাকে স্বামীর কাছে পৌঁছে দেবে। কিন্তু চন্দ্রদ্বীপের ঘাটে পৌঁছে তারা শুনলো, রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের উপর রাগ করে আবাব বিয়ে করেছেন। বিভাকে রামচন্দ্র গ্রহণ করলেন না। উদয় ভগ্নীকে নিয়ে কাশী চলে গেলেন।

চন্দ্রদ্বীপের বাজারের কাছে এক ঘাট ছিল, সেখানে বিভার নৌকা এসে লেগেছিল, সেই বাজার সেই সময় থেকে বৌঠাকুরাণীর হাট নামে খ্যাত হলো।

প্রধান চরিত্র: প্রতাপাদিত্য। উদয়াদিত্য। বসন্ত রায়। রামচন্দ্র রায়। প্রতাপের মন্ত্রী। বসন্ত রায়ের ঘাতক মুক্তিয়ার খাঁ। দেওয়ান নয়নচাঁদ। রামচন্দ্রের মন্ত্রী হরিশঙ্কর। রামচন্দ্রের বিদূষক রমাই ভাঁড়। রামচন্দ্রের সেনাপতি ফার্ণাণ্ডিজ। রামচন্দ্রের ভৃত্য রামমোহন। প্রতাপের মহিষী। প্রতাপের কন্যা বিভা। উদয়ের স্ত্রী সুরমা। রাজবাড়ীর পরিচারিকা রুক্মিনী। টোট্‌কা ঔষধ জরী-গুটি বিক্রেত্রী মঙ্গলা। শিমুলতলার চটিরক্ষক প্রতাপের অন্তঃপুর-রক্ষী সীতারাম। সীতারামের বন্ধু ভাগবত। প্রভৃতি। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ঐতিহাসিক উপন্যাস বা রোমান্স। তবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁহার বিশ বৎসর বয়সে উহাকে যতদূর পর্যন্ত 'নবেলি' করা সম্ভবপর, তাহা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।···

অল্প বয়সের রচনা হইলেও এই উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি সুন্দর চরিত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে বসন্তরায়। ···লেখকের অপর আদর্শ চরিত্র উদয়াদিত্য।···উদয়াদিত্য লোকপ্রিয়, দরিদ্রের বন্ধু, আদর্শবাদী, প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী।···

'বৌঠাকুরাণীর হাটে' সুরমার মৃত্যু ও বসন্তরায়ের হত্যাকাণ্ডের দ্বারা ট্রাজেডি হয় নাই; ইহা ট্রাজেডি তখনই, যখন উদয়াদিত্য পিতৃসিংহাসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিজয়দম্ভের মধ্যে যে অসীম শূন্যতা সৃষ্ট হইল, ট্রাজেডি সেইখানে। আর নির্বোধ রামচন্দ্র রায়ের

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের মহোৎসব ক্ষেত্র হইতে সাধ্বী বিভা ফিরিয়া গেলে রামচন্দ্র রায়ের অন্তরের মধ্যে যে গভীর রেখাপাত করিয়া দিল, তাহাই হইতেছে উপন্যাসের যথার্থ ট্রাজেডি।…” [—রবীন্দ্র জীবনী

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

“বৌঠাকুরাণীর হাট’-এ প্রতাপাদিত্যের রুদ্রমূর্তি ও হিংস্র ভীষণতা অপেক্ষা বসন্তরায়ের আনন্দ-বিভোর সরলতা, উদয়াদিত্যের ম্লান ও বিষন্ন মুখচ্ছবি ও বিভার করুণ জীবন কাহিনী আমাদের মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত থাকে।…যে উদাস বিরহ-ব্যাথ্যাতুর রাগিনী তাঁহার গীতি-কবিতায় এরূপ মনোহরণ সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহারই প্রথম কাকলী এই তরুণ বয়সের উপন্যাসে শুনা যায়। প্রতাপাদিত্য তাঁহার নিকট ঠিক জীবন্ত, ঐতিহাসিক মানুষ নহে—সংসারের নির্মম ক্রুরতা, যাহা আততায়ীর মত আমাদের সুখ-শান্তির কণ্ঠ চাপিয়া ধরে ও আমাদের সুকুমার সৌন্দর্য-প্রবণ বৃত্তিগুলিকে নির্দয় পেষণে পীড়িত করিতে চাহে, তাহারই একটা অস্পষ্ট মূর্তি মাত্র।”

[—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন—

“…বৌঠাকুরাণীর হাটে প্রতাপাদিত্যের নির্মম ও হিংস্র ভীষণতার, রামচন্দ্রের নির্বোধ ঔদ্ধত্যের পাশে পাশে যদি বসন্ত রায়ের মুক্ত উদার প্রাণের আনন্দময় সারল্য, বিভার কারুণ্যমণ্ডিত বিষাদ-গ্রস্ত মুখশ্রী, উদয়াদিত্যের ভাগ্যবিপর্যস্ত জীবনের ম্লানিমার কথা চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে সহজেই বুঝা যাইবে শেষোক্ত চরিত্রগুলির স্বচ্ছ সহজ মুক্ত জীবনধারার প্রতিই লেখকের পক্ষপাত বেশি।…” [—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা

সুবোধ সেনগুপ্ত বলেছেন—

“…কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রতাপাদিত্যকে এমন ভাবে আঁকা হইয়াছে যে তাহাতে গল্পের সমস্ত রস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি মানুষ; কিন্তু মনুষ্যজনোচিত কোন বৃত্তি তাঁহার নাই …অন্যান্য পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বসন্তরায় ও উদয়াদিত্য প্রধান কিন্তু তাহাদের মধ্যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নাই।...ইহা ছাড়া অন্যান্য যে সব চরিত্র আছে তাহাদের মধ্যে কতগুলি অস্পষ্ট, আর কতকগুলি বৈশিষ্ট্যহীন।…

…বিভা ও রামচন্দ্র রায়ের মিলনে কুমু ও মধুসূদনের বিবাহের পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে। বিভার চরিত্রে কঠিন ও কোমলের সমাবেশ হইয়াছে… বিভা ও রামচন্দ্র রায়ের প্রকৃতির বৈষম্যের প্রতি কবি অঙ্গুলি নির্দেশ

করিয়াছেন। কিন্তু এই বৈষম্য কিভাবে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করে অথবা কি করিয়া নরনারী সেই অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজেডিকে অতিক্রম করে, তাহার কোন চিত্র দেওয়া হয় নাই।

…রুক্মিনী বিনোদিনীর অপরিণত সংস্করণ। তাহার বুদ্ধি ও শক্তি অসাধারণ, অথচ সে 'ইন্দ্রিয় পরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ, মনোরাজ্যে অধিকার লোলুপ'।… কিন্তু কবি তাহার চরিত্রের বিশদ বিশ্লেষণ করেন নাই।…একদিনের প্রত্যাখ্যানে রুক্মিনী ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া যুবরাজের সর্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইল।…তাহার এই পরিবর্তন অসম্ভব বলিয়া মনে হয়—ইহার মধ্যে সত্যিকার চরিত্র-বিশ্লেষণ নাই ; ইহার আকস্মিকতা অতি-নাটকীয়।"

[—রবীন্দ্রনাথ

অচ্যুত গোস্বামী বলেছেন—

"…'বৌঠাকুরাণীর হাটে' প্রতাপাদিত্য খুব বড় যোদ্ধা, অথচ তাঁর ভিতর যেমন নেই কোন দুর্বলতা, তেমনি নেই কোন রকম উদারতা বা দয়ামায়ার লেশ। এর বিপরীত চরিত্র হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গীতানুরাগী খুল্লতাত ও পুত্রকে। এরা পারস্পরিক ভালবাসার চর্চা এবং তার প্রসারের দ্বারা যে মধুর জীবন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে তাতে কুচক্রী এবং নিষ্ঠুর স্বভাবের প্রতাপাদিত্য বারবার নিয়ে এসেছে প্রচণ্ড বাধা।…পরন্তু মহত্ত্ব এবং বীরত্বের একত্র সমাবেশে বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বীরত্বের মত বর্বরোচিত জিনিসের সঙ্গে মহত্ত্বকে কোনক্রমে মেলাতে পারেন নি। সেইজন্যেই প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত এবং পুত্রের এক বীরত্ব ছাড়া আর কোন গুণেরই অভাব ছিল না। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য আমাদের পূর্বপুরুষদের শৌর্যবীর্য দেখানো নয়, বা তাদের পতনের কারণ দেখানোও নয়;…মানুষের কোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলন করে সুখী হবার অধিকার আছে এই তাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।…" [—বাংলা উপন্যাসের ধারা

রাজর্ষি

গল্পাংশ : গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা। এক বালিকার কথায় মর্মাহত হয়ে তিনি ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বলি নিষেধ করে দিলেন। মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি দেবপূজার ব্যাপারে রাজার এই হস্তক্ষেপে ক্ষুব্ধ হ'লেন। রাজার বিরুদ্ধে তিনি ষড়যন্ত্র করলেন। রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে তিনি প্ররোচিত

করলেন রাজাকে হত্যা করে নিজে রাজা হবার জন্য কিন্তু নক্ষত্ররায় রাজাকে হত্যা করতে পারলো না। শেষে রঘুপতির কথায় রাজার পালিত পুত্র ধ্রুবকে নক্ষত্ররায় অপহরণ করে আনলো। মন্দিরে রঘুপতি ধ্রুবকে বলি দেবার উদ্যোগ করলেন। যথাসময় গোবিন্দমাণিক্য গিয়ে তাঁদের ধরে ফেললেন। রাজা রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়কে রাজ্য থেকে নির্বাসন দিলেন। নক্ষত্ররায় রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। রঘুপতি ক'দিন সময় চাইলেন। ইতিমধ্যে রঘুপতি মন্দিরের সেবক জয়সিংহকে প্ররোচিত করেছিলেন রাজাকে হত্যা করার জন্য। তাঁর আশা ছিল, জয়সিংহ গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করলে তাঁকে আর নির্বাসনে যেতে হবে না। জয়সিংহ রাজবংশের ছেলে। রঘুপতি বলেছিলেন দেবীর প্রসন্নতার জন্য রাজরক্ত চাই। রাজাকে না হত্যা করে জয়সিংহ দেবীর সামনে আত্মহত্যা করলেন। রঘুপতি রাজ্য ত্যাগ করলেন।

নির্বাসিত রঘুপতি গেলেন রাজমহলে। মোগল সুবাদার শাহ সুজার সঙ্গে দেখা করলেন। সুজাকে পরামর্শ দিলেন ত্রিপুরা আক্রমণ করার জন্য। নক্ষত্ররায়কে রঘুপতি মোগলদের দলভুক্ত করে নিলেন। মোগলবাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণ করলো। গোবিন্দমাণিক্য যুদ্ধ করলেন না। নক্ষত্ররায় রাজা হতে আসছে শুনে, তিনি স্বেচ্ছায় রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন চট্টগ্রামে আরাকান রাজ্যের এক দুর্গে। নক্ষত্ররায় ত্রিপুরার রাজা হলেন। রঘুপতি হ'লেন শাসন ব্যাপারে রাজার উপদেষ্টা। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই দেখা গেল রাজ্যশাসনের যোগ্যতা নক্ষত্ররায়ের নেই। রঘুপতি উপেক্ষিত ও অপমানিত হলেন। তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে রঘুপতি গেলেন গোবিন্দমাণিক্যের কাছে। রঘুপতি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। বললেন—'আমি সমস্ত দেখিয়াছি, কিছুতেই সুখ নাই। হিংসা করিয়া সুখ নাই, আধিপত্য করিয়া সুখ নাই, তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহাতেই সুখ। আমি তোমার পরম শত্রুতা করিয়াছি, আমি তোমাকে হিংসা করিয়াছি, তোমাকে আমার কাছে বলি দিতে চাহিয়াছিলাম, আজ আমাকে তোমার কাছে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে আসিয়াছি।'

রঘুপতির অনুরোধে রাজা আবার রাজ্যে ফিরে এলেন।

প্রধান চরিত্র : ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য। রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়। রাজার পালিত পুত্র ধ্রুব। পুরোহিত রঘুপতি। মন্দিরের সেবক জয়সিংহ।

বাংলার সুবাদার সুজা। বিজয়গড় দুর্গের খুড়াসাহেব। দুর্গপতি বিক্রমসিংহ। উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্মণ বিল্বন প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

"...'রাজর্ষি' উপন্যাসের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি দুই বিপরীত শক্তি বা ধর্মের প্রতীক। রাজা হইয়া ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করিয়া, লোকহিতার্থ ধনজন মান মুহূর্তে বিসর্জন করিবার শক্তি রাজা গোবিন্দমাণিক্যের ছিল বলিয়া তিনি যথার্থই রাজর্ষি। কিন্তু রঘুপতি সর্বত্যাগী হইয়াও সংস্কারাবদ্ধ; সংস্কারকেই সে ধর্ম বলিয়া জানিত। ছাগহত্যা বন্ধ হওয়াতে সে নরহত্যা করিতেও প্রস্তুত। ধর্মীয়তা বা আচারকে সে ধর্ম বলিয়া জানে; বিশুদ্ধ প্রেমের ধর্ম হইতে এই বুদ্ধিহীন হিংসাধর্মকে রবীন্দ্রনাথ পৃথক করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র বারে বারে নানা নামে নানা সাজে প্রকাশ পাইয়াছে। ইনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম আদর্শ চরিত্র।..." [—রবীন্দ্র জীবনী

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"...'রাজর্ষি'তেও ইতিহাস তাহার সমস্ত বাহ্য-বৈচিত্র্য ও কোলাহল লইয়া বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। ইতিহাসের রঙ্গভূমি যেন দুইটি আত্মার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের জন্যই পরিষ্কৃত করা হইয়াছে।...

ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণ উভয়েই নিতান্ত সহজ, অগভীর ও জটিলতা বর্জিত। প্রতাপাদিত্য, বসন্তরায়, উদয়াদিত্য প্রভৃতি সকলেই যেন এক-একটি অবিমিশ্র গুণের প্রতিমূর্তি; কোন বিরোধী গুণের সমন্বয় তাহাদের চরিত্রকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে নাই।...রাজা ও রঘুপতিও ঠিক উপন্যাসোচিত প্রসার ও কমনীয়তা লাভ করে নাই।

...রঘুপতি চরিত্রে লেখক অনেকটা জটিলতা আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন—দ্বিধাহীন ধর্মবিশ্বাস, ও ধর্মক্ষেত্রে রাজশক্তির অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে নির্ভীক প্রতিবাদ ক্ষমাহীন প্রতিহিংসা ও নির্মম ক্রূরতার সহিত জয়সিংহের প্রতি সুগভীর স্নেহ ও রমণীসুলভ কোমলতা তাহার চরিত্রে পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এই উভয় ধারা মিশিয়া এক হইয়া যায় নাই।...নক্ষত্ররায়ের নির্বুদ্ধিতা ও পরমুখাপেক্ষিতা একেবারে অবিমিশ্র ও নিরবচ্ছিন্ন; ইহার ন্যায় আতিশয্য কেবল হাস্যরস ও ঘৃণা উদ্রেক করে।...একটা অসমাপ্ত সৃষ্টি

কার্যের লক্ষণ প্রচুর ভাবে বিদ্যমান—উপন্যাসের বিশেষ রূপ ও আকৃতিটি স্পষ্ট হইয়া ফুটে নাই।" [—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

সুবোধ সেনগুপ্ত বলেছেন—

"...'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরাণীর হাট' একই সময়কার রচনা। কিন্তু 'রাজর্ষির' স্থান 'বৌঠাকুরাণীর হাট' অপেক্ষা অনেক উচ্চে।...

রঘুপতি সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের দ্বন্দ্বের যে সুদীর্ঘায়ত চিত্র দেওয়া হইয়াছে, উপাখ্যানের ও চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়া তাহা অতি মনোরম হইয়াছে।... গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয় প্রশান্ত মহাসাগরের মত; তাহার যেমনি গভীরতা, তেমনি বিস্তৃতি।

...নক্ষত্ররায় খারাপ লোক নহে; কিন্তু তাহার কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নাই।...সে চালক ছাড়া চলিতে পারে না।...

উপন্যাসের শেষের অর্ধ পূর্বার্ধ হইতে অনেকটা অপকৃষ্ট। গোবিন্দমাণিক্যের কার্যাবলীর যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে উপাখ্যানের রস নাই। ইহা যেন বীজগণিতে সূত্রের ব্যাখ্যা অথবা ধর্মাচরণের বিজ্ঞাপন।..." [—রবীন্দ্রনাথ

নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন—

"...চরিত্র সৃষ্টির দিক হইতে রঘুপতিই সকলের চেয়ে জীবন্ত এবং সে-ই সর্বাপেক্ষা লেখকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।...গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রের কোনও প্রসার নাই, সহজ ও সরল না হইলেও তাহার মধ্যে খুব বিরোধী উপাদানের সংগ্রাম নাই।...নক্ষত্ররায়েরও প্রাক্-সিংহাসন লাভের জীবনের মধ্যে কোনও মিশ্র বা বিরোধী গুণের সমাবেশ নাই। তবে সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরে ভিতরে যে মানসিক বিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাতে লেখকের খুব সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় এই অপরিণত ভাব কল্পনার মধ্যেই বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে।..." [—রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' এবং 'রাজর্ষি,' এই দুই গ্রন্থের প্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত সাধুভাব আছে, গাম্ভীর্য আছে, ঔদার্য আছে—এক কথায় গম্ভীর সৌন্দর্য আছে।...এই দুইটি গ্রন্থেই যে কয়টি প্রধান চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে সকল কয়টিই অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সেই কারণে সুন্দর হইয়াছে।...'রাজর্ষি'র গোবিন্দমাণিক্যের শান্তসৌম্য মূর্তি বাঙ্গলার উপন্যাসে কয়টি আছে? 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাটের' ঐ রাজা বসন্তরায় দাদামহাশয়ের চিত্রে সৌন্দর্য কি প্রকার

ফুটিয়াছে! যুবরাজ ও তাঁহার পত্নীর দাম্পত্য প্রেমের স্নিগ্ধ পবিত্রতা কি গভীর সৌন্দর্যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়!…'বৌঠাকুরাণীর হাটে' স্বাভাবিকতার সঙ্গে কতক পরিমাণে অস্বাভাবিকতাও মাখানো আছে।… মঙ্গলার পরোক্ষভাবে রাজমহিষী দ্বারা বিষপ্রদানে সুরমার হত্যাসাধন এবং রমাই ভাঁড়ের নিষ্প্রয়োজন কার্যাবলীর চিত্র গ্রন্থের সৌন্দর্য বড়ই বিধ্বস্ত করিয়াছে…সুরমার মৃত্যুর পর প্রতাপাদিত্যের ভয়ে উদয়াদিত্যকে যে প্রকার প্রতিপদে ভীতি-বিহ্বল রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে…রুক্মিনী চাহিবা-মাত্রে তাহাকে উদয়াদিত্যের নিজের হাত হইতে আংটি খুলিয়া দেওয়া… উদয়াদিত্যের চরিত্রের সহিত, তাঁহার ধীর-গম্ভীর বিচারভাবের সহিত ইহার কতদূর সঙ্গতি আসে বলিতে পারি না।…

রবীন্দ্রনাথ চরিত্র অঙ্কনে যেরূপ, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাতেও সেইরূপ সিদ্ধহস্ত। তাঁহার দুইটি গ্রন্থেই মনস্তত্ত্ব প্রকৃতির অন্তর্ভাব ফুটাইবার দিকে বেশী ঝোঁক দেখা গেলেও, প্রকৃতির বহির্বিকাশ বহিঃপ্রকৃতিও বড় কম সুনিপুণ ভাবে অঙ্কিত হয় নাই।…রবীন্দ্রনাথের প্রাকৃতিক বর্ণনার একটু বিশেষত্ব এই যে সেগুলিতে তাঁহার অনির্বচনীয় কবিত্ব মাখানো আছে।…

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি উপন্যাসে, এমন কি 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণী'তেও এক প্রকার সাংসারিকতার, এক প্রকার কামজ পার্থিব প্রেমের চাঞ্চল্য ও মাদকতা আছে;…কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িবার পর রবীন্দ্রনাথের এই দুইটি উপন্যাস পড়িলে যে কি এক অপূর্ব শান্তি আসে, হৃদয় যে কি বিশ্রাম লাভ করে তাহা বলা যায় না। সূর্যতাপে দগ্ধপ্রায় হইলে একটুখানি বটের ছায়াতে মৃদুমন্দ মলয় হিল্লোলের স্পর্শে প্রাণ যেমন স্নিগ্ধ ও শীতল হয়, ক্ষণকালের জন্যও যেমন আমাদের সান্ত ভাব অনন্তের আনন্দে ডুবিয়া গিয়া আশ্রয় লাভ করে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষের' ন্যায় উপন্যাস হইতে রবীন্দ্রনাথের এই দুইটি উপন্যাস পড়িলেও ঠিক সেই ভাবের উপলব্ধি হয়—প্রাণে যেন প্রভাতের সুবিমল বায়ুর স্পর্শ অনুভূত হয়।…"[-আর্ট ও সাহিত্য

চোখের বালি

মহেন্দ্র ও বিহারী দুই বন্ধু ও সহপাঠী। বিধবা কাকী অন্নপূর্ণার পিতৃমাতৃ-হীন বোনঝি আশালতার সঙ্গে মহেন্দ্রের বিয়ে হলো। বিয়ের পর পড়াশুনায় শৈথিল্য দেখা দিল ও মহেন্দ্র ফেল করলো। মা রাজলক্ষ্মী ক্ষুব্ধ হলেন,

সেই ক্ষোভ প্রকাশ পেল অন্নপূর্ণার উপর। অন্নপূর্ণা পিসতুতো ভাইয়ের বাড়ীতে চলে গেলেন। রাজলক্ষ্মীও চলে গেলেন বারাসতে। বিধবা বিনোদিনী সেই বাড়ীর বউ। পিস্-শাশুড়ী রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীর সেবাযত্নে প্রীত হয়ে তাকে কলিকাতায় নিয়ে এলেন।

বিয়ের আগে বিনোদিনীর সঙ্গে প্রথমে মহেন্দ্রের, পরে বিহারীর সম্বন্ধ হয়েছিল। এখন সেই বিনোদিনী বিধবা। বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের আসক্তি দেখা দিল। বিহারী মহেন্দ্রকে সাবধান করে দিল। মহেন্দ্র পাল্টা অভিযোগ করলো—'আমি স্পষ্ট বলছি তুমি আশাকে ভালবাস।'

বিহারী মনের দুঃখে কাশী চলে গেল। কাশীতে তখন অন্নপূর্ণা ছিলেন। মহেন্দ্রকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে তিনি কাশীবাসী হয়েছেন। অন্নাপূর্ণা বহারীকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। কাশীতে গিয়ে বিহারী দেখে আশালতা সেখানে রয়েছে, বিহারীর সেখানে আর থাকা হলো না, সে কলিকাতাতেই ফিরলো। বিহারী বরাবার মহেন্দ্রের বাড়ীতে গেল। দেখে মহেন্দ্র বিনোদিনীর পা ধরে ক্ষমা চাইছে। বিহারী এতটা সইতে পারলো না, মহেন্দ্রের সঙ্গে তার বিবাদ হয়ে গেল।

আশা কাশী থেকে ফিরলো। মহেন্দ্রের জামার পকেটে আশা বিনোদিনীর একখানি চিঠি পেল। বিনোদিনীর উপর মন বিরূপ হয়ে উঠলো। রাজলক্ষ্মীও আর সইতে পারলেন না। বিনোদিনীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হলো। বিনোদিনী বিহারীর বাড়ীতে চলে গেল। বিহারী বিনোদিনীকে দেশে পাঠিয়ে দিল।

মহেন্দ্র বেরুলো বিনোদিনীর খোঁজে। গ্রামে এসে সে বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করলো। গ্রাম-সমাজে নিন্দা হলো। মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনী কলিকাতায় ফিরলো। মহেন্দ্র পটলডাঙ্গায় এক বাসায় বিনোদিনীর থাকার ব্যবস্থা করলো। মহেন্দ্র বিনোদিনীর হাতের পুতুল হয়ে পড়লো। বিনোদিনীকে নিয়ে সে গেল পশ্চিমে।

রাজলক্ষ্মীর হাঁপানী ছিল, মানসিক অশান্তিতে সেই অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল। আশালতার চিঠি পেয়ে অন্নপূর্ণা কাশী থেকে ফিরলেন। বিহারী মহেন্দ্রের বাড়ী আসা বন্ধ করেছিল, তিনি নিজে গিয়ে বিহারীকে ডেকে আনলেন। বিহারী বেরুলো মহেন্দ্রের সন্ধানে। এলাহাবাদে দেখা হলো। মহেন্দ্র বিদ্রূপ করে বললো—বিনোদ-বিহারী। বিহারী তার উত্তরে বললো—আমি বিনোদিনীকে বিয়ে করবো। মহেন্দ্র বার বার বিনোদিনীর কাছে প্রত্যাখ্যাত

হয়েছে, এবার তার আশা ছাড়লো। মায়ের অসুখের সংবাদে সে কলিকাতায় ফিরলো। বিনোদিনী ও বিহারীও এলো।

রাজলক্ষ্মীর দিন তখন শেষ হয়ে এসেছে। তিনি মহেন্দ্রের সকল অপরাধ ক্ষমা করলেন ; বিনোদিনীকেও আশ্রয় দিলেন।

রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হলো। বিহারী বিনোদিনীকে বিয়ে করতে চাইল, কিন্তু বিনোদিনী রাজী হলো না, সে অন্নপূর্ণার সঙ্গে কাশী চলে গেল। যাবার আগে তার শেষ সম্বল দু'হাজার টাকা বিহারীর হাতে দিয়ে গেল তার জনসেবাকার্যে সাহায্য হিসাবে। রাজলক্ষ্মী বারাসতের বাড়ী দান করেছিলেন বিহারীকে। ডাক্তার বিহারী সেখানে গরীবদের জন্য চিকিৎসালয় করলো। মহেন্দ্রও ডাক্তার, সে বিহারীর সহযোগী হলো।

বিনোদিনী ও আশালতা পরস্পর সখীত্বে 'চোখের বালি' পাতিয়েছিল, তা-ই এই উপন্যাসের নামকরণ।

প্রধান চরিত্র : মহেন্দ্র। বন্ধু বিহারী। মা রাজলক্ষ্মী। কাকী অন্নপূর্ণা। মহেন্দ্রের স্ত্রী অন্নপূর্ণার বোনঝি আশালতা। রাজলক্ষ্মীর ভাইপোর বিধবা পত্নী বিনোদিনী, ইত্যাদি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন---

"চোখের বালি' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে যে একটি নূতন ধারা বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহা আজ সর্ববাদীসম্মত।......

নরনারীর যৌন আকাঙ্ক্ষা-অধ্যুষিত সমস্যা ও সংগ্রামের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও বিশ্লেষণ এই উপন্যাসের প্রধানতম বিষয়বস্তু।......

মহেন্দ্রের চরিত্র নিন্দনীয় হইলেও তাহার মধ্যে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ......বিহারী ও বিনোদিনীর বিচ্ছেদের ব্যবধানটা বড়ো হইয়াছে বলিয়া মহৎ সৃষ্টি।...রবীন্দ্রনাথ যথার্থ আর্টিস্ট বলিয়া বিনোদিনীকে কুন্দনন্দিনীর ন্যায় বিধবা বিবাহ দিয়া একটা জটিল পারিস্থিতি সৃষ্টি করিলেন না।...গল্পকে গল্পের ন্যায়ই শেষ করিলেন।..." [—রবীন্দ্রজীবনী

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"...মহেন্দ্রই সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার চরিত্রের সমস্ত পরিবর্তনগুলি এক আতিশয্য ও অসংযমের ঐক্যবন্ধনে গাঁথা। তাহার অপরিমিত মাতৃভক্তি ও পত্নীপ্রেম, বিনোদিনীর সহিত সম্পর্কে তাহার নির্লজ্জ আতিশয্যের পূর্বসূচনা।

বিনোদিনীর চরিত্রে স্থূল বাস্তবতা ও উচ্চ আদর্শবাদ এই দুইটি বিপরীত ধারার সংযোগ হইয়াছে।...

বিহারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়াছে অত্যন্ত বিলম্বে। গ্রন্থের প্রথম হইতে সে কেবল মহেন্দ্রের অনুচর ও উপগ্রহরূপে চিত্রিত হইয়াছে।...মহেন্দ্রের ত্রুটি অপূর্ণতা ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিহারীর চরিত্রে তদ্বিপরীত গুণগুলি আরোপিত হইয়াছে।.....মহেন্দ্রের দুর্জয় বন্যা-প্লাবনের ন্যায় অসংযত হৃদয়াবেগ ও বিনোদিনীর চক্ষুজ্বালাকারী তীব্র রূপ-শিখার সম্মুখীন হইয়া সে (আশা) অনেকটা ম্লান ও নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে।

'চোখের বালিকে' উপন্যাস সাহিত্যে নব-যুগের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। অতি আধুনিক উপন্যাসে বাস্তবতা যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এখানেই তার সূত্রপাত। নৈতিক বিচার অপেক্ষা তথ্যানুসন্ধান ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণই ইহাতে প্রধান লক্ষ্য।..." [—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন—

..."চোখের বালি" বাংলা সাহিত্যে প্রথম সমাজ-জীবনাশ্রিত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক সমস্যানিষ্ঠ উপন্যাস।...

'চোখের বালির' ঘটনা বিন্যাস কতকটা শিথিল। তাহা ছাড়া সমস্ত গল্পভাগ আগাগোড়া এত সহজ সরলভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে এমন জটিল মানসিক ভাঙা-গড়ার মধ্যেও কোথাও গল্প খুব জমাট ও দৃঢ় হইয়া উঠে নাই।... সমস্ত গল্পটি যেন একটি সমতল রেখা; উত্তেজিত মুহূর্ত আছে প্রচুর, কিন্তু লেখকের মনে উত্তেজনা নাই রচনায়ও নাই। ·

...এক হিসাবে মহেন্দ্র চরিত্রই এই উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ও পূর্ণ বিশ্লেষিত।...

বিনোদিনীই 'চোখের বালির' একমাত্র সত্য; সে-ই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত গল্পটাকে উদ্দীপ্ত ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।...সে শয়তানী নয়, সে তাহার অবরুদ্ধ কামনার, অতৃপ্ত যৌন বাসনার আগুনে সংসার পোড়ায় নাই, নিজেকেই শুধু সে দীপ্তিমতী করিয়াছে। কোথাও সে পাঠকের শ্রদ্ধাকে এতটুকু ক্ষুণ্ন করে নাই।..." [—রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' শুধু যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তাহাই নহে; ইহা বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছিল। বাংলার উপন্যাস সাহিত্যে বিধবার

অভিযানের একটা ক্রমবিকাশ আছে। প্রথম কুন্দনন্দিনীতে দেখিতে পাই তাহার কুণ্ঠিত, সলজ্জ, প্রেমভারাতুর মূর্তি। বিনোদিনীতে বিধবার হৃদয়ের অভিব্যক্তি অন্য রকমের। তাহার লজ্জানম্র কুণ্ঠা চলিয়া গিয়াছে সে বিজয় ও প্রতিহিংসার অভিযানে বাহির হইয়াছে। ইহার পর বিধবার আর এক মূর্তি দেখিতে পাই শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী-সাবিত্রী-রমার মধ্যে;...ইহারা প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও ধর্মসংস্কারের মধ্যে সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহা করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদের জীবন মরুভূমি হইয়া গিয়াছে।...

...চোখের বালিতে সাধারণ মানুষের সাধারণ কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অথচ নরনারীর চরিত্রের এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে যে তাহাতে সাধারণ জীবনের আখ্যায়িকা অসামান্যতা লাভ করিয়াছে।...

...মহেন্দ্রের নানা খেয়ালের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হইয়াছে যে মহেন্দ্রের ইতিহাস একটা মহামানবের ইতিহাসের মত কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে।...

...একটী জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র যে কয়টি আছে তাহারা একে অপরকে চিনিয়াও চিনে না। রাজলক্ষ্মী তাঁহার ছেলেকে সাধারণ মায়ের অপেক্ষা অধিক নিকট করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু তিনি ছেলেকে ঠিক বুঝিতে পারেন নাই।...আশার ভুলের তো সীমা নাই। সে তাহার সখী ও স্বামীকে খুবই ভালবাসিত। কিন্তু তাহার স্বামীর সঙ্গে সখীর যে কি সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিল, ইহা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই।...বিনোদিনী আশা অপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও কৌশলী, কিন্তু তাহারও চালে ভুল হইয়াছে।...

মহেন্দ্র কোন দিক বিচার করিয়া কাজ করে নাই; কাজেই তাহার ভুল গণনাতীত।"... [—রবীন্দ্রনাথ

অচ্যুৎ গোস্বামী লিখেছেন—

"সমাজনীতির যূপকাষ্ঠে কীভাবে যে মানুষের মানবীয় বৃত্তিসমূহের স্বাভাবিক গতি দারুণ নিষ্ঠুরতায় অবরুদ্ধ হয় এবং একজন বঞ্চিত বিধবা নারীর পক্ষে যে বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন হওয়া কত স্বাভাবিক এ বইয়ে তাই দেখানো হয়েছে।" [—বাংলা উপন্যাসের ধারা

মনোরঞ্জন জানা লিখেছেন—

"নৈতিক প্রেরণা ও পরিণাম বোধ মহেন্দ্রের জীবনে একান্ত ক্ষীণ। কে

জীবনে এই প্রেরণা প্রবল হইয়া দেখা দেয়, আশৈশব মহেন্দ্র সেই জাতীয় জীবন গঠনে কখন প্রয়াসী হয় নাই।...

মহেন্দ্রের জীবনে কোন গভীরতর জীবন-জিজ্ঞাসার কোন গভীর আধ্যাত্ম-ব্যাকুলতার কিছুমাত্র পরিচয় আমরা লাভ করি না। মানুষ যে-কোন বোধকে আশ্রয় করুক-না-কেন, তাহার জন্য যদি ত্যাগ স্বীকার করিতে দুঃখ ভোগ করিতে প্রস্তুত হয় তবে সেই বোধ পরিণামে উন্নততর জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত করিবেই। মহেন্দ্রের চরিত্রের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত কোথাও এই ত্যাগের বোধ কিছুমাত্র সত্য হইয়া উঠে নাই।...

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ার ফলে বিহারীর স্নেহের ক্ষুধা যেমন মিটে নাই, আশৈশব গৃহবন্ধন না থাকিবার জন্য তাহার মধ্যে একপ্রকার ঔদাসীন্য ও নিশ্চেষ্টতার ভাব গড়িয়া উঠে।...

এই স্নেহের অভাব তাহাকে যেমন উদাসীন করিয়াছে, তেমনি আপনার অসহনীয় একাকীত্ব বোধ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সহস্র কর্মের মধ্যে সে আপনার দিনরাত্রিকে ডুবাইয়া দিয়াছে।...

বিনোদিনী একান্ত সুস্থ, প্রেম ও কল্যাণময়ী রমণী। কিন্তু তাহার অন্তরের এই সমস্ত ঐশ্বর্য যে বোধকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হইবে, যে বোধে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিবে, প্রেমের এই যে বোধ, নারীচিত্তের সেই যে একমাত্র আলোক বিনোদিনী তাহারই আশায় অমন অন্ধকারে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিয়াছে। তাহার এই আধ্যাত্ম পিপাসাই তাহাকে একবার মহেন্দ্রের প্রতি একবার বিহারীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে।...

বিনোদিনীর জীবনে প্রবৃত্তির পীড়া যেমন সত্য তেমনি সত্য তাহার সৌন্দর্য ও মাধুর্যের ধ্যান। মহেন্দ্র বিনোদিনীর মধ্যে এই প্রাণ-সর্বস্ব নারীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বিহারী প্রত্যক্ষ কারয়াছে তাহার মানসরূপ।

...বিনোদিনী আপনার অন্তরের এই পরিচয় আপনিও জানিত না। মহেন্দ্রের মত পুরুষের নিকট নারীর সে পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় না। বিহারীর দুর্লভ পৌরুষ ও মহত্বই বিনোদিনীর ওই স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

বিনোদিনী আপনার উন্নততর সত্তার পরিচয় লাভ করিয়াছে, আর সে পরিচয়ে একজন পুরুষ কেমন শ্রদ্ধান্বিত হয় তাহাও মুগ্ধ হইয়া দেখিয়াছে। ইহাতে বিনোদিনী যেন ধন্য হইয়া গিয়াছে;...বিনোদিনী এতদিন পরে বাঁচিয়া থাকিবার একটা সার্থকতা বোধ করিয়াছে।" [—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

নৌকাডুবি

গল্পাংশ : কলিকাতায় রমেশ পড়াশুনা করে। ভাল ছাত্র, আইন পরীক্ষা দিয়েছে। যোগেন্দ্র রমেশের সহপাঠী। তার বোন হেমনলিনী কলেজে পড়ে। রমেশ ও হেম পরস্পরকে ভালবাসে। তবে বিবাহের একটা বাধা আছে, হেমেরা ব্রাহ্ম।

রমেশের বাবা এক বন্ধুকন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ স্থির করলেন এবং সহসা একদিন কলিকাতায় এসে রমেশকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন দেশে। কন্যার বাড়ী অনেক দূর, নৌকা করে যেতে হয়। বিয়ের পর বরকন্যা ফেরার পথে ঝড়ে নৌকা ডুবি হলো। তাতে রমেশের পিতা ও সঙ্গীরা সকলেই মারা পড়লো। শুধু রমেশ রক্ষা পেল।

জ্ঞান হলে রমেশ দেখলো সে নদীর তীরে পড়ে আছে। কাছেই পড়ে আছে নববধূ। রমেশের চেষ্টায় বধূর জ্ঞান হলো। একখানি নৌকার সাহায্যে রমেশ বধূকে নিয়ে স্বগ্রামে ফিরলো। রমেশের মা ছিল না, পিতার মৃত্যুতে রমেশের একমাত্র অবলম্বন হলো নববধূ। রমেশ জানতো বধূর নাম সুশীলা, কিন্তু একদিন সুশীলা বলে ডাকতেই মেয়েটি বললো—আমার নাম কমলা। রমেশ বিয়ের সময় মেয়েটিকে দেখেনি কাজেই চিনতে পারেনি।

রমেশ বুঝলো কমলা তার বিবাহিতা সুশীলা নয়। কিন্তু কমলাকে সে কিছুই বলতে পারলো না। কমলাকে নিয়ে কলিকাতায় এলো ও একটি বোর্ডিং-স্কুলে তাকে ভর্তি করে দিল। এবং নিজে আলিপুরে ওকালতি সুরু করলো।

রমেশের কোন খবর হেম বা যোগেন্দ্র পায়নি। একদিন আলিপুরের পথে রমেশকে দেখতে পেয়ে হেম ও অন্নদাবাবু রমেশকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। রমেশ যে ইতিমধ্যে বিয়ে করেছে সেকথা হেমকে জানাতে পারলো না। অন্নদাবাবু রমেশের সঙ্গে হেমের বিয়ের কথাটা পাকা করে ফেললেন।

যোগেন্দ্রের বন্ধু অক্ষয় এই বিয়ের বিরোধী। সে সংবাদ সংগ্রহ করলো —রমেশ বিবাহিত, তার স্ত্রী বোর্ডিং-স্কুলে পড়াশুনা করে। ব্যাপারটার সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করে নেবার অবসর হলো না। কমলা বোর্ডিংস্কুল থেকে চলে আসায় রমেশ তাকে নিয়ে অন্যত্র বাসা করলো এবং অন্নদাবাবুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করলো। কিন্তু যোগেন্দ্র রমেশের ঠিকানা বের করলো এবং সেখানে এসে উপস্থিত হলো। রমেশ বললো—কমলা আমার আত্মীয়া।

তারপর কলিকাতায় আর থাকা চললো না। রমেশ কমলাকে নিয়ে গাজিপুরে চলে গেল। সেখানে সদাশয় চক্রবর্তী-খুড়ো রমেশের থাকার সব রকম সুব্যবস্থা করে দিলেন।

রমেশ কলিকাতায় এলো। সকল কথা চিঠি লিখে হেমকে জানাতে চাইল, কিন্তু সে চিঠি দেওয়া হলো না। অন্নদাবাবু তখন স-কন্যা পশ্চিমে চলে গেছেন বায়ুপরিবর্তনের জন্য। সেই চিঠি রমেশের কাছেই রহে গেল এবং রমেশ ফিরে আসার পরে সেই চিঠি পড়লো কমলার হাতে। কমলা চিঠি পড়ে সব জানলো এবং গঙ্গায় ডুবে মরবে বলে রাত্রে গৃহত্যাগ করলো। কিন্তু ডুবে মরা হলো না, মুকুন্দবাবু সস্ত্রীক কাশী যাচ্ছিলেন, তাঁর স্ত্রী নবীন-কালী কমলাকে আশ্রয় দিলেন। নবীনকালীর ভাল একজন রাঁধুনীর দরকার ছিল, কমলাকে তিনি রাঁধুনী নিযুক্ত করলেন।

এদিকে অন্নদাবাবুরা এলেন কাশীতে। নলিনাক্ষ ডাক্তারের সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গতা হলো। অন্নদাবাবু নলিনাক্ষের সঙ্গে হেমের বিবাহের স্থির করলেন।

ইতিমধ্যে কাশীতে কমলা নলিনাক্ষ ডাক্তারের সংবাদ পেল, কমলা জেনেছিল নলিনাক্ষই তার স্বামী। নলিনাক্ষের সঙ্গে সে একবার দেখা করতে উৎসুক হয়েছিল কিন্তু নবীনকালীর তাড়নায় তা সম্ভব হয়নি। ফেরার পথে মোগল-সরাইয়ে গাজিপুরের ভৃত্য উমেশের সঙ্গে তার দেখা হলো, তার সঙ্গে সে চক্রবর্তী-খুড়োর বাড়ীতে এসে উঠলো। খুড়ো তখন কাশীতে আছেন। খুড়ো কমলাকে নিয়ে গেলেন নলিনাক্ষের বাড়ীতে, তার মা ক্ষেমংকরীর আশ্রয়ে কমলার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

এদিকে রমেশ ঘুরতে ঘুরতে একদিন যোগেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলো। বিশাইপুরের ইস্কুলে যোগেন্দ্র শিক্ষকতা করতো। যোগেন্দ্রের সঙ্গে রমেশ এলো কাশীতে। সেখানে হেমের সঙ্গে রমেশের আবার দেখা হোলো।

এদিকে নলিনাক্ষের সঙ্গে হেমের বিবাহ ভেঙ্গে গেল। কমলা নলিনাক্ষের কাছে নিজের পরিচয় দিল, সদাশয় নলিনাক্ষ তাকে গ্রহণ করলো।

এইখানিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশী ঘটনাবহুল উপন্যাস।

প্রধান চরিত্র: রমেশ। রমেশেব বন্ধু যোগেন্দ্র। অন্নদাবাবু। যোগেন্দ্রের বন্ধু অক্ষয়। গাজিপুরের চক্রবর্তী-খুড়ো। চক্রবর্তীর জামাই বিপিন। বালক ভৃত্য উমেশ। নলিনাক্ষ ডাক্তার। অন্নদাবাবুর কন্যা হেমনলিনী। কমলা।

চক্রবর্তী-খুড়োর কন্যা বিপিনের স্ত্রী শৈল। ধনী গৃহিণী নবীনকালী। নলিনাক্ষের মা ক্ষেমংকরী। চক্রবর্তীর স্ত্রী হরিভাবিনী, প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

…"ঘটনা বাহুল্যের দ্বারা উপন্যাস অংশ জটিল।…নায়ক-নায়িকাদের অন্তরের সমস্যার ও বাহিরে সংগ্রামের অন্ত নাই। ঘটনা দ্বারা 'নৌকাডুবির' গল্পাংশ গতিলাভ করিয়াছে।…বাহিরের ঘটনা-পারম্পর্য মানুষের মনে কী বিচিত্র সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা দুর্বলচিত্ত রমেশ, অসহায় কমলা ও হতভাগিনী হেমনলিনীর জীবনেতিহাসে পরিব্যক্ত হইয়াছে।…

…হেমনলিনী সুশিক্ষিতা, রমেশের বাক্‌দত্তা; তাহার প্রেম সুগভীর, যৌনাকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক, অথচ অত্যন্ত সংযত। কমলা অশিক্ষিতা, বালিকা-বধূ—স্বামীকে ভক্তি করিতে হয় এ জ্ঞান তাহার স্বভাবসিদ্ধ। ইহাদের প্রেমের মধ্যে কোনো অশিষ্টতা নাই। রমেশকে লেখক অতি সাধারণ প্রকৃতির বাঙালি করিয়া গড়িয়াছেন ;…রমেশ ঘটনার দাস ; ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সে ভাসিয়া চলিয়াছে, ঘটনা সে সৃষ্টি করিতে পারে না, ঘটনার বিরুদ্ধেও সে দাঁড়াইতে পারে না।…

…'নৌকাডুবিতে' কোনো চরিত্রের মধ্যে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা নাই, অথচ অত্যন্ত সহজ মানবীয় প্রেম সকলেরই আছে। তীব্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কাহারও নাই বলিয়া অনেকগুলি চরিত্র নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বিকাশের অবসর পাইয়াছে।…

…খুড়ো মহাশয় এক অদ্ভুত সৃষ্টি।…

…'নৌকাডুবিতে' সংস্কারগত ধর্মবোধ ও নীতিজ্ঞানই নরনারীর জটিল সম্বন্ধকে সুন্দরের পথে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।…" [—রবীন্দ্র জীবনী

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"উপন্যাসটি আগাগোড়া একটী মৃদু স্বচ্ছন্দগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে—ইহার লঘু, চপল প্রবাহ কোথাও গভীর আবর্তের দ্বারা প্রতিহত হয় নাই। ইহার মধ্যে কোথাও খুব গভীর সুর ঝংকৃত হয় নাই বা খুব জটিল বিশ্লেষণের চেষ্টা নাই। রমেশ, কমলা, অক্ষয়, যোগেন, অন্নদাবাবু, চক্রবর্তী খুড়া খুব সরল ও স্বচ্ছ প্রকৃতির মানুষ…চরিত্র বিশ্লেষণের দিক দিয়া গ্রন্থমধ্যে হেমনলিনীর স্থানই সর্বোচ্চ। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসে আমরা যে জাতীয় নায়িকার সহিত পরিচিত হই, হেমনলিনীই সেই সুপরিচিত Typeএর প্রথম।

উদাহরণ। সে 'গোরার' সুচরিতা, 'শেষের কবিতার' লাবণ্য ও 'যোগাযোগের' কুমুদিনীর পূর্ববর্তিনী—শান্ত, সংযত, নীরব, একনিষ্ঠ প্রেমে আত্ম-সমাহিত, কোমল অথচ অবিচলিত দৃঢ়তায় সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখীন…

গ্রন্থের প্রথম অংশে কমলা চরিত্র খুবই জীবন্ত।…

…নলিনাক্ষ মোটেই ফোটে নাই। সে যেন বক্তার ও ধর্মপ্রচারকের উচ্চ মঞ্চ হইতে সাধারণ জীবনের সমতলভূমিতে কোন দিনই অবতরণ করে নাই।…

ক্ষেমংকরীর নিগূঢ় পুত্রাভিমান ও হেমনলিনীর প্রতি বিরাগ তাহাব আচারপূত হিন্দু বিধবার চরিত্রে কতকটা বৈশিষ্ট্য আনিয়াছে।…

রমেশ অনেকটা 'গোরার' বিনয়ের সমশ্রেণীভুক্ত, তাহার সমস্যা তাহার শক্তিকে অতিক্রম করিয়াছে।…

মোটের উপর একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে 'নৌকাডুবি' প্রথমশ্রেণীর উপন্যাস বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য না হইলেও, রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব ইহার মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, ও নূতন ধরণের বাস্তবতা-প্রধান উপন্যাসের উদাহরণ বলিয়া উপন্যাস-সাহিত্যে ইহার স্থান যথেষ্ট উচ্চে।"

[—বঙ্গ-সাহিত্য উপন্যাসের ধারা

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"…সমস্ত গল্পটিই প্রায় আকস্মিক ঘটনার ফ্রেমে বাঁধা।…

রমেশ আগাগোড়াই দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্বল।…

হেমনলিনীর মূল্য ঐতিহাসিক। যে শান্ত একনিষ্ঠ প্রেমে সে আত্মসমাহিত সেই প্রেমের গৌরবে সে ফুটিয়া উঠে নাই।…কিন্তু সাধারণভাবে তাহার নীরব, সংযত, সমাহিত স্বভাব, সূক্ষ্ম অনুভবক্ষম মন ও হৃদয়, কোমল অথচ দৃঢ়বীর্য, বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখে অচঞ্চল অবিরল দীপ্ত নারীত্বের এক নূতন পরিচয় বহন করিয়া আনিয়াছে, এবং এই পরিচয়ই জীবনের পূর্ণতর অভিজ্ঞতায়, বিচিত্রতর রসে ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হইয়া পরে সুচরিতায়, লাবণ্যে, কুমুদিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। হেমনলিনী ইহাদের সকলের পূর্বাভাস।…

'নৌকাডুবি' গল্প-বর্ণনার ভঙ্গি অত্যন্ত লঘু ও সরল; গল্পবর্ণিত চরিত্রগুলিও অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সহজ। বর্ণনার ভাষা যেমন কোথাও আবেগ-কম্পিত নয় তেমনই চরিত্র ও ঘটনা-বিশ্লেষণের মধ্যেও কোথাও খুব গভীর ও জটিল আলোড়ন ও কিছুই নাই।"

[—রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

…'নৌকাডুবি' চোখের বালির পরে লেখা; কিন্তু আর্টের দিক দিয়া ইহা 'চোখের বালি' অপেক্ষা অ-পরিণত।…ইহা প্রধানতঃ ঘটনাপ্রধান উপন্যাস।…

'নৌকাডুবির' প্রথমার্ধ খুব উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস। রমেশের হৃদয়ের যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার তুলনা অতি বিরল।" [—রবীন্দ্রনাথ

মনোরঞ্জন জানা লিখেছেন—

"হিন্দুনারীর সংস্কারের গভীরতা ও শক্তি পরিমাপ করিতে যে মানস-বলের পরিচয় দান করা উচিত ছিল রবীন্দ্রনাথ তাহা দান করেন নাই। এই পরীক্ষায় কিছুদূর মাত্র অগ্রসর তিনি আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ওই মন্থনে যে পরিমাণ বিষ উঠিবে সেই পরিমাণ বিষের জ্বালাকেও প্রশমিত করিবার মত অমৃত পরিণামে আহরণ করিতে পারিবেন কিনা এই সংশয় তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতে তিনি এই সর্বনাশা পরীক্ষা কার্য হইতে কতকটা সভয়ে নিরৃত্ত হইয়াছিলেন।

…হেমনলিনীর প্রেম কোন সংস্কার এবং তদাশ্রয়ী কোন ধর্ম ও আধ্যাত্ম-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলিয়া অবিচলিত হইয়া থাকিতে পারে নাই, ইহা হয়ত সত্য, কিন্তু তাহাকে বারংবার নিষ্ঠুর পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া ঔপন্যাসিক যেভাবে তাহার হৃদয়ের শক্তি-সীমা পরিমাপ করিয়াছেন, কমলাকে তদনুরূপ কোন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন নাই।

এই সংশয় দোলায় দুলিতে দুলিতে হেমনলিনী পরিশেষে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।…

…রমেশ কতকটা আত্মকেন্দ্রিক আদর্শবাদী পুরুষ। সে সমস্ত কিছু বিচার করিয়া দেখে কেবলমাত্র আপনার দিক হইতে। মনের দিক হইতে কোন বাধা না লাভ করিলে সে কোন কাজে দ্বিধা বোধ করে না।…

…বাস্তব জীবন ও তাহার সমস্যাকে রমেশ সমস্ত অন্তর দিয়া সম্পূর্ণরূপে কখনই স্বীকার করিয়া লইতে পারে না।…একটা কোন ভাবনা উদয় হইলেই রমেশের স্বপ্ন বিলাসী স্পর্শকাতর মন নানা তত্ত্ব ও ভাবনা সৃষ্টি করিয়া চলে…

রমেশ হেমনলিনীকে ভালবাসিয়াছিল। মিলনের লগ্নটি ঘনাইয়া আসিয়াছে এমন সময় ভাগ্য তাহাকে দূরে সরাইয়া লইয়া গেল। কমলাকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালোবাসিবার পর সে জানিয়াছে কমলা তাহার স্ত্রী নহে। তাহার পর

আবার একবার হেমনলিনী আবার একবার কমলা,—এমনি করিয়া বারবার হৃদয় পূর্ণ করিয়া শুধু অশ্রু-সমুদ্র দুই চক্ষে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে।…

…যে সাধনায় মানুষ জীব-জীবনের সর্ববিধ লাঞ্ছনা জয় করিয়া উঠে তাহাই অমৃতের সাধনা। রমেশ তাহার জীবনে গভীরতম দুঃখভোগ, নিরতিশয় নিষ্ঠুর বঞ্চনার ভিতর দিয়া সেই অমৃতের কতকটা আভাস লাভ করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই বাহিরের কোন দুঃখ, কোন ক্ষতি, কোন বঞ্চনা রমেশের জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে নাই।

যে শক্তিতে নর-নারীর দেহ দশা বিজড়িত প্রেম পরিণামে জীবের সকল দশা মুক্ত শুদ্ধ ধ্যান পরিণাম লাভ করে নরনারীর সেই শক্তি আধ্যাত্ম শক্তি। রমেশের প্রেম তেমনি এক নির্দ্বন্দ্ব, শান্ত পরিণাম লাভ করিয়াছে। এখানে বাস্তব জীবনের সকল লাভ ও ক্ষতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়।…

[—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

গোরা

গল্পাংশ : কৃষ্ণদয়াল বাবু পশ্চিমে চাকরি করতেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করেই মারা যান। তারপর তিনি বিয়ে করেন আনন্দময়ীকে। আনন্দময়ী নিঃসন্তান। কিন্তু গোরা তাঁকে মা বলেই জানে। সিপাই মিউটিনির সময় এক মেমসাহেব তাঁর বাড়ীতে এসে লুকায়, রাত্রে একটি সন্তান প্রসব করে সে মারা যায়। সেই ছেলেকে আনন্দময়ী পুত্রবৎ মানুষ করেন, সে-ই গৌরমোহন অর্থাৎ গোরা।

গোরার সহপাঠী বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিনয় পিতৃ-মাতৃহীন। আনন্দময়ী তাকে ছেলের মত ভালবাসেন। গোরা ও বিনয় একই সঙ্গে ইস্কুল-কলেজের পড়া শেষ করেছে। বিনয়-ছাত্র হিসাবে গোরার চেয়ে ভাল, কিন্তু পৌরুষের দীপ্তি গোরার বেশী। গোরা উগ্র হিন্দু,—গঙ্গাস্নান করে, খাওয়া-ছোঁওয়া বিচার করে, মাথায় টিকি রাখে, দেশের কল্যাণ চায় এবং ইংরাজ বিদ্বেষী।

এক বর্ষার দিনে বিনয়ের বাড়ীর সামনে দু'খানি গাড়ীতে ধাক্কা লাগলো। সেই সূত্রে পরেশবাবু ও সুচরিতার সঙ্গে বিনয়ের পরিচয় ঘটলো।

পরেশবাবু ব্রাহ্ম, স্ত্রী বরদাসুন্দরী ও তিন মেয়ে, লাবণ্য ললিতা লীলা। সুচরিতা ও সতীশ বন্ধুর পুত্র-কন্যা। মৃত্যুকালে বন্ধু পরেশবাবুকে অভিভাবক করে যান। এরা পরেশ বাবুর কাছেই থাকে।

বিনয়কে পরেশবাবুর বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গেল সতীশ। সেই থেকে যাতায়াত ও অন্তরঙ্গতা সুরু হলো। এই অন্তরঙ্গতা পছন্দ করলো না পানুবাবু—হারাণচন্দ্র নাগ। সুচরিতার সঙ্গে তার বিয়ের কথা চলছিল। পানুবাবু সমাজে তখন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি—নৈশ ইস্কুলের শিক্ষক, কাগজের সম্পাদক, স্ত্রী-বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী।

কৃষ্ণদয়ালবাবু ছিলেন পরেশবাবুর এক কালের বন্ধু। তিনি গোরাকে পাঠালেন পরেশবাবুদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার জন্য। গোরা সেখানে এলো, কিন্তু বিনয়ের মত একাত্ম হয়ে মিলতে পারলো না। গোঁড়ামির ঔদ্ধত্য তাকে সহজ হতে দিল না।

গোরার দাদা মহিম ঠিক করলো বিনয়ের সঙ্গে তার দশবছরের মেয়ে শশিমুখীর বিয়ে দেবে। মহিম কথা পাড়তে বিনয় মুখোমুখি না বলতে পারলো না, কিন্তু আনন্দময়ী বিনয়ের মনের ভাব আন্দাজ করে সে সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

এদিকে দেশকে একবার ভাল করে দেখার জন্য গোরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। চর-ঘোষপুরে এসে দেখলো জমিদার ও পুলিসের অত্যাচার। গোরা প্রতিবিধানের আশায় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করলো। কিন্তু কোন ফল হলো না। পথে ক্রিকেট খেলার মাঠে ছেলেদের উপর পুলিশের জুলুম প্রতিরোধ করতে গিয়ে গোরাকে হাজতে যেতে হলো।

সেইদিনই সন্ধ্যায় পুরস্কার-বিতরণী সভায় পরেশবাবুর মেয়েদের অভিনয়ের কথা ছিল। বিনয়ও তাদের সহযোগী। সকলে সেখানে গিয়েছিল। কিন্তু গোরার ব্যাপারে ললিতা উত্তেজিত হয়ে অভিনয় না করেই ফিরে এলো। ঘটনাচক্রে বিনয়ও তার সঙ্গে এলো। ললিতা ও বিনয় একসঙ্গে সারারাত স্টীমারে আসায় পানুবাবু নিন্দা রটনা করলেন। বরদাসুন্দরী বিনয়কে তার বাড়ী আসতে নিষেধ করলেন। বিনয়ের মুখ থেকে সব কথা শুনে আনন্দময়ী পরেশবাবুর কাছে গিয়ে বিনয় ও ললিতার বিয়ের প্রস্তাব করলেন।

এদিকে আরেক জটিলতার সৃষ্টি করলেন হরিমোহিনী—বরদাসুন্দরীর বিধবা বোন। স্বামী ও পুত্রকন্যাকে হারিয়ে অবলম্বনহীন বিধবা বোনের বাড়ীতে এসে উঠলেন। তিনি ঠাকুর পূজা করেন, ছোঁওয়া-খাওয়ার সংস্কার মানেন। পরেশবাবু তাঁকে ছাদের ঘর ছেড়ে দিলেন। অল্পদিনের মধ্যে সুচরিতা ও সতীশ তাঁর আপনজন হয়ে উঠলো। হরিমোহিনীর ঠাকুর-পূজা বরদাসুন্দরী

সুনজরে দেখলেন না। সুচরিতার তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার জন্য উৎসুক হলেন। কিন্তু পানুবাবুকে বিয়ে করতে সুচরিতা রাজী হলো না। বরোদাসুন্দরী এবার হরিমোহিনীকে বললেন—এখানে ঠাকুর রাখা চলবে না।

সুচরিতার বাবার দু'খানি ভাড়াটে বাড়ী ছিল, পরেশবাবু তারই একখানিতে মাসীর থাকার ব্যবস্থার করে দিলেন। সুচরিতা ও সতীশ তাঁরই কাছে রইল।

এই সময় একমাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে গোরা ফিরলো।

গোরা বিনয়ের এই বিয়ে সমর্থন করতে পারলো না। বললো—বন্ধুর চেয়ে ধর্মাচার বড়। কিন্তু আনন্দময়ী ও পরেশবাবু ললিতা ও বিনয়ের সমর্থক হলেন। হারানবাবুর সঙ্গে এই বিয়ের ব্যাপারে সুচরিতার বিবাদ হয়ে গেল, সুচরিতা হারাণবাবুকে তার কাছে আসতে নিষেধ করলো। পরেশবাবুকে সমাজচ্যুত করার কথা উঠলো, পরেশবাবু কিন্তু কর্তব্যচ্যুত হলেন না।

হরিমোহিনী ইতিমধ্যে সুচরিতার অভিভাবিকা হয়ে উঠলেন। সুচরিতার বিয়ে দেবার জন্য তিনি বিপত্নীক দেওর কৈলাশের সঙ্গে সম্বন্ধ করলেন। গোরাকে সুচরিতার সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য তিরস্কারও করলেন। কিন্তু সুচরিতা স্পষ্ট বলে দিল--আমি বিয়ে করবো না।

জেলে খাওয়া-ছোঁওয়ার ব্যাপারে যে পাপ হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে গোরা গেল বাগানবাড়ীতে। সেখানে সংবাদ পেল যোগাভ্যাস করতে গিয়ে কৃষ্ণদয়ালবাবুর মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। তখনই সে বাড়ী ফিরলো। স্বামীর অনুরোধে আনন্দময়ী গোরাকে তার জন্মকথা বললেন। এক মুহূর্তে গোরার সব গোঁড়ামি ধূলিসাৎ হয়ে গেল—সে আইরিসম্যানের সন্তান, তার মা নেই, বাবা নেই, দেশ নেই, জাতি নেই, নাম নেই, গোত্র নেই, দেবতা নেই !

গোরা গেল সুচরিতার বাড়ী। নিজের পরিচয় দিয়ে বললো—আমি আজ মুক্ত। সুচরিতার হাত ধরে পরেশবাবুকে সে প্রণাম করলো।

প্রধান চরিত্র : পরেশবাবু। গোরা। বন্ধু বিনয়। মা আনন্দময়ী। পরেশবাবুর স্ত্রী বরদাসুন্দরী। বরদাসুন্দরীর বোন হরিমোহিনী। আনন্দময়ীর স্বামী কৃষ্ণদয়াল। কৃষ্ণদয়ালের পুত্র মহিম। পরেশবাবুর তিন কন্যা লাবণ্য, ললিতা ও লীলা। পরেশবাবুর বন্ধু-কন্যা সুচরিতা। সুচরিতার ভাই সতীশ। পানুবাবু, প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"গোরা উপন্যাসে লেখক দেশের সমস্যাকে মানবীয় পটভূমিতে সর্বপ্রথম বর্ণনা করিয়াছেন।…'গোরায়' যৌন সমস্যা থাকিলেও তাহা কোনো নরনারী হৃদয়ে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার বিষয় হয় নাই;… প্রেমের পথ স্বভাবকে কোথাও অতিক্রম করে নাই।

…বিনয় ও ললিতার প্রেমের মধ্যে সংগ্রাম কম; তাহাদের সংগ্রাম সমাজকে কেন্দ্র করিয়া। গোরা ও সুচরিতার সংগ্রাম ধর্মবিশ্বাসকে লইয়া,—বিতর্ক ঘুরিতেছে তত্ত্বের চারিপাশে, সামাজিক মতামতকে বা ধর্মসংস্কারকে কেন্দ্র করিয়া যত কথার সৃষ্টি; তাই যেন ঘটনাস্রোত দ্রুত চলে না;…

…'নৌকাডুবির' কয়েকটি চরিত্রকে 'গোরার' মধ্যে নূতনভাবে দেখিতে পাই, যেমন হেমনলিনী ও সুচরিতা, ক্ষেমংকরী ও হরিমোহিনী। 'নৌকাডুবির' অন্নদাবাবু ও নলিনাক্ষ মিলিয়া 'গোরার' পরেশবাবু হইয়াছে।…

'গোরার' মধ্যে যেসব বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়।" [—রবীন্দ্রজীবনী

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"…বঙ্গদেশের একটা বিশিষ্ট যুগসন্ধিক্ষণের সমস্ত বিক্ষোভ আলোড়ন, আমাদের দেশাত্মবোধের প্রথম স্ফুরণে সমস্ত চাঞ্চল্য, আমাদের ধর্ম-বিপ্লবের সমস্ত একাগ্রতা ও উদ্দীপনা এই উপন্যাসে স্থান লাভ করিয়াছে।…গোরা, বিনয়, পরেশবাবু, হারাণ, সুচরিতা, ললিতা, আনন্দময়ী—সকলেরই প্রধান আগ্রহ একটা মতবাদ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম ও ব্যবহারগত জীবনে একটা বিশেষ পথ বা চিন্তাধারার সমর্থনে।…গোরাকে একটা জীবন্ত মানুষ অপেক্ষা ভারতবর্ষের দেশাত্মবোধের প্রকাশ বলিয়াই বেশি মনে হয়।…ইহার চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব উন্মেষ যথেষ্ট উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান নয়।

যখন কাব্যের বা উপন্যাসের চরিত্র একটা জাতির সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বা কোন ধর্ম বা সভ্যতার বিশেষত্বের সহিত সম্পূর্ণ একাঙ্গীভূত হয়, তখন তাহার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এই অসাধারণ প্রসারের জন্য খর্ব হইয়া পড়ে বলিয়া আমরা অনুভব করি। শতকণ্ঠের বাণী যদি একের মুখে ধ্বনিত হয় তখন তাহার সেই উক্তির মধ্যে তাহার নিজস্ব সুরটি খুব স্পষ্ট থাকে না।…গোরা যেখানে নিছক তার্কিকতার প্রশ্রয় দিয়াছে, যেখানে সে ঘোষ-চরপুরের প্রজাদের প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বা দেশের অবস্থা-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া হাঁটিয়াছে, সেখানে

জাতীয়তার প্রবল অভিভবে তাহার ব্যক্তিত্ব ক্লিষ্ট, নিষ্পেষিত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে সে তর্কের সূত্র ধরিয়া আনন্দময়ীকে বেদনা দিয়াছে বা বিনয়ের সহিত বোঝা-পড়া করিবার জন্য তাহার অন্তঃকরণের তলদেশে নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির আলোকপাত করিয়াছে, সর্বোপরি যেখানে সে সুচরিতার সহিত নিগূঢ় হৃদয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে সেখানে সে প্রতিনিধিত্বের ছায়ামণ্ডল মুক্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আলোকে ভাস্বর পুরুষ।...

বিনয়ের সহিত ললিতার প্রেমের, উদ্‌ভব ও পরিণতি খুব নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

বিনয় তাহার দ্বিধাসংকোচপূর্ণ সুকুমার হৃদয়টি লইয়া...উভয় সংকটে পড়িয়াছে। তাহার যুক্তি তর্ক মতবাদ হৃদয়াবেগের নিকট মাথা হেঁট করিয়াছে।...

ললিতার সহিত সুচরিতার ভাবগত ঐক্য, অথচ চরিত্রগত পার্থক্য খুব চমৎকার ভাবে দেখান হইয়াছে। ললিতার নির্ভীক বিদ্রোহ ঘোষণার পাশে সুচরিতার শান্ত ধীর, বিনয়-নম্র, নূতন জ্ঞান আহরণের জন্য উন্মুখ, ভক্তিপূর্ণ শিক্ষার্থীর ন্যায় প্রকৃতিটি একটি সুন্দর বৈপরীত্য বিকাশের হেতু হইয়াছে।...

হরিমোহিনীর চরিত্রের মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। গ্রন্থের প্রথমাংশে সে একজন খাঁটি হিন্দুঘরের বিধবা—তেমনি কুণ্ঠিত, তেমনি পরমুখাপেক্ষী, তেমনি সর্বংসহা। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাহার অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।...

আনন্দময়ী ও পরেশবাবুর মধ্যে আনন্দময়ীকে আমরা অধিকতর সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারি।...তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব—সর্বপ্রকার আচার-বিচারগত সংস্কার-নিরপেক্ষতা, সর্ববিধ সংকীর্ণতা হইতে মুক্তি, স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি, পরকে আপন করিবার ও সমস্ত বিষয়ের ভাল দিক লক্ষ্য করিবার অসামান্য ক্ষমতা, নীরব, নিরভিযোগ সহিষ্ণুতা ও করুণ সমবেদনা—গোরাকে পুত্ররূপে স্বীকার করা হইতে সমুদ্ভূত।...

পরেশবাবু খুব জীবন্ত বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হন না; তাঁহার উক্তিগুলির সহিত তাঁহার চরিত্রের খুব ঘনিষ্ঠ সমন্বয় সংসাধিত হয় নাই।...

সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি বা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সে (মহিম) কোন ধার ধারে না, ভণ্ডামি

তাহার নিকট হেয় প্রতারণা নয়, পরন্তু একান্ত প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষার উপায়-মাত্র।...মহিমের তীক্ষ্ণ সাংসারিক বুদ্ধি, সরস বাক্‌চাতুর্য ও অকুণ্ঠিত সুবিধাবাদের প্রতি আনুগত্য বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

কেবল তত্ত্বালোচনার দিক্ হইতে গ্রন্থটির স্থান খুব উচ্চে।"

[—বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"...গোরার প্রসারিত পটভূমি, ইহার সুবিস্তৃত পরিধি, বিশাল ও গভীর জাতীয়-সত্তার তুলনা আজ পর্যন্তও বাংলা উপন্যাসে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তিগত জীবনই ইহাদের একমাত্র পরিচয় নয়; ব্যক্তিগত পরিচয় অতিক্রম করিয়া ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি বৃহত্তর সত্তা আছে, সে-সত্তা বৃহত্তর সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।...গোরা মহাকাব্যের প্রসার ও গভীরতা লইয়া বাংলা-সাহিত্যের প্রথম এবং আজ পর্যন্ত একমাত্র আধুনিক উপন্যাস।...

...গোরা বৃহৎ ও মহৎ ইহার সুনিপুণ ঘটনা সংস্থানের জন্য, গোরা-বিনয়-ললিতা-সুচরিতার চরিত্র-বিকাশের ধারা ও গতিভঙ্গির জন্য, ইহার মনন সমৃদ্ধির জন্য, ইহার গভীর ও সুউচ্চ আদর্শ মহিমার জন্য, ইহার পরিকল্পনার জন্য, ইহার বস্তুধর্মের দৃঢ়তার জন্য।...

...আনন্দময়ী...সহজ স্বাভাবিক।...সর্বসংস্কার মুক্ত, মতামত-নিরপেক্ষ, সুগভীর সহানুভূতি-দৃষ্টিসম্পন্ন, সকল চিত্তের পরমাত্মীয়, সকল সংকীর্ণতা মলিনতা মুক্ত এবং সুগভীর বোধ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই মহীয়সী মহিলাটির উপন্যাস-গত চরিত্রের একমাত্র রহস্য-চাবি হইতেছে গোরা স্বয়ং।

পরেশবাবু আনন্দময়ীর মতন এত স্বচ্ছ ও সহজ নহেন।...সমগ্র গ্রন্থটিতে এতখানি জায়গা জুড়িয়া থাকিয়াও, সু-উচ্চ বেদীতে বসিয়া মহৎ আদর্শানু-প্রেরিত এত কথা কহিয়াও, সকল ঘটনাবর্তের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত থাকিয়াও কোথাও যেন তিনি নাই, কোথাও যেন তাঁহার এতটুকু প্রভাবের চিহ্নও নাই।...পরেশবাবুর সার্থকতা পরেশবাবুতেই, ঐখানেই তাঁহার শেষ;...

...পানুবাবু ও মহিম একই জাতীয় জীব, দুই আধারে দুইরূপ লইয়াছে মাত্র।...হরিমোহিনীর চরিত্র কিন্তু এতটা সহজবোধ্য নয়; এ-চরিত্র একটু নূতন এবং এই ধরণের বিকাশ ও পরিণতি সচরাচর দেখা যায় না।...শুধু

সুচরিতার প্রতি স্নেহাতিশয্যের যুক্তি দিয়া ইহাকে যেন ব্যাখ্যা করা যায় না।

…'চোখের বালিতে' বিনোদিনী যদি বিহারীর ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন করিয়া থাকে। 'গোরার' বিনয়ের ব্যক্তিত্ব উদ্বোধন করিয়াছে ললিতা। পূর্বজীবনে বিনয় ছিল গোরার ছায়ামাত্র ;…

…সুচরিতা তেজস্বিনী বিদ্রোহিনী নয়। ‥নম্রতায় ও ভক্তিতে সে আনত, নিজের সম্বন্ধে সে একান্তভাবে উদাসীন।…আত্মানুসন্ধানই তাহার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করিয়া তাহার চারিদিকে কোমল কমনীয় দীপ্তি বিকীর্ণ করিয়াছে ;…" [—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"…ইহাকে একখানি গদ্য মহাকাব্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। গোরা একটি বিরাট মানব ; মহাকাব্যের নায়কের মধ্যে যে শক্তি তেজ ও প্রতিভা থাকা উচিত তাহা তাহার চরিত্রে খুব বেশী করিয়াই আছে। কেবল মহাকাব্যে যে বিরাট সংঘর্ষের চিত্র দেওয়া হইয়া থাকে, এই উপন্যাসে সেইরূপ কিছুই নাই। গোরার বিরুদ্ধে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তাহার সমকক্ষ… কবি চাহিয়াছেন নানা ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়া গোরার বুদ্ধির তীক্ষ্নতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, অনুভূতির সঙ্কীর্ণতা ও গভীরতা ফুটাইয়া তুলিতে এবং তাহার এই চেষ্টা যে অপরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে সেই সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।…

…গোরা যে তর্ক করে, তর্ক হিসাবে তাহার মূল্য কম , কিন্তু প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে তাহার বিরাট হৃদয়ের অনুভূতি জড়িত হইয়া আছে।…গোরার হৃদয়ের প্রধান প্রবৃত্তি—আত্মসম্মান বোধ।‥ গোরার চরিত্র প্রশান্ত নহে, কিন্তু তাহা অতিশয় ঋজু।…" [—রবীন্দ্রনাথ

গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"হিন্দুধর্মের ও সমাজের ভিতর কোন গলদ ঢুকিয়াছে কি না, তাহার কোন অঙ্গ পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে কি না, যদি হইয়া থাকে তাহা একেবারে পরিত্যজ্য কি না ? …ইহা লইয়াই পাতার পর পাতা সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিতর্ক এবং চুলচেরা বিভাগ—কিন্তু সমস্যার সমাধান বা তাহার পন্থা নির্দেশ করা নাই। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সর্বপ্রকার মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকের ও ভবিষ্য সংস্কারকদের উপর সমাধানের ভার দিয়াছেন।

এই যে উপন্যাসকে সমস্যামূলক করিবার চেষ্টা এবং এই শ্রেণীর প্রশ্নের সমাবেশ আমরা 'গোরার' আগে দেখিতে পাই নাই—তাই 'গোরা' বাঙলা উপন্যাস-সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্তন ও প্রথম প্রশ্ন তুলিয়াছে বলিতেছিলাম।"

[—বিচিত্রা, আশ্বিন '৩৮

মনোরঞ্জন জানা লিখেছেন—

"...গোরার ধ্যানের ভারতবর্ষ ও বাস্তব ভারতবর্ষের মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্য সাধনের সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও ব্যর্থতা, তাহার আধ্যাত্মিক শূন্যতাবোধ এবং শূন্যতাবোধের ভিতর দিয়া পরিণামে যে নব চেতনার জন্ম,—এই প্রত্যেকটি পর্যায় রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়।...

রবীন্দ্রনাথের গোরা কোন বিশেষের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া সকল বিশেষ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণের সন্ধান করিতে হইয়াছে। ইহা কোন বিশেষের ভিতর দিয়া নির্বিশেষ সত্যোপলব্ধি নয়। গোরার নিকট বিশেষের বোধ মাত্রেই বন্ধন। গোরা তাই পরিণামে সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। এই বন্ধন রবীন্দ্রনাথকেও ছিন্ন করিতে হইয়াছিল এবং ইহার জন্য তাঁহাকেও দুশ্চর তপস্যা নিমগ্ন হইতে হয়।...

এক একটি বিশেষ যুগে এমন এক-একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহার নিকট অতীতের সকল সংস্কার, সকল প্রতীক নিষ্প্রাণ বলিয়া অনুভূত হয়। তাঁহার নিকট পশ্চাতের সমস্ত পথ রুদ্ধ, অথচ সম্মুখের পথও অনাবিষ্কৃত। এই মানুষই সম্পূর্ণরূপে একা, এই মানুষই যথার্থরূপে আধুনিক। নির্বিশেষে তত্ত্বোপ-লব্ধি করিতে তাঁহাকে আপনার পথ সম্পূর্ণ আপনার নিয়মে উদ্ভাবন করিতে হয়। এই সাধনা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সাধনা। গোরা পরিণামে এই সাধন-পথটিকে আশ্রয় করিয়াছে।"

[—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

অচ্যুৎ গোস্বামী লিখেছেন—

"...গোরা আসলে 'আনন্দমঠের' প্রতিপাদ্যের জবাব। 'আনন্দমঠের' জাতীয়তার আদর্শে প্রাচীন ভারতের আদর্শ; গোরা দেখিয়ে দিল তার সঙ্গে আরও চাই গণতন্ত্র, মানবীয় বৃত্তির প্রাধান্য, সমানাধিকার। তা যদি পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করতে হয়, তবু। আমাদের জাতীয় চিন্তাধারায় গোরা নিয়ে এল গণতন্ত্র ও মানবতন্ত্রে নতুন আলোকবার্তিকা।"

[—বাংলা উপন্যাসের ধারা

ঘরে বাইরে

গল্পাংশ : নিখিলেশ, সন্দীপ ও বিমলা তিনজনের ডায়েরী নিয়ে এই কাহিনী। নিখিলেশ জমিদার, বিমলা নিখিলেশের স্ত্রী, সন্দীপ বন্ধু এবং স্বদেশী নেতা। স্বদেশী প্রচার করতে সন্দীপ নিখিলেশের গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলো। নিখিলেশের গৃহে বিমলার সঙ্গে পরিচয় হলো। সন্দীপের ব্যক্তিত্ব ও স্তাবকতা বিমলাকে আকৃষ্ট করলো; বিমলার মনে দুর্বলতা দেখা দিল। বিলিতি কাপড় বয়কটের ব্যাপার নিয়ে সন্দীপের দল অত্যাচার সুরু করলো। গরীব ফেরিওয়ালার সব কাপড় কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হলো, উপরন্তু বিলিতি কাপড় বেচার জন্য জরিমানা করা হলো একশো টাকা। মিরজানের নৌকা হাটে কাপড় নিয়ে আসতো, তার নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হলো। নিখিলেশ এই ধরণের ধ্বংসমূলক কাজের বিরোধী। তার সঙ্গে বাধলো সন্দীপের আদর্শের বিরোধ। নিখিলেশ জীবন-শিল্পী, সে বিলিতি কাপড় বয়কট করার আগে দিশি কাপড় বোনার ব্যবস্থা করতে চায়।

বিমলা সন্দীপকে মনেপ্রাণে সমর্থন করে। সন্দীপ বিমলার কাছ থেকে টাকা চাইল কাজের জন্য। নিখিলেশের সিন্দুক থেকে বিমলা ছ'হাজার টাকার গিনি চুরী করে সন্দীপের হাতে দিল। পরে ধরা পড়ার ভয়ে নিজের গহনা দিল অমূল্যকে বেচতে। অমূল্য আদর্শবাদী কিশোর, সন্দীপের শিষ্য হয়ে দেশের কাজে নেমেছে। অমূল্য সে-গহনা বিক্রী করতে গেল না। রাত্রে জমিদারীর খাজাঞ্চিখানা লুঠ করলো। মাত্র ছ'হাজার টাকা সে নিয়ে এলো। সেই টাকা সে দিল বিমলাকে। বিমলা সে টাকা নিতে পারলো না। সে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে বললো। অমূল্য টাকা ফেরৎ দিতে গিয়ে ধরা পড়লো।

হরিশ কুণ্ডু জমিদার। সন্দীপের সঙ্গে যোগ দিয়ে সে প্রজাদের উপর নানা অত্যাচার করছিল। মুসলমান প্রজারা ক্ষেপে গেল। একদিন তারা হরিশ কুণ্ডুর কাছারী লুঠ করলো। দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে গেল। নিখিলেশ ছুটলো সেই দাঙ্গা থামাতে। মারাত্মক আহত হয়ে নিখিলেশ ফিরে এলো। গভীর মনোবেদনার মধ্যে দিয়ে বিমলা এবার চিনলো স্বামীর আদর্শনিষ্ঠার মহত্ত্ব।

প্রধান চরিত্র : জমিদার নিখিলেশ। নিখিলেশের পত্নী বিমলা। স্বদেশী নেতা সন্দীপ। নিখিলেশের মাষ্টারমশাই চন্দ্রনাথবাবু। নিখিলেশের বিধবা

ভ্রাতৃবধূ মেজোরাণী। বিপ্লবী বালক অমূল্য। হরিশকুণ্ডুর প্রজা পঞ্চু। নৌকার মাঝি মিরজান, প্রভৃতি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"...'ঘরে বাইরে'-এর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দুটি স্তর আছে—প্রথমটি রাজনৈতিক ও দ্বিতীয়টি সমাজনীতিমূলক। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে উচ্ছ্বসিত দেশপ্রীতির জোয়ারের তলে যে আত্মপ্রচারের ও নীতিজ্ঞানবর্জিত সাফল্যলোলুপতার একটা পঙ্কিল স্তর ছিল, লেখক সন্দীপের চরিত্রে তাহাই একেবারে অনাবৃতভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।...নিখিলেশের অবিমিশ্র আদর্শবাদ তাহার ব্যক্তিত্বকে শীর্ণ ও ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। অবশ্য লেখকের দিক হইতে বলা যাইতে পারে যে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। নিখিলেশের চরিত্রে তিনি রক্তমাংসের আধিক্য ইচ্ছাপূর্বকই বর্জন করিয়াছিলেন।...

বিমলা তাহার আত্মাভিমান, তাহার প্রশংসা-লোলুপতা, তাহার আধিপত্যপ্রিয়তা, তাহার নারীসুলভ অস্থির-মতিত্ব ও চিত্ত-চাঞ্চল্য লইয়া সর্বাপেক্ষা সজীব চরিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আর একটা অপ্রধান চরিত্রও অতর্কিতভাবে অত্যন্ত সজীব হইয়া উঠিয়াছে—সে মেজরাণী।...নিখিলের সমস্ত জ্বালাময় ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে মেজরাণীর স্নেহ স্থির-রশ্মি দীপশিখারই মত একটি স্নিগ্ধ, অনির্বাণ আলোকরেখা বিকীর্ণ করিতেছে।

...কলাগত ঐক্য ও ভাবগত সুসংগতিতে—এক কথায় সাধারণ সমন্বয় নৈপুণ্যে (General unity of atmosphere) ইহার (ঘরে বাইরে) স্থান খুব উচ্চে।" [—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"সন্দীপ কবির একটি অপরূপ সৃষ্টি। লোকধর্ম ও দেশধর্মকে শাশ্বত মানবধর্মের উপর স্থান দান করিতে যাহাদের ধর্মজ্ঞানে বাধে না সন্দীপ তাহাদের প্রতীক।...নিখিলেশের ধর্মশাস্ত্র অনুসারে মানুষের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করাই দেশসেবকদের একমাত্র কর্তব্য—তাহাই ধর্মবিজয়।...নিখিলেশের বাহিরের জীবনে অসংখ্য ক্ষুব্ধতা থাকিলেও অন্তরে তাহার সত্য মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

...কয়েকটি চরিত্র স্বল্প পরিসরের মধ্যেও আশ্চর্যরূপে জীবন্ত হইয়াছে।—মেজরাণী, অমূল্য ও চন্দ্রনাথবাবু। মেজরাণীর ব্যর্থজীবনের মধ্যে বহুপ্রকার

স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা ও লঘুতা থাকা সত্ত্বেও দেবরের প্রতি তাহার অকৃত্রিম স্নেহ তাহার সমস্ত নঙাত্মকতাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। অমূল্য রুদ্রযুগের বাঙালি যুবকের প্রতীক,—হেলায় জীবন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। চন্দ্রনাথ বাবুকে আমরা কবির অন্যান্য নাটক ও উপন্যাসে নানা রূপে নানা নামে দেখিয়াছি। 'রাজর্ষির' বিল্বন হইতে 'চতুরঙ্গের' জ্যাঠামশাইয়ের মধ্যে ও রূপক নাট্যগুলির ঠাকুরদা, দাদাঠাকুর প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি আদর্শ মানবচরিত্র বারে বারে দেখা দিয়াছে।…" [—রবীন্দ্রজীবনী

অচ্যুৎ গোস্বামী লিখেছেন—

"…বিমলার সামনে দুই পুরুষ এসে উপস্থিত, একজন নিখিলেশ, তার স্বামী ধীর, স্থির, আত্মবাদী, জ্ঞানতাপস, যার সহনশীলতা অসীম, যে তার আইনসঙ্গত অধিকারও জোর করে প্রয়োগ করতে চায় না; আর একজন সন্দীপ, অস্থির দেহবাদী, আবেগপ্রবণ ভোগচিন্তাই যার জীবনের সর্বস্ব এবং ভোগ্যবস্তু সে গায়ের জোরে আদায় করে নেবে। জাতীয়তার আদর্শবিচারে এরা দুরকম আদর্শের বাহক—নিখিলেশ ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং আত্মিকতার ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে বিশ্বমানবতার আদর্শের সমন্বয়ে, সংগ্রামে বলপ্রয়োগে কোন মহৎ প্রাপ্তি ঘটতে পারে বলে বিশ্বাসী নয়; সন্দীপ পাশ্চাত্ত্য ভোগবাদ এবং বলপ্রয়োগের আদর্শে বিশ্বাসী। এই অতীন্দ্রিয়তা বনাম ভোগবাদ, বিশ্বমৈত্রী বনাম হিংসা—বিমলা এর মধ্যে কাকে গ্রহণ করবে। সমাজতাত্ত্বিক অর্থে বিমলা একজন নারীমাত্র। জাতীয়তার আদর্শের অর্থে বিমলা ভারতীয় জনসাধারণ। স্থূল ভোগবাদের বা জাতীয়তার জড়-শক্তির উদ্বোধনের আপাত আকর্ষণ অনেক বেশী, কাজেই বিমলা যে প্রথমে সন্দীপের দিকে ঝুঁকবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু শুভবুদ্ধি নিশ্চয় একদিন ফিরে আসবে এবং সেদিন বিমলাকে আবার ফিরে আসতে হবে নিখিলেশের কাছে।…'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিমূর্ততার আশ্রয় নিয়েছেন।"

[—বাংলা উপন্যাসের ধারা

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"…'ঘরে বাইরে' গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ চরিত্র হইতেছে সন্দীপ ও বিমলা। সন্দীপের চরিত্র যদি বা আপাতদৃষ্টিতে তাহার মতবাদ দ্বারা কতকটা ক্লিষ্ট, বিমলার ক্ষেত্রে তাহাও নয়।…সন্দীপের শক্তি আছে এবং সে-শক্তি ব্যবহার করিবার সমস্ত কৌশল তাহার করায়ত্ত, কিন্তু তাহার চরিত্র বলিয়া কোন পদার্থ

নাই। বিমলাকে যে সন্দীপ আকর্ষণ করিয়াছে তাহার ক্রমবিকাশ অতি সুনিপুণ; প্রথমে সে তাহাকে দেশসেবার সহযোগিতায় অসংকোচ অথচ সসম্মান আহ্বান জানাইয়াছে ক্রমশঃ···স্তরে স্তরে শেষ পর্যন্ত প্রণয় নিবেদনে গিয়া পৌছিয়াছে। তারপর ধীরে ধীরে সন্দীপের মুখোশ খুলিতে আরম্ভ করিল···শেষ পর্যন্ত অমূল্যকে উপলক্ষ করিয়া ঈর্ষার ছিদ্র পথ দিয়া তাহার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা বিমলার কাছে ধরা পড়িয়া গেল।···শেষ পর্যন্ত একথা সে জানিয়া গিয়াছে যে তাহার মতন শক্তিমানের কাছেও দুর্লভ এমন বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিদিনের মানব সংসারে আছে।···

···এই উপন্যাসে বিমলাই সর্বাপেক্ষা জীবন্ত।···স্বল্পায়তনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সজীব ও অভিনব চরিত্র মেজরাণীর।··· মেজরাণী নিখিলেশের জীবনের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা দুঃখজ্বালার সঙ্গিনী হইয়া একটি স্নিগ্ধ কোমল আশ্রয়ের মধ্যে তাহাকে ঘিরিয়া রাখিলেন।···

'ঘরে বাইরে' গ্রন্থেই লেখক উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম চলিত ভাষা ব্যবহার করিলেন।···গল্পবস্তুর গতিবেগ তাহাতে বাড়িয়াছে এবং বিষয়বস্তুকে তাহা সমৃদ্ধও করিয়াছে।···ঘটনা স্রোতও এত দ্রুত যে চরিত্রগুলিও যেন সেই স্রোতের মুখে অনিবার্য বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে।··"

—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"···এই উপন্যাসের আখ্যানভাগে স্বদেশীযুগের কথা আছে; কিন্তু ইহা স্বাদেশিকতার উপন্যাস নহে।··

···সন্দীপ জীবন্ত মানুষ; তাহার প্রত্যেক কর্মে, প্রত্যেক বাক্যে প্রাণবান সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। সে লোভ করে, কারণ সে লাভ করিতে চায়। সে যাহা চায় তাহা স্পষ্ট করিয়াই চায়, কোন লুকোচুরি করে না।···ন্যায়-অন্যায়বোধের কোন মূল্য তাহার কাছে নাই।··· স্বদেশীর মূলমন্ত্র হইতেছে স্বার্থত্যাগ; তাই সন্দীপের সঙ্গে স্বদেশীর কোন সত্যিকার সংযোগ নাই। কিন্তু তবুও স্বদেশীকে সে গ্রহণ করিয়াছে কারণ সন্দীপ ক্ষমতালোভী।···

অমূল্য ও মেজরাণী উপন্যাসে খুব মুখ্য; মেজরাণীর সস্নেহ কটাক্ষ ও অমূল্যের নিঃস্বার্থ প্রীতি বিমলাকে অনুক্ষণ স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে সন্দীপের

সংসর্গ কত কদর্য।···বিমলাকে আরও একটু কম সচেতন করিলে আর্টের দিক দিয়া সে পরিণতি লাভ করিত।···

···নিখিলেশ 'গোরার' পরেশবাবুর জাতীয় লোক ;—অর্থাৎ সে ভয়ঙ্কর ভাবে আদর্শ মানুষ।···নিখিলেশের কথা সন্দীপের চেয়ে ভাল, কিন্তু সে নিজে সন্দীপ অপেক্ষা নির্জীব।···সে প্রণয়ী, সে কবি।···তাহার এই অনুভূতিপরায়ণতাই সজীব, আর যা কিছু তাহা শুধু ভাল কথায় ঝুরি।" [—রবীন্দ্রনাথ

মনোরঞ্জন জানা লিখেছেন—

"বিমলার স্বভাবের মধ্যে স্থূলতা একটু অধিক মাত্রায় ছিল বলিয়া সন্দীপের কামনাগ্নি স্পর্শে মুহূর্তে সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে।···বিমলা আপনার পরিচয়ে আজ আপনি বিস্মিত। দেশাত্মবোধের একটা ছদ্মবেশ না থাকিলে এবং আপনার মনকে ভুলাইবার এমন একটা উপায় না থাকিলে হয়ত তাহার এই স্খলন এত দ্রুত হইত না।···

বিমলার জীবনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহা প্রবৃত্তি ও সংস্কারের মধ্যে নয়। সমগ্র উপন্যাস কাহিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোথাও তাহা উল্লেখ করেন নাই।··· বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্ব শ্রেয়ের সহিত প্রেয়ের। বিমলা সতীত্ব-বোধ হইতে, স্বামী-প্রেমের বন্ধন হইতে, বধূর সংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, পরিণামে ওই সকল বোধ ও ধর্মবিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা বুঝিলে বিমলা চরিত্রের মূল ভাব প্রেরণাকেই ভুল বুঝা হইবে।

স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিবার জন্য, উন্নততর পরিণাম লাভের জন্য সে মানুষের সহজাত আধ্যাত্ম প্রেরণাকে আশ্রয় করিয়াছে। এই প্রেরণায় সংস্কার মাত্রেই বন্ধন। মানুষের মধ্যে এই যে সহজাত আধ্যাত্ম প্রেরণা নারীর জীবনে তার প্রথম প্রকাশ ঘটে স্নেহরূপে। এই স্নেহ তাহাকে প্রথম ত্যাগ করিতে শেখায়, চিত্তবৃত্তিকে ধীরে ধীরে অন্তর্মুখীন করে।

বিমলার জীবনে এই শ্রেয়ের বোধ জাগ্রত করিয়াছে কিশোর অমূল্য। এই শ্রেয়ের বোধ প্রবল হইয়া উঠিতে তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব অবসানের দিকে ঝুঁকিয়াছে।···

নিখিলেশের মধ্যে ছিল প্রকৃত জীবন-পিপাসা।—এই দুর্লভ সত্তার আদি ও অন্ত মথিত করিয়া অমৃত আস্বাদ করিবার গভীর ব্যাকুলতা।···

নিখিলেশ বিমলাকে তাহার পূর্ণ জীবন-সাধনার সঙ্গীরূপে লাভ করিতে

চাহিয়াছে। তাহার প্রেমের সাধনা ও পূর্ণ জীবনের সাধনা ছিল অভিন্ন।…
…নিখিলেশ যে বোধাশ্রয়ী হইয়া তাহার ব্যর্থ প্রেমের বেদনা জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহাকে নির্বিশেষ আত্মতত্ত্ব ভূমাতত্ত্ব বলা যাইতে পারে।…

…সন্দীপ চরিত্র সৃষ্টির পশ্চাতে জীবনের কোন বিস্ময় প্রেরণা নাই বলিয়া তাহা তুচ্ছতায় পর্যবসিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সন্দীপ কোন কিছুতেই বিশ্বাস করে না। এই কোন কিছুতে বিশ্বাস না করা যদি একটি দর্শন হয় তবে তাহাই সন্দীপের একমাত্র জীবন-দর্শন।…

সন্দীপ জীবনে একমাত্র প্রবৃত্তির দিকটিকে সত্য বলিয়া মানে। এই প্রেরণায় মানুষ বহির্মুখী, ভোগের উপকরণে তৎপর। অন্যদিকে নিখিলেশ একমাত্র নিবৃত্তির দিকটিকে জীবনে সত্য বলিয়া মানে।…

বিমলাকে ভালোবাসিয়া সন্দীপ আজ জীবনের এমন একটি মূল্য বোধ করিয়াছে, যাহা প্রবৃত্তির অনেক উর্ধ্বের সামগ্রী যাহাকে মানুষ যুক্তি বিচার দিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে পারে না।…

এই প্রেম সন্দীপের দৃষ্টিকে আবরণ মুক্ত করিয়াছে।”

[—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

যোগাযোগ

গল্পাংশ : বিপ্রদাস ও সুবোধ দুই ভাই। সুবোধ বিলাতে গেছে পড়তে। বড় ভাই বিপ্রদাসের কাছেই পিতৃমাতৃহারা ছোট বোন কুমুদিনী লালিতপালিত। দাদার কাছে কুমু অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করেছে, সংস্কৃত কাব্য পড়েছে, ভজন গান গায়, এস্রাজ বাজায়, বন্দুক ছোড়ে, দাবা খেলে, ফটো তোলে, ঘোড়ার তদারক করে। বাড়ীতে সমবয়সী ছেলেমেয়ে কেউ নেই, বিপ্রদাস বিয়ে করে নি, গৃহে দাদা ছাড়া কুমুর মেলামেশার সঙ্গী আর নেই।

কুমুর বয়স হলো উনিশ বছর। বিয়ের সম্বন্ধ হলো মধুসূদন ঘোষালের সঙ্গে। সে ব্যবসা করে যথেষ্ট উপার্জন করেছে, কোন আদর্শ বা সংস্কৃতির কোন ধার সে ধারে না। সে মনে করে নারী প্রয়োজনের বস্তু, ভোগের সামগ্রী। কুমুর সঙ্গে এইখানেই মধুসূদনের মেলে না। বিবাহের দিন থেকেই মধুসূদনের ব্যবহারে কুমুর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কুমু বুঝতে পারে সে স্বামীর সহধর্মিণী নয়, দাসী মাত্র। স্বামীগৃহে কুমুর মন টেঁকে না। তবে তারই মধ্যে কুমুর

বনকে স্নিগ্ধ করে মধুসূদনের ভাই নবীন ও নবীনের স্ত্রী মোতির মা। শেষ পর্যন্ত স্বামীকে ছেড়ে থাকতে প্রস্তুত হয়েই কুমু দাদার কাছে চলে আসে।

কুমুর বিধবা জা শ্যামাসুন্দরী। মধুসূদনের প্রতি তার আসক্তি ছিল। মধুসূদনকে সে আকৃষ্ট করে, কিন্তু মধুসূদনের লালসাকে সে জয় করতে পারে না।

ইতিমধ্যে জানা যায় কুমুদিনী অন্তঃসত্ত্বা। স্বামীর প্রতি যত বিরাগই থাক, মধুসূদন-শ্যামার অশুচি সংসারে কুমুদিনীকে আবার ফিরে আসতে হলো। সমস্ত অন্যায় ও অপমান সহ্য করেই স্বামীগৃহে স্বামীর সন্তানকে মানুষ করে তুলতে হবে।

প্রধান চরিত্র: বিপ্রদাস। বিপ্রদাসের বোন কুমুদিনী। ঘোষাল কোম্পানীর মালিক মধুসূদন ঘোষাল। মধুসূদনের ভাই নবীন, আরেক ভাই রাধু। নবীনের পুত্র মতিলাল। নবীনের স্ত্রী, মোতির মা নিস্তারিণী। মধুসূদনের বিধবা ভ্রাতৃবধূ শ্যামাসুন্দরী। বিপ্রদাসের বিশ্বস্ত ব্যক্তি কালু মুখুজ্জে। বিপ্রদাসের বেহারা মুরলী ও রামস্বরূপ। বিপ্রদাসের পিসি ক্ষেমা-পিসি। বিপ্রদাসের জ্ঞাতি ভাই নবগোপাল। জ্যোতিষী বেংকট শাস্ত্রী। ব্যবসায়ী মহাজন ভূষণ রায়। ঘটক নীলমণি, প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"ইহার নর-নারী কেহই আধুনিক আধুনিকা নহে; বর্তমান যুগে বাস করিয়াও ইহাদের মনে বা দেহে আধুনিকতার স্পর্শ অস্পষ্ট।...বিপ্রদাস ও নবীন উভয়েই পজিটভিস্ট তবে তাহাদের কেহই উগ্রভাবে আপনাদের মতামত লইয়া মত্ত নহে; তাহারা ধীর স্থির।...সমস্ত বইটার কেন্দ্রে কুমু—ইহারই সমস্যা উপন্যাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

কুমু অত্যন্ত স্পর্শচেতন করিয়া গড়া, বয়সের তুলনায় অস্বাভাবিকরূপে আধ্যাত্মিক করিয়া তুলিবার চেষ্টা পদে পদে। তাহার শিক্ষা আধুনিক কালের নয়।...বিপ্রদাসের শিক্ষার গুণে বা দোষে কুমু একটি অবাস্তবতার মধ্যে লালিত হয়। ইহার উপর পরিবারের প্রাচীন কালের আচারধর্ম ও সমাজের আদিযুগের সংস্কারে তাহার মন আচ্ছন্ন।...মধুসূদনের সহিত কুমুদিনীর বিবাহ, যথার্থভাবে অ-সবর্ণ বিবাহ; কারণ ইহারা দুই জাতের মানুষ—বিভিন্ন কালচারের স্তরে ইহারা লালিত। মধুসূদন ইংরেজ আমলের ব্যবসায়ী,

ইংরেজি সংস্কৃতি বা সভ্যতা তাহার মনকে স্পর্শ করে নাই—সে পাইয়াছে ইংরেজের বাণকবুদ্ধি। প্রাচীন হিন্দু আদর্শ তাহার কাছে অর্থহীন, য়ুরোপের আধুনিক কালচারের সহিতও সে অপরিচিত। মধুসূদন স্ত্রীকে চায় ভোগের সামগ্রীরূপে, সহধর্মিণী শব্দ তাহার শব্দভাণ্ডারে অজ্ঞাত।...এই অভিঘাতে কুমুর সমস্ত দেহ সংকুচিত, মন বিদ্রোহী। এমন কি স্বামীকে ত্যাগ করিতে সে প্রস্তুত।...

ঘটনার সমবায়ে, মনোবিজ্ঞানের কারিগরিতে ও সর্বোপরি ভাষার চারুতায় এই গ্রন্থ অতুলনীয়।...'যোগাযোগের' ধারাবাহিক ঘটনাখানি পাঠকের মনকে পিষিয়া যেন ক্লান্ত করে; একমাত্র নবীন ও মোতির মা থাকায় মন খানিকটা তৃপ্তি পায়।" [—রবীন্দ্রজীবনী

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"গ্রন্থের কলেবরের সহিত তুলনায় উপক্রমণিকা যেন একটু অযথা দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়।...উপন্যাসের দিক হইতে কুমুদিনীর স্বামী-গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকাপাত হইলে উহার গঠন-সৌষ্টব ও সমন্বয়কৌশল আরও উন্নততর হইত।...

...চরিত্রবিশ্লেষণের দিক দিয়া মধুসূদন-কুমুদিনীর চরিত্র-বৈপরীত্য ও তাহাদের প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছে।...

...নবীন ও মোতির মা মধুসূদনের প্রতিপাল্য-হিসাবে তাহার সংসারে মাথা নীচু করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বুদ্ধি ও মানব-চরিত্র অভিজ্ঞতায় তাহারা মধুসূদন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।...

কুমুদিনী ও বিপ্রদাসের স্নেহসম্পর্কটি অতি লঘু-কোমল স্পর্শের সহিত অপরূপ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কুমুদিনীর, দাদা ও স্বামীর সহিত সম্পর্কের মধ্যে কি বিষম বৈপরীত্য! একদিকে সূক্ষ্ম মমতাময় সহানুভূতি, যাহাতে এক হৃদয়ের নিগূঢ়তম স্পন্দন, ক্ষীণতম আশা-আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত অপর হৃদয়ে নিখুঁতভাবে প্রতিধ্বনিত হয়; অন্যদিকে রুক্ষপরুষ ক্ষমতা-বিস্তার, হৃদয়ের কোমল অঙ্কুর ও নবজাত সুকুমার বিকাশগুলির নির্মমভাবে পদদলন। কুমুদিনীর চরিত্রে নারী-হৃদয়ের সমস্ত অবর্ণনীয় মাধুর্য ও নারী সৌন্দর্যের সমস্ত অপার্থিব রমণীয়তা ঘনীভূত নির্যাস কবিত্বের সুরভি মিশ্রিত হইয়া যেন দেহ ধারণ করিয়াছে—তাহার স্থান যেন কাব্যের কল্পলোকে। উপন্যাসের নির্দয়, ঘাত-প্রতিঘাত পীড়িত বাস্তবক্ষেত্র নহে।...গোলাপ যেমন কণ্টক বাধার

চারিদিকে তাহার আরক্ত সৌন্দর্য বিকাশ করে, তেমনি কুমুদিনীর চরিত্র মাধুর্য মধুসূদনের মূঢ় অবিবেচনা ও অনাদরের আবেষ্টনের মধ্যে আরও চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার সৌন্দর্য বাহির অপেক্ষা অন্তরেরই বেশি।…

…উপন্যাসের কোন পাত্রপাত্রীরই চরিত্র অনুযায়ী বাচনভঙ্গী নাই, সকলেই নির্বিচারে লেখকের বুদ্ধি-প্রদীপ্ত বাক্ বৈদগ্ধ্য প্রয়োগ করিতেছে; কাহারও একটী নিজস্ব ভাষা বা প্রকাশবিধি নাই। ইহা যে উপন্যাসের নাটকোচিত গুণবিকাশের পক্ষে একটা প্রবল অন্তরায় তাহা বুঝাইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।" [—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"…আর্টের দিক দিয়া এই উপন্যাস একেবারে অচল। মধুসূদন ও কুমুর মধ্যে যে বিরুদ্ধতা জাগিয়া উঠিয়াছিল, সন্তান সম্ভাবনায় তাহা কিরূপে লোপ পাইয়া গেল, তাহার চিত্র উপন্যাসে দেওয়া হয় নাই।…

এই উপন্যাসে যে সকল গৌণ চরিত্রের সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার মধ্যেও আর্টের বৈশিষ্ট্য নাই। শ্যামাসুন্দরী ও মধুসূদনের প্রণয়ের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে নিরবলেপ অশ্লীলতা ছাড়া আর কিছুই নাই।…নবীন ও মোতির মার চরিত্রে কবি অতিরিক্ত মাধুর্য ঢালিয়া দিয়াছেন।…" [-রবীন্দ্রনাথ

নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন—

"লেখকের অপূর্ব কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে কুমুদিনী মধুসূদনের চরিত্র বিশ্লেষণে, ঘটনা-বিন্যাসে এবং তাহাদের দুইজনের অন্তর্বিপ্লবের বর্ণনায়।…এই দ্বন্দ্বে পক্ষ দুইটি, কিন্তু আক্রমণটি সমস্তই করিয়াছে মধুসূদন তাহার নীচ, ইতর, প্রভুত্বকামী প্রবৃত্তির অস্ত্রশস্ত্র লইয়া। আর কুমুদিনী সেই আক্রমণকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছে চরম সহিষ্ণুতায় নিজের আদর্শের মধ্যে মধুসূদনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টায়। সে চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইয়াছে তখন সহিষ্ণুতা রূপান্তরিত হইয়াছে ঘৃণায় ও গ্লানিতে।…

…'যোগাযোগে' সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য ইহার কাব্যময় বিবৃতি ও ভাব-গভীর চরিত্র ও ঘটনা বিশ্লেষণ। বর্ণনা এক এক জায়গায় কবিত্বের উঁচু পর্দায় ঝংকার তুলিয়াছে এবং সে বর্ণনা ভাব-গভীরতায়, জ্ঞানের দীপ্তিতে অতুল।…

…ঘটনা ও চরিত্রাবলী যুক্তি পরম্পরাগত চরম পরিণতি লাভ করিল না, এবং গ্রন্থারম্ভে যেসব প্রশ্ন সূচিত হইল, যে গল্প-সীমানা পরিকল্পিত হইল, তাহার উত্তর মিলিল না, এবং সীমানার বৃত্ত সম্পূর্ণ হইল না। 'যোগাযোগ'

একটি মহৎ বৃহৎ পরিকল্পনার অসাফল্যের স্বীকৃতি।" [রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা] অচ্যুৎ গোস্বামী লিখেছেন—

"মূল উপজীব্য বিষয় নারীর স্বাধিকারের প্রশ্ন।···কিন্তু কুমুকে শেষ পর্যন্ত আত্ম সমর্পণ করতে হল, যখন মধুসূদনের সন্তান তার গর্ভে স্থান লাভ করেছে বলে সে জানতে পারল। নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় তার স্বাভাবিক অসুবিধা এইখানটায়—সে মানব জাতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ব্যাপারে প্রকৃতির হাতের যন্ত্র। কিন্তু বোধ করি, বইয়ের গভীরতর তাৎপর্য এই যে বলপ্রয়োগের নীতি দিয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তার জন্য উন্নততর আদর্শ সামনে রেখে অপেক্ষা করতে হবে প্রতিপক্ষের হৃদয়গত পরিবর্তনের জন্য।"

[—বাংলা উপন্যাসের ধারা

মনোরঞ্জন জানা লিখেছেন—

"মধুসূদন ও কুমুদিনীর মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহা ভালোর সহিত মন্দের দ্বন্দ্ব নয়। তাহা এক বোধের জগতের সহিত আর এক বোধের জগতের সঙ্ঘাত। কুমুদিনীর সংস্কার, তাহার নৈতিক বোধ, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাহার যে ধ্যান-ধারণা, জীবনে সার্থকতা ও অসার্থকতা বলিতে তাহার যে বিশিষ্ট বোধ, তাহার কোন একটির সহিত মধুসূদনের মিল নাই।···

কুমুদিনীর জীবনের সমগ্র পরিণাম ধারাটিকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। বিবাহ-পূর্ব জীবনে কুমুদিনীর অন্তরে যে সৌন্দর্য ও মাধুর্যলোক গড়িয়া উঠে তাহাকে স্বর্গলোক রচনা বলা যাইতে পারে। বিবাহিত জীবনে কুমুদিনী সেই স্বর্গলোক হইতে সম্পূর্ণরূপে স্খলিত হইয়া যায়। কুমুদিনী পরিশেষে সেই স্বর্গলোকটিকে ফিরিয়া লাভ করিয়াছে।···

মধুসূদন প্রাণের সম্পদে একান্ত দীন। প্রাণকে সে একপ্রকার হত্যা করিয়াছে। বিশ্বের সৌন্দর্য ও প্রেমের ভিতর দিয়া নরনারীর অন্তরে প্রাণ জাগে।···এই প্রাণকে মানুষ যখন হত্যা করে তখনই সে বাহিরে বস্তুর পর বস্তু সঞ্চয় করিয়া অন্তরের শূন্যতাকে পূর্ণ করিতে চায়।···

এই প্রাণকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া কুমুদিনীর মত প্রাণের এমন পুষ্পিত প্রকাশও মধুসূদনের অন্তরে প্রাণসঞ্চার করিতে পারে নাই।···কুমুদিনীকে লাভ করিয়া মধুসূদনের যে বোধ জাগ্রত হইয়াছে তাহা প্রবৃত্তি মাত্র; তাহা বিজয় বাসনারই নামান্তর।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সামগ্রিক জীবনবিকাশের আদর্শ। তাহা জীবনের

কোন একটি দিককে অস্বীকার করিয়া আর একটি দিকে সার্থকতা অন্বেষণ করিতে চায় না। সে আদর্শে মন-প্রাণ-আত্মা, মর্ত্য ও অমর্ত্য, বাস্তব ও আদর্শ, ভাব ও রূপ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত।...

বর্তমান সমাজে নারীর বিবাহযোগ্য বয়স প্রত্যাশার সীমাকেও ছাড়াইয়া চলিয়াছে।... বিবাহিত জীবনলাভের পূর্বেই তাহাদের প্রাণমন ও বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণবিকাশ ঘটিতেছে।...কুমুদিনী নূতন যুগের এই পূর্ণবিকাশ অবস্থাটি লাভ করিয়াছে, অথচ মধ্যযুগের সংস্কারকেও ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। কুমুদিনীর জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটিয়াছে এইজন্য।...

এই নূতনকালের অশ্রদ্ধার দিকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে মধুসূদনের জীবনে। সমাজ জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে অর্থ ও উপকরণকে ক্রমাগত পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিবার সাধনা, জীবনের উন্নততর সকল মূল্যকে ধুলায় লুটাইয়া দিয়া কেবল স্থূল বাসনা চরিতার্থতা, তাহার জন্য সকল প্রকার মনুষ্যত্বহীনতা।

একালের সকল দারিদ্র্য, অসম্মান ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মার মহিমাকে দীপ-শিখার মত অনির্বাণ রাখিয়াছে বিপ্রদাসের মত পুরুষ, কুমুদিনীর মত নারী।...

নূতন কালের সামর্থ্যের আর একটি দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রাচীন সমস্ত কিছুর, তাহার নৈতিক, সামাজিক, সকল দিকের নূতন করিয়া মূল্য বিচার করিবার মধ্যে।—সমগ্র জীবন জিজ্ঞাসার এমন আমূল রূপান্তর ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখন দৃষ্ট হয় নাই।" [—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

শেষের কবিতা :

গল্পাংশ : অমিত রায় ব্যারিস্টার, অতি আধুনিক ধারায় নাম করেছে অমিট্ রায়ে। স্টাইলের নেশা আছে, লোককে চমকে দিতে চায়, পড়াশুনা ও বুদ্ধির ধার আছে, নিবারণ চক্রবর্তী নামে কবিতা লেখে, বলে—রবিঠাকুরের যুগ শেষ হয়ে গেছে।

অমিত একা গেল শিলংএ। সেখানে মোটরে মোটরে লাগলো সংঘাত, তার ফলে পরিচয় হলো লাবণ্যের সঙ্গে। লাবণ্য এম-এ পাস করা মেয়ে, সুরমার গৃহশিক্ষিকা। অমিত সেদিন বাড়ী ফিরে কবিতা লিখলো—

"পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি
আমরা দুজন চল্‌তি হাওয়ার পন্থী ।..."

লাবণ্যের বাবা পশ্চিমের এক কলেজের অধ্যক্ষ অবনীশ দত্ত, মাতৃ-হারা একমাত্র কন্যাকে মনের মত করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি এক বিধবার প্রেমে পড়লেন। লাবণ্য তখন জেদ করে পিতার বিয়ে দিলে এবং পৈতৃক সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করতে বেরুলো। যোগমায়ার কন্যা সুরমাকে পড়ানোর কাজ নিয়ে সে এলো শিলংএ।

লাবণ্যের গৃহে অমিতের যাওয়া-আসা সুরু হলো। যোগমায়া অমিতের কাকাকে চিনতেন, তিনি উকিল ছিলেন, তাঁর জন্যই যোগমায়ার স্বামীর সম্পত্তি রক্ষা পায়। অমিত সুরমার ভাই যতিশংকরকে পড়াতে সুরু করলো।

অমিত ও লাবণ্যের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পেল। পরিচয় পরিণত হলো প্রেমে। অমিত যোগমায়াকে জানালো, সে লাবণ্যকে বিয়ে করবে। কিন্তু লাবণ্য বললো, সে এখনও মনস্থির করতে পারেনি। তবু যোগমায়া একদিন লাবণ্যকে নিয়ে এলেন অমিতের বাড়ীতে। লাবণ্যর হাত অমিতের হাতে রেখে আশীর্বাদ করলেন—তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক্। ঠিক হলো আগামী অঘ্রান মাসে বিয়ে হবে।

এদিকে অমিতের বোন সিসি ও বান্ধবী কেটি মিত্তির এলো শিলং-এ। লাবণ্যের খবর তারা পেয়েছিল। তারপর অমিত যখন স্পষ্ট বললো যে, সে লাবণ্যকে বিয়ে করবে, তখন কেটির চোখে জল এলো। কেটি, অর্থাৎ কেতকী অমিতকে ভালবাসতো। সিসি ও কেটির চালচলন ও ঔদ্ধত্য দেখে লাবণ্য বুঝলো, এরা যে পরিবেশের মধ্যে লালিত লাবণ্যের সঙ্গে তার কোথাও কোন মিল নেই। অমিত লাবণ্যকে একটি আংটি দিয়েছিল, লাবণ্য সেটি অমিতকে ফিরিয়ে দিল। তারপর অমিতকে কোন সংবাদ না দিয়ে লাবণ্য-যোগমায়ারা শিলং থেকে চলে গেল।

অমিত ফিরলো কলিকাতায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র যতিশংকরকে খুঁজে পাওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। লাবণ্য তখন তার পিতার ছাত্র শোভনলালকে বিয়ে করাই স্থির করেছে। শোভনলাল লাবণ্যকে ভালবাসতো।

অমিত বিয়ে করলো কেতকীকে। লাবণ্য বিয়ে করলো শোভনলালকে। সেই বিয়ের খবরের সঙ্গে অমিত পেল এক কবিতা, লাবণ্য লিখেছে—

…"সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশ্যে।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়।"…

প্রধান চরিত্র : ব্যারিস্টার অমিত রায়। অমিতের বোন সিসি ও লিসি। পশ্চিমী কলেজের অধ্যক্ষ অবনীশ দত্ত। অবনীশের এম-এ পাস করা মেয়ে লাবণ্য। অবনীশের ছাত্র শোভনলাল। লাবণ্যের ছাত্রী সুরমা। সুরমার ভাই যতিশংকর। সুরমার মা যোগমায়া। সিসি-লিসির বান্ধবী কেতকী মিত্তির, প্রভৃতি।

শেষের কবিতা 'লিরিক' উপন্যাস। গল্পাংশ যত আছে, কাব্যের উপাদান তার চেয়ে বেশী। যেখানে প্রেমের প্রকাশকে গদ্যে ধরে রাখা যায়নি, সেখানে কাব্যের মধ্যে দিয়ে তা বার বার ব্যক্ত হয়েছে।
আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"শেষের কবিতা লিরিক উপন্যাস—অর্থাৎ ইহার মধ্যে যতখানি উপন্যাসের গল্পাংশ তাহার চেয়ে অনেকখানি বেশি আছে লিরিক কাব্যের উপদান— গদ্যের আবরণে ব্যক্ত ; তবে সে গদ্য কাব্যধর্মী ; এছাড়া সংস্কারগত ছন্দোবদ্ধ কবিতার মাধ্যমেও অনেক কথা বলা আছে।

'শেষের কবিতার' পটভূমি অত্যন্ত আধুনিক। নরনারীদের অনেকেই বিলাত ফেরত…ইহাদের ধরণ-ধারণ চলন-বলন সমস্তই সাধারণ বাঙালি হইতে পৃথক।…পাত্রপাত্রীদের সংগ্রাম আপনাদের রচিত ভাবের কুহেলিকার সাথে…অমিত বাক্য ও ব্যবহারে আদর্শ ভাববিলাসী।…প্রেম ও ভালবাসার মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ সে কল্পনা করে।…অমিত যাহা কিছু করে সবই অপূর্ব।…

শোভনলাল ভাববিলাসী নয়, সে ভাবুক ; তাহার ভাবনা কর্মে রূপ লয়, তাহার মন আদর্শবাদী তথ্যাশ্রয়ী।…

…অমিত ও লাবণ্য দুই জাতের লোক না হইলেও জীবনের প্রতি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী এত তফাৎ যে ইহাদের মিলন ঘটাইলেও তাহা অসবর্ণ বিবাহের সামিল হইত।…কেটি মিত্তির বা কেতকীই অমিতের উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী। অনেক ভাঙাচোরার পর সকলেই সকলকে ফিরিয়া পাইল—অমিত কেতকীকে,

শোভনলাল লাবণ্যকে। এমনকি যতিশংকরের সহিত সিসিকে মিলাইয়া দিয়া কবি গল্পের উপসংহার করিলেন। রবীন্দ্রনাথের আর কোন উপন্যাসে এমন ঘটা করিয়া জোড় মিলাইবার ব্যবস্থা ইতিপূর্বে দেখি নাই।" [—রবীন্দ্রজীবনী

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"...অমিত ও লাবণ্যের প্রণয়কাহিনী অনন্যসাধারণতার দিক্ দিয়া অতুলনীয়। অমিতের চরিত্রে যে একটা সদাচঞ্চল, প্রথা-বন্ধনমুক্ত, বিচিত্র লীলায়িত প্রাণহিল্লোল আছে তাহাই তাহার সমস্ত চিন্তাধারা ও কর্মপ্রচেষ্টাকে এমন একটা নৃত্যশীল গতিবেগ দিয়াছে, যাহা আমাদের পদাতিক জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ অননুমেয়।।...প্রেম মানুষের সূক্ষ্মতর উচ্চতর বৃত্তিগুলিকে যে কিরূপ আশ্চর্যভাবে বিকশিত করিয়া তোলে, তাহার সুপ্ত অসীম প্রবণতাকে মায়াদণ্ড-স্পর্শে জাগ্রত করে, অমিতের প্রেমে তাহার অখণ্ডনীয় নিদর্শন মেলে।... সে মুহূর্তে মুহূর্তে লাবণ্যকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে চাহে।...প্রেম তাহার পক্ষে একটা বুদ্ধিগত প্রয়োজন মাত্র। লাবণ্যের ভালবাসা কেবল অগ্রগমনের অফুরন্ত পথকে আলোকিত করার জন্য নয়, তাহা অন্তঃপুরের মঙ্গলদীপ। সে রক্ষার প্রতীক, অমিত সৃষ্টির প্রতীক, সুতরাং উভয়ের বিরোধ চিরন্তন।... অমিত যাহা করিয়াছিল শোভনলাল তাহা কোনওদিন করিতে পারিত না— লাবণ্যের সংকোচ-মুদিত হৃদয়কে বিকসিত করিবার মত উত্তাপ তাহার কখনও ছিল না।...সে (লাবণ্য) স্বভাব-দরিদ্রা ছিল, অমিতের প্রেমের প্লাবনই তাহার দারিদ্র্য ঘুচাইয়া তাহাকে ঐশ্বর্যশালিনী করিয়াছে।...

...লাবণ্যের নূতন বরফ-গলা প্রেমধারা অমিতের দিক্ হইতে প্রতিহত হইয়া যে একটা স্বাভাবিক মাধ্যাকর্ষণের বলে শোভনলালের অভিমুখে ছুটিয়া যাইবে তাহা সংগত ও যুক্তিসহ।...প্রেম-মহামন্ত্রে কে-টির অলৌকিক পরিবর্তন যদিও-বা মানিয়া লওয়া যায়, তাহার প্রতি অমিতের আকর্ষণের সঙ্গত ব্যাখ্যা কোথায়?...অমিতের ছিল কে-টির প্রতি বিতৃষ্ণা; আর এই উপেক্ষার কারণ প্রেমের ছলনার সহিত অতি-পরিচয়।...এই অমিত ও কে-টির ব্যাপারটিই উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ দুর্বলতা, ইহার নিখুঁত সমন্বয়-কৌশলের একমাত্র ত্রুটি।..."

[—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন—

"...কবি-কল্পনার অতুলনীয় ঐশ্বর্যে, epigramএর দীপ্তির চরম ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতায়, হ্রস্ব অথচ গৌরবপূর্ণ ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতে ও ভাষণে, বিষয়গত ঐক্য-

বোধে, সর্বোপরি দৃঢ় সংহত সমগ্রতায় 'শেষের কবিতার' মতন কাব্যোপন্যাস বাংলাসাহিত্যে আর রচিত হয় নাই।...ভাষা ও বিবৃতিতে এমন প্রাণাবেগ-চঞ্চল গতিসঞ্চার রবীন্দ্রনাথের আর কোনও উপন্যাসেই নাই, এমন কাব্যময় প্রকাশও নয়।...'শেষের কবিতার' চরিত্র চিত্রণ নিখুঁত।...অমিতর মনের পরিচয় আমরা পাই তাহার প্রত্যেক কথায়, চলনে-বলনে, প্রত্যেক বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে, তাহার বেশ-ভূষায়। এমন সুস্পষ্ট করিয়া একটি অসাধারণ মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় বাংলা-সাহিত্যে কমই দেখা যায়।...লাবণ্য, যোগমায়া, কেতকী, শোভনলাল প্রত্যেকেই আপনাপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।... সর্বাপেক্ষা নৈপুণ্য ফুটিয়াছে কেতকীর চিত্রণে।...

'শেষের কবিতায়' রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে, বুদ্ধি ও কল্পনায় সর্বোপরি প্রেম-লীলার বোধ ও অনুভূতিতে এবং তাহার প্রকাশ ক্ষমতায় তরুণদের মধ্যে তরুণতম, আধুনিকদের মধ্যে আধুনিকতম।

তবু 'শেষের কবিতা' কিছু মহৎ উপন্যাস নয়, মহৎ সাহিত্য সৃষ্টিও নয়।... 'শেষের কবিতার' কাব্যরস জীবনের গভীরতম অভিজ্ঞতা হইতে উৎসারিত নয়... ইহার ভাষা বহুজনের বহুমনের ভাষা নয়...সর্বোপরি 'শেষের কবিতার' উদ্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠী এবং তাহার বস্তুচেতনা বাংলা দেশের নাগর জীবনের সংকীর্ণতম একটি শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।..." [—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"...এই উপন্যাসের নায়ক অমিতের চরিত্রে নায়কোচিত গুণ কম।...

...অমিত বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি।...

লাবণ্য অমিতর যে সংস্রব—ইহা সত্য, কিন্তু আকস্মিক; ইহা ক্ষণিকের, কিন্তু প্রাত্যহিকের নহে।...লাবণ্য ও অমিত—একে অপরের কাছে আসিয়া অনন্তের আস্বাদ পাইল। এই অনুভূতি শুধু একটা খণ্ড উপলব্ধি নহে;—ইহা তাহাদের জীবনের প্রতি অণুপরমাণুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল।...

...পরিপূর্ণের অনুভূতি দৈনন্দিনকে স্পর্শ করিয়া তাহার রূপ বদলাইয়া দেয়, কিন্তু তাহাকে প্রাত্যহিকের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে তাহার অসীমতা ক্ষুণ্ণ হয়। অথচ বিবাহ প্রাত্যহিকের; তাই লাবণ্য অমিতকে প্রাত্যহিক করিল না;...ইহারা পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, একে অপরের কাছে সত্য হইয়া রহিল, এবং দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পাথেয় যোগাইতে লাগিল।" [—রবীন্দ্রনাথ

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"অমিত লাবণ্যকে বিবাহ করিবে স্থির করিল; লাবণ্যও প্রথমে সম্মত হইয়াছিল, কিন্তু শেষে বাঁকিয়া বসিল; ভালোবাসে না বলিয়া নয়, ভালোবাসে বলিয়াই;…লাবণ্য বুঝিতে পারিল অমিত তাহার মধ্যে নিজের মানসীকে ভালোবাসিয়াছে, সুখদুঃখ দোষত্রুটিপূর্ণ মাটির মানুষ লাবণ্যকে নয়; সে মানসীকে গৃহিণী করিবার চেষ্টা করিতেছে;…বিবাহের প্রাত্যহিক নৈকট্যে সে মানসীকেও হারাইবে, গৃহিণীকেও পাইবে না, ফলে উভয়েরই জীবন ব্যর্থ হইতে চলিবে। মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অধিকতর রিয়ালিষ্ট, সেইজন্য এ রহস্যটা বুঝিতে লাবণ্যের বেশি বিলম্ব হয় নাই;…সেইজন্য নিজের প্রতি অমিতের এই রোমান্টিক মনোবৃত্তিকে সে বিবাহের ঘের-দেওয়া বাসরঘরে টানিয়া আনিতে চায় না; সে প্রেমের দুই রূপকেই স্বীকার করে—দুইকে এক করিবার অসাধ্য সাধনা তার নয়।…

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস গোরা ও অমিত রায় কাল বিনিময় করিলে পরস্পরের ভূমিকা নিখুঁতভাবে গ্রহণ করিতে পারিত।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাতে প্রতিভার প্রকাশের একটা অদ্ভুত সমতা দেখা যায়; কোন একটা রচনা আর একটার চেয়ে অনেক বেশি ভালো—বা কোনো একটা অপরটি অপেক্ষা অনেক বেশি খারাপ—এমন বলিবার উপায় নাই।"

[—রবীন্দ্রবিচিত্রা

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির খেলা কোনো উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর কথাবার্তায় আর দেখা যায় নাই। কথায় কথায় রূপক আর উপমা, খুঁটিনাটি বর্ণনার কারিগরী আর বাহাদুরী সমস্ত হৃদয় মন দিয়া উপভোগ করিবার জিনিস হইয়াছে—"

[—রবিরশ্মি

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"অমিত চায় তাঁহার মনের মানসীকে নব নব রূপে ও রসে। লাবণ্যকে প্রেমের বিগ্রহরূপিণী ভাবিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল সে। কিন্তু লাবণ্য পুরা বাস্তববাদী—পাকা রিয়ালিষ্ট। অমিতকে ভালোরূপে চিনিয়াছিল সে—বুঝিয়াছিল যে ভাবের রঙ চটিয়া গেলে সে লাবণ্যকে ছাড়িয়া আবার বাহির হইবে তাহার মানসীর সন্ধানে। তাই অমিতর প্রেমের স্মৃতি তাহার চিরন্তন সম্পদ মনে করিয়াও তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই।"

[—রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা

কানন বিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"...'যোগাযোগ'-এ গোড়ার কথা বুঝতে হয় শেষের কথা দিয়ে। 'শেষের কবিতায়' শেষের কথাটি বুঝতে হয় গোড়ার কথা দিয়ে। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিনের অবতারণা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যখন আসে সন্তান-সম্ভবা কুমুর শ্বশুরবাড়ী যাবার ইতিহাস। 'শেষের কবিতায়' কিন্তু ঠিক তার বিপরীত শেষ অধ্যায়ে আখ্যানবস্তুর মূল সত্যটুকু বুঝতে হয় গোড়ার অধ্যায় দিয়ে যেখানে কবি অমিতর চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন নানা বিচিত্র ঘটনার বর্ণনায়।

রবীন্দ্রনাথ এখানে যে দুটি নায়ক-নায়িকা এনেছেন, তাদের চরিত্র যেমন অতি-সূক্ষ্ম ও অতি আধুনিক তেমনি অতি দুর্বোধ। মানুষের অন্তরের এত সূক্ষ্ম স্তর নিয়ে বাংলা উপন্যাস এর আগে লেখা হয়েছে কি-না সন্দেহ। এদের চরিত্রের মূল তত্ত্বগুলি ধরতে না পারলে আখ্যানভাগ হয়ে পড়বে বেসুরো। তাই কবি আখ্যায়িকা ঠিক-ঠিক আরম্ভ হবার আগেই নায়কের চরিত্র প্রস্ফুট করে তুলতে বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন।

অমিতর অন্তরে সবচেয়ে বিকশিত হয়েছিল প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধ।... কিন্তু গভীর ছিল না মোটেই।...জীবনের সকল বিষয়কেই ও হেসে হালকা করে রাখতো।...ওর চিত্ত কৌতুকে সদাই চপল।...প্রকৃতি অমিতকে দিয়েছিলো যথেষ্ট বুদ্ধি—যা প্রতিভার পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু তাকে ও পরিশ্রমের দ্বারা তীক্ষ্ণ করে নি, এর জন্যে দায়ী ওর মনের হাল্‌কা ভাব।...লাবণ্যের বিবেচনা শক্তি খুব গভীর। তাই ওর অন্তরের নারী বড় হিসেবী, শান্ত, গম্ভীর।...লাবণ্যের জীবনও প্রতিভার আলোকে উদ্‌ভাসিত।...লাবণ্য সব জিনিষ শান্তভাবে বিচার করে নিতে চায়। তাই এসে পড়েছে ওর মনে হারাবার অনিবার ভয়।...

'শেষের কবিতার' যা মূলতত্ত্ব তা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফোটাতে গিয়ে শিল্পী বাস্তবতার সংস্পর্শ হারাননি। তাই উপন্যাসের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত চরিত্রগুলি পূর্ণাবয়ব ও সুসঙ্গত। চরিত্রগুলির যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে গ্রন্থের আরম্ভ হয়েছিল, শেষ অধ্যায়ে দেখি তাদের পরিণতি খুব স্বাভাবিক।...

'শেষের কবিতার' মূল কথা হচ্ছে, বিবাহে যদি মানুষের higher self ও lower self—চিত্তের এই দুই স্তরেরই সঙ্গী পাওয়া;—বিবাহে যদি জীবনের সঙ্গ ও আসঙ্গ একত্রেই মেলে, তবে সেটা জীবনের পরিপূর্ণতার পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের পরিচয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে যদি তা না মেলে, তবে দুঃখের

বিষয় কিছু নেই। যেটা না-পাওয়া বিবাহ সম্বন্ধের মধ্যে সেটাকে জোর করে পরিতৃপ্তি করতে গিয়ে ট্রাজেডি সৃষ্টি করার আবশ্যক নেই।"

[—বিচিত্রা, পৌষ '৩৮

দুই বোন

গল্পাংশ : মেয়েরা দু'জাতের, মা আর প্রিয়া। শশাঙ্কের স্ত্রী শর্মিলা মা-জাতের, চারিদিক থেকে স্বামীকে ঘিরে রাখে, প্রয়োজনীয় সব কিছু হাতের কাছে জুগিয়ে দেয়, বন্ধুর বাড়ী তাস খেলতে খেলতে রাত হয়ে গেলে চাকর পাঠিয়ে দেয় লণ্ঠন দিয়ে।

শশাঙ্ক এম-এসসি পাস করে শিবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করেছে। চাকরি করে। নিঃসন্তান। নিরুপদ্রব জীবন।

জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল শর্মিলা। নীচের লোক যখন শশাঙ্ককে টপ্‌কে উপরে উঠে গেল, তখন সে স্বামীকে বললো—চাকরি ছেড়ে দাও।

চাকরি ছেড়ে শশাঙ্ক ব্যবসা সুরু করলো শর্মিলার মথুর-দাদার সঙ্গে। দেখতে দেখতে শশাঙ্ক বাড়ী করলো, গাড়ী করলো।

শর্মিলার ভাই হেমন্ত ডাক্তারী পড়তো, অস্ত্রঘটিত রোগে সে মারা গেল। পিতা রাজারাম পয়সাওয়ালা মানুষ, ঠিক করলেন এক হাসপাতাল করে দেবেন, হেমন্তের সহপাঠী নীরদ হবে তার কর্তা, আর ছোট মেয়ে উর্মিমালা হবে তার সঙ্গিনী। উর্মিমালার সঙ্গে নীরদের বিয়ের সম্বন্ধটা মোটামুটি পাকা হয়ে গেল। নীরদ উর্মিকে বললো—ভাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ করার ভার তার উপর, উর্মিমালাকে সেইভাবে তৈরী হতে হবে। আর রাজারামবাবুকে বললো যে, হাসপাতালে তিনি যা কিছু দেবেন নিজের মেয়ের নামেই দেবেন, সে উর্মিমালার এক পয়সাও নেবে না, যা কিছু করার নিজের উপার্জন থেকেই করবে।

উর্মিমালা আধুনিকা—মিটিংয়ে যায়, টেনিস খেলে, গান গায়, সেতার বাজায়, সাজসজ্জাতেও পরিপাটি।

রাজারামবাবু মারা গেলেন, উর্মিমালাকে মনের মত করে তৈরী করে নেবার চেষ্টা করলো নীরদ। ইতিমধ্যে সে একটা স্কলারশিপ পেয়ে গেল ও বিলাতে চলে গেল।

এদিকে শর্মিলা অসুস্থ হয়ে পড়লো, ডেকে পাঠালো উর্মিমালাকে।

ঊর্মিমালা দিদির গৃহের গৃহস্থালী করতে করতে শশাঙ্কের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। শশাঙ্ককে টেনে নিয়ে যায় পরেশনাথের বাগানে, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে, দোলের দিন শশাঙ্কের মাথায় আবির মাখিয়ে দেয়, শশাঙ্ক লাল কালি ঢেলে দেয় ঊর্মির শাড়ীতে। শর্মিলা বকাবকি করে। ঊর্মিমালা বাড়ী চলে আসে।

নীরদ বলেছিল টাকা নেবে না, কিন্তু বিলাত থেকে কয়েকবার মোটা টাকা চেয়ে পাঠালো। শেষে চিঠি এলো, নীরদ মেম-সাহেব বিয়ে করছে। বাগদানের বন্ধন থেকে ঊর্মিমালা মুক্তি পেল।

শশাঙ্কের মনে তখন রঙ ধরেছে, সে ঊর্মিমালাকে আবার নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলো। ঊর্মি এবার শর্মিলার কাছে থাকে। শশাঙ্ক বার-বার ছুটে আসে তার কাছে। ঊর্মিকে নিয়ে যায় সার্কাসে, ময়দানে ফৌজদের যুদ্ধ খেলা দেখাতে, ডায়মণ্ড-হারবারে বেড়াতে। তারপর একদিন ঊর্মির হাত চেপে ধরে বলে—তোমাকে আমি ভালবাসি।

শর্মিলা সবই বুঝতে পারে, কাঁদে। রোগ বেড়ে চলে। জীবনের আশা ক্ষীণ হয়ে আসে। একদিন স্বামীকে ডেকে বলে—ঊর্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে।

এবার এক সন্ন্যাসী শর্মিলার চিকিৎসা করে। শর্মিলা সেরে ওঠে।

এদিকে কারবার ডুবতে বসেছে। শশাঙ্ক নেপালে চাকরি নিয়ে চলে যাবে বলে স্থির করে। ঊর্মিমালাও সঙ্গে যাবে বলে স্থির হয়। এমন সময় ঊর্মি বিলাত চলে গেল, চিঠিতে জানালো—ডাক্তারি শিখে ফিরবো। ছ'সাত বছর লাগবে। অজ্ঞানে অপরাধ করেছি, মাপ করো।

প্রধান চরিত্র : শশাঙ্ক। স্ত্রী শর্মিলা। শর্মিলার বোন ঊর্মিমালা। নীরদ। শর্মিলার বাবা রাজারাম, প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"...ইহার অবয়ব যে পরিমাণ ক্ষুদ্র, ঔপন্যাসিক সংঘাত ও সাধারণ আলোচনা প্রণালী তদনুরূপ নীচু-স্তরের।...শর্মিলা ও ঊর্মিমালা—এই দুই সহদরাকে লেখক যে দুই জীবনাদর্শের প্রতিনিধিমূলক ক্ষীণ জীবনস্পন্দন দিয়াছেন, তাহারা সেই মাপকরা প্রাণধারা লইয়া সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছে—ব্যক্তিগত জীবনের অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাস এক মুহূর্তের জন্যও তাহাদিগকে পূর্ণতর সত্তার দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই।..শর্মিলাকে লেখক স্ত্রীলোকের মাতৃজাতীয়ত্বের

প্রতীকরূপে কল্পনা করিয়াছেন, সে-ও অতিরিক্ত বাধ্যতার সহিত লেখকের আজ্ঞানুবর্তী হইয়াছে, মাতৃত্বের আসন ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর হয় নাই। সে চিরজীবন শশাঙ্ককে স্নেহমণ্ডিত সেবা-যত্নের রন্ধ্রহীন আতিশয্যে বিব্রত করিয়াছে।…উর্মিমালা তাহার যৌবনোচ্ছল, ক্রীড়াশীল প্রকৃতি লইয়া শশাঙ্কের কঠোর নিয়মবদ্ধ অনবসর কর্মজীবনে একটা বিপ্লবকারী বিশৃঙ্খলা ও উন্মাদনা আনিয়াছে। উর্মির সংসর্গে শশাঙ্ক জীবনে প্রথম সরসতার ও বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাইয়াছে।…রোগশয্যায় পড়িয়া শর্মিলা একদিকে অশ্রু মুছিয়াছে, অপর দিকে স্বামীকে ভগিনীর হাতে সমর্পণ করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে।…

শর্মিলা যেমন মাতৃজাতীয়ত্বের প্রতীক, উর্মি তেমনি চিরন্তন প্রিয়া।… উপন্যাসটি পড়িয়া মনে হয় যে, গভীর আলোচনা কোথাও লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না…যে সমস্ত উপন্যাসে হৃদয়-বিশ্লেষণের গভীরতা আছে, 'দুই বোন' তাহাদের সমশ্রেণীভুক্ত নহে,…" [— বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"দুই বোন-এ দেখা যায় শশাঙ্কের স্ত্রী শর্মিলা ছিল স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী, শান্তস্বভাবা, সর্বদা সেবাপরায়ণা,—সমবেদনাময়ী মায়েরি মতো স্বামীকে সর্বদা স্নেহের দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া রাখিত সে। কিন্তু শশাঙ্ক এই স্ত্রীর মধ্যে জীবনচাঞ্চল্যদীপ্তা, আবেগময়ী, লীলাময়ী প্রিয়াকে পায় নাই।…তাই পরিণত বয়স্ক শশাঙ্ক পতিগতপ্রাণা, রোগশয্যাশায়িতা স্ত্রীকে ফেলিয়া প্রেমে মাতিল তাহার স্ত্রীর ভগিনী উর্মিলার সঙ্গে প্রণয়-তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য। 'মালঞ্চ'-এর চিত্রটি আরো কঠিন—আরো নির্মম। বিবাহের দশ বৎসর পরে প্রৌঢ়বয়স্ক আদিত্য রুগ্না মৃত্যুশয্যাশায়িনী স্ত্রী নীরজাকে নির্মম তাচ্ছিল্যের দ্বারা ব্যথিত করিয়া বাগানের যত্নের অছিলায় বাল্য-বান্ধবী সরলার সঙ্গে প্রণয়লীলা করিতে লাগিল।…" [—রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"…উর্মি ও শশাঙ্কের যৌথ উন্মাদনার যে চিত্র দিয়াছেন তাহা রুচি-বিগর্হিত।…উর্মিমালা শর্মিলার বোন, ইহার দ্বারা গল্পের কোন প্রয়োজন সাধিত হয় নাই, কিন্তু পাঠকের মনে অনাবশ্যক আঘাত দিয়েছে।…

…উর্মি বিচার-বুদ্ধিশালী। তারপর শশাঙ্ক তাহার ভগিনীপতি। খেলাচ্ছলে যাহা আরম্ভ হইয়াছিল তাহার পরিণতি কোথায়, তাহা তাহার

পক্ষে জানা অসম্ভব নহে। কিন্তু তবুও সে এই বিষয়ে খানিকটা উদাসীন ; সে নীরদের কথা ভাবিয়াছে, কিন্তু তাহার ভগিনীর দাম্পত্য জীবনে সে যে কি অনর্থ আনিতেছে তাহার সম্বন্ধে সে যেন অচেতন।...গভীর অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে দেখিয়া সে পলায়ন করিল। শশাঙ্কের জীবনে সে একটা লজ্জাজনক অধ্যায় মাত্র।...উপসংহারের দিকে লক্ষ্য করিলেও এই উপন্যাসখানির রসলঘুতাই প্রমাণিত হইবে।" [—রবীন্দ্রনাথ

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"...গল্পবস্তুটি সোজাসুজি একটি ত্রিভুজ প্রণয়ের—'দুইবোনে' কামনা-উন্মত্ত চরিত্র শশাঙ্ক।...নারীর দুইরূপ এই গল্পের প্রতিপাদ্য বস্তু নয়, এবং তাহা দ্বারা গল্পের ব্যাখ্যাও করা যায় না।...

'দুই বোন' গল্পের পরিসর অতি সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত।...গল্পের ঘটনা ও বিবরণ অনেক জায়গায়ই অসংলগ্ন ও আকস্মিক বলিয়া মনে হয় ;...

...ঊর্মি যখন শর্মিলার ঘরে আসিয়া সংসারের হাল ধরিল তখন ঊর্মির প্রেমোন্মুখ চিত্ত এবং অন্যদিকে সদ্যসচেতনা শশাঙ্কর পৌরুষ এবং স্ত্রীর অতি-লালনযুক্ত সদ্যজাগ্রত প্রেমবাসনা এ-দুয়ের মধ্যে একটা সংযোগ ঘটিতে দেরি হইল না। এ পর্যন্ত গল্পের বিবর্তন সুন্দর ; কিন্তু তাহার পরেই মুশকিল।... শশাঙ্কর অন্তর্বিরোধ ও বিভ্রান্তির এতটুকু আভাস কোথাও লেখক দেন নাই। ইহা নিতান্তই আকস্মিক, নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক ; ইহার ফলে গল্পটির রস খুব গাঢ় হইতে পারে নাই।...ঊর্মিও শশাঙ্কর মতই বিবেকহীন। শর্মিলা ত তাহারই দিদি,...অথচ তাহারই রোগশয্যার আড়ালে শশাঙ্কর সঙ্গে তাহার নির্দয় দুরন্ত প্রণয়লীলা চলিয়াছে অবাধে। ইহা লইয়া একবারও কি ঊর্মির মনে খট্‌কা কোথাও কখনও লাগে নাই?...এইখানেই মনে হয় 'দুইবোন' গল্পের দুর্বলতা।...

'দুইবোন' গল্পের উজ্জ্বলতম চরিত্র শর্মিলা।...নিদারুণ দুঃখ বহন করিয়াও সে বারবার কেমন করিয়া অপার ধৈর্য ও ক্ষমায়, স্নেহ ও ভালবাসায় স্বামীর নিষ্ঠুর উন্মাদনাকে আশ্রয় দিয়াছে, ঊর্মিকে অন্তরের মধ্যে আশ্রয় দিয়াছে, তাহা কিছুতেই পাঠকের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ না করিয়া পারে না।...

...এই গল্পে শর্মিলাই একমাত্র চরিত্র যাহা নিষ্কম্প দীপশিখার মত নির্মল ও উজ্জ্বল, স্পষ্ট ও জীবন্ত এবং যাহার প্রতি লেখক নিজে শ্রদ্ধান্বিত ;...শর্মিলার কল্যাণময় স্থিরবুদ্ধিই শেষ পর্যন্ত শশাঙ্ককেও স্বকেন্দ্রে ফিরাইয়া আনিয়াছে।"

[—রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা

মালঞ্চ

গল্পাংশ : আদিত্য ফুলের ব্যবসা করে। নীরজা আদিত্যের স্ত্রী। বিয়ের পর দীর্ঘ দশ বছর ধরে সে স্বামীর সঙ্গে উদ্যান রচনা করেছে, তারপর নীরজার সন্তান সম্ভাবনা ঘটলো কিন্তু প্রসবকালে অস্ত্রাঘাত করে শিশুকে মেরে জননী বাঁচলো। সেই অসুস্থতা সারলো না।

নীরজার সংসারে এসে পড়লো সরলা। সরলা আদিত্যের সম্পর্কে বোন। আদিত্যের মেসোমশাই সরলার জ্যাঠা মশাই। সরলার ছ'বছর বয়সে মা ও জ্যাঠাইমা মারা যায়, আট বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে। জ্যাঠামশাই তাকে মানুষ করেন। জ্যাঠামশাইয়ের বাগানে আদিত্য ও সরলা একসঙ্গে তেইশ বছর কাজ করেছে। তারপর জ্যাঠামশাইয়ের দেওয়া টাকাতেই আদিত্য নিজের বাগানের পত্তন করে। নীরজার অসুস্থতার জন্য এখন আবার সেই সরলা এলো বাগানের কাজ দেখতে ও নীরজার সংসার দেখতে। স্বামীর পূর্ব-পরিচিতা অনূঢ়া এই মেয়েটির আগমনে নীরজার মনে জাগলো ঈর্ষা। সহসা সে যেন বুঝতে পারে স্বামী তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে।

সরলা ফুল আনে, নীরজা বিরক্ত হয়, ফুলের নাম নিয়ে তর্ক তোলে। খুড়তুতো দেওর রমেন আসে, নীরজা বলে—'সরলাকে তুমি বিয়ে কর।' আদিত্যকে নীরজা বলে—'বারাসতে ইস্কুলে সরলাকে হেডমিস্ট্রেস করে পাঠিয়ে দাও।' আদিত্য জানায় যে সে সরলাকে তাড়াতে পারবে না, অধর্ম হবে। জ্যাঠামশাইয়ের দেওয়া টাকায় এই বাগান।

নীরজা কাঁদে। সরলা সব বোঝে। আদিত্যের সংসার থেকে সে সরে যেতে চায়। রমেন স্বদেশী করে। রমেনের সঙ্গে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় গিয়ে সে গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু জেলে স্থানাভাবের জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

সরলার গ্রেপ্তারের সংবাদে নীরজা স্বস্তি পেয়েছিল, তার ফিরে আসার খবর পেয়েই সে জ্ঞান হারালো। রাত্রে যখন সরলা এলো, তখন নীরজার অন্তিম মুহূর্ত। শেষ কথা নীরজা বলে গেল—'না না দিতে পারব না, পারব না! আমি থাকব থাকব থাকব।'

নীরজা তার ভালবাসার মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়। কোন এক সময় সে আদিত্যকে বলে—'সন্ধেবেলায় এমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপুরি গাছের ডাল ঠিক আমারই চোখের

সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো, আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে করো, বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে আমার আঙুলের ছোঁয়া আছে তাতে।'…

প্রধান চরিত্র : আদিত্য। স্ত্রী নীরজা। খুড়তুতো ভাই রমেন। সম্পর্কিত বোন সরলা। আয়া রোশনি, হলা মালী, ইত্যাদি।

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"…মৃত্যু শয্যাশায়িনী নীরজার ঈর্ষা-বিকার, প্রতিদ্বন্দ্বিনীর বিরুদ্ধে স্বামী-প্রেম ও ফুলবাগানের উপর তাহার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার প্রবল চেষ্টাই উপন্যাসের বিষয়।…ইহার আসল বিশেষত্বের ইঙ্গিত ইহার নামকরণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।…নীরজার প্রেমের সহিত তাহার স্বহস্তরচিত পুষ্পোদ্যানটির এক আশ্চর্য একাত্মতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুষ্পোদ্যানটি যেন এই প্রেমের একটি জীবন্ত নিদর্শন ও প্রতীক।…উপন্যাসটির উৎকর্ষের প্রধান কারণ ইহার মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ নহে, ইহার ভাবগত সুষমা ও সামঞ্জস্য এবং নীরজার অন্তিম মুহূর্তের ব্যবহারে এই ঐক্যের হানি হইয়াছে।…কলাকৌশলের দিক দিয়া এই পরিচ্ছেদটিকে একটা ত্রুটি বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।…'মালঞ্চ' রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের ক্ষুদ্র উপন্যাসগুলির মধ্যে বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করিতে পারে।" [—বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"…'মালঞ্চ' 'দুই বোনের' সগোত্রীয়,…দুটিরই গল্পাংশ প্রায় এক।… 'দুইবোনে' রবীন্দ্রনাথ শেষ রক্ষা করিয়াছেন। 'মালঞ্চ'…নিষ্করুণ ট্র্যাজেডি…

…নীরজার বঞ্চিত জীবনকে ঘিরিয়া একটি গভীর দুঃখ সঞ্চারমান ;…যে বিশুদ্ধ গভীর দুঃখ, যে মহিমাময় ট্র্যাজিক পরিণতি নীরজাকে আমাদের হৃদয়ের নিকটতর করিতে পারিত রবীন্দ্রনাথ সেই নীরজাকে একটি প্রমত্তা প্রেতিনীর মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া আমাদের চিত্তে যুগপৎ ভয় ও ঘৃণার সঞ্চার করিয়া তাহার উপর শেষ যবনিকা টানিয়া দিলেন, হৃদয়বান কবির হাতে বঞ্চিতা, নিরপরাধ, অনুকম্পনীয়া একটি নারীর প্রতি এই নির্মম অবিচার চিত্তে ক্ষোভের সঞ্চার না করিয়া পারে না।…

রমেন অত্যন্ত অস্পষ্ট চরিত্র…তাহার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব সর্বত্রই অপরিস্ফুট।… হলা মালি ও রোশনির চরিত্র দুইটি স্পষ্ট ও জীবন্ত।…

…গল্পের শেষ দৃশ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম আচরণ আদিত্যের নিজের।…বলা

যাইতে পারে, আদিত্যের মনে নীরজার সম্বন্ধে ভালবাসার লেশমাত্র অবশিষ্ট নাই ; কাজেই সে যে আচরণ করিয়াছে, যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে কথা বলিয়াছে তাহাই সত্যাচরণের ভাষা ও ভঙ্গি। কিন্তু এই সত্যাচরণ মনুষ্যধর্মবোধ বহির্ভূত আচরণ এবং সেই হেতু মিথ্যা ; মৃত্যুর দুয়ারে বসিয়া এই নিষ্ঠুর নির্মম আচরণ একান্তই অমানুষিক !" [—রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা

মনোরঞ্জন জানা লিখেছেন—

"নীরজার স্বামী-প্রেম, তাহার স্বপ্ন, তাহার সৌন্দর্য, কল্পনা, মাধুর্য, সেবা ও ত্যাগ সমস্ত কিছু অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার মালঞ্চ আশ্রয় করিয়া। সে প্রেম গৃহ ছাড়িয়া সমাজে যতটুকু অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাও ওই মালঞ্চের ভিতর দিয়া। মালঞ্চ ছিল তাহার সমগ্র অন্তর্জীবনের বহিঃপ্রকাশ।...

...সে ছিল স্বামীর সহধর্মিনী, স্বামীর গৃহের লক্ষ্মী, তাহার সচিব।...

আজ তাহার স্বামী, তাহার সেই মালঞ্চ, মালঞ্চের পরিচিত প্রত্যেকটি বৃক্ষ লতা, বৃক্ষের প্রত্যেকটি কুসুম, এই পরিজনবর্গ, তাহাদের এত প্রেম, প্রীতি, এই অপরূপ, দুর্লভ মর্ত্যভূমি,...এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করিয়া বড় অকালে তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে।...সব চলিবে সব থাকিবে কেবল সেই শুধু চলিবে না থাকিবে না।...

....মৃত্যুর পর মানুষ আর একটি জগৎ আর একটা জীবন লাভ করে।...যে প্রিয়জনকে মৃত্যুতে চিরকালের জন্য হারাইয়াছি সে একেবারে নাই, কোন রূপে নাই, ইহা অপেক্ষা সে আর কোন লোকে, আর কোন স্বরূপে আছে এই কল্পনায় মানুষের অধিক সান্ত্বনা।...

মানুষের প্রেম এমনি করিয়া নিত্য লীলার কল্পনা করে, এমনি করিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠিতে চায়। সকল মানুষের ন্যায় নীরজাও তাহার প্রেমে জীবনের এই শাশ্বত নিয়তিকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে।

কিন্তু নীরজার এই চেষ্টা সার্থক হয় নাই। তাহার স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে। সান্ত্বনাশূন্য হাহাকারের মধ্যে নীরজার জীবনদীপ ফুৎকারে নিভিয়া গিয়াছে। সে তাহার আসক্তির পাত্রকে প্রাণপণ বলে জড়াইয়া ধরিয়া অসহায়ভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। একমাত্র মৃত্যুতে সে বাহুবন্ধন শিথিল হইয়াছে।

সরলা আদিত্যের প্রেমের বৈধতা স্বীকার করে। এই বৈধতা সম্পর্কে তাহার মনে কোথাও এতটুকু সংশয়ের দ্বন্দ্ব জাগে নাই।...

আদিত্য শেষে অধৈর্য হইয়া কী জানি কী করিয়া বসে, হয়ত তাহার নিরুদ্ধ

প্রেম সকল সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া গৃহের অশান্তিকে সহস্রগুণ বাড়াইয়া তুলিবে এই আশঙ্কায় সরলা পলাইয়া কারাবরণ করিয়াছে। যাওয়ার পূর্বে আদিত্যকে অনুরোধ করিয়া গেল যেন সে নীরজার মর্ত্যজীবনের শেষ কটা দিন তাহার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করিয়া দেয়। নীরজার প্রতি সরলার এই যে করুণা তাহা উন্নত-তর কোন বোধের প্রকাশ তো নয়ই বরং ইহা নীরজাকে আরও অসম্মানিত করিয়াছে।...সরলা যদি তাহার বর্তমান অবস্থাকে প্রকৃতই ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইত, জীবনের এই নিয়তি রূপটিকেই যদি সে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিত তাহা হইলে বুক ফাটিয়া গেলেও আদিত্যের নিকট তাহার প্রেম প্রকাশ হইয়া পড়িত না।...

আদিত্যের অন্তরে কামনার শিখা জ্বালাইয়া দিবার পর কিছুকালের জন্য কারাবাস যাপনের সঙ্কল্পের সার্থকতা কিছুমাত্র নাই।...

সরলা আশৈশব নিষ্ঠার সহিত দেবপূজা করিয়া আসিয়াছে; নিত্যদিন ভক্তিভরে দেবতার নিকট কুশল কামনা করিয়াছে। ইহার ফলে সে কি পাইয়াছে? শৈশবে সে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে। যে জ্যাঠামশায় তাহাকে কন্যার অধিক স্নেহে মানুষ করিয়াছিলেন তিনিও অকালে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। ইহসংসারে তাহার আত্মীয়স্বজন পরিজন সহায় সম্বল বলিয়া কিছু নাই। আর সে শৈশব হইতে যাহার প্রতীক্ষায় দিন গুনিয়াছে সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে সেই আদিত্যের সংসারে সৌভাগ্যের সীমা নাই। সে তাহার গৃহে একদিন গৃহিণীর সর্বোচ্চ সম্মান লইয়া আসিতে পারিত, কিন্তু আজ সে এ সংসারে একজন আশ্রিতমাত্র।...আদিত্য যখন তাহার কাছে প্রেম যাচ্ঞা করিয়াছে তখন তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার কোন উপায় নাই।... সরলা তাই দেবপূজা পরিহার করিয়াছে।...

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী নীরজার অন্তর স্পর্শ করে নাই, তাহার স্বধর্ম ও তদাশ্রয়ী সাধনা ইহার বিরুদ্ধে ছিল বলিয়া। কিন্তু সরলা তাহার ঠাকুরের উপাসনা ত্যাগ করিয়াছে মিথ্যা বোধের বশে। জীবনের গভীরতর কোন সত্যবোধ, কোন উপলব্ধির পরিচয় তাহার জীবনের কোন পর্যায়ে আমরা প্রত্যক্ষ করি না।" [—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

" 'দুই বোনের' মধ্যে শর্মিলার মাতৃরূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে স্বামীর সেবায়। 'মালঞ্চের' মধ্যে নীরজার ভালবাসাও ছিল প্রচণ্ড।...উভয় গল্পে সমস্যা দেখা

দিল, যখন স্ত্রী হইল পীড়িত।…শর্মিলার মাতৃহৃদয় সন্তানের অভাবে স্বামীর উপরেই তাহার অতিলালনের ভার চাপাইয়াছিল। শশাঙ্কের পক্ষে সে ভার হয় দুর্বহ।…ভালোবাসার অসহ্য পীড়নে সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল।

…শর্মিলা শশাঙ্কের জীবনের পরিবর্তন দেখিয়া মর্মাহত, নিজের প্রতি সে আস্থাহীন। উর্মিমালা তাহার সহোদরা বলিয়া ঈর্ষা তাহার উগ্র হইয়া উঠে নাই।…'দুই বোনের' শেষ দিকটা একটু অদ্ভুত; শর্মিলা তিব্বতী অবধূতের ঔষধে সুস্থ হইয়া উঠিল; উর্মিমালা বিলাত চলিয়া গেল। কিন্তু 'মালঞ্চের' শেষাংশ অত্যন্ত নিষ্ঠুর বেদনাদায়ক, নাটকীয় ভঙ্গীতে শেষ হইয়াছে।…'মালঞ্চের' মধ্যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব সুনিপুণভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে।" [—রবীন্দ্রজীবনী

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"…'মালঞ্চ' 'দুইবোন' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।…

কবির বিশ্লেষণী ও সৃজনী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রহিয়াছে নীরজাচরিত্রে। শেষ পর্যন্ত তাহার মনে কঠোর দ্বন্দ্ব চলিয়াছে—যে পরাজয়কে সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছে একান্তভাবে তাহাকে গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারে নাই। যে ত্যাগ তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী তাহাকে সহজ করিয়া লইতে সে প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু মৃত্যুর দ্বারেও তাহার স্বাধিকারপ্রমত্ততা অটুট রহিয়াছে। তাহার মৃত্যুর বর্ণনা অতি অপরূপ হইয়াছে।…" [—রবীন্দ্রনাথ

চতুরঙ্গ

গল্পাংশ: চার জনের কাহিনী: জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস।

দু-ভাই, জগমোহন ও হরিমোহন। জগমোহন নিঃসন্তান বিপত্নীক, হরিমোহনের সাতটি ছেলেমেয়ে, শচীশ তাদের মধ্যে সবার ছোট। শচীশের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন জগমোহন। জগমোহন পণ্ডিত মানুষ, শচীশ ভালমতই লেখাপড়া শিখলো। তারপর জগমোহন মেতে উঠলেন জনকল্যাণে। পাড়ার দরিদ্র চামারদের নিমন্ত্রণ হলো বাড়ীতে, রান্না করলো মুসলমানে। হরিমোহন সইতে পারলো না, মামলা করলো। আদালতের বিচারে নাস্তিক জগমোহন গৃহদেবতার সেবায়েৎ হবার অযোগ্য হলেন, বাড়ীর মাঝে পাঁচিল উঠলো। শচীশ জগমোহনের ভাগেই রয়ে গেল। হরিমোহন বললো—'দাদা সয়তানি করছে, ছেলেকে হাতে রেখেছে।' জগমোহন বললো—'গড্ বাই, শচীশ।' শচীশ হেসে গিয়ে উঠলো।

শচীশের কথায় জগমোহন একটি মেয়েকে গৃহে আশ্রয় দিলেন। সে ননীবালা। ননীবালা বিধবা, মায়ের কাছে ছিল। তাহার মায়ের মৃত্যুর পর শচীশের বড় ভাই পুরন্দর তাকে গৃহের বাহির করে আনে। পরে ননী সন্তানসম্ভবা হলে তাকে মাঝরাতে লাথি মেরে বের করে দেয়।

হরিমোহন নিন্দা রটালো। পিসি এসে জগমোহনকে বললেন—'পাপ বিদায় করে দে।' শেষে একদিন পুরন্দর এলো ননীকে বিদায় করতে; কিন্তু ননীকে দেখেই সে চমকে উঠলো। ননী মূর্ছিত হয়ে পড়লো। জ্যাঠামশাই পুরন্দরকে গৃহ থেকে বের করে দিলেন। পুরন্দরের কীর্তি তাঁর কাছে আর গোপন রইল না।

ননীকে নিন্দা থেকে রক্ষা করার জন্য শচীশ বললো—'আমি ওকে বিয়ে করবো।' জগমোহন আশীর্বাদ করলেন। হরিমোহন বাধা দিতে চাইলেন। কিন্তু ননী এই আবহাওয়া সইতে পারলো না, আত্মহত্যা করলো।

কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিল। জগমোহন পাড়ায় প্রাইভেট হাসপাতাল খুললেন। প্লেগের সেবা করতে গিয়ে নিজেই মারা গেলেন।

আঘাতটা শচীশকে বড় বেশী করে লাগলো। সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো, চাটগাঁয়ে লীলানন্দ স্বামীর শিষ্য হলো। নাস্তিক শচীশ একেবারে বদলে গেল। স্বামীজীর পা টেপে, স্বামীজীর তামাক সাজে।

লীলানন্দের সঙ্গে শচীশ কলিকাতায় এলো। সেখানে শিবতোষের বাড়ীতে স্বামীজী থাকেন। শিবতোষ নেই, তার বিধবা স্ত্রী আছে দামিনী। গুরু বা ধর্মের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। দামিনীর হৃদয়াবেগ দেখা দিল শচীশের প্রতি। স্বামীজী দেশভ্রমণে বেরুলেন, দামিনীও সঙ্গে রইল।

একদিন এক গুহায় স্বামীজী রাত কাটালেন। রাতে দামিনী এসে শচীশের পা জড়িয়ে ধরলো, শচীশ অন্ধকারে লাথি মেরে সরিয়ে দিল। উপযাচিকা নারীর স্পর্শে সে সংকুচিত হয়ে উঠলো। সে কিছুদিনের মত দূরে পালিয়ে গেল।

শচীশের বন্ধু শ্রীবিলাস লীলানন্দ স্বামীর শিষ্য হয়েছে। দামিনী শ্রীবিলাসের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। শচীশ দেখে, বলে—'দামিনীর এখানে থাকা চলবে না।' কিন্তু দামিনী কোথাও যেতে রাজী হয় না। গুরুও দামিনীকে ভয় করেন।

গুরুর এক চ্যালার আত্মীয় নবীন। নবীনের স্ত্রী তার মাতৃহীনা বোনকে

কাছে এনে রেখেছিল। একদিন শ্যালীর প্রতি নবীনের আসক্তি ধরা পড়লো। স্ত্রী নবীনের সঙ্গে বোনের বিয়ে দিল ও নিজে বিষ খেয়ে মরলো। সেই রাত্রেই দামিনী এসে শচীশকে বললো—'যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে সে তুমি তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও···যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি।' শচীশ বললো—'তাই হবে।'

এক বৃষ্টির রাতে শচীশ চমকে উঠলো। দামিনী ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করতে এসেছে। শচীশ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পরে দামিনীকে বললো —'তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।'

দামিনী কলিকাতায় মাসীর বাড়ীতে চলে এলো, কিন্তু সেখানে টিকতে পারলো না। আবার কি সে লীলানন্দ স্বামীর কাছে যাবে? শ্রীবিলাস বললো—'আমাকে বিয়ে কর।'

দামিনীর সঙ্গে শ্রীবিলাসের বিয়ে হলো। শ্রীবিলাস রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী। সে অধ্যাপক হলো, 'নোট' লিখলো, ইংরাজী কাগজের সাব্-এডিটর হলো। বছরখানেক পরেই দামিনী অসুস্থ হলো। সে অসুখ সারলো না, বছরখানেক ভুগে দামিনী মারা গেল।

প্রধান চরিত্র: জ্যাঠামশাই জগমোহন। শচীশ। শচীশের পিতা হরিমোহন। শচীশের দাদা পুরন্দর। ননীবালা। শচীশের বন্ধু শ্রীবিলাস। দামিনী। গুরু লীলানন্দ স্বামী, প্রভৃতি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"সাধারণ ঔপন্যাসিক যেরূপ গভীর দায়িত্ববোধ ও সর্বতোমুখী সতর্কতার সহিত তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রদের পরস্পর সম্পর্ক ও প্রকৃতির পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করেন, এখানে তদনুরূপ কিছুই নাই।···শচীশ ও দামিনীর দ্রুত পরিবর্তন-গুলি যেন একটা নিয়মহীন উদ্দাম খেয়ালেরই অনুবর্তন করিতেছে বলিয়া মনে হয়।···উপন্যাসটির গঠন-শিথিলতার একটা প্রমাণ শচীশের জ্যাঠামশাইয়ের অত্যাবশ্যকরূপে পল্লবিত জীবন-বর্ণনায়। উপন্যাসের মধ্যে শচীশের জীবনাদর্শের উপর প্রভাব বিস্তার করা ছাড়া তাহার কোন প্রত্যক্ষ অংশ নাই। অথচ শচীশ অপেক্ষা তাঁহার জীবনকাহিনী অধিকতর ধারাবাহিকতার সহিত ও সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে।··" [—বাংলা-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"মূল চরিত্র শচীশ।···জ্যাঠামশাই যখন ছিলেন, তখন সে ছিল নাস্তিক,

জ্যাঠামশায়ের চেলা; তিনি মারা গেলে সে হইল লীলানন্দ স্বামীর শিষ্য।...

আইডিয়া বা আইডিয়াল লইয়া শচীশের কারবার; সে আদর্শবাদী—সমাজের চক্ষে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ তাহার বিচার সে কোনদিন করে নাই।...আদর্শ বা আইডিয়াল তাহার কাছে সব চেয়ে বড়ো, মানুষ নহে। আইডিয়ার সঙ্গে যতক্ষণ বিরোধ হয় না ততক্ষণ মানুষকে সে মানে, আদর্শের উপলব্ধিতে মানুষ যেখানে অন্তরায়, সেখানে তাহার বন্ধনও সে কাটে। দামিনীর কাছে মানুষ বড়ো। শচীশের প্রতি প্রেম তাহাকে সামান্যতর হইতে মহত্ত্বে পৌছাইয়া দিয়াছে। এই প্রেমের সাধনার মধ্য দিয়াই সে শ্রীবিলাসের প্রেমকে চিনিতে পারিল।...

...দামিনী ও শ্রীবিলাস উভয়েই 'চোখের বালির' বিনোদিনী ও বিহারীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 'চোখের বালিতে' বিনোদিনীর সহিত বিহারীর কোন সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই; কিন্তু 'চতুরঙ্গে' শ্রীবিলাস দামিনীকে বিবাহ করিয়াছিল। তবে এ বিবাহ সাধারণ ঘরসংসার পাতিবার জন্য বিবাহ নহে—ইহা আইডিয়ালের ভাঙাচোরায় গড়া সম্বন্ধ।....

'চতুরঙ্গ' ফাল্গুনী ও 'ঘরে বাইরে' বলাকার যুগে রচিত। বলাকার মধ্যে কবির যেসব তত্ত্বকথা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহার জীবনদর্শনের মূলগত কথা।...গতিস্থিতি, রূপ অরূপ, রাত্রি-দিন, আলো-আঁধার, প্রভৃতি অসংখ্য বিপরীতের যথার্থ সমবায় ও সমন্বয়ে জীবন অর্থপূর্ণ। শচীশের জীবনে সেই গতি, স্থিতি ও পূর্ণতার তিনটি স্তরই কবি ব্যক্ত করিয়াছেন—জ্যাঠামশাইয়ের শিষ্যরূপে শচীশ জগতের গতিকে, তাহার বাহিরের দৃশ্যমান রূপটিকে দেখিয়াছিল জ্ঞানের মধ্যে; লীলানন্দ স্বামীর শিষ্য হইয়া সে স্থিতির মধ্যে অনুভূতির মধ্যে রসের মধ্যে জগতকে দেখিল;...উভয়ের প্রভাব হইতে মুক্ত শচীশ যে সত্যের সন্ধান পাইল তাহা পূর্ণতার রূপ।...শচীশ পুনরায় যে কাজে লাগিল সে-কাজে তাপ নাই, দাহ নাই, তাহা সেবায় উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ।" [—রবীন্দ্রজীবনী

সরসীলাল সরকার লিখেছেন—

"এই পুস্তকের প্রথম চরিত্র জ্যাঠামহাশয় জগমোহন। ইঁহার চরিত্রে সর্বপ্রধান বিশেষত্ব যে ইনি নাস্তিক।...জ্যাঠামহাশয়ের নাস্তিকতা তাঁহার ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল না। এইটির ভিত্তি ছিল নিছক একটা বিদ্রোহের ভাব। এই বিদ্রোহের ভাবটি শচীশ আহরণ করিয়াছিল। আবার

এই বিদ্রোহের ভাবটি শচীশ এক দিক দিয়া জ্যাঠামহাশয়ের উপরই প্রয়োগ করিয়াছিল।...

...বিদ্রোহের ভাব লইয়া জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যুর পর সে এমন একটি লোককে গুরুরূপে বরণ করিল যিনি জ্যাঠামহাশয়ের ঠিক উল্টা প্রকৃতির এবং সেই উল্টা প্রকৃতির গুরুবরণে যেন সে জ্যাঠামহাশয়ের শিক্ষাই মানিয়া চলিল, কেননা জ্যাঠামহাশয়ও উল্টাপথে কি চলেন নাই ?...

যথার্থ ধর্মবোধের বিকাশ মিষ্টিক উপলব্ধির পথেই হয়। প্রত্যেকেই নিজের মিষ্টিক উপলব্ধি দ্বারাই নিজের ধর্ম সৃজন করে এবং নিজের মধ্যে তাহা অনুভব করে, সেই জন্যেই আর সব জিনিষ পরের হাত হইতে দানস্বরূপ লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম কখনও লওয়া যায় না।...

শচীশের মিষ্টিক উপলব্ধির ভিন্ন ভিন্ন স্তর গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন। এবং তাহার চরিত্রগঠনের ভঙ্গীতে মনে হয় যে নিষ্কামকর্মী ও ইন্দ্রিয়জয়ী শচীশ এখনও নব নব উপলব্ধির পথে চলিয়া নূতনভাবে নিজেকে গড়িয়া লইতে পারে গ্রন্থকার তাহার সম্পর্কে এই অসমাপ্ত ইঙ্গিতটি রাখিয়া দিয়াছেন।...

আমাদের জীবনের যাহা যথার্থ বিকাশ তাহা এই মিষ্টিক উপলব্ধির ভিতর দিয়া। যথার্থ আর্ট এই মিষ্টিক উপলব্ধিকে যথাযথ প্রকাশ করে। আমরা এইরূপ আর্টের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের পুস্তকের মধ্যে পাইয়া থাকি।”

[—বিচিত্রা, পৌষ' ৩৮

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

“...‘চতুরঙ্গকে’ আমি মহৎ উপন্যাস বলি না। ইহার বস্তুভূমির গভীরতা আছে, কিন্তু প্রসার নাই ; মানব সংসারের বিচিত্র বহুমুখীন্ তরঙ্গলীলার সঙ্গে ইহার যোগ নাই। ইহার জীবন-দর্শন খণ্ডিত, জীবনের সমগ্রতার স্পর্শ এই উপন্যাসে লাগে নাই। কিন্তু ‘চতুরঙ্গ’ সুন্দর ও সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি! ইহার বুদ্ধির দীপ্তি, রহস্যময় সংকেত, ইহার হ্রস্ব, সূত্রায়িত বর্ণনাভঙ্গি, ইহার জ্ঞানগর্ভ ইঙ্গিতময় বিবৃতি, ইহার সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের ধারা, সর্বোপরি ইহার কবিকল্পনার ঐশ্বর্য ইহাকে যে বিশেষ এবং অভিনব সাহিত্যমূল্য দান করিয়াছে—তাহার কথাঞ্চৎ তুলনা ‘শেষের কবিতা’ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর একটিও নাই।”

[—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা

মনোরঞ্জন জানা লিখেছেন—

"জগমোহনের জীবন-দর্শনের মূল কথা হইল অন্তর ও বাহিরের সর্ববিধ বাধা দূর করিয়া দেওয়া, লৌকিক ও অলৌকিক কোন শক্তির নিকট মাথা না নত করা, কেবল আপন চিত্তের পরিশুদ্ধতা ও মনোবলের উপর নির্ভর করা, সামাজিক সকল সুযোগ-সুবিধা সকল মানুষের নিকট আনিয়া দেওয়া।

জগমোহন মানুষকে সম্পূর্ণরূপে যুক্তি ও বিচারবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। মন ও বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত মানবীয় আর কোন সত্তায় জগমোহনের বিশ্বাস ছিল না।...

...একমাত্র জ্যাঠামশাইকে আশ্রয় করিয়া শচীশের ভাব-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। শচীশ তাহার জীবনে যাহা কিছু পাইয়াছিল তাহা জ্যাঠামশায়ের ভিতর দিয়া, যাহা কিছু দিয়াছিল তাহাও জ্যাঠামশাইয়ের ভিতর দিয়া।...

জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর ভিতর দিয়া শচীশ গভীরতর জীবন-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইয়াছে।...সে তাহার চূড়ান্ত জ্ঞান যুক্তি ও বিচার প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছে যে মানুষ কেবল বুদ্ধির সহায়তায় এই জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ লাভ করিতে পারে না। বুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া এই জীবনের সীমাহীন প্রসার।...

শচীশ লীলানন্দ স্বামীর সাধনার মধ্যে একটি ভিন্নতর পথের ইঙ্গিত লাভ করিয়াছে। এই সাধনায় ওই জ্ঞান ও বুদ্ধিটাকেই মূলে অস্বীকার করা হইয়াছে।

...এ সাধনা মানুষকে বহির্জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন করিয়া জগৎ ও জীবনের ঘটনাবলীর ঊর্ধ্বে একটি ভাবজগতে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।...

...লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভাব ও রসের গভীরতম তল পর্যন্ত লাভ করিয়া শচীশ দেখিয়াছে যে এখানে জীবনের সমাধান নাই। জীবনকে সামগ্রিক রূপে তাহার চরম অর্থে দেখিতে হইলে জীবনের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে হয়।...

দামিনী সমস্ত জীবন তাহার নিম্নতর বোধ দিয়া যেমন, উন্নততর বোধ দিয়াও তেমনি শচীশকে মোহমুক্ত করিয়া উন্নততর জীবন বোধে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে—সে চেষ্টা কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও পরোক্ষ।... দামিনীই শচীশের অন্তরে সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র এবং ইহার সাধন-রূপকে সকল মোহ মুক্ত, স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে।...দামিনী বুঝিয়াছিল শচীশকে লইয়া আর যাহাই করা যাক-না কেন সংসার রচনা করিতে পারা যায় না। শচীশের রচনা-লোক, কর্মলোক, সংসার নয়।

শ্রীবিলাস শচীশের সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহার সহিত তাহার প্রাণের কোন গভীরতর কোন আধ্যাত্মিক পিপাসা বিজড়িত ছিল না।

…শ্রীবিলাস শচীশকে ভালোবাসিয়াছিল কতকটা মতবাদের মিলের জন্য কতকটা তাহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য।

…শচীশকে ভালোবাসিয়া তাহার সঙ্গ লাভের জন্য সে তাহার সাধনাকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীবিলাস ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

তাহার নিকট এই জগৎ ও জীবন অনেক বেশী সত্য, অনেক বেশী সত্য সংখ্যাতীত নরনারীর সংসার লীলা, মায়া ও মমতার বিচিত্র বন্ধন। অমনি একটি স্নেহের নীড় রচনা করিয়া বুক ভরিয়া সকলকে ভালোবাসা।…

শ্রীবিলাসের সাধনা এইদিক হইতে রূপের সাধনা বলা যাইতে পারে। প্রেমে মানুষ রূপের মধ্যেই রূপের সীমা ছাড়াইয়া যায়।…

শ্রীবিলাসের এই প্রেমের সহিত পরিশেষে করুণা আসিয়া মিশিয়াছে। তাহার নিজের বেদনা অপেক্ষা, তাহার নিকট দামিনীর বেদনা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। সত্য প্রেমের স্বরূপই এই।…

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার শ্রেষ্ঠ ফললাভটিকে শচীশের পরিণত আধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। সেখানে রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীমের পূর্ণ স্বীকৃতি আছে।…

এই সাধনারই একটি দিক শ্রীবিলাস-দামিনীর মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। যে প্রেমে অসীম সীমা-রূপ লাভ করিয়াছেন, সেই এক প্রেম নর-নারীর মধ্যে। এই প্রেমের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে তাই সীমা অসীমের যোগের রহস্যও উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব।…

…এই সমগ্র সৃষ্টিকর্মের পশ্চাতে যে মন, বুদ্ধি ও বোধ এককথায় যে মনস্তত্ত্ব ক্রিয়া করিয়াছে তাহা ভারতীয় সমগ্র সাংস্কৃতিক গুচ্ছৈষা (Culture-Complex) বহির্ভূত।" [—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

চার অধ্যায়

গল্পাংশ : রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস। এলাকে নিয়ে কাহিনী। বাপমায়ের একমাত্র কন্যা এলা। বাবা অধ্যাপক, নরেশ দাসগুপ্ত, সাইকলজির বিলিতি ডিগ্রি

আছে, পণ্ডিত মানুষ। মা শুচিবায়ুগ্রস্ত। এলা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি পরীক্ষায় পাস করে বেরুলো তখন তার মা-বাবা দুজনেই মারা গেছেন। কাকা সুরেশবাবু ডাকবিভাগের অফিসার, এলা এলো কাকার কাছে। কাকার মেয়ে সুরমা তার কাছে পড়তে লাগলো।

সেই সময় ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘটলো পরিচয়। ইন্দ্রনাথ য়ুরোপ ঘুরেছেন, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় সুপণ্ডিত, বিজ্ঞানী, ডাক্তারী পাস, যুযুৎসু-বীর। অসাধারণ তাঁর পাণ্ডিত্য, অনন্যসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব। তিনি বিপ্লবী নেতা, কিশোর ও যুবকদের নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক দল। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডাকাতি, হত্যা কোনটাই তাঁর কাছে অধর্ম নয়।

ইন্দ্রনাথ এলাকে দলে টানলো।

মোকামার স্টীমারে এলার সঙ্গে অতীনের পরিচয়। সেই পরিচয় পরে প্রেমে পরিণত হলো। এলা বললো—সে বিয়ে করবে না, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইন্দ্রনাথের কাছে। দেশের কাজে তার জীবন উৎসর্গীকৃত। এলার আকর্ষণে অতীনও এলো ইন্দ্রনাথের দলে।

কানাই গুপ্তের চায়ের দোকানে দলের একটা আড্ডা। সেখানে ইন্দ্রনাথের কাছ থেকে এলা মুক্তি চাইল, ইন্দ্রনাথ বললো, তাঁর দল থেকে কাউকে মুক্তি দেওয়া হয় না, দরকার হলে সরিয়ে দেওয়া হয়।

এলার বাড়ীতে অতীন এলো দেখা করতে, দলের হুকুম এলো—এখনি যেন সে সেখান থেকে চলে যায়।

কানাই গুপ্ত ইন্দ্রনাথের প্রধান মন্ত্রী। অতীনের ডায়েরী সে চুরী করলো। মুখোমুখী বলে গেল যে অতীনকে সে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। নাহলে অতীনের জন্য দলের লোকসান হবে। অতীনকে দলের আদেশে তখনই কলিকাতা ছাড়তে হলো।

অতীন গঙ্গার ধারে পাট কলের মজুরদের মাস্টারি করতে এলো। এক ভাঙা বাড়ীতে হলো তার আশ্রয়। এলা এসে বললো—আমাকে বিয়ে কর। আমার বাড়ী আছে, আমার টাকা আছে। অতীন বললো—না, আমার পথ তোমার পথ নয়।

এদিকে বটু এলাকে বিয়ে করতে চায়। প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে এলাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। এলা দলের সবাইকে চেনে, পুলিশের অত্যাচারে সে সমস্তই প্রকাশ করে দিতে পারে, সেইজন্য অতীনের উপর আদেশ হলো এলাকে

হত্যা করবার। অতীন এলো। অতীন তখন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত। এলা তার কাছে প্রেম নিবেদন করে। অতীন জানালো—দলের মধ্যে কথা উঠেছে যে এলার আর বেঁচে থাকা উচিত নয়। এলা বুঝলো তার অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে, অতীনের হাতেই সে মরবার বাসনা জানালো। অতীন এলাকে ঘুমুতে বললো, তার কাছে ছিল শেষ ঘুমের ঔষধ।

নিষ্ঠুর ইঙ্গিতের মধ্যে গল্পের শেষ হলো।

প্রধান চরিত্র: বিপ্লবী নেতা ইন্দ্রনাথ, বিদুষী মেয়ে এলা। অতীন। এলার সম্পর্কিত ভাই অখিল। বিপ্লবী দলের বটু ও কানাইগুপ্ত। এলার বাবা নরেশ দাসগুপ্ত। মা মায়াময়ী। কাকা সুরেশবাবু। কাকী মাধবী। খুড়তুতো সুরমা। ইত্যাদি।

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"ইহাতে স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গীভূত একটি বিশেষ প্রচেষ্টা—বিপ্লববাদ—আলোচিত হইয়াছে।...উপন্যাসের আসল নায়ক-নায়িকা অতীন বা এলা নহে, বিপ্লববাদের যে প্রতিবেশ উপন্যাসের সমস্ত পাত্রপাত্রীর মনোভাবকে বিশেষ আকার ও গতিবেগ দিয়াছে তাহাই প্রকৃতপক্ষে উক্ত সম্মানের দাবী করিতে পারে। অতীন ও এলা এই প্রতিবেশের দুরন্ত-বেগোৎক্ষিপ্ত দুইটি ধূলিকণা মাত্র।...অতীনের আত্মঘাতী বিদ্রোহ ও এলার ব্যাকুল অনুশোচনা বুঝিতে হইলে যে শক্তি তাহাদিগকে নিজ দুশ্ছেদ্য নাগপাশে বাঁধিয়াছিল তাহার আনুমানিক নহে, প্রত্যক্ষ পরিচয় চাই। এই পরিচয়ের অভাবই উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি।...

...এলার চরিত্রে রক্তমাংসের বাহুল্য নাই—তাহার চরিত্র সম্পূর্ণ অভাবাত্মক (negative)...

ইন্দ্রনাথ লোকটি যেমন ব্যবহারে দুর্বোধ্য, সেইরূপ পাঠকের পক্ষেও দুরতিগম্য—তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন তার্কিকতার অন্তরালে তাঁহার ব্যক্তিত্ব রহস্যটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার দলপতিত্ব তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।...

মানুষ হিসাবে বটু ও কানাই বরং ইন্দ্রনাথের অপেক্ষা সুস্পষ্ট হইয়াছে। বটুর ঈর্ষা-কষায়িত স্থূল লালসা ও কানাই-এর অনাবৃত সুবিধাবাদ ও সহানুভূতি-স্নিগ্ধ cynicism তাহাদিগকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছে।...

·· বর্তমান উপন্যাসে বিপ্লববাদের এমন একটা বীভৎস, কলঙ্ককালিমা-লিপ্ত চিত্র দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে প্রেমের সহিত ইহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা কল্পনা করা একেবারেই অসম্ভব।....

...উপন্যাসটির ধূসর ও অস্পষ্ট বেষ্টনী রেখার মধ্যে একমাত্র অতীনের প্রেমই উজ্জ্বল ও প্রাণ-ধর্মী হইয়াছে—উপন্যাসের রত্নভাণ্ডারে 'চার-অধ্যায়'-এর ইহাই মাত্র বিশিষ্ট দান।" [—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"...ইন্দ্রনাথ তাহার কেন্দ্রে; ইন্দ্রনাথ বিপ্লবী নেতা; স্বভাব দুর্দমনীয়, নির্মম হইতে তাহার বাধে না।...বাংলার সন্ত্রাসবাদের রক্তবর্ণ পটভূমিকায় দুটি তরুণ-তরুণীর প্রেমের উন্মেষ, উন্মীলন ও আত্মঘাতী পরিণতি—এই হল 'চার অধ্যায়।' অন্ত-এলার কাহিনী ইতিহাস নহে, লিরিকধর্মী কাব্যের অনুরূপ। ...ইন্দ্রনাথের মধ্যে যেমন আছে সন্দীপের আড়ম্বর তেমনি আছে বাঁশরীর পুরন্দরের গুরুগিরির ভাব।...'পথের দাবীর' সব্যসাচীকে মনে করাইয়া দেয়। অখিলের কথা পড়িতে পড়িতে 'ঘরে-বাইরের' অমূল্যকে মনে পড়ে। এলা কবির একটা অদ্ভুত সৃষ্টি।" [—রবীন্দ্র জীবনী

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"...অতীন্দ্রনাথের মুখ দিয়া কবি বলিয়াছেন যে বিভীষিকাপন্থী যাহাকে বলে দেশের প্রয়োজন, তাহা হইতেছে আত্মধর্মনাশের প্রয়োজন। কিন্তু কবি যেন ইহাও বলতে চান যে এই পন্থা বিশেষভাবে বাঙলার সন্ত্রাসবাদীর পন্থা নহে, ইহা সমগ্র পৃথিবীশুদ্ধ জাতীয়তাবাদের পন্থা।...কবির নালিশ বিশেষভাবে এই-দেশীয় বিভীষিকা-পন্থার বিরুদ্ধে নহে, য়ুরোপীয় 'ন্যাশানালিজম্' ও 'প্রেট্রিয়টিজমের' বিরুদ্ধেও। এই কারণে বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

...উপন্যাসের প্রধান দুইটি চরিত্রের মধ্যে এলা আসিয়াছে গৃহের হাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে, আর অতীন্দ্রকে টানিয়াছে এলার আকর্ষণ। ইহারা আসিয়াই ছুটি চাহিয়াছে, দলে রহিয়াছে শুধু কথা দিয়াছে বলিয়া মিথ্যা আত্মসম্মানের দাবীতে এবং শেষকালে জড়াইয়া গিয়াছে কর্মের গ্রন্থিতে যেখান হইতে নিষ্কৃতি নাই। ইহাদের সমস্যা বিশেষভাবে ইহাদেরই সমস্যা, দলের সমস্যার সঙ্গে তাহার যোগ একান্ত নহে। ইন্দ্রনাথ দলের নেতা, কিন্তু কবি তাহার পতনের চিত্র আঁকেন নাই।...

...ইহাতে ভাষার ঐন্দ্রজালিক শক্তির যে পরিচয় আছে তাহার তুলনা

অন্য কোন সাহিত্যিকের রচনায় পাওয়া যায় না।...মূলনীতি ও কথোপকথনের ভাষা অনবদ্য কিন্তু, তবুও অভিব্যক্তি হইয়াছে খণ্ডিত।" [—রবীন্দ্রনাথ

নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন—

"...লেখকের কাছে পাঠকের একটা মৌলিক দাবি এই যে, যে-বস্তুভূমির উপর তাহার গল্পের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় সেই বস্তুভূমিকে লেখক তাহার যথার্থ স্বরূপে, তাহার সামগ্রিক রূপে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। 'চার অধ্যায়ে' এই বস্তুভূমির যথার্থ বাস্তব রূপ যেমন উদ্‌ঘাটিত হয় নাই আমার মনে হয় তেমনই দেখান হয় নাই তাহার সামগ্রিক রূপ।...

'চার অধ্যায়ে' সবচেয়ে বস্তুঘনিষ্ঠ চরিত্র কানাই এবং বটু, আর সবচেয়ে মধুর চরিত্র অখিল...

...এলা-অতীন সংবাদ যতই রোম্যান্টিক হউক না কেন, 'চার অধ্যায়ে' এই এলা-অতীন সংবাদ গ্রন্থের প্রথমতম এবং প্রবলতম আকর্ষণ...মনস্তত্ত্বের দিক হইতে তাহাদের প্রেমের সূচনা, বিবর্তন ও পরিণতি একান্ত গ্রাহ্য, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং যেভাবে উভয়ের কথাবার্তা ও ঘটনার ভিতর দিয়া সেই প্রেম আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে তাহা অনবদ্য।...

'চার অধ্যায়ের' সুর গীতিকাব্যের—তীব্র লিরিকের ধ্বনি ও মোহ, উত্তাপ ও আবেগ, সুর ও ব্যঞ্জনা ইহার আত্মার তন্তুতে।...চরিত্রগুলির পরিচয় ও ব্যঞ্জনা সমস্তই প্রকাশিত হইয়াছে কথার ভিতর দিয়া, অনর্গল অবিশ্রান্ত মুখের কথায়।...কবিকল্পিত চায়ের দোকানের অবাস্তব পরিবেশে, তৃতীয় অধ্যায়ে হুইসিলের শব্দ, ইলেকট্রিক টর্চ, ঝুরি নামা বটগাছের অন্ধকার তলায় হঠাৎ ট্যাক্‌সির আবির্ভাব, শেষ অধ্যায়ে ক্লোরোফরমের ইঙ্গিত এবং আবার হুইসিলের শব্দ ইত্যাদি সমস্তই মেলোড্রামার লক্ষণাক্রান্ত। আখ্যান বস্তুতেও রোম্যান্টিক নাটকীয় উপাদান প্রচুর। কিন্তু, লিরিক প্রকৃতি ও নাটকীয় আকৃতি এ দুয়ের দ্বন্দ্বে 'চার অধ্যায়েরও' সাহিত্যরস ব্যাহত হইয়াছে।..."

[—রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা

মনোরঞ্জন জানা লিখেছেন—

"মানুষ যত মুক্ত মন লইয়া জন্মগ্রহণ করে, অনুভূতি যাহার যত তীব্র, হৃদয়-বোধ যাহার যত গভীর, আত্মপ্রসারের বা আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা যাহার যত অধিক, বাহিরের বন্ধন, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা তাহাকে তত অধিক পীড়িত করে। জাতির লাঞ্ছনা ইন্দ্রনাথকে তাই মর্মান্তিক পীড়া দান করিয়াছিল।...

সশস্ত্র সংগ্রামে যে প্রতিপক্ষের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতে হয়…এবং নিয়ত এই ঘৃণাবোধ পোষণ করিবার জন্ম মানুষ যে ক্রমাগত মনুষ্যত্ব হারাইতে থাকে এইরূপ একটা যুক্তি অহিংসবাদীরা উপস্থিত করিয়া থাকেন। ইন্দ্রনাথ এই যুক্তিকে স্বীকার করিতে পারে নাই। তাহার মতে প্রতিপক্ষের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ বা ঘৃণাবোধ না পোষণ করিয়াও এই সংগ্রাম করা যাইতে পারে…

ইন্দ্রনাথের সাধনা প্রাণ ও মনের সাধনা।…পুরুষ ও নারীর মিলিত সাধনায় প্রাণ ও মনের বিকাশ যেমন হয়, তেমন আর কোথাও হয় না। ইন্দ্রনাথের দেশব্যাপী মহাযজ্ঞে তাই নারী ও পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন।…

ইন্দ্রনাথ তো কোন চরিত্র নয়, ইন্দ্রনাথ একটা আইডিয়ার প্রতীক মাত্র। ঔপন্যাসিক তাই তাহার চরিত্রের ধীর 'বিকাশের কোন পরিচয় দান করেন নাই, তাহার আইডিয়াটিকেই একপ্রকার উপস্থাপিত করিয়াছেন।…

অতীন জীবনে যে পথ বাছিয়া লইয়াছিল তাহার সহিত তাহার স্বভাব বা স্বধর্মের কোন মিল ছিল না। মানুষের সমগ্র সত্তা তাহার স্বধর্ম আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয়। স্বভাব বিরুদ্ধ আচরণে তাই সমগ্র সত্তা ছিন্নমূল হইয়া দিনে দিনে নীতি ও ধর্মহীনতার অতলে তলাইয়া গিয়াছে। একদিকে স্বভাবস্থিত হইবার জন্ম আত্মার দুর্নিবার প্রেরণা, অন্যদিকে কর্তব্যের টানে ঘটনার আবর্তে ধিক্কার দিতে দিতে আপনার অধিকার লোক হইতে ক্রমাগত দূরে সরিয়া যাওয়া। দুই বিরুদ্ধশক্তির প্রবল পীড়নে তাহার সমগ্র সত্তা পরিণামে শতধা হইয়া গিয়াছে।

স্বভাবে অতীন ছিল কবি। সাহিত্যের প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল প্রগাঢ়।…কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে অতীন শেষে যে পথ বাছিয়া লইয়াছে তাহাতে এই স্বপ্ন সার্থক করিবার কোন উপায় রহিল না। এই পথে পরিণামে তাহাকে বঞ্চনা ও পরাজয় বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। পরাজয়ে তো অগৌরব নাই, অতীনকে এ পরাজয় বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়া। অতীনের এ পরাজয়ে তাই কোন সান্ত্বনা নাই।··

অতীনের মধ্যে পৌরুষ ছিল বলিয়া অতীনের অন্তরে এলাকে বেষ্টন করিয়া এমন অপরূপ সৌন্দর্যলোক রচিত হইয়াছে, আবার তাহার এই সৌন্দর্যলোক আধ্যাত্ম বোধাশ্রয়ী প্রকৃত সৌন্দর্যলোক বলিয়া অতীন এলাকে পরিহার করিবার চেষ্টা করে নাই, সে চেষ্টা তাঁহার পক্ষে আত্মঘাতী।…

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অতীন আজ জীবনে এমন একটি পরিণাম লাভ করিয়াছে যেখানে এলার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে। যে ধর্মাচরণের জন্য সে এলাকে লাভ করিতে চাহিয়াছিল সেই ধর্ম হইতে চিরকালের জন্য স্খলিত হইয়া গিয়াছে।

স্খলিত জীবনের সর্বশেষ পরিণাম লাভ করিয়াও অতীন এ জগতের কাহারও উপর কোন ক্ষোভ রাখিয়া গেল না। এলাকে সে ক্ষমা করিয়াছে আর তাহার জীবনে বিধাতার অভিপ্রায় পূর্ণ হইতে পারিল না বলিয়া ঈশ্বরের অসীম ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে ঃ

সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌছিয়াও অতীন কিন্তু তাহার সামগ্রিক তত্ত্বদৃষ্টি হারায় নাই।" [—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"...চোখের বালি-গোরা-চতুরঙ্গ-ঘরে বাইরে-শেষের কবিতার লেখক রবীন্দ্রনাথ যে দুই বোন-মালঞ্চ-চার অধ্যায়েরও রচয়িতা একথা সহজ আনন্দে স্বীকার করতে ইচ্ছা হয় না। ভাষার সেই অপরূপ যাদু, বাক্‌ভঙ্গির সেই অপূর্ব দীপ্তি ও গতি তাহাও যেন এই গল্পগুলিতে দুর্বল ও স্তিমিত, শুধু যেন তাহাদের বাহিরের রূপ ও কাঠামোটা বজায় আছে, এর মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া যে বিদ্যুৎদীপ্তি চমকিয়া উঠে তাহাতে ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গির পূর্ব পরিচয় যেন সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাও ক্ষণিক দীপ্তি মাত্রই।"

[—রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"দুই বোন-মালঞ্চ-চার অধ্যায় পড়িলে এই ধারণাই হয় যে, গল্প বিবৃতির প্রতি, চরিত্র সৃষ্টির প্রতি লেখকের মনোযোগ একেবারেই শিথিল, ন্যূনতম যে প্রয়োজন পূরণ না করিলেই নয়, মাত্র তাহাই পূরণ করিয়া লেখক দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছেন...লেখক গল্প বলিতে বসেন নাই, গল্পকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করাইয়া অন্য উদ্দেশ্য সাধনে উদ্যত।...

চার অধ্যায়ের তত্ত্ব বীজাকারে 'গোরাতে,' অঙ্কুরাকারে 'ঘরে-বাইরেতে' বর্তমান, গুপ্ত পন্থার সমর্থন কোথাও পাওয়া যাইবে না।...

ইন্দ্রনাথ পাঠকের বিস্ময় আকর্ষণ করিতে পারে কিন্তু পাঠকের হৃদয়ের উপর তাহার কোন দাবী নাই।" [—রবীন্দ্র বিচিত্রা

অচ্যুৎ গোস্বামী লিখেছেন—

"...বঙ্কিমের মত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বিষয় বস্তুর স্পষ্ট দুটি ভাগ আছে

সমাজতাত্ত্বিক ও জাতীয়তাবাদী। সমাজতাত্ত্বিক বিস্তারিত ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই বলেছেন যে আমাদের সমাজ জীবনে স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, শিল্পানুশীলন প্রভৃতি স্বাভাবিক সহজাত বৃত্তিগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, এমন-কি জঙ্গীবাদী জাতীয় আদর্শ যদি তার বিরুদ্ধে যায়, তবু (বৌঠাকুরাণীর হাট)। আমাদের পীড়নমূলক সমাজ-ব্যবস্থা যখন স্বাভাবিক জৈবিক মানবীয় বৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশের কণ্ঠরোধ করে ধরে তখন সেই মানবীয় বৃত্তির প্রণবতা অনুযায়ী সমাজ-নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাই সূচিত হয় (চোখের বালি)।...'গোরা'তেও লেখক যে প্রেম-নীতির কথা বলেছেন তা দেহাশ্রয়ী ইন্দ্রিয়জ বৃত্তির অতীত বিশুদ্ধ ভাবমাত্র নয়। কিন্তু 'ঘরে বাইরেতে' তিনি বলেছেন নিছক দেহ কেন্দ্রিক ভোগবাদী প্রেম আর জঙ্গীবাদী জাতীয়তা আসলে এক বৃন্তে দুটি ফুল; এর দ্বারা কখনই প্রেমের প্রকৃত আদর্শে উপনীত হওয়া যায় না; প্রকৃত প্রেম ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, দেহ ছেড়ে বিশুদ্ধ দেহাতীত আত্মিক ভাবমার্গে তার চরিতার্থতা'। 'শেষের কবিতায়' লেখক দেখালেন যে এই বিশুদ্ধ প্রেমের কল্পলোক দিয়ে জীবন যাপন চলে না। তারপর আবার তিনি বাস্তববাদে ফিরে এসে পরবর্তী তিনখানি বই লিখলেন।

জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম রূপান্তর দেখতে পাই। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যদি জঙ্গীবাদী নিষ্ঠুরতা বা উগ্র বিভেদপন্থী রীতি-সর্বস্ব সনাতনত্বের পথে অগ্রসর হয়ে মানবতন্ত্রের সূত্রসমূহকে অস্বীকার করে, তবে তা কখনো কল্যাণপ্রসূ হবে না (গোরা), তারপর কবি বলছেন, স্বাধীনতার ব্যাহিক রূপায়ণটাই বড় কথা নয়; মানুষের আত্মার লোকে তাকে উপলব্ধি করতে হবে (ঘরে-বাইরে)। অতঃপর 'চার অধ্যায়ে' তিনি অনেকাংশে পূর্বতন সিদ্ধান্তে ফিরে এসেছেন। কিন্তু এমন-কি 'যোগাযোগেও' তিনি নারীর স্বাধিকার মানুষের মনোলোকে উপলব্ধি করতে হবে এমন ইঙ্গিত করেছেন।..."

[—বাংলা উপন্যাসের ধারা

ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন—

"সত্য করিয়া বলিতে গেলে বাংলা-সাহিত্যে সর্বপ্রথম ছোট গল্পের সৃষ্টি করিলেন রবীন্দ্রনাথ; তাঁহার আগে আগে আমাদের সাহিত্যে ছোটগল্প বলিয়া কিছু ছিল না, পরেও যে অসংখ্য ছোটগল্প রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির সঙ্গে সমান পর্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে, এমন গল্পের সংখ্যা খুব বেশি নয়।...

রবীন্দ্রনাথের lyric-প্রতিভার সমৃদ্ধির তুলনা নাই, সেই অতুলনীয় সমৃদ্ধি লইয়া তিনি যখন আমাদের জীবনের দিকে তাকাইলেন, বাঙ্‌লাদেশের সহজ অনাড়ম্বর জীবনপ্রবাহ যখন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তখন সংকীর্ণ বৈচিত্র্য-বিহীন জীবনের বহির্বিকাশ তাঁহার কবিচিত্তে রসানুভূতির সঞ্চার করিতে পারিল না; তাঁহার গীতমুগ্ধ মনকে সহজেই দোলা দিল জীবনের নিভৃত গোপন প্রবাহটি যেখানে জীবনের খণ্ডাংশের মধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যেই দুঃখ ও বেদনার সুখ ও আনন্দের এক একটি সুর পূর্ণ ও উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে অথচ সেখানেই তাহা শেষ হইয়া যায় না অন্তরের মধ্যে তাহা গুঞ্জন করিয়া বাজিতে থাকে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ ছোটগল্পই একান্ত-ভাবে গীতিকবিতার ধর্ম লাভ করিয়াছে; চিত্তের একটা বিশেষ mood বা ভাব হইতেই তাঁহার বেশীর ভাগ গল্পগুলি অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে।...রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প তাঁহার গীতিকবিতার আর একটি দিক; একটু আলগা করিয়া বলিতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীতিকবিতারই গদ্যরূপ।

...রবীন্দ্রনাথের এই গীতধর্মী গল্পগুলির একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে কবির কল্পলোকের মানুষগুলি তাহার ঘটনার আবেষ্টনটি, বাহিরের চতুর্দিকের জগতের সঙ্গে প্রকৃতির আলো-ছায়া-গন্ধ-বর্ণ-ধ্বনি ও ছন্দের সঙ্গে একান্তভাবে মিশিয়া যায় এবং বিশ্বজগতের পারিপার্শ্বিক ভাষাময় আবেষ্টনের সঙ্গে এক হইয়া গিয়া একটা সুরের জগৎ সৃষ্টি করে।..." [—বিচিত্রা, ভাদ্র' ৩৮

"রবীন্দ্রনাথ কবি, এবং তাঁহার কবিপ্রতিভা একান্তভাবে লিরিক বা গীতিকবিতার প্রতিভা। সরস সাবলীল গীতবহুল ছন্দের মধ্যে একটি অপূর্ব সুর ফুটাইয়া তোলা, একটি অনাহত ধ্বনি বাজাইয়া তোলাই গীতি-কবিতার ধর্ম;

স্বল্পের মধ্যে তাহা উচ্ছ্বসিত, যদিও তাহার অধিকাংশই অব্যক্ত, খণ্ডের মধ্যেই তাহার পূর্ণতা, যদিও তাহার রেশটুকু অশেষ। এক হিসাবে ইহাই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোট গল্পেরও ধর্ম।…যে-মনোধর্ম, মনের যে বিশেষ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সৃজনী-প্রতিভাকে গীতধর্মী করিয়াছে সেই মনোধর্ম, সেই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁহাকে গোড়ার দিকে তাঁহার ছোটগল্পের উৎসেরও সন্ধান দিয়াছে।…

…অপূর্ব শিল্পকুশলী রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া মনের বিভিন্ন বিচিত্র ভাব ও চিন্তাধারার সঙ্গে বিশ্বজগতের বিচিত্র ভাব প্রকাশের নিবিড় ভাবগত ঐক্যের সৃষ্টি করেন, এবং তাহার ফলে তাঁহার এক একটি গল্প যেমন করিয়া কল্পলোকের স্বপ্ন ও সংগীত মাধুর্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে তেমন প্রকাশ আর কাহারও মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না।…

…ব্যক্তি বিশেষের দুঃখকে, কোনও সবিশেষ ঘটনাসংশ্লিষ্ট বেদনাকে তিনি সকলের দুঃখ সকলের বেদনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাকে একটি অচঞ্চল শুভ্র, সংযত, শুচিময় অবসানের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছেন, কোনও ক্ষুব্ধতায় কোনও বিক্ষোভের মধ্যে তাহার সমাপ্তিটুকু আন্দোলিত হইতে দেন নাই।" [—রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন—

"…বঙ্গ-সাহিত্যের অপর নানা ক্ষেত্রেও যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন আদি লেখক। আমার বিশ্বাস, তিনি সর্বপ্রথম হিতবাদী পত্রিকায় ছোট ছোট গল্প লিখতে শুরু করেন; তারপর সাধনায় তাঁর বহু গল্প প্রকাশিত হয়। তিনি হচ্ছেন বঙ্গসাহিত্যে ছোটগল্পের আদিস্রষ্টা; এবং এক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টি অফুরন্ত।…আর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাঙলার অধিকাংশ লেখকের গল্পে স্পষ্ট লক্ষিত হয়।…" [—কথাগুচ্ছ (এম-সি-সরকার)

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"…লিরিক কবিতা যেমন একটি ভাবকে আশ্রয় করে, ছোটগল্প তেমনি একটি আখ্যানকে কেন্দ্র করে। তাহার মধ্যেই সে যেন সম্পূর্ণ হইয়া থাকে।…

…তিনি কবি। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে তিনি মানবহৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি জাগাইয়াছেন, তাহাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বিষয় সামান্য হইলেও তাহার মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে মানবহৃদয়ের গোপনতম কাহিনী, তাহার চিরন্তন সমস্যা…তাঁহার শ্রেষ্ঠ গল্পে

ঘটনাকে গৌণ করিয়া ঘটনার অন্তরালবর্তী রহস্যের অভিব্যক্তিকে মুখ্য করা হইয়াছে।...

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে, তিনি মানবজীবনের ক্ষুদ্র সুখদুঃখ আশা-আশঙ্কার মর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অনন্তের সন্ধানী ও বিপুল সুদূরের পিয়াসী, কিন্তু তাঁহার নায়ক বেদনাবোধহীন স্বর্গ হইতে সহস্র অপূর্ণতায় ভরা পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছেন। এই কারণে লিরিকের মত ছোটগল্পের আর্টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটা স্বাভাবিক সঙ্গতি আছে।..." [—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"আমাদের এই বাহ্যতঃ তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর জীবনের তলদেশে যে একটি অশ্রুসজল ভাবঘন গোপন প্রবাহ আছে, রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য স্বচ্ছ অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেগুলিকে আবিষ্কার করিয়া পাঠকের বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেলিয়া ধরিয়াছেন।..." [—বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যে ক্ষেত্রের ভেদ আছে। উপন্যাসগুলির ক্ষেত্র নাগরিক জীবন, প্রধান পাত্র-পাত্রী প্রায় সকলেই নাগরিক নর-নারী। আর তাঁহার অধিকাংশ ছোটগল্পের ক্ষেত্র পল্লীজীবন, প্রধান অপ্রধান প্রায় সকলেই পল্লীবাসী।....

কেবল মানবিক সত্যের উপাদানে গল্পগুলি রচিত হইলে ইহাদের স্বাদ সরলতর হইত, হয়তো বা অধিকতর জনপ্রিয়ও হইত। কিন্তু কবি সে সহজ পথ গ্রহণ করেন নাই; মানবিক সত্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক সত্যের মিশল দিয়া গল্পগুলিকে কবিত্বরসে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যুগপৎ কবি ও কাহিনীকারের জোড়কলমে রচিত—ইহা এগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।..." [—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ১০৩টি। রচনাবলীর ১৪শ খণ্ড থেকে ২৬শ খণ্ডে গল্পগুলি আছে। ১৪শ খণ্ডে ৩টি। ১৫শ খণ্ডে ৬টি। ১৬শ খণ্ডে ৫টি। ১৭শ খণ্ডে ১২টি। ১৮শ খণ্ডে ৮টি। ১৯শ খণ্ডে ৭টি। ২০শ খণ্ডে ৬টি। ২১শ খণ্ডে ৭টি। ২২শ খণ্ডে ১৬টি। ২৩শ খণ্ডে ৯টি।। ২৪শ খণ্ডে ৫টি। ২৫শ খণ্ডে 'তিন সঙ্গীর' ৩টি। ২৬শ খণ্ডে 'গল্পসল্পের' ১৬টি গল্প এবং বড় গল্প 'সে'।

এই গল্পগুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আসতে হলে, গল্পগুলির চুম্বকটুকু মনে রাখা দরকার।—

ঘাটের কথা ঃ গঙ্গার এক পুরানো ঘাট। কতজন আসে যায়—শৈশব থেকে বার্ধক্য অবধি। আসতো একটি মেয়ে, কুসুম। ছোট মেয়ে বড় হলো, বিয়ে হলো, বিধবা হয়ে ফিরলো। এই ঘাটের সামনেই শিবমন্দিরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে কুসুমের পরিচয় হলো। পরিচয় পরিণত হলো অনুরাগে। সন্ন্যাসী সে-কথা জেনে নিরুদ্দিষ্ট হলেন। কুসুম ডুবে মরলো এই ঘাটে।

রাজপথের কথা ঃ পুরানো পথ। কতজন এই পথ দিয়ে যাওয়া আসা করে। চেনা লোকের পদক্ষেপ পথ চেনে। একটি মেয়ে আসতো তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে দেখা করতে। সেই সুখকর স্মৃতিটুকু পথের মনে জেগে আছে।

মুকুট ঃ ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের তিন পুত্র, চন্দ্রমাণিক্য, ইন্দ্রকুমার ও রাজধর। সেনাপতি ইশাখাঁর কাছে তিনভাই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে। রাজা অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা নিলেন। লক্ষ্যভেদ করলেন ইন্দ্রকুমার কিন্তু তীরে রাজধরের নাম লেখা। অস্ত্রশালায় গিয়ে রাজধর লুকিয়ে তীর বদল করেছিলেন। রাজধরই জয়ীর পুরস্কার পেলেন।

আরাকান-রাজ রাজ্য আক্রমণ করেছে। তিনভাই যুদ্ধ যাত্রা করলেন। বড় দু'ভাই মুখোমুখি লড়লেন। রাজধর রাত্রির অন্ধকারে নদী পার হয়ে রাজাকে বন্দী করলেন, রাজ-মুকুট কেড়ে নিয়ে এলেন। ইশাখাঁ কিন্তু এজন্য রাজধরের প্রশংসা করলেন না। রুদ্ধ আক্রোশে রাজধর আরাকান-রাজকে গোপনে চিঠি লিখলেন। আবার লড়াই হলো। ইশাখাঁ নিহত হলেন। কর্ণফুলির তীরে যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। রাজধর ভুল বুঝতে পারলেন। অন্তিম মুহূর্তে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

দেনা-পাওনা ঃ পিতার আদরের মেয়ে নিরুপমা। পছন্দমত সুপাত্রে বিয়ের পণ দশহাজার টাকা। রামসুন্দর সব টাকার জোগাড় করতে পারলেন না। বিয়ের আসর থেকেই গোলযোগ বাধলো। শ্বশুর-বাড়ীতে নিরুপমার উপর নির্যাতন চললো। রামসুন্দর বাড়ী বিক্রী করে টাকার জোগাড় করলেন। কিন্তু কন্যা পিতাকে সে টাকা দিতে দিল না। শেষ পর্যন্ত শ্বশুরগৃহে বিনা চিকিৎসায় নিরুপমার মৃত্যু হলো। শাশুড়ী পুত্রের আবার বিয়ের ঠিক করলেন, এবার বরপণ বিশহাজার টাকা।

পোস্টমাস্টার : পোস্টমাস্টার চাকরি নিয়ে এসেছেন গ্রামে। একা থাকেন। রান্না ও ঘরের কাজ করে বারো-তেরো বছরের মেয়ে রতন। রতনই পোস্টমাস্টারের একমাত্র সঙ্গিনী। অসুস্থতার জন্য পোস্টমাস্টার চাকরি ছেড়ে চলে আসে। রতন ভাবে সে-ও সঙ্গে আসবে, কিন্তু তা সম্ভব নয়।

গিন্নি : শিবনাথ পণ্ডিত ছাত্রদের অপদস্থ করতে ভালবাসতেন। শান্ত ছেলে আশু ছুটির দিনে বাড়ীর বারান্দায় বসে বোনের সঙ্গে পুতুল খেলছিল। তাই দেখে শিবনাথ তার নাম দিলেন গিন্নি।

রামকানাইয়ের নিবু্দ্ধিতা : দু'ভাই,গুরুচরণ ও রামকানাই। গুরুচরণ নিঃসন্তান। তার সম্পত্তির উপর রামকানাইয়ের পুত্র নবদ্বীপের লোভ ছিল। কিন্তু গুরুচরণ উইল করে গেলেন স্ত্রীর নামে, সে উইল লিখলো রামকানাই। নবদ্বীপ জাল উইল দেখিয়ে সম্পত্তির দাবী করলো। রামকানাই আদালতে সাক্ষ্য দিল—নবদ্বীপের উইল জাল। নবদ্বীপের জেল হলো। ক'দিন পরে রামকানাই মারা গেল। লোকে বললো—সাক্ষ্য দেবার আগে মরলেই ভাল ছিল।

ব্যবধান : বনমালীর জ্ঞাতিভাই হিমাংশুমালী। হিমাংশু বয়সে অনেক ছোট তবু বনমালীর সেই একমাত্র বন্ধু। এক পাতি-নেবুর গাছ নিয়ে দুই পরিবারে বিবাদ বাধলো। মামলায় বনমালীর বাবা হরচন্দ্র জিতলেন, হিমাংশুর বাবা গোকুলচন্দ্র হারলেন। এ-বাড়ীতে আসা হিমাংশুর বন্ধ হলো। বনমালীর মন বোঝে না, সে প্রতিদিন হিমাংশুর প্রতীক্ষা করে।

তারাপ্রসন্নের কীর্তি : তারাপ্রসন্ন বই লেখে—বেদান্ত প্রভাকর। গৃহিণী দাক্ষায়ণীর উৎসাহে গহনা বেচে বই ছাপে। বই বিক্রী হয় না। গৃহিণী ক্ষুব্ধ হন। সদ্যজাত কন্যার নাম রাখেন 'বেদান্ত প্রভা'।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন : রাইচরণ দু'পুরুষের ভৃত্য, অনুকূলকে মানুষ করেছে, এখন তার ছেলেকে মানুষ করে। বিকালে বেড়াতে বেরিয়ে খোকা ফুলের বায়না ধরে। রাইচরণ ফুল তুলতে যায়, খোকা অলক্ষ্যে নদীর জলে পড়ে ডুবে যায়। রাইচরণের চাকরি গেল। সে দেশে ফিরলো। জমি-জায়গা বেচে নিজের শিশু পুত্রকে নিয়ে এলো কলিকাতায়। ছেলেকে ভদ্রলোকের মত মানুষ করলো। তারপর অনুকূলের কাছে গিয়ে বললো—আপনার ছেলেকে আমি চুরি করেছিলাম, এই সেই ছেলে। সকলেই সেকথা বিশ্বাস করলো। রাইচরণ নিরুদ্দিষ্ট হলো।

সম্পত্তি সমর্পণ ঃ যজ্ঞনাথের অনেক টাকা, কিন্তু বড় কৃপণ। পুত্রবধূ চিকিৎসার অভাবে মারা গেল। পুত্র বৃন্দাবন পৌত্র গোকুলচন্দ্রকে নিয়ে পিতৃগৃহ ত্যাগ করলো। যজ্ঞনাথ একা থাকে, নাতির কথা মনে পড়ে। বছর কয় পরে বাড়ী থেকে পালানো ছেলে নিতাই তার কাছে আশ্রয় নিল। নিতাইয়ের বাবা খুঁজতে এসেছে শুনে নিতাইকে লুকিয়ে রাখার অছিলায় জঙ্গলের মধ্যে এক ভাঙা মন্দিরের নীচে একখান ঘরে যজ্ঞনাথ নিতাইকে 'যক্ষ' করে এলো। এদিকে পুত্রের সন্ধানে এসে বৃন্দাবন বললো, সে নাম বদলে হয়েছে দামোদর আর গোকুল হয়েছে নিতাই। নিজের নাতিকে নিজের হাতে হত্যা করেছে, একথা যজ্ঞেশ্বর মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারলো না।

দালিয়া ঃ ঔরংজীবের ভয়ে শা সুজা পালিয়ে গেলেন আরাকানে। আরাকান-রাজের সঙ্গে যুদ্ধে শা সুজা মারা গেলেন। শা সুজার তিন মেয়ে, বড় মেয়ে আত্মহত্যা করলো, মেজ মেয়ে জুলেখা পলায়ন করলো, ছোট মেয়ে আমিনাকে সুজা নিজে হাতে জলে ফেলে দেন। এক ধীবর নদী থেকে আমিনাকে তোলে ও নিজ গৃহে আশ্রয় দেয়। জুলেখা সেখানে এসে আমিনাকে প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত করে। সংবাদ পেয়ে রাজা আমিনা ও জুলেখাকে রাজবাড়ী নিয়ে যান। রাজার ঘরে ঢুকে দুই বোন দেখে রাজা তাদের চেনা, দরিদ্র যুবক দালিয়ার ছদ্মবেশে তিনি ধীবরের বাড়ী যাতায়াত করতেন। আমিনা তাঁকে ভালবাসে। প্রতিশোধ নেওয়া হলো না।

কঙ্কাল ঃ অস্থিবিদ্যা পড়ানোর জন্য ঘরে একটি কঙ্কাল ছিল, এখন নেই। কঙ্কালের প্রেত এসেছে সেই কঙ্কালের সন্ধানে। প্রেত বলে, এক সময় সে সুন্দরী তরুণী ছিল, অল্প বয়সে বিধবা হয়। অসুস্থতা উপলক্ষে দাদার বন্ধু ডাক্তার শশীভূষণের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। পরিচয় অনুরাগে পরিণত হয়। শশীভূষণ অন্যত্র বিয়ে করতে যাচ্ছে শুনে সে তাকে বিষ খাওয়ায়, নিজেও বিষ খায়।

মুক্তির উপায় ঃ চাকরি না পেয়ে ফাকর গৃহত্যাগ করলো। সন্ন্যাসী সেজে ঘুরতে ঘুরতে এলো নবগ্রামে। সেখানে বৃদ্ধ ষষ্ঠীচরণ তাকে নিরুদ্দিষ্ট ছেলে মাখনলাল বলে ধরে নিল। মাখনের দুই পত্নী, আটটি ছেলেমেয়ে ও গ্রামবাসীদের উৎপীড়নে ফকির বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। শেষে তাকে রক্ষা করলো স্ত্রী হৈমবতী।

ত্যাগ ঃ গ্রামের দলপতি হরিহর প্যারিশংকরকে জাতিচ্যুত করে। তারই প্রতিশোধে প্যারিশংকর এক কায়স্থকন্যাকে ব্রাহ্মণকন্যা বলে হরিহরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ায়। হরিহর ছেলেকে বলে বধূকে ত্যাগ করতে। ছেলে রাজী না হওয়ায় হরিহর পুত্র হেমন্ত ও পুত্রবধূ কুসুম দু'জনকেই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে।

একরাত্রি ঃ রাত্রে বাণ এলো। মাস্টার মশাই পুকুরের এক উঁচু পাড়ের উপর এসে দাঁড়ালেন। প্রাতবেশী রামলোচন উকিলের স্ত্রীও সেখানে এলো। মাস্টার চিনলেন, সে মেয়েটি তাঁর বাল্যের খেলার সাথী সুরবালা, ছাত্রাবস্থায় এই মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ের কথা উঠেছিল, মাস্টার তখন বিয়ে করতে রাজী হননি। আজ সুরবালাকে ভাল লাগলো। দুর্যোগের রাতটি স্মরণীয় হয়ে রইল জীবনে।

একটি আষাঢ়ে গল্প ঃ রাজপুত্র ও সদাগর পুত্র ভ্রমণে বেরিয়ে, এলো তাসের দেশে। এখানে সবাই তাস। সব নিয়মে বাঁধা, পুরানো পারচ নতুন কেউ কিছু ভাবে না। রাজপুত্রেরা নিজের মত চলে, মেয়েদের উপর তার প্রভাব পড়ে। হরতনের বিবির সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হলো, রাজপুত্র রাজা হলো। তাসেরা গতানুগতিকতা ছাড়লো, মানুষ হলো।

জীবিত ও মৃত ঃ কাদম্বিনীকে নিয়ে যাওয়া হলো শ্মশানে। সে মরেনি, জ্ঞান হতেই সে সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়লো। প্রথমে সে গেল সইয়ের বাড়ীতে। সেখানে মৃত্যু সংবাদ পৌঁছালো। কাদম্বিনী এবার ফিরে এলো গৃহে। তাকে দেখে ভয়ে পরিচিতেরা মূর্ছা গেল। শেষে কাদম্বিনী পুকুরে গিয়ে ঝাঁপ দিল, সে মরে প্রমাণ করলো ইতিপূর্বে সে মরেনি।

স্বর্ণমৃগ ঃ বৈদ্যনাথ গরাব। স্ত্রী মোক্ষদার সেজন্য বড় অসন্তোষ। বৈদ্যনাথ এক সন্ন্যাসীর শরণ নিল। টাকাকে সোনা করে দেবে বলে সন্ন্যাসী অনেক টাকা ঠকালো। বৈদ্যনাথ কাশী গেল গুপ্তধন পাবার আশায়। ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এসে দেখে স্ত্রীর মুখ অন্ধকার। মনের দুঃখে বৈদ্যনাথ গৃহত্যাগ করলো।

রীতিমত নভেল ঃ কাঞ্চির সেনাপতি ললিত সিংহ রাজকন্যাকে ভালবাসতো। গোপনে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করার অপরাধে তার নির্বাসন হলো। ললিতসিংহ বনে গিয়ে দস্যু হলো। একদিন দস্যু এক রাজপুত্রকে

হত্যা করলো, পরে চিনতে পারলো সে ছদ্মবেশী রাজকন্যা। তখন ললিতসিংহ আত্মহত্যা করলো।

জয়-পরাজয়ঃ শেখর রাজকবি, মনের আনন্দে সংগীত রচনা করে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পুণ্ডরীক এলো সেই রাজ্যে। শেখর কাব্য-আলোচনায় পরাস্ত হলো। গৃহে এসে মনের দুঃখে সে বিষপান করলো। অন্তিম মুহূর্তে রাজকন্যা এসে শেখরকে জয়মাল্য দিল।

কাবুলিওয়ালাঃ রহমৎ কাবুলি মেওয়া বেচতে আসে। ছোট মেয়ে মিনির সঙ্গে তার ভাব হয়। দেশে মিনির বয়সী তার এক মেয়ে আছে। খুনের দায়ে রহমতের জেল হলো। আট বছর পরে মুক্তি পেয়ে রহমৎ এলো মিনিদের বাড়ীতে। সেদিন মিনির বিয়ে। মিনিকে দেখে নিজের মেয়েকে দেখার জন্য রহমৎ ব্যাকুল হলো। মিনির বাবা পথ-খরচের জন্য তার হাতে দশটি টাকা দিলেন।

ছুটিঃ ফটিক গ্রামের ছেলে, মামার বাড়ী এলো পড়াশুনা করতে। মামীমার স্নেহহীন ব্যবহার ও নাগরিক পরিবেশ তার ভালো লাগে না। সে বাড়ী ফিরে যেতে চায়। মামার বাড়ী থেকে বেরিয়ে, পথ হারিয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে অসুস্থ শরীরে সে ফিরে আসে। সে-অসুখ আর সারে না। অন্তিম মুহূর্তে ফটিক মাকে বলে—আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ী যাচ্ছি।

সুভাঃ সুভাষিণী বোবা। মুখে কথা নেই, কিন্তু মনের ঘাত-প্রতিঘাত আর পাঁচজনের মতই। বিয়ে হলো, বোবা দেখে স্বামী আবার বিয়ে করলো, তার মনের খবর কেউ রাখলো না।

মহামায়াঃ কুলীনের মেয়ে, স্বঘর না পাওয়ায় চব্বিশ বছর বয়সেও মহামায়ার বিয়ে হলো না। অ-কুলীন রাজীবলোচন মহামায়াকে বিয়ে করতে চায়। রাজীবের সঙ্গে বোনের ঘনিষ্ঠতা দেখে ভাই ভবানী এক শ্মশান-যাত্রীর সঙ্গে বোনের বিয়ে দেয়। সহমরণের জলন্ত চিতা থেকে মহামায়া পালিয়ে আসে। রাজীবের সঙ্গে সে চলে যায়। সহসা তার অগ্নিদগ্ধ বীভৎস মুখ দেখে রাজীব চমকে ওঠে। মহামায়া নিরুদ্দিষ্ট হয়।

দান-প্রতিদানঃ শশিভূষণ ও রাধামুকুন্দ দুই ভাই। রাধামুকুন্দ জমিদারী দেখা শুনা করে, বড় বৌয়ের তা ভাল লাগে না। খাজনা লুঠ হবার ফলে জমিদারী নিলাম হয়ে গেল। রাধামুকুন্দ মোক্তারি করে সংসার

চালাতে লাগলো। আবার জমিদারী কিনলো। শেষে শশিভূষণের মৃত্যুকালে রাধামুকুন্দ বললো যে খাজনা লুঠ করিয়ে সে-ই জমিদারী নিলাম করিয়েছিল বড় বৌয়ের গঞ্জনার জন্য। শশিভূষণ বললো, সে কথা সে জানে।

সম্পাদক ঃ লেখক লেখার নেশায় মেতে ওঠে। আহির গ্রামের জমিদারের পত্রিকার সম্পাদক হয়ে মাতৃহারা একমাত্র কন্যার দিকে দৃষ্টি দেবার আর অবসর পায় না। শেষে মেয়ের অসুখে চৈতন্য হয়। সম্পাদনা ত্যাগ করে কন্যাকে নিয়ে পিতা স্বগৃহে ফিরে এলো।

মধ্যবর্তিনী ঃ নিঃসন্তান হরসুন্দরী নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বামীর আবার বিয়ে দিল। নতুন বৌ শৈলবালাকে নিয়ে নিবারণ মেতে উঠলো। সৌখীনতার ব্যয় সংকুলানের জন্য সে আপিসের তহবিল ভাঙলো। বাড়ী বিক্রী করে জেল থেকে বাঁচলো। ভাড়া বাড়ীতে শৈল অসুস্থ হয়ে পড়লো ও মারা গেল। হরসুন্দরী ও নিবারণের মধ্যে পূর্বের প্রেম আর ফিরে এলো না, শৈলর স্মৃতি মাঝে রয়ে গেল।

অসম্ভব কথা ঃ এক ছিল রাজা। রাজার একটি মাত্র মেয়ে। রাগ করে রাজা কন্যা সম্প্রদান করলেন এক কাঠুরিয়ার হাতে। কাঠুরিয়াকে রাজকন্যা পাঠালো পাঠশালায়। সহপাঠীরা কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞাসা করে রাজকন্যা তার কে হয়। কাঠুরিয়া সেই প্রশ্ন করে রাজকন্যাকে। রাজকন্যা যেদিন সব কথা বলে কাঠুরিয়াকে স্বামীত্বে বরণ করবে সেই দিনই কাঠুরিয়াকে সাপে কামড়ালো।

শাস্তি ঃ দুই ভাই দুঃখীরাম ও ছিদাম দিন-মজুর। বড় বৌয়ের গঞ্জনা সইতে না পেরে রাগের মাথায় দুঃখীরাম দা'য়ের আঘাত করলো। বড় বৌ মারা গেল। ছিদাম ভাইকে বাঁচাতে চাইল। তার শেখানো-মত ছোট বৌ চন্দরা খুন করেছি বলে স্বীকারোক্তি করলো। চন্দরার ফাঁসী হয়ে গেল।

একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প ঃ কাদাখোঁচা ও কাঠ-ঠোক্‌রা দুই বন্ধু। দু'জনেই কীট খায়। কীট দুর্লভ হলো। কাদাখোঁচা বললো—'এই পৃথিবী আদ্যোপান্ত জীর্ণ হয়ে গেছে।' কাঠঠোকরাও বললো—'গাছপালাও অন্তঃসার শূন্য হয়ে গেছে।' কাদাখোঁচা ঠোঁটে কাদা তুলে বিরক্তি প্রকাশ করে, কাঠঠোকরা বনস্পতির গায় চঞ্চু আঘাত করে অসন্তোষ জানায়।

সমাপ্তি ঃ বি-এ পাশ করে অপূর্ব দেশে ফিরলো, ঘাটে মৃন্ময়ীর সঙ্গে

দেখা। অপূর্ব শেষ পর্যন্ত তাকেই বিয়ে করলো। শ্বশুরবাড়ীতে মৃন্ময়ীর মন বসে না। বাপ কুশীগঞ্জের ঘাটে কেরাণীগিরি করে, সেখানে যাবে বলে সে বেরিয়ে পড়ে। পথ হারিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। স্ত্রীর আগ্রহে অপূর্বই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় শ্বশুরের কাছে। স্ত্রীকে ঘরে রেখে অপূর্ব চলে যায় কলিকাতায়। এতদিন মৃন্ময়ীর চিত্তে প্রেমের কোন বিকাশ হয় নি, এবার শাশুড়ীর সঙ্গে কলিকাতায় এসে সে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়।

সমস্যাপূরণ ঃ পুত্র বিপিনবিহারীকে জমিদারীর ভার দিয়ে কৃষ্ণগোপাল কাশীবাসী হলেন। প্রজা অছিমদ্দি বিনাখাজনায় জমিজায়গা ভোগ করে বলে বিপিন তার বিরুদ্ধে মামলা করলো। হাটের মাঝে বিপিনকে অছিমদ্দি আক্রমণ করলো। পুলিশ অছিমদ্দিকে গ্রেপ্তার করলো। মামলার দিন কৃষ্ণগোপাল কাশী থেকে ফিরে এলো, বিপিনকে বললো—অছিমকে খালাস করতে হবে কারণ সে আমার পুত্র তোমার ভাই।' অছিম আবার পূর্বাবস্থায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলো।

খাতা ঃ উমা লিখতে ভালবাসতো তাই দাদা তাকে একখানি খাতা দিয়েছিল। ন'বছরের মেয়ে শ্বশুর বাড়ী গেল সেই খাতাখানি নিয়ে। যা মন চায় খাতায় লেখে, স্বামী ও ননদেরা উপহাস করে। স্বামী প্যারিমোহন একদিন খাতাখানি কেড়ে নিয়ে লেখাগুলি পড়ে সকলকে শুনিয়ে দেয়। ননদেরা শুনে হাসে, উমা কাঁদে।

অনধিকার প্রবেশ ঃ নিঃসন্তান বিধবা জয়কালীর একটি মন্দির ছিল। শুদ্ধাচার ছাড়া মন্দিরে কারও প্রবেশ-অধিকার ছিল না। ভ্রাতুষ্পুত্র মাধবী-মঞ্জরী তুলতে এসে ধরা পড়ে শাস্তি পেল। প্রাণভয়ে পালিয়ে-আসা একটি শূকর মাধবী কুঞ্জের তলে আশ্রয় নিল। শূকর অশুচি, কিন্তু তাকে জয়কালী তাড়ালো না। যে ডোমেরা তাড়া করে এসেছিল তাদের মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকতে দিল না। জয়কালীর এই শুচিতাবোধ নিয়ে গ্রাম-সমাজে নিন্দা হলো।

মেঘ ও রৌদ্র ঃ শশিভূষণ গ্রামে থাকে। প্রতিবেশী হরকুমারের কন্যা গিরিবালা তার কাছে পড়ে। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট গ্রামে এসে হরকুমারকে অপমান করে, শশি তাকে মানহানির মামলা করতে বলে। হরকুমার গোপনে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মাপ চেয়ে আসে ও শশিকে গ্রাম ছাড়া করতে চায়। যাবার পথে এক সাহেবের সঙ্গে শশির বিরোধ বাধে। সাহেব গুলি ছুড়ে

একখানি নৌকা ডুবিয়ে দেয়, একজন মারা যায়। কিন্তু বিচারে সাহেব বেকসুর খালাস পায়। শশির আরেক বিরোধ বাধে পুলিশ সুপারিণ্টেনডেণ্টের সঙ্গে। জেলেদের জালে পুলিশ সুপারের নৌকা আটকেছিল, পুলিশ সমস্ত জাল টুকরো টুকরো করে দেয়। শশি প্রতিবাদ করায় পুলিশ সুপারের সঙ্গে মারামারি হয়ে গেল। পাঁচ বছর জেল খাটতে হলো। জেল থেকে বেরিয়ে দেখে গিরিবালা তাকে নিজ গৃহে আমন্ত্রণ করেছে। গিরিবালা এখন ধনীগৃহের বধূ ও বিধবা।

প্রায়শ্চিত্ত ঃ অনাথবন্ধু বড়লোকের ঘরজামাই। সব কাজই তার কাছে মর্যাদা-হানিকর। শাশুড়ীর গহনা চুরী করে, বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে সে ফিরলো। ইতিমধ্যে একমাত্র শ্যালকের মৃত্যুতে সে-ই হলো শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। বিলাত যাবার জন্য সে প্রায়শ্চিত্ত করলো। প্রায়শ্চিত্ত শেষে সভাস্থলে এসে দাঁড়ালো এক মেম-সাহেব, বিলাতে অনাথবন্ধু তাকে বিয়ে করেছে।

বিচারক ঃ হেম পতিতা। একমাত্র পুত্রকে খেতে দিতে না পারায় শিশুকে নিয়ে সে কুয়ায় ঝাঁপ দিল। শিশুটি মরলো। হেমের উপর ফাঁসীর হুকুম হলো। ম্যাজিস্ট্রেট এলেন জেলখানায় তরিতরকারী সংগ্রহ করতে। হেমের হাতে 'বিনোদচন্দ্র' নাম লেখা একটি আংটি দেখে তিনি চমকে উঠলেন। ওই পরিচয় দিয়ে প্রথম যৌবনে এক প্রতিবেশী কন্যাকে তিনি গৃহের বের করে এনেছিলেন। সেই মেয়ে এই হেম। সে আজ পতিতা, তিনি বিচারক।

নিশীথে ঃ জমিদার দক্ষিণাবাবুর স্ত্রী মৃত সন্তান প্রসব করে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বায়ুপরিবর্তনে গিয়ে দক্ষিণাবাবু হারাণ ডাক্তারের কন্যা মনোরমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্ত্রী বুঝতে পেরে বিষাক্ত মালিশ খেয়ে মৃত্যুবরণ করে। দক্ষিণা মনোরমাকে বিয়ে করে। কিন্তু প্রথম স্ত্রীর প্রেতাত্মা নিশীথে তাকে শান্তি দেয় না, রাত্রে আর ঘুম হয় না।

আপদ ঃ শরৎবাবু সপরিবারে এসেছিলেন চন্দননগরে। গঙ্গায় নৌকাডুবি হয়ে এক বালক এসে আশ্রয় নিল। শরৎ-পত্নী কিরণ বালক নীলকান্তকে স্নেহ করতো। শরতের ভাই সতীশের আদর-যত্ন দেখে নীলকান্তের মনে অভিমান জাগলো। সতীশের একটি দোয়াতদানি হারানোর ব্যাপারে সবাই নীলকান্তকে সন্দেহ করলো। নীলকান্তের বাক্সে একদিন কিরণ সেই

দোয়াতদানি দেখতে পেলে। কিরণ কাউকে কিছু বললো না, কিন্তু নীলকান্তের আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

দিদি : পিতার একমাত্র কন্যা শশিকলা সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু শেষ বয়সে তার একটি ভাই হলো। মা ছেলেকে কন্যার হাতে সমর্পণ করে মারা গেল। শ্বশুরের মৃত্যুর পর জয়গোপাল জমিদারী দেখাশুনা করে, সমস্ত সম্পত্তির উপর তার লোভ। শ্যালক নীলমণিকে সে ভাল চোখে দেখে না। নীলমণির অসুখে চিকিৎসা হয় না। শশিকলা গহনা বেচে ভাইয়ের চিকিৎসা করে। গ্রামে ম্যাজিস্ট্রেট এলেন, শশিকলা তাঁর হাতে নীলমণিকে সমর্পণ করলো। ক'দিন পরে শশির মৃত্যু হলো, লোকে সন্দেহ করলো জয়গোপালই তাকে মেরেছে।

মানভঞ্জন : সুন্দরী স্ত্রী গিরিবালাকে অবহেলা করে রমানাথ অভিনেত্রী লবঙ্গকে নিয়ে মেতেছে। অভিমানে গৃহত্যাগ করে গিরিবালাও অভিনেত্রী হলো। মঞ্চে তাকে দেখেই রমানাথ চিনতে পারলো, কিন্তু গিরিবালা তখন রমানাথের স্ত্রী নয়, সে সার্বজনীন অভিনেত্রী।

ঠাকুরদা : নয়নজোড়ের জমিদার বংশের শেষ প্রতিনিধি কৈলাস রায়-চৌধুরী। জমিদারী নেই, শুধু গৌরব-স্মৃতি আছে। কৈলাসের জমিদারীর গল্প প্রতিবেশী যুবক সইতে পারে না। তাকে অপদস্থ করতে চায়। এক বন্ধুকে লাট-সাহেব সাজিয়ে নিয়ে যায়। মিথ্যাচার ধরা পড়ে কৈলাসের নাত্‌নীর কাছে। পরে নাত্‌নীকেই যুবক বিয়ে করে।

প্রতিহিংসা : জমিদার বিনোদবিহারীর দৌহিত্রীর বিয়েতে দেওয়ান অম্বিকাবাবুর স্ত্রী ইন্দ্রাণী নিমন্ত্রণে এসে অপমানিতা হলো। জমিদার-গৃহিণীর ধারণা অম্বিকা জমিদারকে ঠকিয়ে পয়সা করেছে। অত্যধিক অপব্যয়ের জন্য জমিদারী নষ্ট হবার উপক্রম হয়, ইন্দ্রাণী সমুদয় গহনা বিক্রী করে জমিদারী রক্ষা করে। এবার ইন্দ্রাণীর কাছে জমিদার-গৃহিণীর মাথা নত হয়।

ক্ষুধিত পাষাণ : শুস্তা নদীর তীরে নবাবী আমলের পাথরের প্রাসাদ। সন্ধ্যার পর সে গৃহে অশরীরীর পায়ের শব্দ শোনা যায়, আয়নায় সুন্দরীর ছায়া পড়ে, গুমরে-ওঠা কান্নায় ঘরের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। সে গৃহে যে ত্রি-রাত্রি বাস করে সেই মারা যায়। শুধু মেহের আলি পাগল হয়ে বেরিয়ে এসেছে। প্রতি প্রত্যূষে সে সেই রহস্যময় প্রাসাদের পাশ দিয়ে চীৎকার করতে করতে চলে যায়—তফাৎ যাও, সব ঝুটা হ্যায়।

অতিথি ঃ জমিদার মতিলাল সপরিবারে নৌকা করে ফিরছিলেন, পথে ব্রাহ্মণ-বালক তারাপদ এসে আশ্রয় নিল। মতিবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণার স্নেহাশ্রয়ে সে রহে গেল। মতিবাবু তার লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করলেন। শেষে একমাত্র কন্যা চারুশীলার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ করলেন। কিন্তু বিয়ের দিন তারাপদকে আর দেখা গেল না।

ইচ্ছাপূরণ ঃ সুবলচন্দ্রের ছেলে সুশীলচন্দ্র বড় দুষ্ট। সে ইস্কুলে যেতে চায় না বলে বাবা তাকে শাস্তি দেন। সুশীল ভাবে—আমি যদি বাবার মত হতাম। সুবল ভাবে—আমি যদি ছেলে-বয়স পেতাম। ইচ্ছা-ঠাকরুণ দু'জনেরই ইচ্ছা পূরণ করেন। সুশীল হলো বাবা, সুবল হলো ছেলে। সুশীল আর খেলতে পারে না, লজঞ্চুস ভাল লাগে না, পুকুরে স্নান করলে পায়ের গাঁট ফোলে। সুবলও ইস্কুল যেতে চায় না। দু'জনের আর কেউ তার নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না; ইচ্ছাঠাকরুণ আবার তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

দুরাশা ঃ বদ্রাওনের নবাব-কন্যা সেনানায়ক ব্রাহ্মণ যুবক কেশরলালকে ভালবাসতো। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় যুদ্ধে কেশরলাল আহত হলো। নবাব-কন্যা সেবা করতে গেল, যবনকন্যার সেবা কেশরলাল গ্রহণ করলো না, স্থান ত্যাগ করলো। নবাব-পুত্রীও গৃহত্যাগ করলো; শিবানন্দ স্বামীর কাছে হিন্দুশাস্ত্র পড়লো; তারপর কেশরলালের সন্ধানে এলো নেপালে। দার্জিলিঙে এক ভুটিয়া পল্লীতে কেশরলালের দেখা পেল, ভুটিয়া-স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে নিয়ে সে সংসার করছে। সেনানায়ক কেশরলালের পরিণতি দেখে নবাব-কন্যা ব্যথিত হলো।

পুত্রযজ্ঞ ঃ বৈদ্যনাথের স্ত্রী বিনোদিনী নিঃসন্তান। বান্ধবী কুসুমের বাড়ী বিনোদিনী তাস খেলতে যায়। একদিন সেখানে কুসুমের দেবর নগেন্দ্র তাকে জোর করে চুম্বন করে। দাসী দেখে। বৈদ্যনাথ সন্তানসম্ভবা বিনোদিনীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর বৈদ্যনাথ তিনটি বিয়ে করে, পুত্রকামনায় যাগ-যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করায়। দেখতে দেখতে দশবছর কেটে যায়। দশবছরের ছেলের হাত ধরে বৈদ্যনাথের নতুন বাড়ীতে বিনোদিনী আসে ভিক্ষা করতে। বৈদ্যনাথ তাকে তাড়িয়ে দেয়। কেউ কাউকে চিনতে পারে না। যে পুত্রকামনায় এতো ক্রিয়াকাণ্ড সে-ই পুত্রই বৈদ্যনাথের দ্বার থেকে ফিরে যায়।

ডিটেকটিভ : মহিম ডিটেকটিভ। মন্মথর উপর সে দৃষ্টি রাখে। নানা প্রেমোপাখ্যান বলে পুলিশের মাইনে-করা রমণী হরিমতিকে নিয়ে আসে মন্মথর কাছে। মন্মথ মহিমের স্ত্রীকে বাল্যকাল থেকেই জানে, সে তাকে ডেকে পাঠায় সব কথা জানানোর জন্য। অতর্কিতে মন্মথর ঘরে ঢুকে মহিম চমকে ওঠে, সেখানে তার স্ত্রী বসে আছে।

অধ্যাপক : মহীন্দ্র বি-এ পড়ে। অন্যের লেখা নিজের বলে চালিয়ে নাম করতে চায়, কিন্তু অধ্যাপক বামাচরণ বাবু তা ধরে ফেলেন। পরীক্ষা দিয়ে মহীন্দ্র চন্দন নগরে আসে। গঙ্গার তীরে বসে এক প্রহসন লেখে। পাশের বাড়ীর বিপত্নীক অধ্যাপক ভবনাথ বাবুর কন্যা কিরণের সঙ্গে পরিচয় হয়। মহীন্দ্র তার কাছে পাণ্ডিত্য ফলায়। পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা যায় মহীন্দ্র ফেল করেছে এবং কিরণ প্রথম বিভাগে বি-এ পাস করেছে। মহীন্দ্র জানাতে চায় ফেল করাটাই গৌরবের কিন্তু কিরণের সঙ্গে অধ্যাপক বামাচরণকে দেখে স্তব্ধ হয়ে যায়, সেইদিনই চন্দননগর ত্যাগ করে দেশে ফেরে।

রাজটীকা : নবেন্দুর বাবা ছিলেন রায়-বাহাদুর, নবেন্দুও শীঘ্র রায়-বাহাদুর হবে। শ্যালীরা এই নিয়ে ঠাট্টা করে। শ্যালীপতির অনুরোধে সে কংগ্রেসে হাজার টাকা চাঁদা দিল। কাগজে তাই নিয়ে আলোচনা হলো; কংগ্রেসের সভায় অভিনন্দন জানানো হলো; নবেন্দুর আর রায়-বাহাদুর হওয়া ঘটলো না।

মণিহারা : ফণীভূষণের স্ত্রী কলেজে পড়া সুন্দরী মেয়ে মণিমালিকা। কারবারের এক দুর্যোগে ফণী স্ত্রীর কাছ থেকে গহনা চাইল। মণি দিল না। গহনা নিয়ে সে বাপের বাড়ী যাত্রা করলো, সঙ্গী হলো দূর-সম্পর্কীয় ভাই মধুসূদন। ফণী অন্যত্র টাকার যোগাড় করতে গিয়েছিল, ফিরে এসে স্ত্রীর খোঁজ করলো, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পেল না। রাত্রে এক সালঙ্কারা কঙ্কাল তাকে ডেকে নিয়ে গেল নদীর ঘাটে। ফণী জলে গিয়ে নামলো, তারপর ভেসে গেল।

দৃষ্টিদান : মৃত সন্তান প্রসব করে কুমু অসুস্থ হয়ে পড়লো। স্বামী অবিনাশ ডাক্তারী পড়ে, তার চিকিৎসায় কুমু অন্ধ হয়ে গেল। অবিনাশ মফঃস্বলে গেল প্র্যাকটিস করতে। অবিনাশের পিসিমা তার ভাসুর-ঝি হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে আবার তার বিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। এই দুর্ভাগ্যের

সম্ভাবনা থেকে কুমুকে রক্ষা করলো তার দাদা। সে হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করলো। অবিনাশ নিজের দুর্বলতার জন্য স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইল।

সদর ও অন্দর : বিপিন ভালো গান গায়, রাজা চিত্তরঞ্জন তাকে নিয়ে মেতে ওঠেন। এই বাড়াবাড়ি রাণীর ভাল লাগে না। রাজা হাসেন। বিপিনের অভিনয় দেখে রাণী মুগ্ধ হন। রাণীর এই উচ্ছ্বাস রাজার ভাল লাগে না, তিনি বিপিনকে বিদায় দেন।

উদ্ধার : স্ত্রী গৌরীর অত্যধিক গুরুভক্তি পরেশকে বিচলিত করে। স্বামীর সন্দেহে ক্ষুব্ধ হয়ে গৌরী গুরুর কাছে আশ্রয় চায়। গুরু গৌরীকে গৃহত্যাগ করার জন্য চিঠি লেখেন। পরেশ এপোপ্লেকসি হয়ে মারা যায়। গুরুর অধঃপতন দেখে গৌরীও মর্মাহত হয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে।

দুর্বুদ্ধি : ডাক্তার ও দারোগা অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী। উপরি রোজগার করে দুজনেই পয়সা করেছে। হরিদাসের কন্যা মারা গেল, সেই উপলক্ষে ডাক্তার দু'পয়সা কামালো। কিন্তু নিজের মেয়ে শশীর মৃত্যুতে ডাক্তারের মন গেল বদলে। আরেক কন্যাহারা পিতার পক্ষ নিয়ে দারোগার সঙ্গে ডাক্তার বিবাদ করলো। ফলে ডাক্তারকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হলো।

ফেল : নলিন ও নন্দ সহপাঠী। নলিন বার বার ম্যাট্রিক ফেল করে, নন্দ বি-এ পাস করে। নলিনের ঈর্ষা হয়। নন্দর পছন্দ-করা পাত্রীকে ভাঙিয়ে নিয়ে নলিন বিয়ে করে। ভাবে নন্দ এবার হারলো। কিন্তু নন্দর বিয়ের পর মনে হয়, নন্দর স্ত্রী বোধ হয় বেশি সুন্দরী, এবারও সে হারলো।

শুভদৃষ্টি : কান্তি শিকার করতে এসে গ্রামের একটি মেয়েকে দেখলো, তাকে বিয়ে করার জন্য উৎসুক হলো। শুনলো মেয়েটির নাম সুধা। বিয়ের পর দেখে সুধা সে-মেয়ে নয়। মন বিরূপ হলো। পরে খবর পেল, তার পূর্বের দেখা মেয়েটির নাম সুধা নয়, সে কালা ও বোবা। কান্তি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলো।

যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ : জমিদারের ছেলে বিভূতি নিজে মেয়ে পছন্দ করলো। মেয়ের বাবা গরীব যজ্ঞেশ্বর বহুকষ্টে আয়োজন করলেন। বরযাত্রীরা খেতে বসে অনাচার সুরু করলো। শেষে বিভূতি নিজে পরিবেশন করে খাওয়ালো।

ঘড়ের বিপদ : জমিদারের নায়েব দুশ্চরিত্র। গৃহের দাসী প্যারীর উপর তার নজর পড়লো। প্যারী গ্রামের হরিহর ভট্টাচার্যের বাড়ীতে

আশ্রয় নিল। নায়েবের আক্রোশে প্যারীর জেল হলো, হরিহর তার জমি-জায়গা-হারালো।

প্রতিবেশিনী : দুই বন্ধু এক প্রতিবেশিনীর প্রতি অনুরক্ত; দু'জনেই বিধবা বিবাহ সমর্থন করে। নবীন বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়। বন্ধু উৎসাহ দেয়। কিন্তু পরে শোনে নবীনের মনোমত পাত্রীটি তারই মানসী।

নষ্টনীড় : ভূপতি কাগজ বের করে, কাগজ নিয়েই মেতে ওঠে। গৃহে স্ত্রী চারুর একমাত্র সঙ্গী ভূপতির পিসতুতো ভাই অমল। অমল সাহিত্য চর্চা করে। লেখক হিসাবে সে একদিন নাম করলো। চারুও লেখিকা হলো। দু'জনের হৃদ্যতা অনুরাগে পরিণত হলো। অমল শশুরের টাকায় বিলাত চলে গেল। চারু অমলের কথা মন থেকে মুছতে চায় কিন্তু পারে না। স্ত্রীর মনের অবস্থা ভূপতি দরদ দিয়েই বুঝতে চায়।

দর্পহরণ : হরিশ উকিল। স্ত্রী নির্ঝরিণী সাহিত্য চর্চা করে খ্যাতিলাভ করেছে। সে খ্যাতি স্বামী সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। এক প্রতিযোগিতায় স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুটি গল্প পাঠায়। স্ত্রী পুরস্কার পায়। স্বামীকে সুখী করার জন্য সে তারপর লেখাই ছেড়ে দিল।

মাল্যদান : যতীন ডাক্তার। খুড়তুতো বোন পটোলের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে কুড়ানির সঙ্গে তার পরিচয় হলো। সে-সম্পর্কে ঠাট্টা করায় যতীন সেখান থেকে চলে এলো। কুড়ানি মনোবেদনায় গৃহত্যাগ করলো। মরনোম্মুখ অবস্থায় কুড়ানি এলো হাসপাতালে। যতীন সেখানে ডাক্তারি করে। যতীনের ভালবাসার স্বীকৃতি নিয়ে কুড়ানি চোখ বুঁজলো।

কর্মফল : সতীশের পিতা মন্মথ চেয়েছিলেন পুত্রকে ভালভাবে মানুষ করতে। কিন্তু সতীশের মায়ের জন্য তা হয়নি। মেসো শশধর ও মাসী বিধুমুখী ধনী ও নিঃসন্তান। তাঁরা সতীশকে সাহেবিয়ানায় দীক্ষিত করে তোলেন। সতীশ সাহেব সেজে ভাদুড়ি-পরিবারে মেলামেশা করে। ভাদুড়ির মেয়ে নলিনীকে উপহার দেবার জন্য সে বাপের সিন্দুক থেকে চুরী করে। পিতা সম্পত্তি থেকে সতীশকে বঞ্চিত করে যান। মাসী পোষ্যপুত্রের মত সতীশকে গৃহে স্থান দেন। পরে মাসীর এক পুত্র হলো এবং তিনি সতীশকে বাড়ী থেকে বিদায় করার জন্য সচেষ্ট হলেন। শশধর সতীশকে এক চাকরী করে দিল। গঞ্জনায় উত্যক্ত হয়ে সতীশ আপিসের তহবিল ভেঙে পনেরো হাজার টাকা

এনে দিল মাসীর হাতে। তারপর জেলে যাবার ভয়ে সে আত্মহত্যা করার জন্ম প্রস্তুত হলো। ইতিমধ্যে সতীশকে রক্ষা করার জন্ম নলিনী তার সমস্ত গহনা নিয়ে ছুটে এলো। সতীশ নলিনী মিলন হলো।

মাস্টার মশাই: হরলাল বেণুর গৃহশিক্ষক। বেণু মাস্টার মশাইয়ের অত্যন্ত অনুরক্ত। মা ননীবালার তা সহ্য হয় না। বেণুকে শেষ অবধি শিক্ষকতা ছাড়তে হলো। হরলাল চাকরি পেল। বেণুর সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক বজায় রইল। ইতিমধ্যে বেণুর মা মারা গেল, বাপ দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন। আপিসের মাল কেনার টাকা ছিল হরলালের কাছে। বেণু সেই টাকা চুরী করে বিলাত পালিয়ে গেল। হরলাল কি করবে ভেবে পেল না। দুর্ভাবনায় পথে এক ঠিকা গাড়ীর মধ্যে তার মৃত্যু হলো।

গুপ্তধন: মৃত্যুঞ্জয় মুদীর দোকান করে। পিতার কাছ থেকে সে গুপ্তধনের একটা ছক পেয়েছিল। সেটি হারিয়ে গেল। মৃত্যুঞ্জয় সন্দেহ করলো এক সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসীকে সে পাকড়াও করলো বনের মধ্যে। সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়কে গুপ্তধনের গুহার মধ্যে নিয়ে গেল। সেই পাতাল-ঘরের অন্ধকার থেকে বাইরে আসার জন্ম মৃত্যুঞ্জয় সমস্ত গুপ্তধন ত্যাগ করলো। মুক্ত আলো-হাওয়ার মূল্য তখন তারা কাছে পৃথিবীর সকল সম্পদের চেয়ে মূল্যবান।

রাসমণির ছেলে: পৈতৃক উইল চুরী যাওয়ার ফলে ভবানীচরণ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলো। একমাত্র পুত্র কালীপদ বৃত্তি নিয়ে কলিকাতা এলো পড়তে। মেসে কালীপদর উপরতলে শৈলেনরা থাকে। তারা কালীপদকে জব্দ করতে চায়। কালীপদর বাক্স থেকে টাকা চুরী গেল, মর্মাহত কালীপদ অসুস্থ হয়ে পড়লো। ভবানীচরণ কলিকাতায় এলেন। জানা গেল কালীপদ সম্পর্কে শৈলেনের খুড়া। কালীপদ মারা গেল। রাত্রির অন্ধকারে শৈলেন চুরী-যাওয়া উইলখানি ফেলে দিয়ে গেল ভবানীচরণের গৃহে। কিন্তু তখন ভবানীচরণের আর সম্পত্তির প্রয়োজন নেই।

পণ রক্ষা: বংশীর বাপ-মা নেই। ছোট ভাই রসিককে সে অত্যন্ত স্নেহ করে। নিজে অবিবাহিত, কিন্তু সারাদিন তাঁত বুনে সে পণের টাকা সঞ্চয় করে, রসিকের বিয়ে দেবে। রসিক বাইসিকল কেনার জন্ম টাকা চায়, না পেয়ে অভিমানে গৃহত্যাগ করে। কলিকাতায় এসে স্বদেশী তাঁতের ইস্কুলে রসিক মাস্টার হয়। পরে ধনী জানকীবাবুর কন্সার সঙ্গে তার বিয়ে হলো।

রসিক এবার গ্রামে ফিরলো। বংশী তখন মারা গেছে। ভাইয়ের জন্য রেখে গেছে বাইসিকল আর পণের পাঁচশো টাকা।

হালদার গোষ্ঠী ঃ মনোহরলালের ম্যানেজার নীলকণ্ঠ মধু কৈবর্তের উপর জুলুম করে। পুত্র বনোয়ারীলাল তার প্রতিবাদ করেন। পিতা বিরক্ত হন। নীলকণ্ঠ মধুকে কাছারীতে ধরে আনে। বনোয়ারী পুলিশে খবর দেয়। বে-আইনী কাজ করায় নীলকণ্ঠের ছ'মাস জেল হয়। অসন্তুষ্ট পিতা সম্পত্তি থেকে বানোয়ারীলালকে বঞ্চিত করে যান। সম্পত্তির মালিক হয় ছোটভাইয়ের বালক পুত্র হরিদাস। পিতৃহীন হরিদাসকে বনোয়ারী বড় স্নেহ করে। নীলকণ্ঠের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়ে সে জমিদারীর কাগজপত্র হস্তগত করে, কিন্তু হরিদাসের মুখের পানে তাকিয়ে জমিদারীর ক্ষতি করতে পারে না। কাগজপত্র হরিদাসের হাতে তুলে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে চাকরীর সন্ধানে।

হৈমন্তী ঃ বোষ্টমীর বিচিত্র জীবন কথা। একমাত্র পুত্র জলে ডুবে মারা যায়। স্বামীর গুরু এসে শোকে সান্ত্বনা দেন, একদিন একান্তে বলেন—তোমার দেহখানি সুন্দর! পরদিন বোষ্টমী স্বামীর অনুমতি নিয়ে সংসার ত্যাগ করে। গুরু ও গৃহ ছেড়ে সে পথে বেরোয় সত্যের সন্ধানে।

স্ত্রীর পত্র ঃ গ্রামের মেয়ে মৃণাল, রূপের জোরে বিয়ে হলো কলিকাতায়। সেখানে বড় জায়ের কুৎসিৎ অনাথা-কুরূপা বোন বিন্দু এসে আশ্রয় পেল মৃণালের স্নেহচ্ছায়ায়। এক পাগলের সঙ্গে বিন্দুর বিয়ে দেওয়া হলো। বিন্দু স্বামীগৃহ থেকে পালিয়ে এলো। সবাই নিন্দা করলো। আবার তাকে ফিরে যেতে হলো স্বামীর ঘরে। ক'দিন পরে বিন্দু নিরুদ্দেশ হলো। মৃণাল তার সন্ধান নিয়ে পুরী যাওয়ার বন্দোবস্ত করলো। কিন্তু বিন্দু পুড়ে মরলো।

ভাইফোঁটা ঃ গল্পের নায়ক গরীব বলে অনসূয়ার সঙ্গে তার বিয়ে হলো না। বিয়ে হলো এক মুনসেফের সঙ্গে। নায়ক ব্যবসা করে অর্থশালী হলো। ইতিমধ্যে অনু বিধবা হয়ে একমাত্র পুত্র সুবোধকে নিয়ে পিতৃগৃহে এলো। ভাইফোঁটার দিনে নায়ককে ফোঁটা দিয়ে অনু সুবোধ ও সাতচল্লিশ হাজার টাকা তার হাতে সঁপে দিল। অনু মারা গেল। নায়ক সেই টাকা কারবারে লাগিয়ে দিল। সুবোধের উপর অনাদর সুরু হলো। কারবার ডুবিয়ে দিয়ে অংশীদার প্রসন্ন নিরুদ্দেশ হলো। তাকে খুঁজতে গিয়ে সুবোধ অসুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরলো। সুবোধ মারা গেল। নায়কের মনে অনুশোচনা দেখা দিল।

শেষের রাত্রি ঃ যতীন অসুস্থ, ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। আপনার জন বলতে মাসী আর স্ত্রী মণি। মণি রোগীর সেবা করতে চায় না, সীতারামপুরে চলে যায় পিতার কাছে। মাসী যতীনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মণির সব ত্রুটি ঢেকে দেন। যতীনের মৃত্যুকালে মণি এসে যতীনের পায়ে মাথা রেখে কাঁদে।

অপরিচিতা ঃ নায়কের অভিভাবক মা ও মামা। শম্ভুনাথ সেনের মেয়ে কল্যাণীর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হয়। হিসাবী মামা স্যাকরা নিয়ে গহনা যাচাই করতে বসেন। শম্ভুবাবু ক্ষুব্ধ হয়ে বিয়ে ভেঙে দেন। পরে তীর্থে যাবার পথে ট্রেনে এক শিক্ষিকার সঙ্গে মাতাপুত্রের আলাপ হলো। মেয়েটির তে তায় তারা মুগ্ধ হলো। পরিচয়ে জানা গেল সে সে-ই কল্যাণী। নায়ক বিয়ের প্রস্তাব করলো, কল্যাণী সম্মত হলো না। নায়ক কল্যাণীর শিক্ষাদানের কাজে সহযোগী হলো।

তপস্বিনী ঃ বরদা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার ভয়ে গৃহত্যাগ করলো। স্ত্রী ষোড়শীর বিশ্বাস স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। সে-ও সহধর্মিনী হিসাবে জপ-তপে মেতে উঠলো। বারো বছর পরে বরদা সাহেব সেজে ফিরলো। সে আমেরিকা গিয়েছিল, কাপড়-কাচা কালের এজেন্ট হয়ে ফিরেছে।

পয়লা নম্বর ঃ অদ্বৈতচরণ সাহিত্য আলোচনায় মশগুল। স্ত্রী অনিলা নিঃসঙ্গ। পিতৃমাতৃহীন ছোট ভাই সরোজ তার একমাত্র অবলম্বন। পরীক্ষায় ফেল করে সরোজ আত্মহত্যা করলো। পরদিন সকাল থেকে অনিলাও নিরুদ্দিষ্ট হলো। একখানি চিঠি দেখে অদ্বৈতর ধারণা হলো, পাশের বাড়ীর ভাড়াটে রাজা সীতাংশুমৌলির সঙ্গে অনিলা গৃহত্যাগ করেছে। অনেকদিন পরে মুসৌরীতে রাজার সঙ্গে দেখা হলো, তখন জানলো অনিলা রাজার সঙ্গে যায়নি।

পাত্রপাত্রী ঃ নায়কের দু'বার বিয়ে ভেঙে যায়। প্রথম বারে আপত্তি করেন পিতা, দ্বিতীয় বারে অসম্মত হয় সে নিজে। উনআশী টাকা সম্বল করে সে ব্যবসায় নামে এবং লাখপতি হয়। তখন নতুন করে সংসার পাতার বাসনা জাগলো। বয়স্কা শিক্ষিতা মেয়ে দীপালীর সঙ্গে বিয়ের কথা উঠলো। দীপালী ভালবাসে শ্রীপতিকে। কিন্তু শ্রীপতির পিতার বিয়েতে মত নেই। লাখপতি দু'জনের বিয়ে দিয়ে নিজগৃহে স্থান দিল। তাদের নিয়ে সংসারের অভাব পূরণ হলো।

নামঞ্জুর গল্প ঃ জেলফেরৎ স্বদেশী নেতা জীবনকাহিনী লেখেন। গৃহে আপনার বলতে আছেন বিধবা পিসি আর তার পালিতা কন্যা অমিয়া। অমিয়া দাদার স্বাদেশিকতায় মেতে ওঠে। দলের ছেলেরা তাকে বলে 'যুগলক্ষ্মী'। অনিল অমিয়াকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু যখন শোনে অমিয়া দাসীকন্যা, তখনই পিছিয়ে যায়।

সংস্কার ঃ স্ত্রী কলিকা স্বাদেশিকতায় মেতে ওঠে, স্বামীকেও মাতিয়ে তুলতে চায়। সকালে বাড়ী থেকে বেরুবার সময় চোখে পড়ে ছোঁয়াছুয়ির অপরাধে এক মেথরকে প্রহার করা হচ্ছে। স্বামী মেথরকে মোটরে তুলে নিতে চায়, স্ত্রী আপত্তি করে বলে—তা হয় না, ও যে মেথর!

বলাই ঃ মাতৃহারা বলাই কাকীর কাছে মানুষ। সে গাছপালা ভালবাসে। বাগানের একটি শিমূল গাছ তার বড় প্রিয়। বাপ বলাইকে নিয়ে যায় সিমলায়, সেখান থেকে সে বিলাত যাবে। বলাই শিমুল গাছটির একখানি ফটো চেয়ে পাঠায়। কিন্তু কাকা ইতিমধ্যে গাছটিকে কেটে ফেলেছে। নিঃসন্তান কাকী মনে বড় ব্যথা পান।

চিত্রকর ঃ মুকুন্দের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীপুত্রের অভিভাবক হলো খুড়তুতো ভাই গোবিন্দ। বিধবা সত্যবতী ছবি আঁকতে ভালবাসে। পুত্র চুনীলালও ছবি আঁকে। গোবিন্দ শিল্পকর্ম বোঝে না, চুনীর ছবি ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ভাগ্নে রঙ্গলাল নামকরা শিল্পী, সত্যবতী ছেলেকে নিয়ে তার কাছে যায়, বলে—তুমি নাও এর ভার।

চোরাই ধন ঃ অরুণা ভালবাসে অমলকে। মা সুনেত্রা তা পছন্দ করেন না। তিনি কোষ্ঠীর মিল দেখে বিয়ে দেবার পক্ষপাতী। সুনেত্রার পিতাও কন্যার বিয়ের সময় কোষ্ঠীর মিলের কথা তুলেছিলেন। সুনেত্রার মায়ের পরামর্শমত অরুণার বাবা নকল কোষ্ঠী তৈরী করে দিয়েছিলেন। তারপর একুশ বছর কেটে গেছে, ভুয়া-কোষ্ঠীর মিলন কোন গরমিল ঘটাতে পারেনি। স্বামীর এই কথা শুনে সুনেত্রা অমলের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিতে আর আপত্তি করেন না।

'তিনসঙ্গী' গ্রন্থে আছে তিনটি গল্প :

রবিবার ঃ অভয়াচরণ অর্থাৎ অভীক, সুপুরুষ ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু চিত্র-শিল্পী হিসাবে খ্যাতিলাভ করার দিকেই তার আগ্রহ। পিতৃমাতৃহীন ধনীকন্যা বিভাকে সে ভালবাসে। অভীক বিভাকে বিয়ে করতে চাইলে বিভা বলে—

বিয়েটা আর্টিস্টের পক্ষে গলার ফাঁস। অভীকের বিলাত যাবার ইচ্ছা, বিভার গহনা চুরী করে সে বিলাত যাত্রা করে। জাহাজ থেকে ভালবাসার স্বীকৃতি দিয়ে চিঠি লেখে।

শেষ কথা : নবীন মাধব সেনগুপ্ত ইঞ্জিনিয়ার, খনিজবিদ্যা ও জিওলজিতেও ডিগ্রি নিয়েছে। ছোটনাগপুরের এক সামন্ত রাজ্যে চাকরি করতে এসে অধ্যক্ষ অনিল কুমার সরকারের পিতৃহীন একমাত্র নাতনী অচিরার সঙ্গে পরিচয় হয়। অচিরার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল অধ্যক্ষের ছাত্র ভবতোষের সঙ্গে। ভবতোষ অধ্যক্ষের টাকায় বিলাত ঘুরে এসে অন্যত্র বিয়ে করে। আশাহত অধ্যক্ষ নাতনীকে নিয়ে অরণ্য-পরিবেশে চলে আসেন। নবীন অচিরাকে বিয়ে করতে চায়। অচিরা রাজী হয় না। অধ্যক্ষ ফিরে যান চাকরিতে, নবীন ফিরে আসে কলিকাতায়।

ল্যাবরেটরি : নন্দকিশোর ইঞ্জিনিয়ার। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। পাঞ্জাবে সোহিনীর সঙ্গে তার পরিচয়। বিধিমত বিয়ে না হলেও সোহিনী তার জীবনসঙ্গিনী। নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয় সোহিনী। একমাত্র মেয়ে নিলীমা, সংক্ষেপে নীলার বিয়ের জন্য সোহিনী সচেষ্ট হয়। অধ্যাপক মন্মথবাবুর ছাত্র রেবতী ভট্টাচার্যকে সোহিনী মনোনীত করে; রেবতীকে নিযুক্ত করে নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরির কাজে। রেবতীর সঙ্গে নীলার পরিচয় হয়। সে পরিচয় প্রেমে পরিণত হয়। সোহিনী দিন-কয়েকের জন্য পাঞ্জাবে যায় অসুস্থ আই-মাকে দেখতে। ফিরে এসে দেখে গৃহে জাগনী ক্লাবের ভোজসভা বসেছে। সে সভায় নীলার সঙ্গে রেবতীর বিয়ের কথা পাকা হয়। ঠিক সেই সময় রেবতীর প্রাচীনপন্থী পিসিমা এসে পড়লেন, ডাকলেন—রেবি চলে আয়! রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।

গল্পসল্পে আছে ১৬টি গল্প। এই গল্পগুলি তেমনভাবে আলোচিত হয়নি। গল্পগুলির নাম যথাক্রমে এখানে উল্লেখ করা হলো : বিজ্ঞানী। রাজার বাড়ি। বড়ো খবর। চণ্ডী। রাজরাণী। মুনশি। ম্যাজিসিয়ান। পরী। আরও সত্য। ম্যানেজারবাবু। বাচস্পতি। পান্নালাল। চন্দনী। ধ্বংস। ভালোমানুষ। মণিকুন্তলা।

প্রতিটি গল্পের শেষে একটি করে কবিতা আছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে এই 'গল্পগুচ্ছে'ই আমরা মানুষের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্নার, তাহার হৃদয়ের নীচতা-উচ্চতা প্রভৃতির চিত্র—সমগ্র মানুষের চিত্র পাই।" [—রবীন্দ্র কাব্যপরিক্রমা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"…তাঁহার গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়েই তিনি আমাদের প্রাত্যহিক সাধারণ জীবনের উপর রোমান্সের অসাধারণতা ও দীপ্তি আনিয়া দিয়াছেন—(১) প্রেম; (২) সামাজিক জীবনে সম্পর্ক-বৈচিত্র্য; (৩) প্রকৃতির সহিত মানব মনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ ও (৪) অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ।" [—বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

তিনি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত করে তার বিচার করেছেন।

প্রেম: এক রাত্রি, মহামায়া, সমাপ্তি, দৃষ্টিদান, মাল্যদান, মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, প্রায়শ্চিত্ত, মানভঞ্জন, দুরাশা, অধ্যাপক ও শেষের রাত্রি।

সামাজিক জীবনে সম্পর্ক-বৈচিত্র্য: পোস্টমাস্টার, ব্যবধান, কাবুলিওয়ালা, দান প্রতিদান মাস্টারমশাই, মেঘ ও রৌদ্র, পণ রক্ষা, রাসমণির ছেলে, কর্মফল, দিদি, হালদার গোষ্ঠী, ঠাকুরদা, দেনা-পাওনা, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, হৈমন্তী, ইত্যাদি।

প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ: সুভা, অতিথি, আপদ, সমাপ্তি ইত্যাদি।

অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ: নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ, মণিহারা, কঙ্কাল।

নষ্টনীড়, স্ত্রীর পত্র, পাত্র ও পাত্রী, পয়লা নম্বর ও নামঞ্জুর গল্প তিনি পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন।

শ্রীকুমারবাবু বলেছেন—দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে 'দিদই' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। শেষ পর্যায়ের 'নষ্টনীড়ও' উল্লেখযোগ্য গল্প।

সুবোধ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন:

প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের নিগূঢ় সম্পর্কিত গল্প: একরাত্রি, দালিয়া, হৈমন্তী, অতিথি, সুভা, দৃষ্টিদান, অনধিকার প্রবেশ, নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ,

প্রেম সম্পর্কিত গল্প : জয় পরাজয়, পয়লা নম্বর, মহামায়া, অপরিচিতা, পাত্র ও পাত্রী, অধ্যাপক, মাল্যদান, শেষের রাত্রি, সমাপ্তি, দুরাশা, নষ্টনীড়, প্রতিবেশিনী, প্রভৃতি।

স্নেহ সম্পর্কিত গল্প : দান প্রতিদান, দিদি, আপদ, ঠাকুর্দা, দুর্বুদ্ধি, সম্পাদক, পোস্টমাস্টার, কাবুলিওয়ালা, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, কর্মফল, রাসমণির ছেলে, পণরক্ষা, মাস্টার মশাই প্রভৃতি।

শ্লেষাত্মক গল্প : প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, তপস্বিনী, পুত্রযজ্ঞ, নামঞ্জুর গল্প, প্রভৃতি।

নানা বিষয়ক গল্প : রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, গিন্নি, গুপ্তধন, ভাইফোঁটা, হালদার গোষ্ঠী, ফেল, সদর ও অন্দর, শুভদৃষ্টি, মানভঞ্জন, প্রতিহিংসা, ডিটেকটিভ, রাজটীকা, দর্পহরণ, প্রভৃতি।

সুবোধবাবু বলেছেন—"প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের নিগূঢ় সম্বন্ধ লইয়া যত গল্প লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে 'অতিথি' গল্পটি সর্বশ্রেষ্ঠ।···

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে রবীন্দ্রনাথ অতীতের বিস্মৃত বেদনার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার একটি অপরূপ মাধুর্য আছে।···তাহাতে অতি-প্রাকৃতের অলৌকিকতা বজায় রাখা হইয়াছে, অথচ মানবজীবনের নিগূঢ়তম বেদনাও তাহার মধ্যে মুখর হইয়া রহিয়াছে।···

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গল্পের মধ্যে 'সমাপ্তি' ও 'দুরাশার' স্থান অতি উঁচুতে।" [—রবীন্দ্রনাথ

কাহিনী বিন্যাস ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে প্রমথনাথ বিশী তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

"কোন কোন গল্প গীতি-কবিতার প্যাটার্ণে বা ছাঁচে গঠিত। একটি ভাব বা একটি অনুভূতিকে স্বতঃস্ফূর্তঃ ভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ লেখক দিয়াছেন; ঘটনার গুরুত্ব ও নর নারীর সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমাইয়া দিয়াছেন পাছে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি নষ্ট হইয়া যায়। পোস্টমাস্টার, একরাত্রি, সুভা, শুভদৃষ্টি, খাতা, নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর গল্প।···

দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পে কাহিনী বিন্যাসের কৌশল প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।··· খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি সমর্পণ, দান প্রতিদান, সমস্যাপূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, অধ্যাপক, দৃষ্টিদান, কর্মফল ও নষ্টনীড় প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

···শেষ বয়সে লিখিত হালদার গোষ্ঠী, স্ত্রীর পত্র, বোষ্টমী, অপরিচিতা,

পয়লা নম্বর, পাত্র ও পাত্রী, নামঞ্জুর গল্প, সংস্কার, বলাই, চোরাই ধন প্রভৃতি গল্প সূত্র ও সূত্রের ব্যাখ্যামূলক।…আত্মব্যাখ্যা ও তত্ত্ব ব্যাখ্যার ইচ্ছায় ইহাদের জন্ম।" [—রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—

"শিলাইদহ সাজাদপুরের ছায়াঘন জলকল্লোলিত পরিবেশে বসে 'হিতবাদী পত্রিকার' জন্য লিখতে আরম্ভ করেন দেনাপাওনা, গিন্নি, পোস্টমাস্টার, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা। হিতবাদীতে লেখা বেশি দিন চলে না, কিন্তু 'ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা,' তাঁর মনে 'গল্প লিখি এক একটি করে'—র যে বাসনা জাগিয়েছিল, তারা এইবার 'সাধনা' পত্রিকায় প্রসারিত হল। রবীন্দ্রনাথের গল্প সাধনা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এগিয়ে চলল কঙ্কাল, মহামায়া, ক্ষুধিত পাষাণ, মধ্যবর্তিনী, দুরাশা, একরাত্রি, রাসমণির ছেলে, হালদার গোষ্ঠী, পয়লা নম্বর, ও না-মঞ্জুর গল্প পর্যন্ত। তাঁর ছোট গল্পের শেষ স্বাক্ষর তিন সঙ্গীর জলন্ত জিজ্ঞাসা-চিহ্ন ল্যাবরেটরিতে আর খসড়ার আকারে রচিত প্রগতি-সংহারে।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের সমস্ত দিকেই রবীন্দ্রনাথের মহিমাচ্ছায়া পড়েছে। সমাজসমস্যা, নারী, রোমান্স, দার্শনিকতা, কাব্যধর্মিতা, এবং এমন কি ব্যঙ্গ গল্পেও তাঁর কলম সর্বসিদ্ধি লাভ করেছে। ঐতিহাসিক ভাবে না হোক্ সাহিত্যিক বিচারে একালীন বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টাই হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ এবং আজ পর্যন্ত তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্পকার।

…পোস্টমাস্টার গল্পটি যেমন অতি ক্ষুদ্র একটি অনাথিনী বালিকার হৃদয় বেদনায় আচ্ছন্ন, তেম্‌নি তার মধ্যে প্রকৃতির রহস্যঘন সত্তাটি নিজেকে বিকীর্ণ করে দিয়েছে।…বরপণ প্রথার হৃদয়হীনতা আর স্বার্থের সংকীর্ণতার রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম রামসুন্দরের চরম লাঞ্ছনায় এবং নিরুপমার মৃত্যুতে। (দেনা পাওনা)।…তারাপ্রসন্নের কীর্তি এবং রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা এই বিশ্ব সত্যকেই প্রমাণ করল যে এই কুটিল—বৈষয়িকতার জগতে বিশ্বাসী সরল মানুষের স্থান নেই—একালের স্বার্থ-সর্বস্বতার নিরিখে তারা উপহাস্যতার উপকরণ মাত্র।

…সমাজ সমস্যা এল ত্যাগ, সমস্যাপূরণ, খাতা, বিচারক, দিদি, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি গল্পে; পরাধীনতার মর্মজ্বালা ফুটে বেরুল মেঘ ও রৌদ্রে,…আমলা-তান্ত্রিকতা এবং পুলিশের সমালোচনা-রূপে দেখা দিল দুর্বুদ্ধি। কবি-কল্পনার

ঝঙ্কার বেজে উঠল ক্ষুধিত পাষাণের মালব-কৌশিক রাগে, অতিথির মল্লারে, এক রাত্রির বেহাগে। বিচিত্র রসের গল্প হয়ে দেখা দিল মহামায়া, জীবিত ও মৃত, সম্পত্তি সমর্পণ ও মণিহারা। নারীর শক্তিমত্তার উদ্বোধন ঘটল মানভঞ্জনে, দৃষ্টিদানে, কঙ্কালে। শাশ্বত পিতৃহৃদয়ের নিত্য-বাণী ঘোষিত হল কাবুলিওয়ালায়।

বস্তু বৈচিত্র্য, মনস্তাত্ত্বিকতা, ভাষার তীক্ষ্ণতা, উইটের ঔজ্জ্বল্য—রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে সবকটি গুণই বিদ্যমান।...তাঁর কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ-উপন্যাসের স্থান যেখানেই নির্ধারিত হোক, মাত্র গল্প লেখক রূপেই তিনি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের সঙ্গে আসন লাভের যোগ্য।" [—সাহিত্যে ছোটগল্প

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"এই ধরণের (অতি প্রাকৃত) গল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে রসঘন ও রহস্য-নিবিড় গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ'। প্রাচীন ও আধুনিক, দেশী ও বিদেশী কোনো সাহিত্যেই, এই বিশেষ ধরণের গল্পে এমন অপূর্ব কলাকৌশল, রহস্য-নিবিড় বর্ণনাভঙ্গি অপরূপ কল্পনার ঐশ্বর্য, সর্বোপরি এমন উচ্ছ্বসিত সুরপ্রবাহ দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না।" [—বিচিত্রা ভাদ্র' ৩৮

'সে' সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"চৌদ্দটি পরিচ্ছেদে ছোটদের জন্য লেখা গল্প সমষ্টি। এর প্রধান চরিত্র তিনটি, গল্প-কথক আমি, গল্পের শ্রোতা তুমি অর্থাৎ পুষ্পদিদি, আর সে। এ ছাড়া আরও অনেকে আছে।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদটিই গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।...পরবর্তী অনুচ্ছেদও কবিত্ব ও ভাবের গভীরতায় পূর্বতন অনুচ্ছেদগুলির চেয়ে অনেক রস সমৃদ্ধ।... সর্বত্রই ভাষার ভঙ্গীতে ও Fancy-র লীলায় রবীন্দ্রনাথের হস্তচিহ্ন বর্তমান, শেষের তিনটি অনুচ্ছেদ তো অমূল্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বইখানি অল্প বয়স্কের সম্পূর্ণ উপভোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তবে ইহার বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য এত অধিক যে, ছেলেমেয়েরা তাহাদের মতো গ্রহণ করিবে আর বয়স্কগণ তাহাদের মতো গ্রহণ করিবে, তবু ফুরাইবে না।" [—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

'গল্পসল্প' সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

"গল্পগুলি প্রত্যক্ষত অল্প বয়স্কের জন্য লিখিত হইলেও, এগুলির সম্যক্ রসগ্রহণ কেবল বয়স্কদের পক্ষেই সম্ভব। ক্ষীণকায় গল্পস্রোতের আড়ালে

যে প্রচুর মননশীলতা বর্তমান—তাহাই এইগুলির প্রধান সম্পদ। আর প্রধানতম সম্পদ গল্পসংলগ্ন কবিতাগুলি।" [—ঐ

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—

"সে, খাপছাড়া, গল্পসল্প, এদের আমি রাখবো—শিশু সাহিত্যের বিভাগে নয়, স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীতে, এদের বলবো প্রতিভাবানের খেয়াল, অবসরকালের আত্মবিনোদন, চিরচেনা রবীন্দ্রনাথেরই নতুনতর ভঙ্গি একটি।" [—সাহিত্যচর্চা

'তোতাকাহিনী' সম্পর্কে শিব নারায়ণ রায় লিখেছেন—

"এখন থেকে বিয়াল্লিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রে এই আশ্চর্য গল্পটি লিখেছিলেন। তারপর গঙ্গায় অনেক জল বয়েছে, কিন্তু পাখিদের নসিব বদলায় নি। বরং আদম শুমারের হিসাব নিলে দেখা যায় পণ্ডিতদের দৌরাত্ম্যে পক্ষিমৃত্যুর হার এই চল্লিশ বছরে কমা দূরে থাক, হু হু করে বেড়ে চলেছে। কেননা শিক্ষার যা প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং মূল অনুপ্রেরণা তার সঙ্গে এদেশে সাধারণ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার যোগ আগেও খুব সবল ছিল না এবং সম্প্রতি ক্রমেই সে-যোগ ক্ষীণতর হয় আসছে। আমাদের বিদ্যাভ্যাসের শুরু মুখস্থে এবং তার সমাপ্তি ডিগ্রী লাভে।" [—নায়কের মৃত্যু

'তিন সঙ্গীব' তিনটি গল্প সম্পর্কে নীহাররঞ্জন লিখেছেন—

"রবীন্দ্র মানসের বৈশিষ্ট্য 'রবিবার' কিংবা 'ল্যাবরেটরি' গল্পে নাই, আছে 'শেষ কথায়'। গল্পগুচ্ছের আবহাওয়া ও পরিবেশ, সেই কবিত্বময় নিসর্গবর্ণনা, ব্যঞ্জনাময় নিসর্গ পরিবেশ, মানবচিত্তের উপর প্রকৃতির দুর্নিবার প্রভাব, সেই বিদগ্ধ ও বিজ্ঞানী মনের সমস্ত যুক্তি ও বুদ্ধির কাঠিন্য ভেদ করিয়া চরম প্রাণের সজীবতায় মধ্যে প্রেমের পক্ষ বিস্তার, সব যেন আমরা দেখিলাম 'শেষ কথা' গল্পটিতে।...অচিরাই রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্রের আদর্শ। বস্তুত অচিরা, বিভা, শেষের কবিতার লাবণ্য, গোরার সুচরিতা ইহারা সকলেই একই স্বভাব ও প্রকৃতির মেয়ে, ইহাদের বুদ্ধি যত দীপ্ত, শিক্ষা যত উন্নত, রুচি ও প্রবৃত্তি যত সংযত, ত্যাগের মহিমা তত উজ্জ্বল, ইহাদের চারিদিকে একটা শুভ্র শুচিতা এবং নিরাসক্ত অথচ গভীর প্রেমের জ্যোতি দীপ্যমান।" [—রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা

'মুকুট' সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"বস্তুত মুকুট ছোটগল্প নয়, ছোটউপন্যাস মাত্র। কি গঠনরীতি, কি বিষয়বস্তু, কোন বিচারেই তাহাকে ছোটগল্প বলা যায় না।" [—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

নাটক

রবীন্দ্রনাথের নাটক : ১। প্রকৃতির প্রতিশোধ, ২। বাল্মীকি প্রতিভা, ৩। মায়ার খেলা, ৪। রাজা ও রাণী, ৫। বিসর্জন, ৬। চিত্রাঙ্গদা, ৭। গোড়ায় গলদ, ৮। বিদায় অভিশাপ, ৯। মালিনী, ১০। বৈকুণ্ঠের খাতা। কাহিনীর পাঁচখানি গীতিনাট্য: ১১। গান্ধারীর আবেদন, ১২। কর্ণকুন্তী সংবাদ, ১৩। নরকবাস, ১৪। সতী, ১৫। লক্ষ্মীর পরীক্ষা। ১৬। হাস্য কৌতুক—(পনেরোটি নাটিকা।) ১৭। ব্যঙ্গ কৌতুক—(পাঁচটি নাটিকা, তার মধ্যে 'বশীকরণ' সমধিক প্রসিদ্ধ।) ১৮। শারদোৎসব। ১৯। মুকুট। ২০। প্রায়শ্চিত্ত। ২১। রাজা। ২২। অচলায়তন। ২৩। ডাকঘর। ২৪। ফাল্গুনী। ২৫। গুরু। ২৬। অরূপরতন। ২৭। ঋণশোধ। ২৮। মুক্তধারা। ২৯। বসন্ত। ৩০। রক্তকরবী। ৩১। চিরকুমার সভা। ৩২। শোধবোধ। ৩৩। গৃহ প্রবেশ। ৩৪। শেষবর্ষণ। ৩৫। নটীর পূজা। ৩৬। নটরাজ। ৩৭। শেষরক্ষা। ৩৮। পরিত্রাণ। ৩৯। তপতী। ৪০। নবীন। ৪১। শাপমোচন। ৪২। কালের যাত্রা। ৪৩। চণ্ডালিকা। ৪৪। তাসের দেশ। ৪৫। বাঁশরী। ৪৬। শ্রাবণগাথা। ৪৭। চিত্রাঙ্গদা (নৃত্যনাট্য) ৪৮। চণ্ডালিকা। ৪৯। শ্যামা। ৫০। মুক্তির উপায়।

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রধান বাহন কবিতা ও গান। কবিতা ও গানের পরেই নাটককে তাঁহার প্রতিভার বাহন বলা যাইতে পারে, কি সংখ্যার বিচারে, কি রসের বিচারে, কবিতার নীচেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে নাটকগুলির স্থান।...

রবীন্দ্রনাথের নাটকের কালানুক্রমিক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে উত্তরোত্তর তাঁহার নাটকে গানের সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিংবা একখানি নাটকে যখন পরবর্তী কালে রূপান্তরিত করিয়াছেন তাহাতে গানের সংখ্যা বাড়িয়াছে; সংস্করণভেদেও এই একই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার নাটক নিরবচ্ছিন্ন গানের মালায় পরিণত হইয়াছে, কেবল মাঝে মাঝে এক গানের সঙ্গে অন্য গানের জোড়া দিবার জায়গায় একটু করিয়া গদ্য বা পাত্রপাত্রীর উক্তি।..." [—রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের নাটকেও দেখা যায় তাঁহার নরনারী কোনো নির্দিষ্টভাব ও তত্ত্বের বাহন মাত্র; কতকগুলি নাটক আকারে নাটক হইলেও প্রকৃত গীতিকাব্য।" [— রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি আটটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে।—

গীতিনাট্য: বাল্মীকি প্রতিভা (কাল মৃগয়া)। মায়ার খেলা (নলিনী)।

কাব্যনাট্য: চিত্রাঙ্গদা। বিদায় অভিশাপ। গান্ধারীর আবেদন। কর্ণকুন্তী সংবাদ। নরক বাস। সতী। লক্ষ্মীর পরীক্ষা।

রোমান্টিক ট্রাজেডি: রাজা ও রাণী (তপতী)। বিসর্জন। মালিনী।

সামাজিক নাটক: প্রায়শ্চিত্ত। (পরিত্রাণ)। গৃহ প্রবেশ। শোধবোধ। নটীর পূজা। চণ্ডালিকা। বাঁশরী। মুক্তির উপায়।

কৌতুক নাট্য: গোড়ায় গলদ। বৈকুণ্ঠের খাতা। চিরকুমার সভা। হাস্য কৌতুক। ব্যঙ্গ-কৌতুক।

রূপক নাটক: প্রকৃতির প্রতিশোধ। শারদোৎসব (ঋণশোধ)। রাজা (অরূপ-রতন)। অচলায়তন (গুরু)। ডাকঘর। ফাল্গুনী। মুক্তধারা। রক্তকরবী। কালের যাত্রা। তাসের দেশ।

ঋতুনাট্য: শেষবর্ষণ। বসন্ত। নবীন। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা। শ্রাবণ গাথা।

নৃত্যনাট্য: চণ্ডালিকা। চিত্রাঙ্গদা। শ্যামা। নটীর পূজা। শাপমোচন।

প্রমথনাথ বিশী একটি নূতন পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন, কয়েকখান নাটকের ঘটনার কাল নির্ণয় করে তিনি তার নামকরণ করেছেন—ঋতুচক্র: গ্রীষ্ম-বর্ষা—অচলায়তন, বর্ষা-শরৎ—বিসর্জন; শরৎ প্রারম্ভ—শারদোৎসব, ঋণশোধ, শরৎ শেষ—ডাকঘর, শীতকাল—রক্তকরবী, বসন্ত—রাজা ও রাণী, রাজা, ফাল্গুনী।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাসী গুহায় বসে তপস্যা করেন। তপস্যা শেষে একদিন এলেন লোকালয়ে। রাজপথে এক অস্পৃশ্য বালিকা সন্ন্যাসীর আশ্রয় নিল। সন্ন্যাসী স্নেহবন্ধনে জড়িয়ে পড়লেন। সন্ন্যাসী পালালেন অরণ্যে, বালিকা সেখানে উপস্থিত হলো। সন্ন্যাসী আবার একদিন বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব আবার তাকে ফিরিয়ে আনলো। এবার ফিরে এসে দেখলেন গুহামুখে বালিকা পড়ে আছে—মৃত।

পাত্রপাত্রী : সন্ন্যাসী। অনাথা বালিকা। জনকয় কৃষক, জনকয় ব্রাহ্মণ, জনকয় পথচারী, জনকয় রমনী, মালিনী, মন্দির রক্ষক, বৃদ্ধ ভিক্ষুক, বিদেশ তাঁতী, এক বৃদ্ধা, প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"কাব্য হিসাবে বা নাটক হিসাবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'—এর শিল্পমূল্য অতি সামান্য। ইহা একটি অপরিণত, অপরিস্ফুট রচনা, ইহার ভাষা ও ছন্দ দুর্বল, ভাব এখনো রূপমূর্তি লাভ করে নাই, নাটকীয় কলাকৌশল ও আবেগের অভিব্যক্তি প্রাথমিক স্তরের।…

সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ লইয়াছিল। এবার তাহাকে সংসারে ফিরাইয়া আনিয়া প্রকৃতি প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। সত্য কঠোর মূর্তিতেই আমাদিগকে জাগ্রত করে। প্রচণ্ড আঘাতের মধ্য দিয়াই জীবনের চরম সত্য উপলব্ধ হয়।…" [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

বাল্মীকি প্রতিভা

দস্যু রত্নাকর বনের মধ্যে দস্যুবৃত্তি করে। কালীপূজা করে নরবলি দেবার জন্য দস্যুরা এক বালিকাকে ধরে আনে। সেই বালিকার কান্না দেখে রত্নাকরের ভাবান্তর হয়। বালিকাকে ছেড়ে দিয়ে সে শূন্য মনে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। একদিন এক ব্যাধ ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মধ্যে একটিকে শরাহত করলো। রত্নাকরের ব্যথিত চিত্তে কবিত্ব শক্তি জন্মলাভ করলো। এবার লক্ষ্মী আবির্ভূত হয়ে বর দিতে চাইলেন, কিন্তু রত্নাকর বললেন--সম্পদ চাই না। সরস্বতী দেখা দিয়ে বললেন— "এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার।
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।"

রত্নাকর হলেন মহাকবি বাল্মীকি।

পাত্রপাত্রী : বাল্মীকি ও তিনজন দস্যু। দু'জন ব্যাধ। এক পথহারা বালিকা। লক্ষ্মী ও সরস্বতী।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"বিহারী লাল চক্রবর্তীর 'সারদা মঙ্গল'—এর প্রভাব 'বাল্মীকি প্রতিভার' উপর বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ক্রৌঞ্চ বধের চিত্রখানি রবীন্দ্রনাথ 'সারদা মঙ্গল' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।…

ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রভাবে অনেকটা প্রভাবান্বিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ

আমাদের দেশীয় রাগ-রাগিনীকে গতানুগতিকতা ও কৃত্রিমতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে নানা ভাবের বাহন করিবার পরীক্ষা করিয়াছেন এই 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতি-নাট্যে। বাংলা গানের যে যে মুক্তি সাধিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের হাতে, 'বাল্মীকি-প্রতিভা' সেই মুক্তির প্রথম বিজয় চিহ্ন।"

[—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়াতে' নাট্যরস মুখ্য, সঙ্গীত গৌণ, আর 'মায়ার খেলাতে' গীতরসই প্রধান—নাট্যরস গৌণস্থান অধিকার করিয়াছে। বস্তুত 'মায়ার খেলাই' বিশুদ্ধ গীতিনাট্য।" [—রবীন্দ্র নাট্য-প্রবাহ

মায়ার খেলা

শান্তা অমরকে ভালবাসে, কিন্তু অমর তা বোঝে না, মানসী খুঁজতে বেরোয় বিদেশে। প্রমদাকে সে ভালবাসলো, কিন্তু সংকোচে ও সখীদের বিদ্রূপে প্রমদা মনের কথা বলতে পারলে না। অমর ফিরে এলো শান্তার কাছে। বিয়ের দিন প্রমদা এলো। তার পানে তাকিয়ে অমরের হাত থেকে মালা খসে পড়লো। শান্তা তখন প্রমদার সঙ্গে অমরের মিলন ঘটাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু প্রমদা সম্মত হলো না। শান্তার সঙ্গেই অমরের বিয়ে হলো। প্রমদা ফিরে গেল শূন্য হৃদয়ে।

পাত্রপাত্রী: অমর। কুমার। অশোক। শান্তা। প্রমদা। মায়াকুমারী। পুরবাসী, পৌরজন ও সখীরা।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"ভোগবাসনা পরিত্যক্ত না হইলে প্রেমের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না—এইটাই সে-যুগের কবি-মানসের একটা বিশেষ সুর। সেই সুর এই 'মায়ার খেলা'তেও ধ্বনিত হইয়াছে।" [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া, প্রকৃতির প্রতিশোধ ও মায়ার খেলা সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"দয়া, করুণা, প্রেম, স্নেহ, মৈত্রী এই গুণই মানবতার স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত। এই স্বভাবজ মানবধর্ম নানা অভ্যাসের কঠোরতা, নানা সংস্কারের শাসনে, নানা বিধি-বিধানের, নানা ঐতিহ্যের বাঁধনে মানুষ ভুলিয়া যায়, তাহাকে অস্বীকার করে। এই ভাবেই স্বাভাবিক মানবত্ব লাঞ্ছিত হয়। দস্যু

রত্নাকরের কাছেও একদিন তাহাই হইয়াছিল, সংসার বন্ধন মুক্ত সন্ন্যাসীর কাছেও তাহাই হইয়াছিল।...দস্যু রত্নাকর তাহাকে ভুলিয়াছিল অভ্যাসের কঠোরতায়, সন্ন্যাসী তাহাকে ভুলিয়াছিল সন্ন্যাস-সংস্কারের শাসনে, প্রমদা ভুলিয়াছিল তাহার নিজের অহংকারে। বিভিন্ন ঘটনা ও পরিবেশকে আশ্রয় করিয়া একদিন প্রত্যেকেরই জীবনে এক একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিল; এই দ্বন্দ্বটুকুই নাটক, এবং যেটিতে এই দ্বন্দ্ব যতটা সুস্পষ্ট রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই নাটকটি ততটুকু সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি হইতে পারিয়াছে। এই হিসাবে এই চারটির ভিতর 'প্রকৃতির প্রতিশোধই' সার্থকতম।"

[—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা

রাজা ও রাণী

জলন্ধরের রাজা বিক্রমদেবের রাণী কাশ্মীরের রাজকন্যা সুমিত্রা। রাণীর কুটুম্বেরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করে, রাজা সেদিকে দৃষ্টি দেন না। রাজা অন্তঃপুরে রাণীর অঞ্চল-ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। রাণী রাজাকে কর্তব্য-বোধে সজাগ করতে না পেরে কাশ্মীর চলে গেলেন, এবং ভাই যুবরাজ কুমারসেনকে নিয়ে অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য সসৈন্যে জলন্ধর যাত্রা করলেন।

এদিকে বিক্রমদেব আত্মস্থ হয়ে অত্যাচারীদের দমন করলেন। যুধাজিৎ ও জয়সেন পালিয়ে গেল কিন্তু পথে তু'জনেই বন্দী হলো কুমারসেনের হাতে। কুমারসেন বন্দী তু'জনকে বিক্রমদেবের হাতে সমর্পণ করলেন। বন্দীরা রাজাকে কুমারসেনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলো। বিক্রমদেব কুমারসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। বিক্রমদেব কাশ্মীরে এলেন। সুমিত্রার কাকা রাজা চন্দ্রসেন তাঁকে সমাদর করলেন। কুমারসেন ও সুমিত্রা পলায়ন করলো।

কুমারসেন গেল ত্রিচূড়ে। সেখানে রাজকন্যা ইলার সঙ্গে তার বিয়ের স্থির হয়েছিল। কিন্তু ত্রিচূড়-রাজা কুমারসেনকে তাড়িয়ে দিলেন। ভাই-বোনে বনে চলে গেল।

বিক্রমদেবের সৈন্যেরা কাশ্মীর রাজ্যে অত্যাচার সুরু করলো। কুমার-সেন ও সুমিত্রাকে ধরে দেবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। অনাচার নিবারণের জন্য ভাইবোন আত্মসমর্পণ করাই স্থির করলো।

এদিকে বিক্রমদেবের মন বদলে গেছে, তিনি স্থির করেছেন ত্রিচূড়-রাজকন্যা

ইলার সঙ্গে কুমারসেনের বিয়ে দিয়ে, তাকে কাশ্মীরের সিংহাসনে বসিয়ে রাণীকে নিয়ে ফিরে যাবেন। কুমারসেনের শিবিকা এসে দাঁড়ালো সভার সামনে। দ্বার খুলে বেরুলেন সুমিত্রা, হাতে সোনার থালায় কুমারসেনের ছিন্ন মুণ্ড। সেই থালা সামনে রেখে সুমিত্রা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো—প্রাণ ত্যাগ করলো। ইলা মূর্চ্ছা গেল, বিক্রমদেব বসে পড়লেন, চন্দ্রসেন সিংহাসনে পদাঘাত করে মুকুট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

পাত্রপাত্রী : জলন্ধরের রাজা বিক্রমদেব। রাণী সুমিত্রা। বিক্রমদেবের বাল্যসখা দেবদত্ত। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ত্রিবেদী। নায়ক জয়সেন ও যুধাজিৎ। কাশ্মীরের রাজা চন্দ্রসেন। যুবরাজ কুমারসেন। কুমারসেনের ভৃত্য শংকর। ত্রিচুড়ের অমরুরাজ। দেবদত্তের স্ত্রী নারায়ণী। চন্দ্রসেনের রাণী রেবতী। অমরু রাজের কন্যা ইলা, প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"প্রেম যদি নিজের সংকীর্ণ ভোগের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মঙ্গলকর্মের বৃহৎ ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া না যায়, তবে তাহা বিফল ও পঙ্গু হইয়া ক্লেশেরই কারণ হয়; এবং অবশেষে নিদারুণ দুঃখের কঠোর আঘাতে সেই সর্বগ্রাসী ভীষণ ভোগপ্রধান একদেশদর্শী প্রেমের নাগপাশ ছিন্ন হইয়া যায়।

রাজা হইতেছেন অন্ধ আবেগ, আর রাণী হইতেছেন নিঃস্বার্থ ত্যাগ অন্ধ আবেগ প্রথমে প্রেম-রূপে ও পরে প্রতিহিংসারূপে রাজাকে পাইয়া বসিয়াছিল। রাণী রাজাকে প্রেমের অন্ধতা হইতে বাঁচাইলেন নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া, এবং প্রতিহিংসার অন্ধতা হইতে বাঁচাইলেন নিজের প্রিয় ভাইকে ত্যাগ করিয়া—রাণী দুইবারই নিজেকে কঠিন কঠোর আঘাত করিয়া রাজাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিলেন।" [—রবিরশ্মি

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"...'রাজা ও রাণীতে' কবির বক্তব্য এই যে, প্রেম যখন নিজের ভোগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তখন তাহা বৈশিষ্ট্যহীন, সংকীর্ণ ও আত্মঘাতী। এই আত্মকেন্দ্রিক ভোগপ্রধান প্রেম মানুষকে সমস্ত অকল্যাণ ও পাপের মধ্যে ঠেলিয়া লইয়া যায়। এই অন্ধ প্রেমের পাশ ছিন্ন না হইলে মানুষ বৃহৎ আদর্শ ও প্রকৃত কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে না।" [—রবীন্দ্রকাব্য-পরিক্রমা

নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন—

"সমগ্র নাটকটিতে প্রায় সবগুলি চরিত্রই সুপরিস্ফুট, বিশেষ করিয়া বিক্রম

ও সুমিত্রার, ইলা ও কুমারসেনের, এবং বৃদ্ধ ভৃত্য শংকরের।...কিন্তু ইলা ও সুমিত্রার পরিচয় যতটা নিবিড় করিয়া আমরা পাই, এমন আর কাহারও নয়। এ কথা খুব সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের নাট্যে ও কাব্যে, গল্প ও উপন্যাসে নারী-চরিত্র, নারী-জীবনের রহস্য যেমন করিয়া ফুটিয়াছে,' পুরুষ-চরিত্র তেমন করিয়া ফুটিবার অবসর পায় নাই।..." [—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা

তপতী

'রাজা ও রাণীর' নতুন রূপ।

কবি লিখেছেন—"কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে, এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য পরিণাম নয়। অনেকদিন ধরে 'রাজা ও রাণীর' ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে।...এ-নাটক আগাগোড়া নূতন করে না লিখলে এর সদ্‌গতি হতে পারে না।"

পাত্রপাত্রী থেকে ইলা ও রেবতী, জয়সেন ও যুধাজিৎ বাদ গেছে এবং দু-একটি নতুন চরিত্র যোগ হয়েছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"তপতী নাটকখানি একরকম স্বতন্ত্র নূতন নাটক হইয়া গিয়াছে। ইহাতে পুরাতন 'রাজা ও রাণী' নাটকের অনেক চরিত্র বাদ পড়িয়াছে বা বদল হইয়াছে, আবার অনেকগুলি নূতন চরিত্র ইহাতে প্রবেশলাভ করিয়াছে, ইহার গানগুলিও নূতন এবং নাটকের অবসানও নূতন ধরণের গভীর বিয়োগান্তিক।...'রাজা ও রাণী' ছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, আর 'তপতী' গদ্যে রচিত।" [—রবিরশ্মি

নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন—

"...'তপতী' 'রাজা ও রাণী' অপেক্ষা দৃঢ় ও সংহত; 'রাজা ও রাণীতে' যে-তত্ত্বটা ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন বিক্রম ও সুমিত্রার প্রেমের গতি, প্রকৃতি ও পরিণতির মধ্য দিয়া, তাহা 'তপতী'তে সুস্পষ্ট রূপ লইয়াছে, এবং কুমার ও ইলার অপ্রাসঙ্গিক গল্পটা খসিয়া পড়াতে বিক্রম-সুমিত্রার আখ্যানটি স্পষ্টতর হইয়াছে, নাটকটিও সংহত হইয়াছে।...'রাজা ও রাণীর' রাণী সুমিত্রা

মানবী ছিলেন…কিন্তু 'তপতীর' রাণী ত্যাগের কঠোর তপস্যায় মানবীর দোষগুণ হইতে মুক্ত হইয়া প্রায় যেন দেবীর পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছেন…"

[—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা

বিসর্জন

'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশ বিসর্জনের বিষয়বস্তু; জয়সিংহের মৃত্যুতে নাটক শেষ হয়েছে।

পাত্রপাত্রী: ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য। রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়। বালক ধ্রুব। পুরোহিত রঘুপতি। রঘুপতির পালিত যুবক জয়সিংহ। দেওয়ান চাঁদপাল। সেনাপতি নয়ন রায়। রাণী গুণবতী। ভিখারিণী বালিকা অর্পণা। নাগরিকগণ, প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"এই নাটকের মূল দ্বন্দ্বটি হইতেছে—ধর্মের অর্থহীন, অন্ধ সংস্কার ও চিরাচরিত যুক্তিহীন প্রথার সঙ্গে নিত্যসত্য মানবধর্ম হৃদয় ধর্মের; মিথ্যা ধর্মবোধের সঙ্গে উদার মনুষ্যত্বের; মানুষের রচিত আচার-বিধির সঙ্গে হৃদয়ের পরম সত্য প্রেমের; হিংসার সঙ্গে অহিংসার। রঘুপতির মধ্যে এই মিথ্যা ধর্মবোধ ও অন্ধসংস্কার তাহার প্রচণ্ড শক্তি লইয়া রূপায়িত…অন্যপক্ষে রাজা গোবিন্দমাণিক্য উদার সত্য-ধর্ম, চিরন্তন হৃদয়ধর্ম বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অচল, অটল পর্বতের মতো দণ্ডায়মান…এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যপথে আছে জয়সিংহ।…সে হৃদয়বান, কবি, দার্শনিক, প্রেমিক।…প্রেমের স্পর্শে যখন সে জীবনের আনন্দময় স্বরূপের সন্ধান পাইল, তখন পূর্বের সংস্কার মিথ্যা বলিয়া মনে হইল, কিন্তু লৌকিক বুদ্ধির দ্বারা সে চালিত নয়, তাই সে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুবিধামত আপোষ করিতে পারিল না, পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে সংকোচ বোধ করিল এবং শেষে মৃত্যুতেই মুক্তিকামনা করিল।…

আনুষ্ঠানিক ধর্মসংস্কারের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও সেই ধর্মকে রক্ষা করিবার দায়িত্ববোধ ও তাহার প্রতিনিধিত্বের গর্বই রঘুপতি-চরিত্রের মূল ভিত্তি।… রঘুপতি এক বিরাট শক্তির মূর্তিমান প্রকাশ।…প্রবল রাজশক্তির সহিত সে নানা ছলে ও বুদ্ধির কৌশলে অবিরাম যুদ্ধ করিয়াছে। ন্যায়-অন্যায়-বিচারহীন, বিবেকবর্জিত, দাম্ভিক আত্ম-প্রতিষ্ঠার অভিযান চলিয়াছে অক্লান্তভাবে।…

…রঘুপতির পশু-অংশ বাহিরে রাজশক্তির সহিত সংগ্রাম করিতেছিল, কিন্তু সে চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল নিজেরই দেব-অংশের হাতে—বৃহত্তর অংশের হাতে। নিদারুণ বেদনার মধ্য দিয়া সে স্নেহ-প্রেমের প্রকৃত মর্যাদা বুঝিল, তাহার নবজন্ম হইল।…শিষ্য জয়সিংহ মরিয়া গুরু রঘুপতির অন্তরাত্মাকে বাঁচাইল।…

…রাজা গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রও একেবারে দ্বন্দ্বহীন এবং একমুখী গতিবিশিষ্ট।…সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঊর্ধ্বে যে আদর্শ চরিত্র, কবি তাহাই রূপায়িত করিয়াছেন গোবিন্দমাণিক্যে। তিনি কেবল রাজা নহেন রাজর্ষি।…

…নাটকের মধ্যে অপর্ণার স্থান নগণ্য, কিন্তু তাহার প্রভাব নাটকের সর্বত্র। সে জয়সিংহকে বিগলিত করিয়াছে, রাজাকে স্বপ্ন হইতে জাগরিত করিয়াছে…রঘুপতিকে সে পরোক্ষভাবে দূর হইতে আকর্ষণ করিয়া শেষে তাহার উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। নাটক পরোক্ষভাবে তাহারই জয় ঘোষণা করিতেছে।" —রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা

নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন—

"…কি জয়সিংহ, কি রঘুপতি, কি গোবিন্দমাণিক্য, কি অপর্ণা, ইহাদের মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম তাহা মনের মধ্যেই শুধু লীলায়িত হয় নাই, বাহিরের কথায় গতি ভঙ্গিমার মধ্যেও তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। চিত্তের ও কর্মের দ্বন্দ্বগতির এমন অপূর্ব সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের আর কোন নাটকেই এতটা সম্ভব হয় নাই …

ভাববিকাশের দিক হইতেও 'বিসর্জন' প্রতিমুহূর্তে লীলাচঞ্চলিত। প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্রেই একটী সংশয়ের চঞ্চলতা, একটী সংগ্রামের ক্ষুব্ধতা যেন দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে। এই সংশয় ও সংগ্রাম সকলের চেয়ে প্রবল জয়সিংহের চরিত্রে।…

…রঘুপতি চরিত্রের শেষ পরিণতি যে একটু অকস্মাৎ ঘটিয়াছে, এবং তাহার পূর্বাপর দৃপ্ত অনম্য চরিত্রের সঙ্গতিকে যেন একটু ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।…

গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র এত শান্ত ও স্তব্ধ, এত স্থির ও অচঞ্চল লীলার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে সে সহসা তাহা আমাদের অনুভূতিকে স্পন্দিত করে না—জয়সিংহ, রঘুপতি ও অর্পণা আমাদের সমস্ত বোধ ও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া রাখে।…

অপর্ণা বিচলিত করে, নিজে বিচলিত হয় না, হইলেও পরক্ষণেই নিজের

সংবিৎ নিজেই ফিরিয়া পায়।…একটি অবিকৃত সহজ সরল সত্যের যে রহস্যমূর্তি বালিকার রূপ ধরিয়া স্নেহের ও প্রেমের শান্ত স্নিগ্ধ রাজ্যের মধ্যে জয়সিংহকে, সকল সংশয়াকুল মানুষকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া আনিতে চাহিতেছে। অপর্ণা একটি আইডিয়ার রসমূর্তি, কোনও জীবনের বিকাশ নয়, রক্তমাংসের একটি মানবকন্যার রূপ তাহার মধ্যে কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই।…

…'বিসর্জনের' মধ্যে একটী আইডিয়া খুব নিবিড় হইয়া আছে, সমস্ত নাটকটিও সেই আইডিয়াটিরই সংগ্রাম।…

…অর্পণা একটি গানের সুর; তাহার সমস্ত চরিত্রের মধ্যে যে জিনিষটি ফুটিয়াছে তাহা একান্তই গীতধর্মী।… আসল কথা হইতেছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই মূলত গীতধর্মী—গানের প্রতিভা, কবিতার প্রতিভা, সুরের প্রতিভা।… নাটক তিনি অনেক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু একথা বলিতেই হয়, তাঁহার প্রতিভা নাটকের প্রতিভা নয়; নাটকের মধ্যে নাট্যীয় ধর্ম তত নাই, যত আছে গীতধর্ম, সুরধর্ম।" [—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"বিসর্জন রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটক।…রঘুপতির মধ্যে সংস্কারের অপরিসীম তেজ, গোবিন্দমাণিক্যে নবজাগ্রত অনুভূতি আজন্মার্জিত সংস্কারের মতই বেগবান্‌। এই দুই বিরাট মানবের সংঘর্ষ এই ট্রাজেডির প্রধান উপাদান।… মানবিক দ্বন্দ্বের কঠিন নিপীড়ন দেখিতে পাই জয়সিংহে।…জয়সিংহ অপেক্ষাকৃত দুর্বলচিত্ত লোক। তাহার প্রাণ দিবার শক্তি আছে, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বকে মুদ্রিত করিবার মত বুদ্ধি বা তেজ নাই।…অপরূপ সৃষ্টি অপর্ণা।…"

[—রবীন্দ্রনাথ

মালিনী

কাশীরাজের কন্যা মালিনী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলো। ব্রাহ্মণেরা তার নির্বাসন ব্যবস্থা করলেন। পরে তার শান্ত সমাহিত ভাব দেখে ও কথাবার্তা শুনে ব্রাহ্মণ-সভা প্রভাবিত হলো। কিন্তু ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ক্ষেমংকর স্থির করলো বিদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে সে কাশী থেকে বৌদ্ধধর্ম উৎখাত করবে। বন্ধু সুপ্রিয়কে রেখে সে বিদেশে যাত্রা করলো।

সুপ্রিয় মালিনীর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করে তার অনুরক্ত হয়ে পড়লো।

ক্ষেমংকর কাশী আক্রমণ করতে আসছে, সেই সংবাদ পেয়ে সে রাজাকে জানালো। রাজা মৃগয়া করতে গিয়ে অতর্কিতে ক্ষেমংকরকে বন্দী করে আনলেন। বিচারে ক্ষেমংকরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হলো। সভার মাঝে ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে হত্যা করলো। 'ক্ষেমংকরকে ক্ষমা কর'—বলে মালিনী মূর্ছিতা হয়ে পড়লো।

পাত্রপাত্রী : কাশীর রাজা। রাজমহিষী। রাজকন্যা মালিনী। গুরু কাশ্যপ। ক্ষেমংকর, সুপ্রিয়, চারুদত্ত, সোমাচার্য ও উগ্রসেন। যুবরাজ, সেনাপতি, মালিনীর পরিচারিকা, প্রতিহারী, প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"ক্ষেমংকর ও রঘুপতির চরিত্র নানা কারণে তুলনীয়। দু'জনেই চারিত্র্য-প্রধান; দু'জনেরই ধর্মমত সংকীর্ণ; দু'জনেই ধর্মের জন্য রাজদ্রোহী; নিজের ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য দু'জনেই বিদেশে সৈন্য সংগ্রহে গিয়াছে। [রাজর্ষির রঘুপতি, বিসর্জনের নহে]; এবং তাহাদের চারিত্র্যবেগের স্রোতে বিতাড়িত হইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্বলপ্রকৃতি, বিশ্বাসপ্রবণ সুপ্রিয় ও জয়সিংহ প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। রঘুপতির চরিত্র প্রশস্ততর, ক্ষেমংকরের সংকীর্ণ; কিন্তু সংকীর্ণতার চাপেই সংহত হইয়া, ঘনীভূত হইয়া, স্ফটিকের দীপ্তি ও সংহতি লাভ করিয়া ক্ষেমংকর-চরিত্র রঘুপতি-চরিত্রের চেয়ে অধিকতর সজীব ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

মালিনী-চরিত্র আলোচনার সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, তাহার ধর্মের প্রেরণা সাধনাজাত নহে, তাহা আবির্ভাবজাত, তাহা মূলহীন অর্থে অমূলক। যতক্ষণ তাহার চিত্তে এই আবির্ভাবের দীপ্তি উজ্জ্বল ছিল ততক্ষণ সে অসাধারণ, আবির্ভাবের দীপ্তি ম্লান হইতেই সে সাধারণ রাজকন্যা মাত্র। প্রথম তিন দৃশ্যে সে অসাধারণ, চতুর্থ বা শেষ দৃশ্যে সে আর পূর্বের ধর্মরাগোজ্জ্বল দেবী নয়, পূর্বরাগোজ্জ্বল প্রণয়িণী মাত্র।" [—রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"ক্ষেমংকর দীপ্ত, গর্বিত, কঠোর, সংস্কারগত ধর্মকেই সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে; সে রঘুপতির ন্যায় কঠিন। রবীন্দ্রনাথ ক্ষেমংকরকে কোথাও ভীরু বা দুর্বলভাবে বর্ণনা করেন নাই; আচার ধর্মকে তিনি বিশ্বাস করেন না, তাঁহার সহানুভূতি সুপ্রিয়ের সহিত, তাহার সংস্কারহীন ন্যায়ধর্মকে তিনি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেন।

কিন্তু সে পক্ষপাতিত্ব লেখার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই, ক্ষেমংকরকে তিনি মহৎ করিয়াছেন।" [—রবীন্দ্রজীবনী

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"তাঁহার (রাজার) কাছে ধর্ম রাজনীতির অনুকূল হওয়া চাই, ধর্ম ধর্মের জন্য নয়, রাজনীতির জন্য। কিন্তু ধর্মের উপরে, রাজনীতির উপরে তাঁহার পিতৃস্নেহ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে দেখা যায়। কন্যাকে হারাইয়া তিনি রাজ্যকে ধিক্কার দিয়াছেন, রাজনীতিকে ধিক্কার দিয়াছেন। মানবী মালিনীই তাঁহার উপর বেশি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, দেবী মালিনী নয়—পিতৃধর্ম নবধর্মের উপর জয়লাভ করিয়াছে।

রাণীর মধ্যেও দেখি মাতৃধর্মই তাঁহার উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, মানবী মালিনীই তাঁহার চোখে বড়। নারীর ধর্ম যে সংসারধর্ম—তাহার উপরেই তিনি বেশি জোর দিয়াছেন।...

সুপ্রিয়ের চরিত্র সর্বাপেক্ষা জটিল। আনুষ্ঠানিক প্রাচীন ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের শিথিলতা, ধর্মকে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়া, তাহাকে জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সংসারকে স্নেহ-প্রেম-ভক্তির বন্ধনে বাঁধিবার একটা আনন্দময় প্রেরণা ও মালিনীর মধ্যে সেই প্রাণময় প্রেমধর্মের জীবন্ত মূর্তি দেখিয়া তাহার প্রতি প্রবল আকর্ষণ, গভীর বন্ধুপ্রীতি ও নির্ভরশীলতা এবং মানবী মালিনীর প্রতি সৌন্দর্য ও প্রেমের অতি নিগূঢ় আসক্তি—ইহাদের সম্মিলিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বই তাহার চরিত্রের মধ্যে রূপায়িত।...যাহা তাহার হৃদয়কে নাড়া না দিতে পারে, তাহার বিশেষ কোন আবেদন তাহার কাছে নাই। আবেগের চরম মুহূর্তে অনুভূতির মধ্যে যাহা ধরা দেয়, তাহাকেই সে একান্ত সত্য বলিয়া মনে করে।...

কিন্তু যে ধাতুতে ক্ষেমংকর গড়া, তাহা একেবারে অবিমিশ্র,—তাহার মধ্যে অসত্য নাই, মালিন্য নাই, ফাঁকি নাই। প্রয়োজনের অনুরোধে সে কখনো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। জীবন ও কর্ম তাহাতে একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। উভয়েই সমান অচলপ্রতিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ। আসন্ন মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াও সে স্থির, নিষ্কম্প দীপশিখার মতো তাহার অন্তরের আলোককে জ্বালাইয়া রাখিয়াছে।" [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"...দুটি নাটকই ট্র্যাজেডি কিন্তু তাহা সত্ত্বেও 'মালিনীর' ট্র্যাজেডি এত

ঘনীভূত এবং এত প্রবল এবং এত স্বল্পকাল বিস্তৃত যে 'বিসর্জনের' ট্র্যাজেডি সেই তুলনায় অনেকটা তরল ও নিষ্প্রভ। পাঠকের অথবা দর্শকের মনের পুঞ্জীয়মান বেদনা মাঝে মাঝে লাঘব করিবার চেষ্টা 'বিসর্জনে' আছে। 'মালিনী'তে তাহা অনুপস্থিত এবং সেই হেতু 'মালিনীর' ট্র্যাজেডি অনেক ঘন ও নিবিড়।....'বিসর্জন' অপেক্ষা 'মালিনী' 'শিল্পসৃষ্টি হিসাবে সার্থকতর, নাটকীয় গুণের দিক হইতেও তাহাই।...

...একটা আইডিয়া একটা প্রত্যয় 'বিসর্জন' ও 'মালিনী' এই দুইটি নাটকেই বিভিন্ন ভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে;...দুটি নাটকেই এই সত্যটি ব্যক্ত হইয়াছে একটি তরুণী নারীচিত্তকে আশ্রয় করিয়া, 'বিসর্জনে' নিকটতর করিয়াছে অপর্ণা, মালিনীতে মালিনী।..." [—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা

চিত্রাঙ্গদা

মহাভারতের কাহিনী। মণিপুরের রাজকন্যা পিতার একমাত্র সন্তান। সে পুরুষের মত কাজকর্ম করে। মৃগয়া করতে গিয়ে বনমধ্যে অর্জুনের সঙ্গে দেখা, ভাবান্তর ও বিবাহ প্রস্তাব। অর্জুনের প্রত্যাখ্যান। চিত্রাঙ্গদার তপস্যা ও মদনের বরে রূপলাবণ্য লাভ। সে-ই রূপে উদ্‌ভ্রান্ত অর্জুনের আত্মসমর্পণ। বর্ষশেষে চিত্রাঙ্গদার আত্মপরিচয় দান—

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

পাত্রপাত্রী: মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন। মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। প্রেমের দেবতা মদন। গ্রামবাসীর দল ও চিত্রাঙ্গদার সখীগণ।

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"চিত্রাঙ্গদার দুইটি সত্তা; বাহিরে সে রূপময়ী অন্তরে সে প্রেমময়ী: বাহিরের রূপ দেবদত্ত অন্তরের প্রেম স্বাভাবিক।...

একদিক দিয়া দেখিতে গেলে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যকে প্রেমের বিকাশের কাব্য বলা যাইতে পারে—প্রণয়িনী হইতে গৃহিনীর বিকাশ; পত্নীরূপ হইতে মাতৃ-রূপের বিকাশ; এই হিসাবেও ইহা শকুন্তলা কাব্যের সগোত্র।..."

ইহাতে নাটকীয় লক্ষণ বা গুণ বিশেষ নাই; পাত্রপাত্রীর মুখে দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া হইলেও সেগুলি কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়।..."

[—রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"...রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সৃষ্টি।...

...আখ্যান বস্তুর মধ্যে ভাবকে রসরূপদানে, কল্পনার সমুন্নতি ও সৌন্দর্যে, আবেগের মনোহর প্রকাশে, বাস্তবের উর্ধ্বে একটা স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করায় কাব্য হিসাবে 'চিত্রাঙ্গদা' অনবদ্য।" [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

বিদায় অভিশাপ

পৌরাণিক উপাখ্যান। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের | সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখতে এলেন দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ। সহস্র বছর ধরে নৃত্যগীত-বিদ্যায় দেবযানীর মনোরঞ্জন করে কচ বিদ্যালাভ করলেন। দেবযানী তাঁকে ফিরে যেতে নিষেধ করলেন, কিন্তু কচ প্রেমের আকর্ষণকে জয় করলেন, তাঁর কাছে কর্তব্য বড়।

পাত্রপাত্রী: কচ ও দেবযানী।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"দেবযানীকে কবি বাস্তব নারীরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, চিত্রাঙ্গদার মতো ইহাকে ভাবের বাহন করেন নাই।...কচকে কবি মহান পুরুষ করিয়াছেন। কচের জীবনেও একটা বিরাট ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হইয়াছে।...জীবনের সুখ তাহারো গিয়াছে, তবে তাহা সহ্য করিবার মত পুরুষোচিত শক্তি তাহার আছে। দেবযানীর প্রতি তাহার গভীর প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে তাহার আশীর্বাদে—তাহার বরদানে। দেবযানীর নিদারুণ অবস্থা সে বুঝিতে পারিয়াছে, স্মৃতির সহস্রদংশনে তাহার জীবন যে জর্জরিত হইবে তাহা অনুভব করিয়াই সে বিস্মৃতির জন্য বর দিয়াছে—জীবনের ভিন্নপথে নব-প্রেমের

বিপুল গৌরব সম্ভাবনার জন্ত আশীর্বাদ করিয়াছে। সে সম্ভাবনা হয়তো কচের জীবনে না-ও থাকিতে পারে, তাই তাহার বেদনা চিরস্থায়ী ও গভীরতর বলিয়া অনুমেয়।"
[—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"কর্তব্যনিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে মর্মকথা সহজ নয়, মর্মপথ অনুসরণ করা আরো কঠিন। 'বিদায় অভিশাপের' ইহাই ট্র্যাজেডি। দেবযানী স্বাধীন, কচ কর্তব্য-পাশে আবদ্ধ। দেবযানী প্রণয়ৈকসত্তা, কচ প্রেম ও কর্তব্যের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত। এ দুয়ের মধ্যে যদি কোনোটাকে ত্যাগ করিতে হয়, তবে পৌরুষগর্বী পুরুষকে প্রণয়িনীকেই ত্যাগ করিতে হয়।…পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা আছে, কিন্তু ভালোবাসা থাকা সত্বেও তাহারা পরস্পরকে বুঝিতে পারিতেছে না—ইহাই কাব্যের মৌলিক বেদনা; ইহা বোধ করি ব্যর্থ প্রেমের চেয়েও মর্মান্তিক।"
[—রবীন্দ্র নাট্য-প্রবাহ

গান্ধারীর আবেদন

কপট পাশা খেলায় পাণ্ডবেরা হারলেন, দ্রৌপদী সভামধ্যে লাঞ্ছিত হলেন, পাণ্ডবেরা বনে যাবার উদ্যোগ করলেন। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করলেন দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে, কারণ দুর্যোধন ন্যায়ধর্ম, বীরধর্ম পরিত্যাগ করে যে পাপের পথে চলেছে তাতে তার ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর কথা শুনলেন না, বললেন—

"এখন তো আর
বিচারের কাল নাই,—নাই প্রতিকার,
নাই পথ—ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে।"

পাত্রপাত্রী: ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, দুর্যোধন ও তাঁর পত্নী ভানুমতী।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"প্রথম, প্রবল, অন্ধ পুত্রস্নেহ, দ্বিতীয়, নিত্যধর্মের বৈশিষ্ট্য ও অলঙ্ঘনীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান ও মানসিক স্বীকৃতি, তৃতীয়, ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা ও আত্মকর্তৃত্বের অভাব। এই তিনটি অবস্থার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তাঁহার চরিত্রে একটা জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই জটিলতাই ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রকে একটা বিশেষ নাটকীয় গৌরব দান করিয়াছে।…গান্ধারীর চরিত্র ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক সরল,

একটা প্রবল দ্বন্দ্ব কোনো সময়ই তাঁহার চরিত্রে ফুটিয়া ওঠে নাই। মাতৃস্নেহ ও ধর্মবোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব তাঁহার অন্তরে আছে বটে কিন্তু মাতৃস্নেহ ধর্মচেতনার কাছে পরাজিত…দুর্যোধন ন্যায়ভ্রষ্ট রাজা।…দুর্যোধনের পত্নী ভানুমতি দুর্যোধনের যোগ্যা পত্নী।" [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

কর্ণকুন্তী সংবাদ

মহাভারতের কাহিনী। তবে মূল কাহিনীতে কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের কাছে আগেই শুনেছিলেন যে তিনি পাণ্ডবদের ভাই। কিন্তু এখানে কর্ণ সে কথা শুনলেন কুন্তীর মুখ থেকে। কুন্তীর অনুরোধে কর্ণ দলত্যাগ করলেন না, মাতৃস্নেহের আকাঙ্ক্ষা ও সিংহাসন লাভের উপরেও কর্তব্যজ্ঞান স্থান পেল। কর্ণ বললেন—

"যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডব সন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে।"

পাত্রপাত্রী: কর্ণ ও কুন্তী।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"মহাভারতের কর্ণ একটি বিরাট ট্র্যাজিক চরিত্র।…

রবীন্দ্রনাথের কর্ণ চরিত্র নাটকীয়ত্ব ও চরিত্র গৌরবে মূল অপেক্ষা উন্নত।… মূলের ক্রুদ্ধ, কটুভাষী কর্ণকে রবীন্দ্রনাথ মাতৃস্নেহপিপাসু, ধীর, সংযত ও উদার-হৃদয় করিয়াছেন।…

মূলের কুন্তী চরিত্র অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের কুন্তীচরিত্র বহুগুণে সমৃদ্ধ। মূলে কর্ণের প্রতি কুন্তীর স্নেহ অপেক্ষা পঞ্চপাণ্ডবকে রক্ষা করার আগ্রহই বেশী পরিস্ফুট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কুন্তী পরিত্যক্ত সন্তানকে মায়ের কোলে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য বেশি আগ্রহশীলা।" [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"এই কাব্যে কুন্তীই সত্যিকারের ট্র্যাজিক চরিত্র এবং তাহার জীবনের ironyটাও কম নয়। কন্যা বয়স হইতে তাহার সমস্যা—ধর্ম রাখিবে, না পুত্র রাখিবে?…যে লজ্জা সে বিশ্বের কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিয়াছে, নিয়তির পরিহাসে,—ঘটনাচক্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষে আজ তাহা নিজ মুখে তাহারই কাছে প্রকাশ করিতে হইল, বোধ করি যাহার কাছে প্রকাশ করা সব চেয়ে লজ্জাজনক।

…এই নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে যে ইহা শ্রেষ্ঠ শুধু তাহা নয়, রবীন্দ্র-কাব্যেও এমন 'কালের কপোল তলে শুভ্রসমুজ্জল' সৃষ্টি অল্পই আছে, পৃথিবীর সাহিত্যেও অল্প থাকিবার কথা।" [—রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ

নরক বাস

সোমক রাজার শত রাণী, কিন্তু একটিমাত্র পুত্র। একমাত্র পুত্র সদাই উদ্বেগের কারণ, তাই রাজা এক পুত্রকে হত্যা করে তার বসায় দিয়ে শতপুত্র লাভের যজ্ঞ করলেন। মৃত্যুর পর রাজা পরলোকে গিয়ে দেখলেন যজ্ঞের যাজক শিশু-হত্যার পাপে নরকবাস করছেন। রাজাও নরকবাস করলেন, তাতে যাজকের পাপ ক্ষয় হলো, শেষে দু'জনেই মুক্তি পেলেন।

পাত্রপাত্রী: সোমক রাজা। ঋত্বিক। ধর্ম। দেবদূত ও প্রেতগণ।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"সোমকের চরিত্র উচ্চ ন্যায়বোধ, অপরিসীম মহত্ত্ব ও দুঃখের তপস্যায় আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।…

ঋত্বিক অনড় শাস্ত্রধর্মের মূর্তিমান প্রকাশ। শাস্ত্রের বিধি বা অনুষ্ঠানই তাহার জীবনে একমাত্র সত্য…বিচার-বিতর্ক, জিজ্ঞাসা-সন্দেহের কোনো স্থান তাহার মনে নাই—সুকুমার চিত্তবৃত্তির প্রেরণা বা বিবেকের দংশন সে অনুভব করে না। ঋত্বিকের ধর্ম ক্ষুদ্র, খণ্ড, ছদ্ম শাস্ত্রধর্ম, ইহা হৃদয়ধর্ম ন্যায়ধর্ম হইতে বিচ্যুত, ইহা সর্বাঙ্গীন, পরিপূর্ণ ধর্ম নয়।" [— রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"ঋত্বিক চরিত্র রঘুপতির ছাঁচে ঢালা। ইহারা শাস্ত্রাভিমান ও আত্মাভিমানকেই ধর্ম বলিয়া জানে। দেবতার স্থানে ইহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে।"

[—রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের নাটিকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'কর্ণকুন্তী সংবাদ,' 'বিদায় অভিশাপ' 'প্রকৃতির প্রতিশোধ,' 'মালিনী' ও 'চিত্রাঙ্গদা'। 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'সতীর' মধ্যে অলঙ্কারবাহুল্য আছে; কিন্তু কবিপ্রতিভার তেমন বিকাশ নাই।…ব্যক্তিগত ধর্মের সঙ্গে পরিবারের দাবীর দ্বন্দ্ব এই দুইটি নাটিকার মুখ্য বিষয়।…বর্ণনায় কোন বৈশিষ্ট্য নাই; ইহার মধ্যে উত্তাপ আছে, আলো নাই।

'কর্ণকুন্তী সংবাদ' ও 'বিদায় অভিশাপ'—ইহাদের মধ্যে কোন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নাই।…ইহাদের মধ্যে গীতিকাব্যসুলভ গুণ অনেক আছে… গীতিকাব্য স্থিতিশীল, নাটক গতিমান। কচ ও দেবযানীর কাহিনীতে নাটকের এই গতিশীলতা খুব বেশী করিয়াই দৃষ্ট হইবে।…এই কাহিনীতে ঘটনার সমাবেশ না থাকিলেও দেবযানীর হৃদয়ের এই দ্রুত চঞ্চল পরিবর্তনের জন্য ইহা শ্রেষ্ঠ নাটকোচিত গুণের দাবী করিতে পারে।…

'কর্ণকুন্তী সংবাদ' কাব্যে মানসিক পরিবর্তন এত দ্রুত নহে। তাই তাহার মধ্যে নাটকোচিত গুণ অপেক্ষা গীতিকাব্যের লক্ষণ বেশী।..” [—রবীন্দ্রনাথ

বিনায়ক রাওয়ের কন্যা অমাবাইয়ের বিবাহ। বর জীবাজী পথে আক্রান্ত ও বন্দী হলো। আক্রান্তকারী মুসলমান বিজাপুর রাজ্যের সভাসদ, বর সেজে এসে অমাবাইকে হরণ করলো। বিনায়ক রাও ও জীবাজী শপথ করলো—এই অপমানের শোধ নেবে। দীর্ঘকাল পরে এক যুদ্ধে সেই মুসলমান সভাসদ নিহত হলো, জীবাজীও নিহত হলো। অমাবাইয়ের মা রমাবাই জোর করে কন্যাকে বাগ্‌দত্ত স্বামীর চিতায় তুলে দিলেন, মুসলমান সভাসদ তাকে বিয়ে করেছে, এ কথা মা শুনলেন না। অমাবাই জীবন্ত দগ্ধ হলো।

পাত্রপাত্রী : অমাবাই। অমাবাইয়ের পিতা বিনায়ক রাও, মা রমাবাই ও সৈন্যগণ।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে নাটকীয় গুণে সতীই শ্রেষ্ঠ।…

অমাবাই সত্যধর্মের তুলাদণ্ডে তাহার নিজের সমস্ত আচরণ মাপ করিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র দোষ সে দেখে নাই।…অপরিবর্তনীয়, অনমনীয় ন্যায়বুদ্ধি ও নিষ্পাপ বিবেকচেতনা তাহার চরিত্রে আগাগোড়া একটা অসাধারণ দীপ্তি দান করিয়াছে।…

রমাবাই বিচার বিবেকহীন, অবিচলিত সংস্কার ধর্মের প্রতীক। …উহার প্রভাবে হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম, বিচার-বুদ্ধি সব মৃত। সংস্কার প্রথা ও লোকমতই তাহার জীবনে সত্য।

বিনায়কের হৃদয়ে দ্বন্দ্ব আসিয়াছিল সামাজিক প্রথা বা ক্ষুদ্র সমাজধর্ম ও

সন্তান-বাৎসল্যের মধ্যে। এই ধর্ম মিথ্যা বা ছদ্ম-ধর্ম। সন্তান-বাৎসল্য এই ক্ষুদ্র ধর্মকে ধ্বংস করিয়া, বৃহৎ সত্যধর্মের দ্বারে তাহাকে পৌছাইয়া দিল।…"

[—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

লক্ষ্মীর পরীক্ষা :

দানশীলা রাণী কল্যাণী প্রজাদের শ্রদ্ধার পাত্রী। দাসী ক্ষিরো ঈর্ষা করে। সে রাণীর নিন্দা করে, রাণীর অর্থ চুরী করে। ক্ষিরোর ধারণা অর্থ থাকলে সে-ও রাণীর মত দান করতে পারতো। লক্ষ্মী স্বপ্নে ক্ষিরোকে দেখা দিলেন। ক্ষিরো ঐশ্বর্য পেল। কিন্তু দান করতে পারলো না। লক্ষ্মী নিজে ভিক্ষা করতে এসেও ভর্ৎসিত হলেন। স্বপ্ন ভাঙলো, নিজের ভুল বুঝতে পেরে দাসী রাণীর কাছ থেকে ক্ষমা চাইল।

পাত্রপাত্রী : রাণী কল্যাণী। দাসী ক্ষিরো। মালতী। তারিণী। মতি। ক্ষিরোর আত্মীয়া বিকি, কিনি, কাশী। লক্ষ্মীদেবী।

আলোচনা প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরক বাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, কর্ণকুন্তী সংবাদ এই কয়খানি নাট্যকাব্যে কবি এই কথা প্রচার করিয়াছেন যে সামাজিক বা লৌকিক ধর্মের চেয়েও শ্রেষ্ঠ একটি নিত্যধর্ম আছে—তাহা মানবধর্ম, তাহা শাস্ত্রাচারের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নয়, সাম্প্রদায়িকতার মোহে অভিভূত নয়, তাহা ন্যায়ে, যুক্তিতে প্রেমে কল্যাণে সুপ্রতিষ্ঠিত।" [—রবিরশ্মি

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরক বাস, কর্ণকুন্তী সংবাদ ও লক্ষ্মীর পরীক্ষাকে কাব্যনাট্য বলা যাইতে পারে।…কাব্যনাট্য কাহিনী ও নাটকের মিশ্ররীতির রচনা।…

রবীন্দ্রনাথ কখনোই বিশুদ্ধ নাটকীয় কৌশলকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন না। নাটকের মূল রহস্য এই যে, নাট্যকারকে একই সঙ্গে নাটকের পাত্রপাত্রীর মনের গভীরতার মধ্যে তলাইয়া যাইতে হইবে আবার সেই সঙ্গে সমস্ত ঘটনাটিকে অনিবার্য পরিণামের দিকে দুর্নিবার বেগে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। গতির এই দ্বিত্ব, গভীরতামুখী ও পরিণাম মুখী শ্রেষ্ঠ নাটকের লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ একই সময়ে, এই দুই গতিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে পারেন না। তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক প্রবণতা অন্তর্মুখী, পাত্রপাত্রীর মনের গভীরতার

দিকে তাঁহার ঝোঁক বেশী; নাটকীয় পরিণামমুখী সক্রিয় সবলতার প্রতি তাঁহার একটা অবহেলার ভাব আছে।…" [—রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ

গোড়ায় গলদ:

উকিল চন্দ্রকান্তের বৈঠকখানায় বিনোদ, নলিনাক্ষ, নিমাই প্রভৃতি বন্ধুদের আড্ডা জমে। পাশের বাড়ী থেকে গান ভেসে আসে। বিনোদ ঠিক করে ওই গায়িকাকে সে বিয়ে করবে। চন্দ্রকান্ত, নিমাই ও বিনোদ পাশের বাড়ী গেল বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। কন্যাকর্তা নিবারণ বাবু রাজী হলেন। কমলের সঙ্গে বিনোদের বিবাহের স্থির হলো।

কমল নিবারণবাবুর বন্ধুকন্যা। বন্ধু আদিত্যের মৃত্যুর পর নিবারণ বাবুই তার অভিভাবক। এদিকে নিবারণবাবুর কন্যা ইন্দু নিমাইকে দেখে মুগ্ধ হলো। সে চন্দ্রবাবুর স্ত্রী ক্ষান্তমণির কাছে গেল নিমাইয়ের পরিচয় জানতে। ইন্দুর বর্ণনা শুনে ক্ষান্তমণি বুঝলেন, ইন্দু যার কথা বলছে সে ললিত চাটুজ্যে। ইন্দু স্থির করলো সে ললিত ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

সে-বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার সময় নিমাইয়ের সঙ্গে ইন্দুর দেখা হলো। ইন্দু মিথ্যা পরিচয় দিল—সে বাগবাজারের চৌধুরী বাড়ীর মেয়ে কাদম্বিনী। নিমাই বাগবাজারে কাদম্বিনীর খোঁজ করে আর কবিতা লেখে।

বিনোদের বিয়ে হলো। সে নতুন উকিল, রোজগার নেই। স্ত্রী বাপের বাড়ীতেই রইল। কমলের বাবা টাকা রেখে গিয়েছিলেন। কমল জমিদার-পত্নী সেজে বসলো এবং বিনোদকে এস্টেটের উকিল নিযুক্ত করলো।

এদিকে ইন্দুর জন্য কমল বিনোদকে পাঠালো ললিতের কাছে। বিনোদের প্রস্তাব ললিত হেসেই উড়িয়ে দিল। এদিকে ইন্দুর বিবাহের প্রস্তাব এলো নিমাইয়ের বাবার কাছ থেকে। অনেক চেষ্টায় ইন্দুকে হাজির করা হলো নিমাইয়ের সামনে। দু'জনেরই ভুল ভাঙলো।

এবার কমল বিনোদের কাছে আত্মপরিচয় দিল। গোড়ায় গলদ থাকলেও শেষ রক্ষা হলো।

পাত্রপাত্রী: চন্দ্রকান্ত। বিনোদ, নলিনাক্ষ ও নিমাই। নিবারণবাবু। নিমাইয়ের পিতা শিবচরণ। ললিত চাটুজ্জে। চন্দ্রকান্তের স্ত্রী ক্ষান্তমণি। নিবারণবাবুর কন্যা ইন্দুমতী। কমল। প্রভৃতি।

শেষরক্ষা ঃ

'গোড়ায় গলদের' সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত রূপ।

পাত্রপাত্রী ঃ গোড়ায় গলদেরই অনুরূপ।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"বন্ধুদলের চরিত্র চিত্রণে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। চন্দ্র-বিনোদ-নিমাই-নলিনাক্ষ প্রায় এক ছাঁচে ঢালা।...

স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে ইন্দু বুদ্ধিদীপ্ত, কৌতুকপ্রিয় ও লীলাচঞ্চল।...

ক্ষান্তমণি সেকেলে গৃহিনীর টাইপ।..

সমগ্র নাটকের মধ্যে একটিমাত্র ক্ষুদ্র চরিত্র সত্যকার বাস্তবরসের মাধুর্যে ও শিল্পগত উৎকর্ষে আমাদিগকে মুগ্ধ করে।...এটি শিবচরণ ডাক্তারের চরিত্র।"

[—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"গোড়ায় গলদ রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যনাটক, প্রথম প্রহসন রচনা... 'বশীকরণের' মতন 'গোড়ায় গলদের' ঘটনাবস্তু এবং ঘটনাগত কৌতুকের মূল ভ্রান্তিবিলাস; ইহাও বাংলা দেশের একান্ত পারিবারিক ঘরোয়া আবেষ্টনীর মধ্যে কৌতুক ও করুণায় মিশ্রিত একটি মধুর comedy of errors...কমেডির ত বাংলা প্রতিশব্দ নাই, বাধ্য হইয়াই প্রহসন বলিতেছি, 'গোড়ায় গলদ' যথার্থ কমেডি, ঠিক প্রহসন নয়, এবং কমেডি-নায়িকাদের যাহা হওয়া উচিত, ইন্দুমতী ও কমলমুখী ঠিক তাহাই—বুদ্ধিতে দীপ্ত, বাক্যে তীক্ষ্ণ, হাস্যে মধুর ও উজ্জ্বল, সাহসে ও চাতুর্যে দক্ষ। অমন যে নলিনাক্ষ সেও স্পষ্ট এবং জীবন্ত; অন্যান্য প্রধান চরিত্রগুলিও সমান অকুণ্ঠ, সজীব, উদার। 'গোড়ায় গলদ' সত্যই কমেডি-হীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমেডি।"

[—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"গোড়ায় গলদ নাটকের প্রধান নায়ক-নায়িকার চরিত্রে কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নাই। শুধু একটিমাত্র চরিত্রের সৃষ্টিতে অপরূপ মাধুর্য আছে; তিনি নাটকের মধ্যে গৌণ, নিমাইর পিতা শিবচন্দ্র বাবু...তাঁহার চরিত্র-চিত্রণ খুবই নিখুঁৎ হইয়াছে, কিন্তু নাটকে তাঁহার স্থান কতটুকু?" [—রবীন্দ্রনাথ

বৈকুণ্ঠের খাতা

বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশ দুই ভাই। বৈকুণ্ঠ সংগীত-শাস্ত্র গবেষণা করে, খাতায় লেখে আর লোককে শোনায়। অবিনাশ বড় চাকরি করে। বৈকুণ্ঠ বিপত্নীক, বিধবা কন্যা নিরুপমা পিতার কাছেই থাকে। অবিনাশ অবিবাহিত।

কেদার জুয়াচোর। তার সহায়ক তিনকড়ি। কেদার ঠিক করলো অবিনাশের সঙ্গে তার শ্যালীর বিয়ে দেবে। বৈকুণ্ঠকে হাত করবার জন্য সে তার খাতা শোনার একজন আগ্রহশীল শ্রোতা হলো। তারপর শ্যালী মনোরমার সঙ্গে অবিনাশের বিয়ে দিল।

কেদার এবার বৈকুণ্ঠের বাড়ীখানি দখল করতে চাইল। সব আত্মীয়-স্বজন নিয়ে এলো এবং বৈকুণ্ঠকে তাড়াবার চেষ্টা করলো। কেদারের পিসি এসে নিরুপমার উপর অত্যাচার সুরু করলো। শেষে অবিনাশ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সবাইকে দূর করে দিল।

পাত্রপাত্রী: বৈকুণ্ঠ। অবিনাশ। কেদার। তিনকড়ি। ভৃত্য ঈশান। নিরুপমা। মনোরমা। পিসি। মনোরমার খুড়ো বিপিনবাবু, প্রভৃতি

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"তাঁহার (বৈকুণ্ঠের) নির্মল, সরল, উদার হৃদয়, নিজের লাভ-ক্ষতি চিন্তা না করিয়া সকলকে আপন করিবার অকপট প্রয়াস, এবং অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই প্রকৃত ভদ্রলোকের আদর্শটি বজায় রাখিবার চেষ্টার মধ্যে যে অকৃত্রিম মাধুর্য আছে, তাহা আমাদের হৃদয়কে অনিবার্যরূপে স্পর্শ করে।···

উদরান্ন সংগ্রহের জন্য সে (তিনকড়ি) কেদারের সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিল এবং কেদারের নীচ কাজে সাহায্যও করিয়াছিল, কিন্তু অন্তর তাহার কলুষিত হয় নাই—বাহিরের নোংরা কাজ হৃদয়ের মনুষ্যত্বকে তাহার নষ্ট করিতে পারে নাই। সে অত্যন্ত স্পষ্টবাদী, কেদারের লোভ ও স্বার্থবুদ্ধি তাহার মধ্যে নাই।···" [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"···প্রত্যেকটি চরিত্রই সুস্পষ্ট উজ্জ্বল। তিনকড়ি ত একেবারে অনবদ্য।··· আমার ত মনে হয়, ইহার অনাবিল হাস্যরস ইহার মূল রস নয়; ইহার মূলরস করুণার ও মাধুর্যের, হাস্যরস সঞ্চারী রস মাত্র।"

[—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা

চিরকুমার সভা

'প্রজাপতির নির্বন্ধের' নাট্যরূপ। চিরজীবন অবিবাহিত থেকে দেশ সেবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যুবকদের সভা চিরকুমার সভা। সভাপতি অধ্যাপক চন্দ্রমাধব বাবু, সদস্য শ্রীশ, বিপিন, পূর্ণ, প্রভৃতি।

বিধবা জগত্তারিণীর চার মেয়ে, পুরবালা, শৈলবালা, নৃপবালা ও নীরবালা। পুরবালা বিবাহিতা, শৈলবালা বিধবা, অপর দু'জন অনূঢ়া। পুরবালার স্বামী অক্ষয় ও শৈল পরামর্শ করলো চিরকুমার সভার শ্রীশ ও বিপিনের সঙ্গে নৃপবালা ও নীরবালার বিয়ে দেবে। পুরবালার সম্পর্কিত দাদু রসিকদাদা ও পুরুষবেশে শৈল গিয়ে সভার সদস্য হলো। সভার নতুন আস্তানা হলো জগত্তারিণীর গৃহে। শ্রীশ ও বিপিনের সঙ্গে নৃপবালা ও নীরবালার দেখা হলো। মেয়ে দুটির অপাত্রে বিয়ে হচ্ছে শুনে তারা দু'জনকে বিয়ে করলো। এদিকে চন্দ্রমাধব বাবুর ভাগ্নী নির্মলার প্রতি পূর্ণ অনুরক্ত হয়, তাদেরও বিয়ে হয়ে গেল।

এবার চিরকুমার সভায় কুমার-ব্রত গ্রহণের নিয়মই উঠে গেল।

পাত্রপাত্রী: চন্দ্রমাধব বাবু। শ্রীশ, বিপিন ও পূর্ণ। অক্ষয়। রসিকদাদা। জগত্তারিণী। পুরবালা, শৈলবালা, নৃপবালা ও নীরবালা। নির্মলা। ঘটক বনমালী ভট্টাচার্য। সংগীত-শিক্ষক গুরুদাস। কুলীন পাত্র দারুকেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী। বেহারা রামদীন, খানসামা কলিমুদ্দি, চাকর প্রভৃতি।
আলোচনা প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"চিরকুমার সভা যথার্থ প্রহসন।" [—রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা।

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"...যে সব পাত্র-পাত্রী আছে তাহাদের কথাবার্তা ও ব্যবহারে কোন উচ্ছ্বাসের রসিকতা নাই। নাটকে শৈলবালার কোন স্থান নাই, সে কেন বিধবার বেশ ছাড়িয়া অবলাকান্ত সাজিয়া চিরকুমার সভার সভ্য হইল বুঝিতে পারা গেল না।...

তারপর চন্দ্রবাবু। তিনি একটি বাতিকগ্রস্ত লোক; অতএব অপরের কাছে পরম কৌতুকের পাত্র। কিন্তু তাহার চরিত্রও শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্রের সঙ্গে এক আসন পাইতে পারে না।... যে সমস্ত বাতিকগ্রস্ত লোক সাহিত্যে অমর হইয়াছে, তাহাদের চরিত্রে একটা বিরাট ব্যাপকতা আছে। বহুপ্রকারের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহারা গিয়াছে এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার

মধ্যে তাহাদের মানসিক রোগ বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে।…রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত বাতিকগ্রস্ত লোকের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এই ব্যাপকতা নাই।…

'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনের বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশের চরিত্রের ব্যাপকতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠের বাতিক লেখা, অবিনাশের বাতিক বাগান করা, দ্বিতীয় বাতিক মনোরমার জন্য প্রেম। এই সকল বাতিকের ক্ষেত্র সংকীর্ণ।" [—রবীন্দ্রনাথ

হাস্য কৌতুক

হাস্যকৌতুক কয়েকটি একাঙ্ক 'হেঁয়ালী নাট্যের' সমষ্টি। কয়েকটি বিশেষ করে বালকদের জন্য লেখা। পনেরোখানি নাটিকা এতে আছে: ছাত্রের পরীক্ষা, পেটে ও পিঠে, অভ্যর্থনা, রোগের চিকিৎসা, চিন্তাশীল, ভাব ও অভাব, রোগীর বন্ধু, খ্যাতির বিড়ম্বনা, আর্য অনার্য, একান্নবর্তী, সূক্ষ্মবিচার, আশ্রমপীড়া, অন্ত্যেষ্টি সৎকার, রসিক ও গুরুবাক্য।

এই গুলির মধ্যে 'খ্যাতির বিড়ম্বনাই' সবচেয়ে জনপ্রিয়।

খ্যাতির বিড়ম্বনা: উকিল দু'কড়ি দত্তর কাছে কাঙালীচরণ চাঁদা চাইতে এসে ব্যর্থ হয়। দু'কড়িকে জব্দ করার জন্য সে কাগজে ছাপিয়ে দেয় যে দু'কড়ি পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছে। সংবাদ পেয়ে বহু লোক সভা-সমিতি থেকে চাঁদা চাইতে আসে। শেষ অবধি দু'কড়িকে এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গৃহত্যাগ করতে হয়।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচা লিখেছেন—

"…খ্যাতির বিড়ম্বনাটি সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। ইহার মধ্যে ঘটনার গতিতে বেশ একটু নাটকীয়ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন প্রকারের কৌতুক একমুখী হইয়া পরিণামে একটি চরম অবস্থা বা climax-এর সৃষ্টি করিয়াছে …" [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

ব্যঙ্গ কৌতুক—

পাঁচখানি নাটিকার সমষ্টি: বিনিপয়সার ভোজ, নূতন অবতার, অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি, স্বর্গীয় প্রহসন ও বশীকরণ।

এইগুলির মধ্যে 'বশীকরণই' বিশেষ জনপ্রিয়।

বশীকরণ : অন্নদা ও আশু বিবাহের জন্য পাত্রী খুঁজছে। অন্নদার ইতিপূর্বে বিবাহ হয়েছে, কিন্তু সে ব্রাহ্ম হওয়ার জন্য তার শ্বশুর তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে, স্ত্রী হয়েছেন সন্ন্যাসিনী। ইতিমধ্যে বন্ধু রাধাচরণ এসে খবর দিল, এক সন্ন্যাসিনী এসেছেন, অলৌকিক তাঁর ক্ষমতা। আশু এলো সন্ন্যাসিনীর কাছে। সন্ন্যাসিনী তখন সে-বাড়ী থেকে উঠে গেছেন, আশু জানে না। শ্যামা-সুন্দরীকে সে সন্ন্যাসিনী ভেবে প্রণাম করলো। শ্যামাসুন্দরীর মেয়ে নিরুপমাকে দেখে সে মুগ্ধ হলো। ওদিকে নিরুপমার সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছিল অন্নদার। অন্নদা মেয়ে দেখতে যে-বাড়ীতে গেল, সেখানে মাতাজি থাকেন। মাতাজির সঙ্গে অন্নদার দেখা হলো। জানা গেল ইনিই অন্নদার স্ত্রী। স্বামী-স্ত্রীর মিলন হলো। আশুর সঙ্গে নিরুপমারও বিয়ে হলো।

প্রধান চরিত্র : আশু। অন্নদা। রাধাচরণ। মাতাজি। শ্যামাসুন্দরী। নিরুপমা, প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"ব্যঙ্গকৌতুকের 'বশীকরণ' নাটিকাটি নাটকীয়গুণে বেশ উজ্জ্বল।...ইহা 'গোড়ায় গলদের' সমগোত্রীয়।..." [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"ব্যঙ্গকৌতুক গ্রন্থে যে কয়টি চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহার অধিকাংশের মধ্যে কৌতুক অপেক্ষা ব্যঙ্গের পরিমাণ বেশী। 'বশীকরণ' কৌতুক নাটকে অন্নদা ও মহিমোহিনীর যে উপাখ্যান দেওয়া হইয়াছে তাহা 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনের বিনোদলাল ও কমলমণি চিত্রের রূপান্তর মাত্র।...প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ, অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি, ও স্বর্গীয় প্রহসন—এইগুলিই সর্বাপেক্ষা উপাদেয়।...

ভাষার গৌরব তাঁহার কাব্য, প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ গৌরব কিন্তু ইহা তাঁহার রচনার একটা প্রধান দোষ। তিনি যেন শুধু কথার মারপ্যাচ লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। ইহাতে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু তাহা অপকৃষ্ট হাস্যরস। বিলাতী অলংকার-শাস্ত্রে এই প্রকার হাস্যরসকে wit বলা হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় humour অপেক্ষা wit-র আধিক্য বেশী।... তাঁহার প্রহসনের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে শুধু কথা কাটাকাটি। 'গোড়ায় গলদ' নাট্যের চন্দ্রনাথ, 'চিরকুমার সভার' অক্ষয়, (এবং অনেকাংশে রসিক দাদাও) ইহারা যেন কথার জাল বুনিবার যন্ত্র। শব্দবিন্যাসে হাস্যরসের

সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু তাহা অতি লঘু। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনে অনেক জায়গায়ই বাক্যই মুখ্য।…” [—রবীন্দ্রনাথ

প্রায়শ্চিত্ত

‘বৌঠাকুরাণীর হাট’ উপন্যাসের কাহিনী ‘প্রায়শ্চিত্তের’ বিষয়বস্তু। শুধু একটি চরিত্র নতুন সৃষ্টি, সে ধনঞ্জয় বৈরাগী। ধনঞ্জয় মাধবপুরে প্রজা-বিদ্রোহের নেতা, তারই পরামর্শে প্রজারা জুলুমের প্রতিবাদে খাজনা বন্ধ করেছে। তার মতে রাজত্ব একলা রাজার নয়, প্রজারও।

পাত্রপাত্রী : প্রতাপাদিত্য। উদয়াদিত্য। বসন্তরায়। রামচন্দ্র রায়। রমাই ভাঁড়। মল্ল রামমোহন। রামচন্দ্রের পর্তুগীজ সেনাপতি ফার্ণাণ্ডিজ। প্রতাপের মন্ত্রী। প্রতাপের অনুচর পীতাম্বর। প্রতাপের গৃহরক্ষক সীতারাম। ধনঞ্জয় বৈরাগী। প্রতাপের মহিষী। সুরমা। বিভা। পরিচারিকা, প্রভৃতি।
আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

“ধনঞ্জয় বৈরাগীর মন্ত্র অহিংসা ও অভয়। রাজার আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করিলে প্রকারান্তরে হিংসারই জয় হইয়া থাকে ; ভয় না করিয়া আঘাতকে প্রেমের সহিত বহন করিলে আঘাতকারীর মনের পরিবর্তন হইয়া থাকে। এই শিক্ষায় ধনঞ্জয় বৈরাগী তাহার অনুচরদের শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহা স্পষ্টতঃ গান্ধিজীর বাণীর পূর্বাভাস।” [—রবীন্দ্র বিচিত্রা
নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

“…প্রায়শ্চিত্ত নাটকের লক্ষণীয় বস্তু হইতেছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর সৃষ্টি।…রবীন্দ্র নাটকে এই জাতীয় রসিক অথচ বৈরাগী, আত্মভোলা, চিরনবীন, সদানন্দময়, নির্ভীক, সত্যসন্ধ, স্বচ্ছ, সুনির্মল, অত্যাচার অবিচারের চিরশত্রু, দুঃখী-দুর্গতদের পরম সুহৃদ, নিত্য সত্য-ধর্মের পরম সাধক এবং রহস্য-ইঙ্গিতময় একটি চরিত্রের উদ্বোধন প্রথম আমরা দেখি ‘শারদোৎসব’ নাটকে ঠাকুরদাদার চরিত্রে ; এই চরিত্রই স্বল্প রূপান্তরে দেখা যায় ‘প্রায়শ্চিত্ত’ এবং ‘মুক্তধারা’ নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে, ‘অচলায়তনে’ দাদাঠাকুর চরিত্রে, ‘ফাল্গুনীতে’ সর্দার বা বাউল চরিত্রে, ‘ডাকঘর,’ ‘রাজা,’ ও ‘অরূপরতন’ নাটকে ঠাকুরদাদার ভূমিকায়।…প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই তাহার দেখা পাই বলিয়া এবং প্রায় একইরূপে পাই বলিয়া
…দাদাঠাকুর আমাদের কাছে তাহার নূতনত্ব কতকটা হারাইয়া ফেলিয়াছেন ; আমরা দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিয়া ফেলি ;…এই দাদাঠাকুরটি না থাকিলে

কবির নিজের কথাটি নাটকে আর বলা হয় না, নিজের মনটি আর প্রকাশ করা হয় না। কাজেই তিনি প্রায় অপরিহার্য।" [—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা

পরিত্রাণ

'প্রায়শ্চিত্ত' লেখার কুড়ি বছর পরে কিছু কিছু অদল-বদল করে 'পরিত্রাণ' রচিত হয়। 'প্রায়শ্চিত্ত' রচিত হয় ১৩১৬ সালে। 'পরিত্রাণের' রচনা কাল ১৩৩৬ সাল।

পাত্রপাত্রী: প্রায়শ্চিত্তের অনুরূপ।

আলোচনা প্রসঙ্গে সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"…বৌঠাকুরাণীর হাট উপাখ্যানের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত। নাটকে কবি মূল গল্পটি রাখিয়াছেন, অথচ নাটকের প্রয়োজনে তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে। এই কারণে কোন চরিত্র বা আখ্যায়িকা পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই।…'পরিত্রাণ' নাটকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগী। ধনঞ্জয় বিশ্বভোলা, ভগবানে সমাহিত চিত্ত।…কিন্তু একথা মানিতেই হইবে যে নাটক ও উপন্যাসের মূল ঘটনার সঙ্গে তাহার সংযোগ নাই।…প্রতাপাদিত্য ও মাধবপুরের প্রজাদের মধ্যে যে সংঘর্ষের কথা সূচিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে নাই, ধনঞ্জয় বৈরাগীর জন্য।" [—রবীন্দ্রনাথ

গৃহপ্রবেশ

'শেষের রাত্রি' নামক গল্পের নাট্যরূপ

পাত্রপাত্রী: যতীন। মাসী। যতীনের স্ত্রী মণি। যতীনের বোন হিমি।

আলোচনা প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"গল্প হিসাবে 'শেষের রাত্রি' নিখুঁত।…কিন্তু নাটকীয় গুণে এই গল্প দুর্বল… গল্পে যেমন নাটকটিতেও তেমনই, মাসি চরিত্রের কল্পনাই একমাত্র সত্য ও সার্থক কল্পনা; এই চরিত্রটিই গল্প ও নাটক উভয়েরই একমাত্র দীপ্তি এবং এই চরিত্রেরই যাহা কিছু নাটকীয় ধর্ম।…" [—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"পুত্রহীনা বিধবা মাসির হাতেই যতীন মানুষ।…যতীনের হৃদয়-তারের ঝংকারে সারাক্ষণ তাহার দেহ-মন ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে। এমন অনুপম মাতৃচরিত্র বাংলা সাহিত্যে খুব কম আছে।…

মণি সর্ববন্ধন মুক্ত, চিন্তা-ভাবনামুক্ত—কোনো প্রকারের দায়িত্ব গ্রহণে

পরাঙ্মুখ। জীবনের বিন্দুমাত্র গভীরতা-বর্জিত যে হালকা হাওয়া তাহাতেই তাহার রঙীন ওড়না উড়াইয়া সে জীবনপথে চলিতে চায়।...” [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

শোধবোধ

'কর্মফল' নামক গল্পের নাট্যরূপ।

পাত্রপাত্রী: মন্মথ। মন্মথর পুত্র সতীশ। সতীশের মা বিধুমুখী। সতীশের মেসোমশাই শশধর। সতীশের মাসী সুকুমারী। নলিনী। হরেন। প্রভৃতি। আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

“সতীশের চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা তাহার ব্যক্তিত্বহীনতা ও নির্বুদ্ধিতা। কোনো অবস্থাতেই সে নিজেকে আয়ত্তে আনিবার জন্য আত্মশক্তির অনুশীলন করিতে শেখে নাই—কোনো পরিস্থিতিতেই নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে জানে না।...

নলিনী চরিত্রটি সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। সে প্রখর বুদ্ধিশালিনী, ব্যক্তিত্ব শালিনী এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাসিনী। সমস্ত অবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে কাটাইয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়া তাহার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার ক্ষমতা তাহার আছে।...

নাটকীয় ধর্মের দিক হইতে বিচারে নাটকটি অনেকটা শিথিলবন্ধ ও অগভীর।—যেন বর্ণনামূলক, চিত্রধর্মী সংলাপের সমষ্টিমাত্র—অন্তর্দ্বন্দ্বমুখর ও জীবনীবেগে তরঙ্গায়িত নয়।......শেষের দিকে সতীশের পিস্তল লইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা ও পরক্ষণেই হরেনকে হত্যা করিতে উদ্যত হওয়া এবং পরমুহূর্তেই শশধরের নিকট পিস্তল সমর্পণ ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, অবান্তর এবং একটা কৃত্রিম রোমাঞ্চ সৃষ্টির জন্যই সংযোজিত বলিয়া মনে হয়।”

[—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

“শোধবোধ যথার্থ কমেডি।” [—রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা

নটীর পূজা

কথা ও কাহিনী বইয়ের 'পূজারিণী' কবিতাটি এই নাটকের আখ্যানবস্তু। পাত্রপাত্রী: মহারাজ বিম্বিসারের মহিষী লোকেশ্বরী। রাজকুমারী বাসবী, নন্দা, রত্নাবলী, অজিতা ও ভদ্রা। ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণা। মহিষীর সহচরী মল্লিকা। নটী শ্রীমতী। শ্রীমতীর সহচরী মালতী। ভিক্ষু উপালি ও ভিক্ষুদল। প্রতিহারিণী, রক্ষিণী, রাজকিঙ্করী প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন —

"প্রাচীন আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম ও নবপ্রচারিত বৌদ্ধধর্মের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় সমস্ত চরিত্রগুলি আবর্তিত ও বিবর্তিত হইলেও এই দ্বন্দ্বের কোনো প্রত্যক্ষ ঘটনা নাটকে সংঘটিত হয় নাই ;—বিম্বিসার ও অজাতশত্রু নাটকের বাইরে আছেন।…এই নব ধর্মের আদর্শ ও প্রভাব মহারাণী লোকেশ্বরীর মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছে এক অতি জটিল চিত্তদ্বন্দ্ব; শ্রীমতীর মধ্যে এ আদর্শ জ্বলিতেছে একটি উজ্জ্বল, অকম্পিত দীপশিখার মতো ; মালতীর মধ্যে এ আদর্শ আবির্ভূত হইয়াছে ব্যর্থ প্রেম-বেদনার শেষ সান্ত্বনা স্বরূপ ; রাজকুমারী রত্নাবলী প্রভৃতির নিকট ইহা প্রতিভাত হইয়াছে অভিজাত-মর্যাদা-ধ্বংসকারী, নীচজাতি-প্রাধান্য দায়ক, রাজধর্ম-নষ্টকারী ভিক্ষু-ধর্মরূপে।…

শ্রীমতীর চরিত্রে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সংকোচ-সংশয় নাই। একটিমাত্র মূর্তিই তাহার শান্ত স্নিগ্ধ ভক্তির মাধুর্যে, ধ্যানলোকের নির্লিপ্ততায়, আত্ম-নিবেদনের বিনম্র গাম্ভীর্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আমাদের সম্মুখে বিরাজমান, দেদীপ্যমান। রাজকুমারীদের বিদ্রূপ, রক্ষিণীদের সতর্কবাণী তাহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে নাই—ঘটাইতে পারে নাই তাহার চরিত্রের অভিব্যক্তিতে কোনো পরিবর্তন। উষায় ভিক্ষু উপালির মুখে শুনিয়াছিল তাহার নিকট হইতে ভগবানের দান গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা, সন্ধ্যায় সেই আত্মদানরূপ ফুল উৎসর্গ করিল সে ভগবানের পূজায়।"

[—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"নটীর পূজা আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু শিল্পের দিক দিয়া অনবদ্য।"

[—রবীন্দ্রনাথ

চণ্ডালিকা

বুদ্ধশিষ্য আনন্দ এক গৃহস্থ গৃহে আহার করে ফিরছেন, পথে চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতির কাছ থেকে জল চেয়ে পান করলেন। আনন্দকে দেখে প্রকৃতি মুগ্ধ হলো। তাকে পাবার জন্য মায়ের সাহায্য চাইল। মা তন্ত্রমন্ত্র জানতেন, হোম করে আনন্দকে আকর্ষণ করলেন। আনন্দ এলেন কিন্তু মন্ত্রশক্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন। বুদ্ধ অলৌকিক শক্তিবলে শিষ্যের অবস্থা টের পেলেন, তিনি চণ্ডালীর বশীকরণ-শক্তি থেকে আনন্দকে মুক্ত করলেন। আনন্দ ফিরে এলেন।

পাত্রপাত্রী : আনন্দ। প্রকৃতি ও প্রকৃতির মা।
আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"চণ্ডালিকার মধ্যে নাটকীয়ত্বের বিশেষ অভাব—বাহিরের কোনো ঘটনা ইহাতে প্রবেশ করে নাই।' মূল ধারাটি দুইটি মাত্র ব্যক্তির কথোপকথনের মধ্যেই আবদ্ধ। শেষ দৃশ্যের শেষে কেবল আনন্দ প্রবেশ করিয়া একটি বুদ্ধ স্তোত্র আবৃত্তি করিয়াছে।" [রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

বাঁশরী

বাঁশরী সরকার বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস করা মেয়ে। রাজপুতনার শম্ভুগড় রাজ্যের রাজকুমার সোমশংকরের সঙ্গে হলো পরিচয়। দুজনের বিয়ের ঠিক হলো। রাজা প্রভুশংকর খবর পেয়ে ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন।

পুরন্দর সন্ন্যাসী। সে য়ুরোপ ঘুরেছে, কুম্ভমেলায় গেছে, গল্‌ফ খেলে, ভালুক শিকার করে আবার সাহেবকে যোগ-বাশিষ্ট পড়ায়। তার প্রধান কাজ ভালো ছাত্রীদের বিনাবেতনে পড়ানো। সুষমা তাকে ভালবাসে।

পুরন্দর একখানি বই লিখে কাশীর পণ্ডিত-সমাজের প্রশংসা পেল। বইখানি নিয়ে সে গেল সোমশংকরের রাজ্যে। তার ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য রাজাকে প্রভাবিত করলো। সোমশংকরের সঙ্গে সে সুষমার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলো। সোমশংকর ভালবাসতো বাঁশরীকে, বিয়ে করলো সুষমাকে। কারণ পুরন্দরের আদর্শ ছিল—প্রবৃত্তিমুক্ত নিষ্কাম দম্পতি কর্মসাধনা করবে।

পাত্রপাত্রী : বাঁশরী ও তার বান্ধবী সুরমা, সুষমা, অর্চনা, শৈলবালা, লীলা, নন্দা প্রভৃতি। সুষমার বোন সুষীমা, মা বিভাসিনী। পুরন্দর। রাজা প্রভুশংকর। সোমশংকর ও তার বন্ধু তারক। বাঁশরীর বন্ধু শচীন, অরুণ সতীশ, সুধাংশু প্রভৃতি। সাহিত্যিক ক্ষিতীশ। জহুরী, খানসামা, ভৃত্য, প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"এই নাটকের একটী মাত্রই চরিত্র, যে একাই সঞ্চার করিয়াছে নাটকের মধ্যে যাহা কিছু গতিবেগ, যাহা কিছু নাটকীয়ত্ব—সে হইতেছে বাঁশরী সরকার।…

বাঁশরী রবীন্দ্রনাথের এক অপরূপ সৃষ্টি। সমগ্র বাংলাসাহিত্যে ইহার সমকক্ষ নারীচরিত্র আর নাই,—বাঁশরী অদ্বিতীয়, অনুপম।…

বাঁশরী প্রখর বুদ্ধিশালিনী, অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না, ব্যঙ্গ-সুনিপুণা, শ্লেষ-বাণ সন্ধান-দারুণা, বাস্তব জীবনের সত্যদর্শিনী, নরনারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক ও ভাষ্যকার এবং অচল আত্মপ্রতিষ্ঠ;—তাহার বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির এই ইস্পাতের মতো কঠিন দীপ্তির তলদেশে প্রেমের দুর্দমনীয় আবেগ-তরঙ্গায়িত একটি হৃদয়-ধারা প্রবাহিত। প্রেমই বাঁশরীর জীবনের ধ্রুবতারা—তাহারই নির্দেশে তাহার জীবনতরী চালিত হইয়াছে।"

[—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"নাটকখানিকে গতানুগতিক শিল্পনীতি অনুসারে কমেডি বলা চলে। বাঁশরী—সোমশঙ্করের মধ্যেও শেষের দিকে একটা মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে; বাঁশরী সোমশঙ্করকে পাইল না কিন্তু তাহার ভালোবাসা পাইল। কিন্তু ওইটুকু মিল না করিলেই বোধ করি ভালো ছিল। ওইটুকুতে বাঁশরীর মহিমা যেন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।..."

[—রবীন্দ্র-বিচিত্রা

সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"অমিত রায় ও বাঁশরী সরকারে রবীন্দ্রনাথ ঐশ্বর্যের অন্তরালে হৃদয়ের কমনীয়তা ও দুর্বলতার চিত্র আঁকিয়াছেন।...বাঁশরীর চরিত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ তাহার কমনীয়তা; বিদ্যুতের সমুজ্জ্বলতার অন্তরালে রহিয়াছে জলভারাক্রান্ত মেঘ।...বাঁশরীর বাহিরের ব্যবহারে শাণ দেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য, অন্তরে মধুর দুর্বলতা ও কমনীয়তা। ইহাদের মধ্যে যে বিরুদ্ধতা তাহা নাটকের শ্রেষ্ঠ গুণ, কারণ দ্বন্দ্ব ও বিরুদ্ধতার চিত্রণেই নাট্য প্রতিভা সমধিক বিকাশ লাভ করে।

নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও বাঁশরী নাট্যে শ্রেষ্ঠ আর্টের উৎকর্ষ নাই; একটি মৌলিক দোষে ইহার মহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই নাটকে পুরন্দর একটি প্রধান ব্যক্তি; তাহারই অঙ্গুলি সংকেতে নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রী চালিত হইতেছে। অথচ কবি তাহাকে জীবন্ত করিতে পারেন নাই।...নাটকের একমাত্র জীবন্ত চরিত্র বাঁশরী; সুষমা, সোমশংকর ইহারা যেন এক অদ্ভুত ভোজবাজির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং যে ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহাকেও ছায়ারূপ বলিয়া মনে হয়। এই কারণে এই নাটকের বিষয়বস্তু সত্য হইয়া উঠে নাই; তাহা অলীকের রাজ্যেই রহিয়া গিয়াছে।...

...নাটকের প্রধান ধর্ম গতিশীলতা; ঘটনার পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চরিত্র

গড়িয়া উঠিবে, তাহার নানাদিক্ ফুটিয়া উঠিবে। ক্ষিতীশের চরিত্র এইভাবে বিকশিত হইয়া উঠে নাই, নবীন সাহিত্যিককে প্রাণহীন জড় বলিয়া মনে হয়।" [—রবীন্দ্রনাথ

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"...নগরাশ্রয়ী সামাজিক নাটক।...নাটক হিসাবে বাঁশরী দুর্বল।...এই গ্রন্থের যাহা নাটকীয় গুণ তাহা শেষের দিকে প্রধানত বাঁশরী-সোমশঙ্কর এবং আংশিকভাবে অন্য দু-একটি দৃশ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষিতীশ চরিত্র খুব জীবন্ত এবং বাঁশরী চরিত্রের নাটকীয় দীপ্তি অনেকখানি সম্ভব হইয়াছে ক্ষিতীশকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু কি গল্পে কি চরিত্রে ক্ষিতীশের কোন স্বকীয় মহিমা নাই, তাহার নিজস্ব কোন দীপ্তি নাই।..."

[—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা

মুক্তির উপায়

ঐ নামের গল্পের নাট্যরূপ।

পাত্রপাত্রী: ফকির। মাখন। পুষ্পমালা। হৈমবতী। ফকিরের গুরু স্বামী অচ্যুতানন্দ। বিশ্বেশ্বর। মাখনের ঠাকুর্দা ষষ্ঠীচরণ। প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"ফকিরের গুরুভক্তি, গুরুর অর্থলোভ ও তাঁহার সঙ্গোপাঙ্গে নাটকে প্রয়োজনাতিরিক্ত স্থান জুড়িয়াছে এবং তাহাদের উপর ব্যঙ্গবিদ্রূপও মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে; ফলে ফকির-মাখনের অবস্থান্তরের ও উভয় পরিবারের ভুল—যাহার মধ্যে রহিয়াছে নাটকের মূল হাস্যরস নিহিত—সেই ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে।..." [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

শারদোৎসব

ঋতু উৎসবের জন্য রচিত নাটক। শরৎকালের রূপটি তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। ঠাকুরদাদা, সন্ন্যাসী ও ছেলের দল আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে। তার মধ্যে উপনন্দ কাজ করছে, তার গুরু বীণাচার্য সুরসেন লক্ষেশ্বরের কাছ থেকে ঋণ করে গেছে, তাকে তা শোধ করতে হবে। শরৎকালের সৌন্দর্যের মধ্যে একটি ঋণশোধের রূপ আছে। বিজয়াদিত্য রাজঋণ শোধ করছে কবিত্ব দিয়ে, ঠাকুরদা আত্মসত্তার ঋণশোধ করছেন সকলকে ভালবেসে। শুধু লক্ষেশ্বর স্বার্থবুদ্ধি ও লোভে আচ্ছন্ন, সে ঋণ শোধ করতে পারছে না।

পাত্রপাত্রী : ঠাকুরদাদা। সন্ন্যাসী অপূর্বানন্দ। মহাজন লক্ষেশ্বর। রাজা সোমপাল। মন্ত্রী সুভূতি। ধনপতি শ্রেষ্ঠী। উপনন্দ। অমাত্য, বালক, বন্দী, প্রভৃতি।

ঋণশোধ

শারদোৎসবের নতুন রূপ।

পাত্রপাত্রী : শারদোৎসবের অনুরূপ, নতুন চরিত্র সম্রাট বিজয়াদিত্য ও কবিশেখর।

আলোচনা প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"শারদোৎসব নাটিকায় এক অপূর্ব সৃষ্টি ঠাকুরদাদার চরিত্র।...তিনি বেতসিনী নদীর তীরে তীরে ছেলের দল লইয়া গান গাহিয়া শারদোৎসব করিয়া ফেরেন, কখনো বা অচলায়তনের বাহিরে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শোনপাংশুর দলে ভিড়িয়া যান, কখনো বা রুগ্ন অবরুদ্ধ অমলের শয্যার পার্শ্বে রাজার ডাকঘরের চিঠির খবর লইয়া আসেন, আবার তিনিই ভোল ফিরাইয়া গুরু বাউল সর্দাররূপে ফাল্গুনী বসন্তোৎসবে মাতেন, তিনিই আবার ধনঞ্জয় বৈরাগী নাম লইয়া অত্যাচারের অবিচারের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ করেন।...এই ঠাকুরদাদাই রাজার সহিত মিলনের পথে অনুতাপিনী সুদর্শনার সহযাত্রী, এবং ইনিই ছিলেন বৌঠাকুরাণীর হাটে এবং প্রায়শ্চিত্তে ও পরিত্রাণ নাটকে রাজা বসন্ত রায়ের অন্তরে এবং বিভা সুরমা ও উদয়াদিত্যের সঙ্গে রসমধুর স্নেহ-সম্পর্কের মধ্যে।" [—রবিরশ্মি

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃতির সহিত একাত্ম হওয়া ও তাহার প্রভাবকে গ্রহণ করার মধ্যে গভীরতর ব্যাপক তাৎপর্য নিহিত আছে। ইহাই শারদোৎসব-এর তত্ত্বাংশ। কবি ইহাকে ঋণশোধ বলিয়াছেন।...প্রকৃতি যেমন সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতার প্রকাশ দ্বারা ঋণশোধ করিতেছে, মানবও সেইরূপ পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের দ্বারা ঋণশোধ করিতেছে। জ্ঞানী ঋণশোধ করিতেছে জ্ঞান প্রকাশের দ্বারা, শিল্পী শিল্প সৃষ্টির দ্বারা, কবি কাব্য সৃষ্টির দ্বারা, প্রেমিক প্রেম বিতরণের দ্বারা, কর্মী কর্মের স্বার্থহীন, নিরলস সাধনার দ্বারা—প্রত্যেকেই আপন আপন অন্তরস্থিত অমৃতকে প্রকাশ করিয়া ঋণশোধ করিতেছে। এই ঋণশোধের মধ্যে আছে ত্যাগ, আছে দুঃখ, ইহার মধ্য দিয়াই ঋণশোধ সার্থকতা লাভ করে।" [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

রাজা

রাণী সুদর্শনা রাজাকে কখনও চোখে দেখেনি। গৃহের অন্ধকারে রাজার সঙ্গে রাণীর মিলন হয়। আলোয় রাজাকে দেখতে রাণীর বড় ইচ্ছা। বললেন, আমাকে দেখা দিতে হবে।

রাজা বললেন, বসন্ত উৎসবের দিনে বাগানে তিনি থাকবেন, রাণী যদি পারেন তো তাঁকে চিনে নেবেন।

বসন্ত উৎসবের দিনে অন্যান্য দেশের রাজারা নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন, কিন্তু রাজাকে কেউ দেখতে পেলেন না। সুবর্ণ নামে এক জুয়াড়ী রাজা সেজেছিল, রাণী তাকেই রাজা বলে মনে করলেন। কাঞ্চী রাজা সুদর্শনাকে পাবার জন্য উদ্যানে আগুন লাগিয়ে দিল, রাণী সুবর্ণের কাছে গিয়ে বললেন—রাজা রক্ষা কর!

সুবর্ণ মুকুট ফেলে দিয়ে পালালো। রাণী বুঝলেন সে রাজা নয়। সেই সময় রাজা এসে রাণীকে রক্ষা করলেন। সেই কারণে ক্ষণিকের জন্য রাণী রাজাকে দেখতে পেলেন—রাজা কালো, আকাশের মত কালো, ঝড়ের মেঘের মত কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো। সেই কালোরূপে রাণী মর্মাহত হলেন, বাপের বাড়ী চলে গেলেন।

এদিকে কাঞ্চি, কোশল, অবন্তী, কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা রাণীর পিতৃরাজ্য আক্রমণ করলেন, সুদর্শনাকে তাঁরা কেড়ে নিয়ে যাবেন। সুদর্শনার পিতা স্বয়ম্বর-সভা ডাকলেন, সেই সভার মাঝে এলেন ঠাকুরদা, বললেন—রাজা আসছেন।

রাজা এলেন, যুদ্ধ করে সাতজন রাজাকে বিতাড়িত করে চলে গেলেন। রাজার দেখা না পেয়ে সুদর্শনা পদ-যাত্রা করলেন। এবার রাজার সঙ্গে দেখা হলো, রাণী বললেন—আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।

পাত্রপাত্রী: রাজা। রাণী সুদর্শনা। দাসী সুরঙ্গমা। ঠাকুরদাদা। সুবর্ণ। কোশল, কাঞ্চী, কান্যকুব্জ, অবন্তী, কলিঙ্গ, বিদর্ভ ও পাঞ্চালের সাত রাজা। মন্ত্রী, পাগল, বাউল, নাগরিক, বালক, মালী, প্রতিহারী, দূত, প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"রাজা নাটকের রাজা ভগবান, বা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। সুদর্শনা মানবাত্মা

বা জীবাত্মা। সুদর্শনার সহিত রাজার সম্বন্ধটি বধূর সম্বন্ধ।…সুরঙ্গমা দাসী-রূপে ভগবান লাভ করিয়াছে, ঠাকুরদা লাভ করিয়াছে বন্ধুভাবে।…আর ব্যক্তি কাঞ্চীর রাজা। সে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান, সে অবিশ্বাসী, নাস্তিক। রাজাকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসা ও তাঁহার প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধির সাধনায় সুদর্শনার যে বাধাবিঘ্ন, যে দ্বিধাসন্দেহ, যে দুঃখবেদনা উপস্থিত হইয়াছে তাহার ঘাত-প্রতিঘাতের কাহিনীই এই নাটকের ভিত্তি। ইহার সঙ্গে এক অংশে জড়িত আছে নাস্তিক কাঞ্চীরাজের পরিবর্তন ও ভগবানে আত্মসমর্পণ। তাই 'রাজা' নাটককে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—The 'inner drama' of the 'human soul."

[—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

অচলায়তন

অচলায়তন একটি আশ্রম। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, লোহার ফটক, বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষেধ। ভিতরে থাকেন আচার্য, অধ্যাপক, উপাধ্যায়, মহাপঞ্চক আর কতকগুলি শিক্ষার্থী। ছাত্রেরা মন্ত্র মুখস্থ করে, ক্রিয়াকাণ্ড করে, শাস্ত্রানুযায়ী জীবন যাপন করে,—কঠিন নিয়ম, লঙ্ঘন করলেই মহাপাতকের ভয়। কিন্তু পঞ্চক নিয়ম কানুন মেনে চলতে পারে না, মন্ত্র মুখস্থ ও বদ্ধ জীবনে সে আনন্দ খুঁজে পায় না। আশ্রমের উত্তর দিকে একজটা দেবীর মন্দির, সে দিকের জানালা খোলা নিষেধ, সুভদ্র সেই জানালা খুলেছিল, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, পঞ্চক বলে—কোন পাপ হয়নি। আচার্যও বলেন—কোন পাপ হয়নি।

মহাপঞ্চকের দল বড় গোঁড়া, তারা আচার্য ও পঞ্চককে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেয়। আশ্রমের কাছেই অস্পৃশ্য শোনপাংশু ও দর্ভকদের বাস, আচার্য ও পঞ্চক তাদের মাঝে চলে আসেন। সেখানে দর্ভকদের গোঁসাই ঠাকুরদাদার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়।

খবর এলো আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা গুরু আসছেন। গুরুরূপে যিনি এলেন তিনি ঠাকুরদাদা। সঙ্গে এলো শোনপাংশুর দল। ঠাকুরদাদা পাঁচিল ভেঙে দিলেন। মহাপঞ্চক বললো—আশ্রম কলুষিত হলো। অনশনে প্রাণত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। গুরু তখন পঞ্চক ও মহাপঞ্চকের উপর আশ্রমকে নতুন করে গড়ে তোলার ভার দিলেন।

পাত্রপাত্রী : দাদাঠাকুর। আচার্য, উপাচার্য, উপাধ্যায় ও মহাপঞ্চক।

পঞ্চক, বিশ্বম্ভর, সঞ্জীব, জয়োত্তম, তৃণাঞ্জন, সুভদ্র প্রভৃতি ছাত্রদল। শোনপাংশু, দর্ভক ও বালকদল। পদাতিক ও মালী, প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"অচলায়তনের নির্দিষ্ট জ্ঞান-সাধনার প্রতীক মহাপঞ্চক। সে তন্ত্রমন্ত্র আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্মে গভীর বিশ্বাস করে···শিক্ষার্থী তরুণ যুবক পঞ্চক এই আশ্রমের শিক্ষাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারে নাই, এখানকার অর্থহীন মন্ত্র কণ্ঠস্থ করা ও অবিরত নানা হাস্যকর অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে।···

এই শোনপাংশুরা সংকীর্ণ বা বদ্ধ কর্মের প্রতীক। ইহাদের কর্ম কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচালিত নয়, আত্মোপলব্ধির প্রেরণায় উৎসারিত নয়।···

দর্ভকেরা ভাবাবেশ-সর্বস্ব দুর্বল ভক্তির প্রতীক, ইহারা নিজেদের নিতান্ত দীন মনে করে, সকলের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে ইহারা ব্যগ্র, ভক্তির পাত্রের কোনো বাছ-বিচার ইহাদের নাই।···

খৃষ্ট, বুদ্ধ, নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতির মতো দাদাঠাকুর এক মহাপুরুষ। ভগবানের স্বরূপবোধ ও বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান দ্বারাই তাঁহার নিজের জীবন পরিচালিত। রবীন্দ্র আধ্যাত্ম সাধনার মূর্ত প্রকাশ তিনি। তাই জ্ঞানমার্গীদের কাছে তিনি গুরু, কর্মমার্গীদের কাছে তিনি দাদাঠাকুর, ভক্তিমার্গীদের কাছে তিনি গোঁসাই ঠাকুর।" [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

ডাকঘর

স্ত্রীর দূরসম্পর্কীয় ভাইপো অমলকে নিঃসন্তান মাধবদত্ত পোষ্য নিয়েছেন। অমল অসুস্থ। কবিরাজ তাকে ঘর থেকে বেরুতে নিষেধ করেছেন। অমল বাইরে যেতে চায়, দূরের পাহাড়, নীল আকাশ যেন তাকে ডাকে। পথিক দেখে সে-ও পথ চলতে চায়, দইওয়ালাকে ডেকে আলাপ করে। ছেলেদের সঙ্গে বাহিরে খেলা করতে চায়। অমল শোনে বাড়ীর সামনে রাজার ডাকঘর বসেছে, ভাবে সেখান থেকে চিঠি আসবে তার নামে। সে কথা শুনে গাঁয়ের মোড়ল একটুকরো সাদা কাগজ দিয়ে বলে—এই রাজার চিঠি। সে কাগজ পড়ে ঠাকুরদাদা বলেন—রাজা আসছেন রাজকবিরাজ নিয়ে।

রাজ কবিরাজ সত্যি এলেন, সব জানালা দরজা খুলে দিলেন, বললেন—আলো নিভিয়ে দাও, ওর ঘুম এসেছে।

মান অপমান উপেক্ষা করি দাঁড়াও,
কণ্টক পথ অকুণ্ঠপদে মাড়াও,
ছিন্ন পতাকা ধূলি হতে লও তুলি,
রুদ্রের হাতে লাভ করো শেষ বর,
আনন্দ হোক দুঃখের সহচর,
নিঃশেষ ত্যাগে আপনারে যাও ভুলি ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ জ্যৈষ্ঠ
১৩৪৩

'জয়শ্রীর' সৌজন্যে।

অমল ঘুমিয়ে পড়লো। সুধার কাছ থেকে সে ফুল চেয়েছিল, সুধা ফুল নিয়ে এলো, বললো—ও কখন জাগবে?

রাজ কবিরাজ বললেন—যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।

সুধা বললো—তখন একটা কথা তার কানে কানে বলো যে সুধা তোমাকে ভোলেনি।

পাত্রপাত্রী: অমল। অমলের পিসেমশাই মাধব দত্ত। কবিরাজ, ঠাকুরদাদা, দইওআলা, প্রহরী, পঞ্চানন মোড়ল, রাজদূত ও রাজকবিরাজ। শশী মালিনীর মেয়ে সুধা ও ছেলের দল।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"ডাকঘর নাটকের আকারে লিখিত হইলেও ইহাতে নাট্য-ধর্ম বিশেষ কিছু নাই। সুসংবদ্ধ প্লট বা আখ্যানভাগ ইহার নাই; ইহা একটিমাত্র ঘটনার নানা সংলাপ-মুখর বিবৃতিমাত্র।···

বিশ্বই ভগবানের ডাকঘর, এখানেই বিশ্বরাজের সমস্ত সৌন্দর্যলিপি মজুত থাকে; তারপর দিবারাত্রির উপযুক্ত ক্ষণে, ঋতুপরিবর্তনের বিচিত্র পর্যায়ে, জীবনের নানা রসের ধারায়, জলস্থল আকাশের নানা দৃশ্য পটের রূপবৈচিত্র্যে সেগুলি দিকে দিকে প্রেরিত হয়। মানুষের অন্তরাত্মার উদ্দেশ্যে সেগুলি প্রেরিত হয়।···

মোড়ল এই সমাজের প্রতীক। সে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের দ্বারা, ভীতির দ্বারা, অমলের অনন্তের আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করিতে চায়।····

অমলের ঘুম মৃত্যুর প্রতীক। মৃত্যুতে মানবাত্মা অসীম অনন্ত পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়; আত্মিক ব্যাধি বা জীবনের জ্বর একেবারে সারিয়া যায়, সৃষ্টির নিত্যানন্দের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে চরম সার্থকতা লাভ করে।"

[—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

ফাল্গুনী

রাজার চুল পেকেছে। রাজকাজে মন বসে না, তিনি বৈরাগ্য নেবেন। কবিশেখর বোঝালেন—মৃত্যুভয় বৃথা, জীবন নিত্যকালের, এগিয়ে চলাই জীবনের ধর্ম। এক যৌবন যায়, আরেক যৌবন আসে। কবি ফাল্গুনী রচনা করে রাজাকে শোনালেন। শীতের ছদ্মবেশ খসিয়ে বছরে বছরে বসন্ত আসে, পুরাতন দেখা দেয় নতুন হয়ে। শীত না থাকলে ফাল্গুনের উৎসব হতো না, মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই জানা যায় জীবন সত্য।

পাত্রপাত্রী : রাজা। মন্ত্রী। কোটাল। শ্রুতিভূষণ। কবিশেখর। নব যৌবনের দল, দলের নেতা জীবন সর্দার, দলের প্রিয় সখা চন্দ্রহাস, দলের প্রবীণ যুবক দাদা। শীত ও বসন্তের দূত। অন্ধ বাউল। মাঝি, বালক, অনাথ কলু প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"অন্ধ বাউল ঠাকুরদাদা চরিত্রেরই অন্যতর রূপ। দেহের স্থূল দৃষ্টি দ্বারা অতীন্দ্রিয় রহস্তকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অন্তরের দৃষ্টি দিয়াই তাহা দেখিতে হয়। এ বিষয়ে বাহিরের দৃষ্টি অর্থহীন, তাই বাউল অন্ধ।...

কোটাল হইতেছে লৌকিক জ্ঞান সর্বস্ব, জরামৃত্যুভয়ভীত বৃদ্ধ। সে জানে লোকে জীবনের রাস্তা দিয়া আসিয়া জীবনের পরপারে চলিয়া যায়। জরা-মৃত্যু মানুষের স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম।..." [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

মুক্তধারা

উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ শিবতরাই জয় করলেন, কিন্তু সেখানকার প্রজাদের বশে আনতে পারেননি। রাজা সেখানকার প্রজাদের পিপাসার জল ও চাষের জল বন্ধ করে দিয়েছেন। মুক্তধারা ঝর্ণার উপর যন্ত্ররাজ বিভূতি এক লোহার বাঁধ বেঁধে ফেলেছেন।

শিবতারাই-এর প্রজারা খাজনা বন্ধ করেছে, তাদের নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগী। যুবরাজ অভিজিৎ তাদের জন্য নন্দিসংকটের পথ কেটে দিয়েছেন, বিদেশের হাটে যাবার জন্য। কিন্তু একাজে উত্তরকূটের প্রজারা ক্ষেপে উঠলো, রাজা অভিজিৎকে ফিরিয়ে আনলেন, রাজশ্যালক গেল শিবতরাইয়ের শাসনকর্তা হয়ে। রাজশ্যালক অত্যাচার সুরু করলো। প্রজাদের ঠাণ্ডা করার জন্য রাজা অভিজৎকে বন্দী করলেন।

উত্তরকূটের প্রজারা বিভূতির সম্বর্ধনার আয়োজন করলো। ইতিমধ্যে বন্দী-শালায় আগুন লাগলো। অভিজিৎ মুক্তি পেল। খুড়ো মহারাজ তাকে নিজ রাজ্যে নিয়ে যেতে চাইলেন। অভিজিৎ গেল না। রাত্রের অন্ধকারে সে বাঁধ ভেঙে দিল, মুক্তধারার স্রোত মুক্ত হলো, অভিজিৎ ভেসে গেল জলোচ্ছ্বাসে।

পাত্রপাত্রী : উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ। যুবরাজ অভিজিৎ। ছোটরাজপুত্র সঞ্জয়। মন্ত্রী। সেনাপতি বিজয়পাল। যন্ত্ররাজ বিভূতি। মোহনগড়ের খুড়ো মহারাজ বিশ্বজিৎ। ধনঞ্জয় বৈরাগী। বাউল, বটুক পাগলা, রাজদূত ও

রাজপ্রহরী। নাগরিক—রঞ্জন, ঝগড়ু, বিষণ, কুন্দন প্রভৃতি। সন্ন্যাসী, ভৈরব-পন্থী, পথিক ও স্ত্রীলোকের দল। সুমনের মা অম্বা। ফুলওয়ালী, গণেশ-সর্দার প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"এই অভিজিৎ হইতেছেন সকল স্বার্থমুক্ত সঙ্কীর্ণতামুক্ত মানবাত্মার প্রতিনিধি—যে মানবাত্মা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া দূরের আহ্বানে চলিতে চায়। যেখানে স্বকৃত বা পরকৃত বন্ধন, তাহাকেই আঘাত করিয়া মুক্ত করাই হইতেছে জীবনের সাধনা ও সার্থকতা। লোভের দ্বারা কল্যাণ যখন বন্ধন লাভ করে, তখনই পাপ প্রবল হইয়া উঠে; এবং সেই পাপক্ষালন করিতে মহাপ্রাণকে বলি দিতে হয়।…

মুক্তধারার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবাল্যের বাণী নিহিত আছে—সকল বাধা ও গাণ্ড ভাঙিয়া মুক্তধারায় নিজেকে ভাসাইয়া দিতে হইবে, তবেই মনুষ্যত্বের সম্মান সংরক্ষিত হইবে।" [—রবিরশ্মি

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"মুক্ত ধারাকে রুদ্ধ করিয়াছে কে? রাজা। কিসের দ্বারা? এক বিরাটকায় লৌহযন্ত্রের দ্বারা। রাজার আদেশে রাজ-ইঞ্জিনিয়ার বিভূতি বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করিবার জন্য এটি নির্মাণ করিয়াছে—মানুষের অচল জীবন ধারায় বাধা সৃষ্টি করিয়াছে রাজশাসন যন্ত্রশক্তির সহায়তায়। পাশ্চাত্ত্য উগ্র, সংকীর্ণ জাতীয়তা ও রাষ্ট্রনীতির ইহাই স্বরূপ।…

এখন এই যন্ত্রসর্বস্বতায় পীড়িত হইতেছে কে? পীড়িত হইতেছে মানুষের অন্তরাত্মা, তাহার মনুষ্যত্ব। কুমার অভিজিৎ মানুষের এই নিপীড়িত অন্তরাত্মার প্রতীক।…

ধনঞ্জয় বৈরাগী বিজিত, অত্যাচারিত জাতির আত্মিক প্রতীক। আত্মার শক্তি জড়শক্তি নয়, শারীরীক বল বা যন্ত্রের শক্তি নয়,—সে শক্তি বৃহত্তর নীতির শক্তি।" [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

রক্ত করবী

যক্ষপুরীর রাজা মকররাজ সোনার খনির মালিক। তিনি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, সম্পদ লাভের চেষ্টার মধ্যে নিজেকে বন্দী করেছেন। তিনি নতুন সমাজ তৈরী করেছেন, যে সমাজ ধনসঞ্চয় ও শক্তিসঞ্চয়ের যন্ত্রমাত্র, আনন্দ ও

কল্যাণবুদ্ধি সেখানে নেই। সেখানে সহজ সৌন্দর্য ও স্বাভাবিক আনন্দবোধ নিয়ে এলো নন্দিনী। রাজা আকৃষ্ট হলেন। কিন্তু নন্দিনী ভালবাসে রঞ্জনকে, রঞ্জনের জন্যই তার রক্ত করবীর ভূষণ। রাজা নন্দিনীকে জয় করতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। রঞ্জন মরলো। সেই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জাগলো বিপ্লব, যক্ষপুরীর যে মানুষগুলি যন্ত্র হয়েছিল তাদের মধ্যে এলো জীবনের জোয়ার। রাজা হারলেন। এতদিন তিনি ছিলেন আড়ালে, এবার তিনি বেরিয়ে এলেন। রুদ্ধ জীবন মুক্ত হলো।

পাত্রপাত্রী : রাজা। অধ্যাপক। রঞ্জন। নন্দিনী। বিশু পাগলা, গোঁসাই, মোড়ল, পুরাণ বাগীশ, পালোয়ান, চিকিৎসক, সর্দার ও ছোট সর্দার। খনিকের দল—ফাগুলাল, কিশোর প্রভৃতি। ফাগুলালের স্ত্রী।

আলোচনা প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"নন্দিনী—জীবন-শ্রী প্রেম-কল্যাণময়ী লক্ষ্মী—লোভীকে যে লোভ ভোলায়, পণ্ডিতকে তাহার পাণ্ডিত্য ভোলায়। যে নারী সম্পূর্ণতার আদর্শকে পরিব্যক্ত করে, যে সকলের মধ্যেকার সুপ্ত প্রাণকে জাগ্রত করে, প্রকাশ করে।···

নন্দিনী যে ক্রমাগত ডাকিতেছে—এস, এস আমার দিকে, আমি তোমাকে মুক্তি দিব। এই যে ডাক, ইহা তো প্রাণের ও প্রেমের ডাক। কারাগার ভাঙিল কি না তাহা বড লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য এই যে জীবন ও শ্রী অপরকে ডাক দিয়াছে বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যাইতে।" [—রবিরশ্মি

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"মুক্তধারা একান্ত ভাবে নাট্যধর্মী।···ইহার নাটকীয় রসই প্রধান···নাটকীয় রস 'রক্ত করবীতে' অনুপস্থিত। 'মুক্তধারায়' ঘটনার আবর্ত আছে,···'রক্ত করবী'তে এই আবর্ত নাই; একটি মাত্র সংস্থান গল্পের মধ্যে স্থির হইয়া আছে। একদল লোক, তাহারা সমাজের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজ মানসের বিভিন্ন স্তরের প্রতীক; তাহারা সকলেই লোভের, প্রথা ও সংস্কারের শৃঙ্খলে নিজেদের কারাগারের মধ্যে আবদ্ধ। সেই কারাগারের জানালার লোহার জালের বাহির হইতে প্রেম ও প্রাণশক্তির প্রতীক, মুক্ত জীবনানন্দের প্রতীক নন্দিনী হাতছানি দিয়া সকলকে ডাকিতেছে···আর, তাহার সেই উন্মাদন আহ্বানে কারাগারের ভিতরে যত লোক সকলে চঞ্চল ও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, সকলের হৃদয়ের দ্বারে আঘাত লাগিয়াছে। এই ত গল্পার্থ, ইহাই ত গল্পের সংস্থান। এই সংস্থানের মধ্যে প্রত্যেকটি ব্যক্তি নিজ

নিজ শ্রেণী ও স্তরের বিশিষ্ট রূপে বিশিষ্ট মানস লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে অসাধারণ শিল্প-কৃতিত্বে, গভীর সামাজিক চেতনায়।" [—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"নন্দিনী কে? সে লীলাময় প্রাণের প্রতীক। প্রাণের লীলার প্রকাশ সহজ আনন্দে। আনন্দের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি সৌন্দর্যে ও প্রেমে, সর্ব-বন্ধনহীন মুক্তির মধ্যে।···

রঞ্জনের রক্তের রেখা, নন্দিনীর বুকের রক্ত, আর রক্ত করবীর গুচ্ছ একত্রে উজ্জ্বল লাল আভায় যক্ষপুরীর বুকে অম্লান দীপ্তিতে শোভা পাইতে লাগিল। নন্দিনীর আত্মবিসর্জনে যক্ষপুরীর মধ্যে মুক্তির হাওয়া বহিল, যৌবন ও প্রাণেরই চিরন্তন জয় ও অমরত্ব ঘোষণা করিয়া গেল তাহারা।

সর্দার···রাজশক্তির বহিঃপ্রকাশ যে গভর্ণমেণ্ট ইহারাই তাহার ধারক ও বাহক।···

তারপর, গোঁসাই ধর্মকে এই লুব্ধ, শোষণশীল, আত্মপ্রসারী ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে।"

[—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

তাসের দেশ

'একটি আষাঢ়ে গল্প'—এই নাটকের আখ্যান বস্তু।

পাত্রপাত্রী: রাজপুত্র, সদাগরপুত্র, প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"এই তাসের দেশ যে আমাদেরই সনাতনপন্থী দেশ তাহা না বলিয়া দিলেও কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না। কতবার কত রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র আমাদের এই নির্জীব তাসের দেশে আসিয়া আমাদের কানে মন্ত্র দিয়াছে—···কিন্তু সেই অমৃতজয় বাণী তো আমাদের রুদ্ধ প্রাণের দরজায় মাথা কুটিয়া অপমানিত হইয়া ব্যর্থ হইয়াছে।" [—রবিরশ্মি

কালের যাত্রা

রথ যাত্রার মেলা। নরনারীর ভীড়। রথ কিন্তু নাড়ে না। পুরোহিত মন্ত্র পড়েন, ফল হয় না। রাজার সৈন্যেরা এলো, রথ নাড়াতে পারলো না। ধনপতির দল এলো, রথ নড়লো না। শূদ্রেরা এলো, রথ চললো, তবে নতুন পথে কাঁচা রাস্তায়। কবি এসে বললেন—

"পুজো পড়েছে ধূলোয়, ভক্তি করছে মাটি,
রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে,
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা; দেহে দেহে, প্রাণে প্রাণে।
সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।...
...একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান,
বড়োটিকে দিলেন কাৎ করে।
সমান করে দিলেন তাঁর আসনটা।"

পাত্রপাত্রী: সন্ন্যাসী। পুরোহিত। মন্ত্রী। ধনপতি শেঠি ও তার দল। সৈন্যদল, শূদ্রদল, নাগরিক দল, রমণীর দল, চর, কবি প্রভৃতি।

শেষ বর্ষণ

রাজসভায় ঋতু উৎসব। শেষবর্ষণ পালা—বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমন। বর্ষা যেন বিরহের বেদনাময় রূপ। শরতে দেখা দেয় অনির্বচনীয় সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্য দেখা দিয়েই চলে যায়, ধরে রাখা যায় না, সৃষ্টির লীলাই এই।

পাত্রপাত্রী: রাজা ও পারিষদ বর্গ। নটরাজ, নাট্যাচার্য, রাজকবি, গায়ক-গায়িকা প্রভৃতি।

বসন্ত

কবি রাজাকে বসন্তের পালাগান শোনাচ্ছেন। বসন্ত পৃথিবীকে পূর্ণ করে দিয়ে চলে যায় রিক্ত সন্ন্যাসীর বেশে, গ্রীষ্মের রিক্ততার আগমনে। পূর্ণতা ও রিক্ততা, ঐশ্বর্য ও সন্ন্যাস, ভোগ ও ত্যাগ—দুই মিলেই পূর্ণতা।

পাত্রপাত্রী: রাজা। কবি। বসন্তের পরিচরগণ—বনভূমি, আম্রকুঞ্জ, করবী, বেণুবন, আকন্দ, ধুঁতুরা, জবা, মাধবী, শালবীথিকা, বকুল, মালতী, ঝুমকোলতা, দক্ষিণ হাওয়া, নদী, দীপশিখা, প্রভৃতি।

নবীন

বসন্তের পালাগান। প্রথম পর্বে বসন্তের আবির্ভাব ও পূর্ণ পরিণতি, দ্বিতীয় পর্বে বিদায়। পাঠ, আবৃত্তি, গান ও নৃত্যের সমন্বয়।

পাত্রপাত্রী: ব্যাখ্যাতা।

আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"নবীনের একটি বিশেষ দিক্ এই যে এই ঋতুনাট্যে কবি গানের সঙ্গে নাচকে বিশেষ ভাবে যুক্ত করেন। নানা ধরণের নৃত্যের সমাবেশে কবি ইহার ভাবের রূপদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই তিনি পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন।" [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা

ছয় ঋতুকে নিয়ে নৃত্য গীত। গ্রীষ্ম রিক্ত, নিঃস্ব, ধ্যানমগ্ন তপস্বী, বর্ষার সজল শ্যামলিমা, শরতের আলোকোজ্জ্বল শুভ্রতা, হেমন্তের অন্নদাত্রী লক্ষ্মীরূপ, শীতের শীর্ণ নগ্নতা, সব শেষে বসন্তের নবযৌবন মূর্তি। ছয় ঋতুর এই রূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে নটরাজ নৃত্য করে চলেন। তাঁর নৃত্যপর দুই চরণে ধ্বংস ও সৃষ্টি, রিক্ততা ও পূর্ণতা, ভীষণতা ও কমনীয়তা, সুখ ও দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যু একই ছন্দে বিধৃত।—

"নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্ব তনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়
বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়,… …
তব নৃত্যের প্রাণ-বেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,……
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে।…"

শ্রাবণ গাথা

বর্ষার পালাগান। 'শেষ বর্ষণের' অনুরূপ। রাজসভায় নটরাজ ব্যাখ্যা করেন—বর্ষার মধ্যে বিশ্ব বেদনার বিরহের সুর ও শুভ্র সমুজ্জ্বল শরতের আবির্ভাব।

পাত্রপাত্রী: রাজা। নটরাজ। সভাকবি। নর্তক উগ্রসেন ও নর্তকী শ্যামলিমা। গায়িকা—কমলিকা, গীতরসিকা, সকরুণা, পুরবিকা, মঞ্জুলা, বিদ্যুন্ময়ী, কিশলয়িনী, বিজুলি, যমুনা, অরুনিমা প্রভৃতি।

আলোচনা প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"কবির অনেক ঋতু-উৎসব সম্বন্ধীয় পুস্তকের মধ্যে একজন রাজা থাকেন এবং একজন কবি থাকেন। রাজা হইতেছেন বৈষয়িক, আর কবি হইতেছেন সৌন্দর্য লক্ষ্মীর উপাসক। কবির আনন্দের ছোঁয়াচে রাজা বিষয়কর্ম ভুলিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য পূজায় মাতেন, এমন কি অর্থসচিব পর্যন্ত টাকার থলির ভার ভুলিয়া আনন্দে নৃত্য করেন। ঋতু উৎসবগুলির অন্তরের কথাই এই। প্রকৃতির সহিত মানব-মনের মিলনেই বিশ্বের আনন্দোৎসব পূর্ণতা লাভ করে।"

[—রবিরশ্মি

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"...রবীন্দ্রনাট্যের তিনটি ধাপ আছে। এক শ্রেণীর নাটকে মানব অভিনেতাই দৃষ্ট হয়, প্রকৃতির কোনো স্থান নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে মানুষ প্রধান অভিনেতা, প্রকৃতি সজীব ও সঙ্কেতময় পটভূমিকা। তৃতীয় শ্রেণীর নাটকে প্রকৃতি প্রধান অভিনেতা, মানুষ পটভূমিতে মাত্র আছে, কখনো ব্যাখ্যাতা-রূপে, কখনো কেবল দর্শকরূপে মাত্র।...

শ্রেণী বিচারের যে সঙ্কেত দিলাম তদনুসারে আমাদের মতে নিম্নলিখিত পাঁচখানি নাটককে প্রকৃত ঋতুনাট্য বলা চলে। শেষ বর্ষণ, বসন্ত, নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা, নবীন ও শ্রাবণ গাথা।..." [—রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য পাঠকালে একটি মূলভাব স্মরণ রাখিতে হইবে।... ঋতুর অন্তর্নিহিত ভাবগুলির সঙ্গেও মানব জীবনের ভাবের গভীর মিল আছে। বর্ষার মধ্যে আছে বিরহ, কোমলের সঙ্গে কঠোরের সমাবেশ,—শরতের মধ্যে আছে মিলনের আনন্দোচ্ছ্বাস; বসন্তের রাজ বেশের মধ্যে আছে বৈরাগ্য। এই হাসি-অশ্রু, বিরহ-মিলন, ত্যাগ-ভোগের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে মানব জীবন। এই প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনকে মিলাইয়া তাহার রস, রহস্য ও তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেই মানবজীবন হইবে সার্থক—বাহির ও ভিতরের হইবে পরিপূর্ণ মিলন। ইহাই সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-মানব-সম্বন্ধের দর্শনবাদ।" [—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার নতুন রূপ।

পাত্রপাত্রী: কাব্যনাট্যের অনুরূপ।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা

'চণ্ডালিকার' নতুন রূপ।

পাত্রপাত্রী কিছু নতুন যোগ হয়েছে: দইওয়ালা, চুড়ীওয়াল', রাজবাড়ীর অনুচর, বৌদ্ধ নারী, ফুলওয়ালী ও শিষ্যাদল প্রভৃতি।

নৃত্যনাট্য শ্যামা

'কথা' কাব্যগ্রন্থের 'পরিশোধ' কবিতাটির নাট্যরূপ।

পাত্রপাত্রী: রাজকন্যা শ্যামা ও তার সহচরীগণ। উত্তীয়। বণিক বজ্রসেন ও তার বন্ধু। কোটাল ও রাজপ্রহরী।

নৃত্যনাট্য শাপমোচন

'পুনশ্চ' গ্রন্থের একটি গদ্য কবিতা এই নাটকের মূল কাহিনী। এবং আখ্যানবস্তু 'রাজা' নাটকের অনুরূপ।

পাত্রপাত্রী: গন্ধর্ব সৌরসেন। সৌরসেনের পত্নী মধুশ্রী। দেবরাজ ইন্দ্র ও শচী: গান্ধারের রাজপুত্র অরুণেশ্বর। মদ্র রাজকন্যা কমলিকা প্রভৃতি।

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ বহু বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি মোটামুটি কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে :

ভ্রমণকথা : য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১০ খানি চিঠি)। য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি (২২শে আগষ্ট ১৮৯০ থেকে ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত ডায়ারি)। জাপান যাত্রী (১৫ খানি চিঠি)। পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি (২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ পর্যন্ত ডায়ারি)। জাভাযাত্রীর পত্র (২১ খানি চিঠি)। রাশিয়ার চিঠি (১৪ খানি চিঠি ও উপসংহার)। পারস্যে (১১টি পরিচ্ছেদে ১১ এপ্রিল ১৯৩২ থেকে ৮ মে পর্যন্ত ডায়ারি)। পথের সঞ্চয় (আরব সাগর, লোহিত সাগর ও বিলাত থেকে লেখা ১৩১৯ সালের কয়েকখানি চিঠি)।

ভাষা ও সাহিত্য : প্রাচীন সাহিত্য (৬টি প্রবন্ধ)। লোক সাহিত্য (৪টি প্রবন্ধ)। সাহিত্য (১৮টি প্রবন্ধ ও চিঠি)। আধুনিক সাহিত্য (১৯টি প্রবন্ধ)। শব্দতত্ত্ব (২২টি প্রবন্ধ)। বাংলা ভাষা পরিচয় (২০টি পরিচ্ছেদ)। ছন্দ (১০+২ প্রবন্ধ + ১৯টি চিঠি)। সাহিত্যের পথে (১১+৮টি প্রবন্ধ)।

দেশ ও সমাজ : আত্মশক্তি (৯টি প্রবন্ধ)। ভারতবর্ষ (১ টি প্রবন্ধ)। চারিত্রপূজা (৬টি প্রবন্ধ)। স্বদেশ (৫টি প্রবন্ধ)। সমাজ (২১টি প্রবন্ধ)। কালান্তর (২৫টি প্রবন্ধ)। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। রাজা-প্রজা (১০টি প্রবন্ধ)। সমূহ (৩+১৬টি প্রবন্ধ)। সভ্যতার সংকট।

শিক্ষা : শিক্ষা (১৩টি প্রবন্ধ)।

জীবনকথা : জীবনস্মৃতি। ছেলেবেলা।

ধর্ম : শান্তিনিকেতন (১৫৩টি উপদেশ)। ধর্ম (১৫টি প্রবন্ধ)। মানুষের ধর্ম (২টি প্রবন্ধ)।

নানা বিষয়ক : পঞ্চভূত (১৬টি প্রবন্ধ)। বিচিত্র প্রবন্ধ (১৪টি প্রবন্ধ) ব্যাজকৌতুক (৯টি প্রবন্ধ)। সঞ্চয় (৮টি প্রবন্ধ)। পরিচয় (১০টি প্রবন্ধ)।

চিঠিপত্র : চিঠিপত্র (৯খানি চিঠি)। ছিন্নপত্র (১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত ১৫২ খানি চিঠি। ভানুসিংহের পত্রাবলী (১৯১৭ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

প্রণামের শ্রেণীভেদ আছে। ১ নম্বর সহজ প্রণাম হচ্ছে গ্রীবা বাঁকিয়ে জোড় হাত কপালে ঠেকানো। যখন বলি গড় করি তোমার পায়ে, তখন বোঝায় এমন কোনো ভঙ্গী করা যেটা বিনম্রতার দ্যোতক। গড় শব্দে একটা বিশেষ রকমের ভঙ্গী বোঝায় তার প্রমাণ তার সঙ্গে "করা" ক্রিয়া পদের যোগ। সেই রকম ভঙ্গী করে প্রণাম করাই গড় করে প্রণাম করা। নমস্কার হই বলি নে, নমস্কার করি বলি — গড় করি সেই পর্যায়ের শব্দ। গড়াই, গড়াগড়ি দিই শব্দে বুঝতে হবে শরীরকে একটা বিশেষ অবস্থাপন্ন করি, এর সংসর্গে "হই" ক্রিয়াপদ আসতেই পারে না, বস্তুত গড় করে প্রণাম করা হচ্ছে পায়ের কাছে গড়িয়ে প্রণাম করা, সেই ভঙ্গীটা রূঢ় হয়। রবীন্দ্রনাথ

'মঞ্জু মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে]

চিঠির সমষ্টি)। পথে ও পথের প্রান্তে (১৯২৬ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত চিঠির সমষ্টি) ছিন্নপত্রাবলী (১০৭ খানি চিঠি)।

বিজ্ঞান ঃ বিশ্বপরিচয় (৬টি প্রবন্ধ)।

আলোচনা প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন,—

"...উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধের গদ্যে প্রথম জীবনে কিছু কাঁচা হাতের ছাপ ছিল, কিন্তু পত্র-সাহিত্যের গদ্যরীতি যেন প্রথম থেকেই পরিণত—পরবর্তীকালে অধিকতর চর্চা ও যত্নের ফলে এর স্বাচ্ছন্দ্য সুমসৃণ হয়েছে, অধিকতর প্রসারিত হয়েছে বক্তব্যের প্রকরণ।...রবীন্দ্রনাথের চিঠি শুধু খবরের প্রত্যাশাই নিয়ে আসে না, তার সঙ্গে নিয়ে আসে অপরূপ মানুষটির নিভৃততম আত্মভাষণ।... রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যের বক্তব্য ও বল দুটিই সমান তালে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য চিঠি হয়েও উপকরণ উপকরণ হয়েও রস, রস হয়েও মানুষের অন্তরাত্মার ছন্দায়িত আন্দোলন।...

'কালান্তর'-এর প্রবন্ধ সমূহে এই কালের বহু বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যিক রূপ উদ্ভাসিত। ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ক নির্ণয় প্রভৃতি সমকালীন সমস্যার বহুবিধ আলোচনায় প্রবন্ধগুলি সমৃদ্ধ। এই কারণে 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধগুলি একটি দেশ ও কালের মহৎ ইতিহাস। ভবিষ্যতে যাঁরা বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাস রচনা করবেন 'কালান্তর' তাঁদের কাছে এক মহামূল্য উপাদান হয়ে রইল ..." [—সাহিত্য বিচিত্রা

শিক্ষা সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"কেবল প্রকৃতি ও মানুষে মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের জগৎ নয়, প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবান এই তিন সত্তা মিলিয়া তাঁহার জগতের সম্পূর্ণতা।...যখন দেশের প্রচলিত স্কুলগুলি হইতে প্রকৃতি ও ভগবান নির্বাসিত, মানুষেরও মাত্র খণ্ডিত অস্বাভাবিক সম্বন্ধ, সেই সময় তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে এই তিন সত্তাকে সম্মিলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা দেশের শিক্ষা-প্রথার যে কত বড় যুগান্তর, অস্বাভাবিক অবস্থায় আমরা অত্যন্ত অভ্যস্ত না হইয়া গেলে তাহা বুঝিতে পারিতাম।..." [—রবীন্দ্র বিচিত্রা

ছিন্নপত্রাবলী সম্বন্ধে কমলাকান্ত লিখেছেন—

"...কোন একখানিমাত্র গদ্যগ্রন্থকে অবলম্বন করে যদি বলতে হয় যে, এখানে কবি সাকুল্যে ধরা দিয়েছেন, তবে তা এই বইখানি। কী জীবনপ্রবেশ, কী করুণামাধুর্য, গহন-গম্ভীরের মধ্যে কী অনায়াস উত্তরণ, নিজের প্রতিভার কী সহজ বিশ্লেষণ।..." [আনন্দ বাজার পত্রিকা—১৩৷২৷৬১

কবিতা ও গান

১। সন্ধ্যাসংগীত (২১টি কবিতা)। ২। প্রভাত সংগীত (১৩টি)। ৩। ছবি ও গান (২৭)। ৪। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৯)। ৫। কড়ি ও কোমল (৮০)। ৬। মানসী (৬৩)। ৭। সোনার তরী (৪২)। ৮। নদী (১)। ৯। চিত্রা (৩৬)। ১০। চৈতালি (৭৯)। ১১। কণিকা (১১০)। ১২। কথা (২৫)। ১৩। কাহিনী (৭)। ১৪। কল্পনা (৫০)। ১৫। ক্ষণিকা (৬৩)। ১৬। নৈবেদ্য (১০০)। ১৭। স্মরণ (২৭)। ১৮। শিশু (৬২)। ১৯। উৎসর্গ (৫৯)। ২০। খেয়া (৫৬)। ২১। গীতাঞ্জলি (১৫৭)। ২২। গীতিমাল্য (১১১)। ২৩। গীতালি (১০৮+১+১১)। ২৪। বলাকা (৪৫)। ২৫। পলাতকা (১৫)। ২৬। শিশু ভোলানাথ (২৮)। ২৭। পূরবী (৭৭)।২৮। লেখন (২৫ পৃষ্ঠা)। ২৯। মহুয়া (৬৯)। ৩০। বনবাণী (১৪)। ৩১। পরিশেষ (৬৯+২৯)। ৩২। পুনশ্চ (৫০)। ৩৩। বিচিত্রিতা (৩২)। ৩৪। শেষসপ্তক (৪৬+১০)। ৩৫। বীথিকা (৭৭)। ৩৬। পত্রপুট (১৮+৬)। ৩৭। শ্যামলী (২২)। ৩৮। খাপছাড়া (১০৫+২+২৪)। ৩৯। ছড়ার ছবি (৩২)। ৪০। প্রান্তিক (১৮)। ৪১। সেঁজুতি (২২)। ৪২। প্রহাসিনী (১৪+১+১৮)। ৪৩। আকাশ প্রদীপ (২১+১)। ৪৪। নবজাতক (৩৫)। ৪৫। সানাই (৬০)। ৪৬। রোগশয্যায় (৩৯+১)। ৪৭। আরোগ্য (৩৩+১)। ৪৮। জন্মদিনে (২৯)। ৪৯। ছড়া (১১+১)। ৫০। শেষ লেখা (১৫)।

মোট কবিতার সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজারের মত।

গীতবিতানে কবির যে সব গান আছে :

পূজা ৬১৬+১। স্বদেশ ৪৬। প্রেম ৩৯৫। প্রকৃতি ২৮৩। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২০। নাট্যগীতি ১০০। জাতীয় সংগীত ১৬। পূজা ও প্রার্থনা ৮০। আনুষ্ঠানিক সংগীত ১৪। প্রেম ও প্রকৃতি ৬০৭। পরিশিষ্ট ৩০। এছাড়া কয়েকটি নৃত্যনাট্য আছে: কালমৃগয়া (৩৬টি গান), বাল্মীকি প্রতিভা, মায়ার খেলা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা, গীতিনাট্য মায়ার খেলা ও পরিশোধ। গীতিনাট্যগুলি বাদ দিলে মোট গানের সংখ্যা হয় ১৭০৮টি।

এই কাব্যের ভাবধারা ছয়টি ভাগে ভাগ করা চলে :

১। উচ্ছ্বাস যুগ—'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে কড়ি ও 'কোমল' পর্যন্ত। এ যুগে

উচ্ছ্বাস ও হৃদয়াবেগের প্রাবল্যই বেশি। ২। 'মানসী' থেকে 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত প্রকৃতি-মানব সৌন্দর্য-বোধের যুগ। এই যুগে প্রকৃতি-সৌন্দর্য ও মানবের প্রেম —রূপ জগৎ ও ভাবজগতের সমন্বয় হয়েছে। ৩। 'নৈবেদ্য' থেকে 'গীতালি' পর্যন্ত ভগবদ্‌ভাব-অনুভূতির যুগ। ভগবানের বিচিত্র অনুভূতিই এই সময়কার কাব্যের বিষয়বস্তু। ৪। 'বলাকা' থেকে 'পরিশেষ', 'বীথিকা', 'নবজাতক', 'সানাই' পর্যন্ত দার্শনিক তত্ত্বের যুগ। এই যুগে নিত্য-অনিত্যের লীলা, সৃষ্টির সহিত ভগবানের সম্পর্ক, প্রেম-সৌন্দর্য-মৃত্যুর স্বরূপ প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্ব কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। ৫। 'প্রান্তিক' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত আত্ম-উপলব্ধির যুগ। আত্মা নিত্যস্বরূপ মহান ব্রহ্মের অংশ, উপনিষদের এই সত্য অনুভূতি কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। ৬। ছোটদের জন্য কবিতা ও ছড়া।

আলোচনা প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন –

"রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সেই সেই অবস্থায় রচিত তাঁহার কাব্যের এমন এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে তাঁহার কাব্যকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার জন্য তাঁহার জীবনের কথা কিছু কিছু জানা দরকার; আর কোন কবির জীবন নিজ কাব্যের ধারাকে একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া চলে নাই। কবির জীবনের বড় বড় পরিবর্তনগুলি প্রথম কাব্যের মধ্য দিয়া নিগূঢ় ইঙ্গিত মাত্রে প্রতিফলিত হইয়া শেষে জীবনের ঘটনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে।"

[–কাব্য-পরিক্রমা

নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন –

"রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির মূল কথা এবং সকলের চেয়ে বড় কথা হইতেছে, 'সৌন্দর্য'—তিনি দেখিতেছেন সুন্দরকে এবং দেখাইতেছেন সেই সুন্দরকে সুন্দরভাবে; যেখানে যাহা কিছু সুন্দর—প্রকৃতির রাজ্যে হউক আর অন্তরের রাজ্যে হউক, কায়ে হউক মনে হউক বাক্যে হউক তিল তিল করিয়া সকল স্থান হইতে সকল সৌন্দর্য কুড়াইয়া লইয়া তিনি কাব্যের গড়িয়াছেন তিলোত্তমা মূর্তি। তাঁহার ভাষা সুন্দর —শব্দের লালিত্য, ছন্দের লাস্য তাঁহাতে পাইয়াছে বোধ হয় পরাকাষ্ঠা। তাঁহার ভাব সুন্দর—চিন্তার বৈদগ্ধ্য, অনুভবের সৌকুমার্য অতি বিচিত্র ও মনোহর। তাঁহার আখ্যানের বিষয় ও বস্তু নিজে নিজেই সুন্দর। শব্দের অলঙ্কার, অর্থের অলঙ্কারে—মণ্ডলের পর মণ্ডল দিয়া—তাহাকে আবার অধিকতর অলঙ্কৃত সুন্দর করিয়া তিনি ধরিয়াছেন।"

[—বাঙলার প্রাণ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"যাঁহার কাব্য অতিমাত্র ব্যাপক, যাহা নিজে শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্। যাহার শিক্ষা—কর্মে সুখমস্তি, যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্। যাহা বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সহিত একাত্ম, যাহার মধ্যে জগতের নাড়ীস্পন্দন স্পষ্ট অনুভূত হয়, যাহা সামান্যতা পরিহার করিয়া ভূমানন্দের অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে, যাহা মানবের মনকে আমিত্ব পরিহার করিয়া বিশ্বের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়, যাহা বিশ্বের ভিতর দিয়া মানবমনকে বিশ্বেশ্বরের চরণপদ্মের অভিমুখীন করে। ইহা ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব সাধনা, এবং এই লক্ষণটি আমরা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই অত্যন্ত পরিস্ফুট দেখিতে পাই।···

রবীন্দ্রনাথ একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্যরাশি, অপর দিকে ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাবৈশ্বর্য একত্র সমাহৃত করিয়া নিজের প্রতিভার অপূর্ব ছাঁচে ফেলিয়া যে অনন্ত-লালামশায়িনী তিলোত্তমা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে।···

সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া সত্যের ও প্রেমের সাধনা করা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যজীবনের ইতিহাস।···

যে কবি দেশ-কালকে অতিক্রম করিয়া শাশ্বত সত্যকে যত বেশী প্রকাশ করিতে পারেন তিনি তত বড় কবি। রবীন্দ্র এই হিসাবে কবীন্দ্র, তিনি শাশ্বত সত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত।" [—রবিরশ্মি

যতীন্দ্রমোহন বাগচি লিখেছেন—

"···রবীন্দ্রনাথ যে ভাবেই হউক,—আর যে রূপেই হউক, যে মূর্তি যখন গড়িয়াছেন তাহার খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা বা অস্পষ্ট ইঙ্গিত রেখায় অঙ্কিত; খানিকটা তাহার ইন্দ্রিয়-গোচর, খানিকটা অতীন্দ্রিয় কল্পনা বা অনুভূতির আয়ত্ত; খানিকটা মাটি, খানিকটা জল, খানিকটা আলো, খানিকটা বাতাস, খানিকটা-বা সূক্ষ্মতর আরও কিছু; প্রকৃতির এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির উপাদানে, ইঙ্গিতে, আভাষে, রেখায়, কল্পনায়, ওতঃপ্রোত অবর্ণনীয় রসভঙ্গিতে রচিত, রহস্যে আবৃত ও অন্তরের অপূর্ব রঙে রঞ্জিত।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পাঠ-কালে এই সত্যটি মনে রাখিতে হইবে।"

[—রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

"আসলকথা কোনও কাব্যকে, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রকাব্যকে কোনও বিশেষ চিহ্নে, কোনও বিশেষ নামে চিহ্নিত বা নামাঙ্কিত করা যায় না। নানা বিভিন্ন ধারা, আপাতবিরোধী ভাব ও অনুভূতি একই কবিতায় হয়ত একটা সমগ্র রূপ ধরিয়া প্রকাশ পায়, বিশেষভাবে কবিজীবনের যুগসন্ধিকালে যে সব কাব্যের রচনা সেই সব কবিতায়। তবু আলোচনা ও বিশ্লেষণ যখন আমরা করিতে বসি তখন নিজেদের বোধের সুবিধার জন্য প্রবলতর ভাব ও অনুভূতি অনুসারেই কাব্যপর্যায়ের নামকরণ করিয়া থাকি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা ভুলিলে চলিবে না, কবির কাব্যে যে-মনের প্রকাশ আমরা দেখি সে-মনের মধ্যে জড়াজড়ি করিয়া থাকে বিচিত্র ভাব ও অনুভূতির ধারা, শতেক যুগের গীতি, রসের সরু মোটা সহজ জটিল উপলব্ধি। তবু, সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য, সকল বিচিত্রতা, সকল জটিলতা অতিক্রম করিয়া এক এক সময় এক একটা সুর, এক একটা অনুভূতি প্রবলতর হইয়া প্রকাশের মধ্যে ধরা দেয়।"

[—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"সামান্যের মধ্যে অসামান্যের ব্যঞ্জনা, ক্ষুদ্র, নগণ্য তুচ্ছের মধ্যে মহান্ ও বিরাটের স্পর্শ, সংসারের কাদা মাটি-আবর্জনার মধ্যে ভাবের স্বর্গ রচনার আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার কবিপ্রতিভাকে চিরকাল প্রেরণা দিয়াছে।…

কিশোর-কবি তাঁহার অপরিণত রচনা 'কবি-কাহিনীর' মধ্যে খুব ঘটা করিয়া বিশ্বপ্রেমের কথা প্রচার করিয়াছেন।… তারপর যখন 'সন্ধ্যাসংগীতের' যুগে তাহার প্রতিভার স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন, তখন পূর্বেকার দীর্ঘ-আখ্যায়িকা-কেন্দ্রিক, বহির্মুখ ঘটনা সমন্বিত-কাব্য লেখা ছাড়িয়া দিয়া একেবারে আত্মগত ভাবানুভূতি-প্রকাশক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিকবিতা লিখিতে লাগিলেন।…'কড়ি ও কমল'-এর শেষের দিক হইতে যুবক মনে একটা বাস্তব চেতনা আসিয়াছে। 'মানসী' হইতে যখন তাঁহার কাব্যপ্রতিভা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে তখন এই বাস্তব সৌন্দর্য ও প্রেমকে তিনি ভাবলোকে উত্তীর্ণ করিয়াছেন, অলৌকিক রহস্যের আবরণে মণ্ডিত করিয়া উপভোগ করিয়াছেন। 'মানসী' হইতে 'চিত্রা' পর্যন্ত চলিয়াছে এই মানসিক অবস্থা। তারপর এই অখণ্ড প্রেম ও সৌন্দর্যের সত্তাকে বিশ্বসৃষ্টির মূল অনন্ত সৌন্দর্যময় ও প্রেমময় সত্তার সহিত মিশাইয়া দিয়া জগতের সমস্ত সৌন্দর্য ও প্রেমের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনে উহাদিগকে এক চিরন্তন,

অনির্বচনীয় তাৎপর্য দান করিয়াছেন।...এই অনুভূতি চলিয়াছে 'চৈতালী' হইতে 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত। তারপর প্রকৃতি ও মানবজীবনের অভিব্যক্ত এই সৌন্দর্যপ্রেমের ভোগকে ত্যাগ করিয়া সৃষ্টির মধ্যে অনুস্যূত সৌন্দর্যময় ও প্রেমময় স্রষ্টার অনুভূতি ছাড়িয়া, স্রষ্টার প্রত্যক্ষ অনুভূতির পথ ধরিয়াছেন---সেই অসীম সৌন্দর্যময় প্রেমময়ের সঙ্গে লীলায় মাতিয়াছেন কবি 'খেয়া' হইতে 'গীতালি' পর্যন্ত।... তারপর 'বলাকা' হইতে 'পরিশেষ'-এর মধ্য দিয়া 'বীথিকা' 'পত্রপুট' পর্যন্ত সৃষ্টির স্বরূপ ও রহস্য, মানবের অন্তর্নিহিত সত্তার রহস্য, অনিত্য প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে নিত্যের লীলা, নিজের জীবন পর্যালোচন, তাহার ব্যক্তি সত্তার স্বরূপ প্রভৃতি নানা দার্শনিক ভাব-চিন্তা ও রহস্য-ধ্যানের অপূর্ব সমারোহ হইয়াছে তাঁহার কাব্যে। তারপর 'প্রান্তিক' হইতে তাঁহার ভাবজীবনে আর একটা পরিবর্তন আনিয়াছে।..কবি এই শেষযুগে একেবারে আধ্যাত্ম-সত্য-দৃষ্টির ঋষিতে পরিবর্তিত হইয়াছেন।" [---রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা

শিবনারায়ণ রায় লিখেছেন--

"মাইকেল বাংলা কবিতায় যে বিপ্লব আনলেন, তা পূর্ণতা পেলো রবীন্দ্রনাথে।...রবীন্দ্রনাথের পরিশীলিত প্রেরণায় সংস্কৃত ও দেশজ শব্দসম্ভার এবং ইউরোপীয় ভাবসম্ভারের পরিপূর্ণ স্বীকরণ ঘটলো...বাংলা ভাষার বিশিষ্ট প্রকৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করে তিনি তাকে ধীরে ধীরে নিজের প্রয়োজনের উপযোগী করে নিয়েছিলেন।...

...তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষ দশ বছর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় নতুন নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ এনে এবং রূপ সৃষ্টি করে বাঙালী পাঠককে বার বার বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিলেন।" [—নায়কের মৃত্যু

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিজেই নিজেকে ব্যক্ত করে, অন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না;...চারদিকের প্রত্যক্ষ এই পৃথিবী দিনে-দিনে যেমন করে দেখা দিয়েছে তাঁর চোখের সামনে, নাড়া দিয়েছে তাঁর মনের মধ্যে, তাই তিনি অফুরন্তবার বলেছেন; প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের সাড়া, মুহূর্তের বৃন্তের উপর ফুটে-ওঠা পলাতক এক একটি রঙিন বেদনা—তাই ধরে রেখেছেন তাঁর কবিতায়, আর কবিতার চেয়েও বেশি তাঁর গানে। এইজন্য তাঁর কবিতা এমন দেহহীন, বিশ্লেষণ বিমুখ; তার সারাংশ বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাকে দেখানো যায় না ভাঁজে-ভাঁজে খুলে; যেটা কবিতা, আর যেটা পাঠকের মনে

তার অভিজ্ঞতা, ও-দুয়ে কোনো তফাৎই তাতে নেই যেন; তা আমাদের মনের উপর যা কাজ করবার করে যায়, কেমন করে তা করে আমরা ভেবে পাই না, সমালোচনার কলকব্জা দিয়েও ধরতে পারিনা সেই রহস্যটুকু;—শেষ পর্যন্ত হার মেনে বলতে হয় তা যে হতে পেরেছে তা-ই যথেষ্ট, তা ভালো হয়েছে, তার অস্তিত্বেরই জন্য—আর-কোনোই কারণ নেই তার।...বাংলা সাহিত্যে আদিগন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তিনি, বাংলা ভাষার রক্তমাংসে মিশে আছেন;...রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহার্যতা, ক্রমশই বিস্তৃত হয়ে, বিচিত্র হয়ে প্রকাশ পাবে বাংলা সাহিত্যে।...তাঁর জীবৎকালের ইতিহাসে এমন-কোনো তথ্যই বোধ হয় নেই, তাঁর রচনাবলীর কোনো-না-কোনো অংশে যার উল্লেখ না আছে।...

...স্বকালকে অবলম্বন করে ব্যক্ত করেছেন চিরকালকে, স্বদেশের জীবনের মধ্যে প্রকাশ করেছেন বিশ্বজীবন। মহাকাবদের সমসাময়িকতার বৈশিষ্ট্য এইখানে যে সমসাময়িক প্রসঙ্গকে উপলক্ষ্য করে তাঁরা যা বলেন, ভিন্ন দেশে ভিন্ন সময়েও তার সার্থকতা নষ্ট হয় না, যে-কোনো দেশের, যে-কোনো কালের বিশেষ প্রসঙ্গের মধ্যে তা যেন মানিয়ে যায়, ভিন্ন-ভিন্ন পারবেশে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যঞ্জনা তার বিচ্ছুরিত হয়। এইজন্যেই তাঁরা স্থায়ী, এইজন্যেই যুগে যুগে বিচিত্র তাঁদের আবেদন।

সমসাময়িক থেকে চিরন্তনে পৌঁছবার দিগন্ত দীর্ঘ পথে রবীন্দ্রনাথের জয়যাত্রা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।..." [—সাহিত্য চর্চা

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন—

"...মানুষ যে বস্তুকে বড় মনে করে, মানুষে যুগে যুগে তার আলোচনা করবেই। মহাকবির বাণী কোনও দেশের গণ্ডীতেও আবদ্ধ নয় কোনও কালের গণ্ডীতেও নয়। ফলে যুগে যুগে তার নব নব টীকা ভাষ্য রচিত হবেই। ঐ টীকা ভাষ্যই প্রমাণ যে যা বড় তা মানুষের মনকে চিরদিনই উত্তেজিত করে আর সেই সঙ্গে তাকে মুখর করে তোলে।...

...রবীন্দ্রনাথ যখন মহাকবি, তখন এক কথা ভরসা করে বলা যায় যে ভবিষ্যতে যুগ যুগ ধরে, তাঁর কাব্যের আলোচনা হবে, এবং ভবিষ্যৎ মানব তাঁর কাব্য থেকে নূতন রস নূতন প্রাণ আহরণ করবে।" [—বিচিত্রা, আশ্বিন'৩৮

শ্রীমরাও শাস্ত্রী লিখেছেন—

সকলেই জানেন আমাদের মধ্যে সঙ্গীত ও গীত এই দুইটি শব্দ প্রচলিত

আছে। এই দুইটি শব্দকে বিচার করিয়া দেখিলে ইহাদের মধ্যে অর্থভেদ বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই। যেখানে স্বরই প্রধান থাকে তাহাকে বলে সঙ্গীত, আর যেখানে ভাবের প্রাধান্ত থেকে, সুর কেবল ভাবেরই অনুসরণ করে তাহাকে বলে গীত।...

...এটি অবশ্যই স্বীকার্য যে সব কিছুই পরিবর্তনশীল।...লোকের রুচি যেমন যেমন বদলাইতেছে সঙ্গীতও সেই রুচির অনুগামী বলিয়া বদলাইতে থাকিবে। এই বদলের কর্তা কাল।...

তারপর মুসলমান আমল হইতে সঙ্গীতে এক মস্ত ভুল থাকিয়া গেল যে ভাবে ও সুরে মিল হইল না। তাহার প্রধান কারণ মনে হয়—আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় ছিল না বলিয়া তাঁহারা গানে ভাব দিতে পারেন নাই।

...ধরুন আশাবরী করুণ রসপ্রধান রাগিণী, কিন্তু তাহাতে আদি রসের অনেক গান আছে। পরজের সুরটি কেহ যে ডাকিতেছে এই ভাব সূচিত করে কিন্তু ঐ রাগে "কারী কারী কমরিয়া" অর্থাৎ হে গুরু আমায় কালো রঙের কম্বল দাও প্রভৃতি এই ভাবের প্রাচীন ওস্তাদী গান রহিয়াছে। ইহাতে রাগ ও ভাবের মিল নাই। কিন্তু উপর্যুক্ত ঐ দুই রাগে পূজনীয় গুরুদেবের আশাবরীতে "নিশিদিন মোর পরাণে" আর পরজে "ডাকো নিশীথে" এই গান দুটির তুলনা করুন, এখানে রাগে ও ভাবের মিলন অপূর্ব। এরূপ শত শত গানে তাঁহার ভাব ও রাগের ঐক্য বিরাজমান।

ভাবুক সঙ্গীত-গায়ক বৈষ্ণবরা ভাব দিতে পারেন কিন্তু সুর দিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা সুরের বৈচিত্র্য শিক্ষা করেন নাই।...ভাব রস সুর তাল প্রভৃতিতে সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ গান যদি কাহারো থাকে তাহা পূজনীয় গুরুদেবের।"

—বিচিত্রা, ভাদ্র'৩৮

শুভ গুহঠাকুরতা লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। এই বিরাট ভাণ্ডার আবার এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সমগ্রভাবে ও যথাযথ জানা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার।...যে সতেরোটি ধারার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত রচনার শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে তার মধ্যে—ধ্রুপদ ও ধামার, খেয়াল ও ঠুংরী, টপ্পা, ভাঙা গান ও লোকসঙ্গীত এই পাঁচটি গীতধর্মী পর্যায় আছে। রবীন্দ্রনাথ যে ছয়টি নূতন তাল সৃষ্টি করেছেন তার মর্যাদা দেবার জন্ত 'নূতন

তালের গান' শীর্ষক একটি গীতধর্মী পর্যায় সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ছাড়া কাব্যসঙ্গীত, প্রেমসঙ্গীত, ধর্মসঙ্গীত, ঋতুসঙ্গীত, উদ্দীপক, হাস্যরসাত্মক, দেশাত্মবোধক, শিশু সঙ্গীত, ভানুসিংহের পদাবলী, আনুষ্ঠানিক ও বেদগান এই অবশিষ্ট এগারোটি হলো কাব্যধর্মী পর্যায়।…" [— রবীন্দ্র সংগীতের ধারা

তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত তিনটি যুগে ভাগ করেছেন: ১৮৮১ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত কুড়ি বছর প্রথম যুগ বা শিক্ষানবীশ যুগ; ১৯০০ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত কুড়ি বছর মধ্যযুগ বা পরীক্ষার যুগ, ১৯২১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত একুশ বছর শেষ যুগ অর্থাৎ সৃষ্টির যুগ।

তিনি বলেছেন —"রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার মধ্যে আমরা আর একটা জিনিস পেয়েছি যার ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। এ হল ছন্দ বৈচিত্র্য। এতো বিভিন্নরকম ছন্দের ব্যবহার হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে, যার প্রয়োগ ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি।"

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"যাঁরা বলেন স্বরসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়, তাঁরা যেমন ভুল করেন, তেমনি ভুল করেন তাঁরা যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানকে বলেন কথার ফুলঝুরি।… কারণ স্বরস্রষ্টা বা স্বর-বিশ্লেষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি নয়, তাঁর বৈশিষ্ট্য স্বরের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং প্রয়োগে,—স্বরের ভাবগত ঐক্যকে কাজে লাগানোতে।… অপরপক্ষে কেবল বাক্যসম্পদেই তাঁর গান অনবদ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান আছে যা শব্দ সংগঠনে বিশিষ্ট, বাক্‌মাধুর্যে চিত্তহারী, কিন্তু সুর ছাড়া হলে যা নীরহারা মীনের মত।…

নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য কথা দিয়ে কিভাবে সুরকে বশ করতে হয়, সুর দিয়ে কিভাবে কথাকে জাগানো যায় তার শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ।…"

তাঁরা আরও একটি কথা বলেছেন - [—রবীন্দ্র সংগীতের ভূমিকা

"রবীন্দ্রনাথই বোধহয় সবপ্রথম শিশুদের উপযোগী গান লিখলেন, এবং প্রচুর লিখলেন।"

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

"কালিদাসের পরে এত বড় কবি-প্রতিভা ভারতবর্ষে আসে নি, আর এ প্রতিভা কালিদাসকেও ছাড়িয়ে গেছে সৌন্দর্যের গভীরতায়, সৃষ্টির বৈচিত্র্যে ও অনুভূতির অন্তর্লীনতায়।…

রবীন্দ্রসংগীতের চারটি মহল আছে। প্রথম হচ্ছে খাঁটি রাগ সংগীতের মহল। এখানে গানের কথার অংশে, ভাবের অংশে, বিশেষত্ব ফোটালেন তিনি। অসামান্ত কবিত্ব গানের কথার মধ্যে দেখা দিলো…

তারপরে তাঁর গান-সৃষ্টির দ্বিতীয় মহলে একটি গানকে একটি রাগে না বেঁধে, একটি শুদ্ধ রাগের কাঠামোর মধ্যে অন্ত রাগের সুরকে স্থান দিলেন রবীন্দ্রনাথ।…

রবীন্দ্রসংগীতের তৃতীয় মহলে তিনি বাউল, ভাটিয়ালি, সারি, কীর্তন প্রভৃতি সুরে তাঁর গান-রচনা করলেন।… তাঁরা খাঁটি লোক-সংগীতের সুরেই হলো…

রবীন্দ্রনাথের গানের চতুর্থ মহলে…এ মহলে যে গানগুলির বাসা তারা একেবারে নতুন সৃষ্টি…ভারতীয় সংগীতের অন্যতম স্বরস্রষ্টা হিসেবে গণ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ এই মহলের গানগুলি সৃষ্টি করে।…

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের গানের জগতের একজন অসাধারণ স্রষ্টা।…

তিনি ভারতীয় সংগীতের নৈর্ব্যক্তিকতাকে ব্যক্তির অনুভূতির প্রকাশের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী করেছেন। তিনি ভারতীয় সংগীতকে মানবধর্মী ও ব্যক্তি-ধর্মী করেছেন।

তিনি কথার সঙ্গে সুরের অপূর্ব মিলন ঘটিয়েছেন অথচ কথাকে যেতে দেননি সুরকে ছাপিয়ে।" [—রবীন্দ্রনাথের গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—

"বিশ্ব-কবি-সভায় মোরা তোমারই করি গর্ব
বাঙালী আজ গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব।"

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গ্রন্থ :

অজিত চক্রবর্তী—রবীন্দ্রনাথ
কাব্য পরিক্রমা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমাদের বিশ্বকবি

অমল হোম—পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

অমিতা মিত্র—রবীন্দ্র কাব্যালোক

অশোক সেন—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

ডঃ আদিত্য ওহদেদার—রবীন্দ্র-সাহিত্যের কয়েক দিক
রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ধারা

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব

উপেন্দ্রকুমার কর—গীতাঞ্জলির সমালোচনা

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা
রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস

কাজী আবদুল ওদুদ—রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রসংগীতের ভূমিকা

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়—রবি-পরিক্রমা

কানন বিহারী মুখোপাধ্যায়—মানুষ রবীন্দ্রনাথ

ডঃ কালিদাস নাগ—সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ

কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত—গীতাঞ্জলির ভাবধারা

ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী—বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা

ক্ষুদিরাম দাস—রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভা

গুণময় মান্না—রবীন্দ্রনাথ

গৃহস্থ—রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী

গোপাল রায়—রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পরিহাস

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রবি-রশ্মি (২ খণ্ড)

চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি—রবীন্দ্র-রচনা-কোষ

জগদীশ ভট্টাচার্য—সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ

ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়—সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ

জয়ন্ত ভাদুড়ি ও শিশির সেন—বাহিরবিশ্বে রবীন্দ্রনাথ
জীবনকৃষ্ণ শেঠ—রবীন্দ্র নাটক প্রসঙ্গ
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ
তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত—রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচয়
দক্ষিণারঞ্জন বসু—শতাব্দীর সূর্য
দেবজ্যোতি বর্মন—রবীন্দ্রনাথ
ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—রক্তকরবীর তত্ত্ব ও তাৎপর্য
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্র চর্চার ভূমিকা
নির্মলকুমারী মহলানবিশ—বাইশে শ্রাবণ
কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে
ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (২ খণ্ড)
প্রতিমা ঠাকুর—নির্বাণ
প্রফুল্লকুমার সরকার—জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ
প্রফুল্লকুমার বসু—রবিদাদা
প্রবোধচন্দ্র সেন—ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথ
ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী—রবীন্দ্র সৌন্দর্য দর্শন
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-জীবনী (৪ খণ্ড)
রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী
রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী
প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ
রবীন্দ্র কাব্য-নির্ঝর
রবীন্দ্র নাট্য-প্রবাহ (৩ খণ্ড)
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন
প্রেসিডেন্সি কলেজ রবীন্দ্র-পরিচয় সভা—কবি পরিচিতি
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-শ্রী
রিয়ালিষ্ট রবীন্দ্রনাথ
বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য—প্রভাত রবি
বিনয়কুমার সরকার—রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী
ডঃ বিমলকান্তি সমদ্দার—রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব
বিশ্বপতি চৌধুরী—কাব্যে রবীন্দ্রনাথ
কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ
বিশ্বভারতী—রোঁলা ও ঠাকুর
বুদ্ধদেব বসু—সব পেয়েছির দেশ
রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য
ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত—রবীন্দ্র সাহিত্য
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয়
ভারতচন্দ্র মজুমদার—জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ
ভোলানাথ সেন—রক্তকরবীর মর্মকথা
ডঃ মনোরঞ্জন জানা—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস
মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেম
মৈত্রেয়ী দেবী—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ
বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ
মোহিতলাল মজুমদার—কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য (২ খণ্ড)
মৌমাছি—শিশু রবি
মৌলবী একরামুদ্দীন—রবীন্দ্র প্রতিভা
যামিনীকান্ত সোম—ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ
ছোট্ট রবি
যতীন্দ্রমোহন বাগচি—রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য
রবীন্দ্র পরিষদ—কবি পরিচয়
রবীন্দ্র পরিচয় সভা—জয়ন্তী উৎসর্গ
রবীন্দ্র-জয়ন্তী ছাত্র-ছাত্রী উৎসব পরিষদ—কবি প্রশস্তি
রাণী চন্দ—আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ
রাণী চন্দ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ঘরোয়া
রেণু মিত্র—রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
রবীন্দ্র হৃদয়

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী— পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ
সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্র-মানসের উৎস-সন্ধানে

শচীন সেন—রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়

শিবকৃষ্ণ দত্ত—রবীন্দ্র সাধনা

শিবনারায়ণ রায়—রবীন্দ্রনাথ

ডঃ শিশির কুমার ঘোষ—রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য

শুভ গুহঠাকুরতা—রবীন্দ্র সংগীতের ধারা

সরসীলাল সরকার—রবীন্দ্রকাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা

সজনীকান্ত দাস—রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য

ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ

সুধীরঞ্জন দাশ -আমাদের শান্তিনিকেতন

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত -রবি দীপিতা

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের গান

হরনাথ পাল— নাট্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথ

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র দর্শন

হেমেন্দ্রকুমার রায়—সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ

* সাধারণ তালিকা ; ইচ্ছা করে কোন বইয়ের নাম বাদ দেওয়া হয়নি, নতুন নাম এর সঙ্গে যুক্ত হবে।